উৎসর্গ

"জীবন-তীর্থ" গ্রন্থখানি আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র অচিন্ত্যকুমার এবং বধূমাতা অর্চনার হাতে সমর্পণ করলাম।

ব. ত. ম.

ভূমিকা

Writers' realism, অর্থাৎ "লেখকের বাস্তব" ব'লে একটা কথা মেনে নেওয়া হয়েছে পাঠক এবং সমালোচক মহলে। গল্পে-উপন্যাসে সৃষ্টি যেখানে বাস্তব-ভিত্তিক—সেখানে তার খানিকটা রঙ ফলাবার অধিকার স্বীকৃত।

আত্মজীবনী উপন্যাস-গোষ্ঠীর অন্তর্গত নয়, সুতরাং সম্পূর্ণ বাস্তবনিষ্ঠ হবে ব'লে একটা প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু এখানে বাধা এই যে, সমস্ত-টুকুই লেখকের স্মৃতি নির্ভর। আয়ুর যতই দীর্ঘতা, এবং সেই কারণে ঘটনাবলীর বিপুলতা, এবং তজ্জনিত জটিলতা, সেখানে স্মৃতিবিভ্রমের সম্ভাবনা ততই বেশি থেকে যায়।

আমার কথাই ধরা যাক। সাহিত্যক্ষেত্রে আমার জীবনালেখ্যের কোন স্থান থাকতে পারে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকায় আমি এতদিন এ-কাজ থেকে বিরতই ছিলাম। তারপর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এবং পাঠক-পাঠিকার তাগিদে যখন প্রবৃত্ত হলাম তখন দেখি আমি আয়ুর আশিটা বছর প্রায় পেরিয়ে এসেছি। তখন দত্তাপহারক আমার বিধাতা তাঁর-দেওয়া অনেকগুলি শক্তি ধীরে ধীরে আত্মস্থ ক'রে নিতে আরম্ভ করেছেন।

আমি আমার জীবনের মূল ঘটনা আর 'চরিত্র'গুলি যথাযথই রাখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু, একে এতদূর থেকে দৃষ্টি বুলিয়ে আসা, তার ওপর আমার জীবনের গতিও ঋজু পথ দিয়ে নয়, ফলে, বিস্মৃতি তার রবার দিয়ে মাঝে মাঝে তার কাজ ক'রে গেছে। এইসব ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কিছু কিছু কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে—অর্থাৎ, ঘটনা বা সংলাপ কোন্ পথে গিয়ে চিত্রটিকে পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল সেটা কল্পনার সাহায্যে পূরণ ক'রে নিতে হয়েছে। আমার 'বাস্তব' বাস্তবই, শুধু এই একটু রঙ-রেখার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে এখানে ওখানে।

এই প্রসঙ্গে আরও দু'টি কথা ব'লে দিতে হয়—

"জীবন-তীর্থ" আমার বিরাশি বৎসর বয়সে এসে শেষ হয়েছে। এর পরও প্রায় আড়াইটে বৎসর শেষ হোল। আয়ুচক্রের সঙ্গে ঘটনাচক্রও সমান্তরালেই আবর্তিত হ'য়ে চলেছে কিন্তু তার বিবরণ আর এখানে এনে. ফেলা যায়না। আমি শুধু দু'টি ব্যাপারের উল্লেখ করব। আমার স্বজাতির কাছ থেকে তাদের সমাদরের যা নিদর্শন পেয়েছি, পুরস্কার-

আদিতে, তার একটি তালিকা একস্থানে দিয়েছি। এরপর আরও যে-দু'টি এরূপ প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে, তার উল্লেখ ক'রে তালিকাটি পূর্ণ ক'রে দেওয়ার এই সুযোগ গ্রহণ করলাম—

(১) ১৯৫৮ সালের "শরৎ পুরস্কার" এবং (২) ১৯৫৮ সালে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত "নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের" সুবর্ণ জয়ন্তী পদক। বিলম্বটুকুকে কাজে লাগিয়ে দেশবাসীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

সর্বশেষ নিবেদন, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হওয়ার পর আমায় অভিশপ্ত বিদ্যুৎ-সংকট এবং তৎসঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী প্রেস ধর্মঘটের সম্মুখীন হ'তে হয়। এখানে যাদের নানাদিক দিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অকুণ্ঠ সাহায্যে বইখানির প্রকাশন সম্ভব হয়েছে—সর্বশ্রী শৈলেন্দ্র নাথ গুহরায়, দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত, দেবব্রত দাশগুপ্ত, সরোজ দত্ত, শোভন বসু, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রসিত রায় চৌধুরী প্রভৃতি—তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমি যেদিন জন্মাই সেদিন আমাদের পরিবারে খুব বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটে; সেটি আর কিছু নয়, আমার জন্মগ্রহণই। নিতান্ত দৈবানুগ্রহে পরিবারের কেউ বিপদটা সদ্য সদ্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। যথারীতি শাঁখ বেজেছিল, যদিও নিজের শঙ্খনিনাদের দিকে মন থাকায় আমার কানে যায়নি। রীতিমতো ষেটেরা, আটকৌড়ে, ষষ্ঠী-সুবচনী পূজা প্রভৃতি জাতকর্ম সম্পন্ন হয়ে পুত্রসন্তান লাভের আনন্দের মধ্য দিয়ে প্রায় মাসখানেক কেটে যায়। তারপর মোটামুটি একটা বৎসরও বলা যেতে পারে, যেমন শুনেছি পরিবারের মধ্যে আমার বাল্য-জীবন আলোচনার প্রসঙ্গে। তারপর থেকেই বৎসর পূর্বের শুভ ঘটনাটি যথার্থই শুভ ছিল কিনা সে বিষয়ে সকলে সন্দিহান হতে আরম্ভ করেন।

প্রথম লক্ষণ, দৌরাত্ম্য—দুরন্তপনাই,—তবে আমার ক্ষেত্রে তার জাতই নাকি আলাদা ধরনের ছিল, নব নব উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে। তবু ব্যাপারটা সাধারণই বলা চলে; দুরন্ত শিশুদেরও একটা যে মোহ বিস্তার করে স্নেহ-মমতা আকর্ষণ করবার স্বাভাবিক শক্তি আছে তাইতেই একরকম করে কেটে যায়; স্নেহ-মমতার কুহেলীই সবার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রাখে, ভবিষ্যতের দিকে অতটা যেতে দেয় না। আমার সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই তাই হয়ে থাকবে। তবে আর একটি লক্ষণ যে প্রকাশ পেতে থাকে, তাতে অনেকের মন বিচলিত হয়ে ওঠে। ভাবটা এইরকম দাঁড়ায়—এ ছেলে বৃথা, এর লালন-পালন-বর্ধনের জন্য মাতৃস্তন্য থেকে শুরু করে যা কিছু ব্যয় করা হচ্ছে তা ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে মাত্র। দুরন্তপনার ফাঁড়াগুলো কাটিয়ে যদি মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় বেঁচেও যায়, এ ছেলেকে কিন্তু ধরে রাখা যাবে না।

যে কোনও গৃহস্থের পক্ষে এমন বিপুল অপব্যয়ের যে মূলে, তাকে একটা মূর্তিমান দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

এবার লক্ষণটার কথায় আসা যাক, তার আবিষ্কারের ইতিহাসেও।

'পা হওয়ার পর' এটা আছড়ানো, ওটা ছড়ানো, সেটা হারানোর মধ্যে

আমি একটি ভাঙ্গা একতারার ফাটা লাউয়ের নাকি অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়ি, স্থানীয় ভাষায় নাম ছিল 'তুম্বা'। যে সব বর্ণনা শুনেছি উত্তরকালে, আমার কোমরে একটি হলদে রঙে-ছোবানো কৌপীন এঁটে দিয়ে তুম্বাটি হাতে নিয়ে ছেড়ে দিলে আর বিশেষ গোল থাকত না। 'তুম্বারে বদ বদ' বলে সেটা বাঁ হাতে বুকে চেপে ডান হাতে বাজাতে বাজাতে বেশ খানিকক্ষণ নিজের মনে বাইরে-ভেতরে ঘুরে বেড়াতাম আমার স্বভাবসিদ্ধ দুরন্তপনা ভুলে। কথাটুকুর অর্থ ছিল—তুম্বারে তুমি বাজো বাজো। অর্থাৎ যন্ত্র আর যন্ত্রীর মধ্যে এমন একটা ইঙ্গিত ছিল, একটা বোঝাপড়া, যা নিবিড় আত্মীয়তা না থাকলে হয় না।

একটা শুক্‌নো ফাটা লাউ, কিন্তু, পরিবারের মধ্যে তার যত্নের অন্ত ছিল না।

এই সময় একদিন আমার সেজো পিসিমা ত্রিনয়নী দেবী তাঁর বাপের বাড়ী এলেন, অর্থাৎ তাঁর শ্বশুরালয় কোন্নগর থেকে পাণ্ডুলে। যে-যুগের কথা, তখন মাত্র গঙ্গার এপারে দ্বারভাঙ্গা পর্যন্ত রেল এসেছে, আমাদের পাণ্ডুল থেকে তেরো-চৌদ্দ মাইল দূরে। পিসিমা প্রথমবার আসেন বিবাহের এক বছরের মাথায়, এবার এলেন চার বছর পরে। সেজো পিসিমা শুনেছি শিশুকাল থেকে বেশ একটু গিন্নিবান্নি গোছের ছিলেন। এবারে কোন্নগরে বাংলার জলহাওয়ায় পাঁচ বছর কাটিয়ে একেবারে পরিপক্ক গৃহিনী হয়ে এলেন।

দৈবক্রমে তাঁর বিবাহও হয় একটি বনেদী সাত্বিক পরিবারে। সেকালের সাত্বিক পরিবার, নানাবিধ আচার বিচারে আর পঞ্জিকা-প্রবাদের নির্দেশে যার দৈনন্দিন জীবনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকত।

এহেন বাড়ীর বড়বৌ, বয়স যাই হোক, একেবারে অথরিটি হয়ে উপস্থিত হলেন সেজো পিসিমা। ঠাকুরমা বেঁচে রয়েছেন, প্রৌঢ়াই, পাশের বাড়ীতে জ্যাঠাইমা রয়েছেন, মা রয়েছেন, দুটি সন্তানের জননী, সবাই যেন একটু নিষ্প্রভই হয়ে গেলেন। সুদূর মিথিলার দূর অভ্যন্তরে একটি নগণ্য পল্লীগ্রাম পাণ্ডুল, সেখানে থেকে থেকে দিন দিন অজ্ঞতাই স্তূপীভূত হচ্ছে তো তাঁদের আচরণে-বিশ্বাসে।

নিজের অভিমত, নিজের মন্তব্য জোরের সঙ্গে বলবার বেশ একটা সহজ ক্ষমতাও ছিল পিসিমার।

যেদিন আসেন সেই দিনেরই কথা। বিকালে উঠান থেকে বেশ ভাল করে রোদ সরে গেছে, দাওয়ায় বসে সবই সবাই গল্প-স্বল্প করছেন, মা, পিসিমা, পাশের বামনপাড়া থেকে দু'তিনজন পিসিমার মৈথিল বাল্যসখী। ছোটদের মধ্যে, ছোট পিসিমা, ও-বাড়ির ছোড়দি। আমি

পিসিমার কোলে, সদ্য ঘুম থেকে উঠে বায়না ধরেছি, পিসিমা ভোলাবার চেষ্টা করছেন, পেরে উঠছেন না।

মা উঠে ঘরে গিয়েছিলেন কাজললতা আনতে, বেরিয়ে এসে বললেন—'পারবে না ঠাকুরঝি, অতিরিক্ত বদ ছেলে হয়েছে, তোমার ভাইপো। ওর একটিমাত্র ওষুধ আছে, দাঁড়াও।'

ছোট পিসিমাকে ইঙ্গিত করলেন—'যাও তো ছোট ঠাকুরঝি।' ছোট পিসিমা আমায় তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। যখন বেরিয়ে এলেন, আমার কোমরে সেই হলদে রঙের কৌপীন, হাতে ফাটা তুম্বা। ছেড়ে দিলেন উঠানে। সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর। তুম্বা বাদনের সঙ্গে সঙ্গে ছোট পিসিমা আর ছোড়দিও নেমে পড়েছেন, হাততালি, হুল্লোড়, দেখতে দেখতে গমগম করে উঠলো উঠান। শ্বাশুড়ি তখনও তাঁর ঘরে নিদ্রিতা, বামনটুলির মেয়েদের দেখাদেখি মাও বারকয়েক হাততালি দিয়ে—'দেখছ তো সেজ ঠাকুরঝি'—বলে পিসিমার দিকে চেয়ে আরম্ভ করতে যাবেন, থেমে গিয়ে বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে উঠলেন—'কি হোল ?'

চুপ করে উঠানের দিকে চেয়ে বসেছিলেন পিসিমা। অতিরিক্ত গম্ভীর, বললেন—'তাই দেখছি বসে বসে অবাক হয়ে, ক্রমে তুমিও দিব্বি হাত তালিতে যোগ দিলে—মা হয়ে—কিন্তু জিজ্ঞেস করি, পারবে এ ছেলেকে ঘরে আটকে রাখতে ?'

'কেন ? কি হোল ঠাকুরঝি !'—মা শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, মুখের যত আলো এক মুহূর্তে গেছে নিভে। পিসিমা বললেন—'তাই দেখছিলাম। শিশু আর সব ছেড়ে বিবাগী-বৈরিগীদের একটা একতারার ভাঙা তুম্বার সঙ্গে এত গলাগলি কেন রে বাপু ?'

'বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে ছেলে ?'—শুষ্ক কণ্ঠে ঢোক গিলে প্রশ্ন করলেন মা।

'কার মনে কি আছে, কি করে বলব বৌদিদি ? আমি তো 'জান্' নই। তবে লক্ষণটা তো ভাল নয়। কোথায় সাবধান হবে, না উলটে আরও ছেলের কোমরে গেরুয়া-কোপনি পরিয়ে তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে...অবাক কাণ্ড।'

'আমি নয় ঠাকুরঝি। বায়না ধরলেই নাতিকে ঐটে পরিয়ে তুম্বাটা হাতে দিয়ে মা বসলেন দাওয়ায়, ওর নাচ, ওঁর হাততালি—ক্রমে হা-ক্লান্ত হয়ে ছেলে এসে ঠাকুমার কোলে এলিয়ে পড়বে। বাড়ি ঠাণ্ডা।'

উঠানের দিকে চেয়ে বললেন—'থামো ছোট ঠাকুরঝি, পাঁচকড়ি থাম্ মা। নিয়ে আয়, ঘেমে উঠেছে।'

পিসিমা কথার জের ধরে বললেন—'মার না হয় বয়সের ভীমরতি ধরেছে, কিন্তু তুমি···'

'ভুতোন খামোকা নেমে গেল কেন রে? লাগল—টাগল নাকি?—' বলতে বলতে ঠাকুরমা বেরিয়ে এলেন তাঁর ওদিককার ঘর থেকে।

বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও-বাড়ি থেকে জ্যাঠাইমা এলেন, পিসিমা আসার খবর পেয়ে বামনটুলি থেকে কয়েকজন বর্ষীয়সীও এসে উপস্থিত হলেন। চার বছর পরে আসা, শ্বশুরবাড়ির কথা থেকেই শুরু হয়ে আলাপ-আলোচনা শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ল।

তুম্বার কথাটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। তবে যতই সময় যাচ্ছিল মার মনের ভেতরের দিকে প্রবেশ করে কাঁটার মত খচখচ করছিল। বউ হিসাবে তাঁর কথায় যোগ দেওয়ার সুযোগ কম বলে আরও অন্তর্লীন হয়ে উঠছিল ব্যাপারটুকু। একসময় আমার প্রসঙ্গ একটু এসে পড়তে, সুযোগ বুঝে পাশ কাটিয়ে বললেন—'কিন্তু সেজো ঠাকুরঝি কি বলছিলেন যেন। বলো না ঠাকুরঝি।'

'বলতে হবে বৈকি, যেমন নিশ্চিন্দি হয়ে আছেন সবাই'···—একটি ছোট গৌরচন্দ্রিকা ক'রে পিসিমা এবার বেশ ফলাও করেই নিজের আশঙ্কার কথাটা এনে ফেললেন।—শ্বশুরালয়ে তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কার এই রকম লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করে যান, কোন্নগরে কার বাড়িতে এই ধরণের লক্ষণ কোন প্রতিবেশীর শিশুর মধ্যে প্রকাশ পাওয়ায় তাঁর আতঙ্কিত হয়ে উঠে কি ক'রে দোষ কাটান—এইসব দৃষ্টান্ত দিয়ে বেশ একটি দুশ্চিন্তার পরিবেশ সৃষ্টি করে তুললেন পিসিমা। ঠাকুরমা ন-পাড়ার পুরাতন ঘটক বংশের মেয়ে। বোধহয় কোন্নগরের সামনে ন-পাড়ার মাথা হেঁট না করবার জন্যই খানিকটা সাহস দেখিয়ে শুরু করলেন—'তিনু অমনি শ্বশুরবাড়ি থেকে মস্তবড় ভট্টাচার্যি হয়ে এল! শিশু, সে একটা ফাটা লাউ নিয়ে খেলা করছে, অমনি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবে।'

প্রসঙ্গটা কিন্তু আরও ঘোরালই হয়ে উঠল। মেয়েদের রসনার পক্ষে এমন রুচিকর প্রসঙ্গ তো সদাসর্বদা পাওয়া যায় না। বামনটুলির দুলার-মনের মা বললেন—এতদিন বলেন নি—ভাবতেন কি দরকার তাঁর ব'লে সবার মন খারাপ করবার—কিন্তু আমি যেদিন জন্মেছি, তাঁদের বাড়িতে বৈদ্যনাথ থেকে যে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন, তাঁর পেতলে-বাঁধানো গঞ্জিকার ছিলিমটি নাকি চুরি যায় কি করে। এদিকে আমার কান্না উঠেছে, সাধু নাকি একটু চকিত হয়ে শুনে বলেন—'এ শিশু সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকতে বলে দিও গেরস্থকে। বাবা বৈদ্যনাথের উচ্ছুগ্যু

করা কল্‌কে চুরি যাওয়া—ছেলে যেমনি জন্মাল—ভালো লক্ষণ নয় একটা !'

'অমনি তুলারমনের মাও যোগ দিলে ।' —ঠাকুরমা টিপ্পনী করলেন। বললেন—'তা, কিছু চেয়ে নিলে না কেন সন্ন্যাসীর কাছে ?'

'চাইতে হবে কেন ? ওর ওষুধ জানা নেই আমার ? সকাল সকাল ছেলের বিয়ে দিয়ে দাও । তোমরা ষোল-সতেরো না হলে বিয়ে দেবে না, ততদিনে ছেলের মতিগতি বদলে যায়—বিশেষ করে এই ধরণের ছেলের ।'

—'বেশ, তোমার নাতনী হয়েছে, রেখে দিও আমার নাতির জন্যে ।'

ঠাট্টা চালাবার চেষ্টা করেন ঠাকুরমা, কিন্তু গলার স্বর স্তিমিত হয়ে আসে ।

একটা পরিত্যক্ত লাউয়ের খোল, সম্বন্ধটা যত নিবিড়ই হোক আমার সঙ্গে, একটি গঞ্জিকার ছিলিম, যতই কেন লোভনীয় হোক তার ঝকঝকে পিতলের সাজে, একটি সদ্যজাত শিশুর পক্ষে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে আত্মসাৎ করবার কোন উপায় ছিল না । প্রয়োজনের কথা বাদই দিলাম, তবু এই দুই বস্তু আমার শৈশবকে সবার দৃষ্টিতে আতঙ্কে যথেষ্ট বিষাদময় করে রেখেছিল । নিবিড়ঘন মমতার মধ্যেও একটি বিরামহীন আতঙ্কের ছায়া—'আহা ও আর কদ্দিনেরই বা ?'

পিসিমা কিন্তু শুধু আতঙ্ক সৃষ্টি করেই নিরস্ত হন নি, প্রতিষেধেরও ব্যবস্থা করে দেন । কোন্নগরের বিশালাক্ষী দেবীর পায়ের ফুল । বহুদিন পর্যন্তই বিভিন্ন স্থানে আরও সব প্রতিষেধেরও সঙ্গে আঁটা ছিল আমার গায়ে। আমি যে গৃহত্যাগ করিনি, সকলের বিশ্বাস, এরা সব চারিদিক থেকে আমায় আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখবার জন্যেই । সে একতারার তুম্বা, সে সব রক্ষাকবচ একে একে লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তবু আজ যে আমি মুক্ত হয়েও মুক্ত হতে কেন পারলাম না, এর রহস্য পিসিমার কাছে জিজ্ঞেস করে নেওয়া হয়নি ।

এ প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে একটা কথা বলে রাখতে হয়, মার পরেই সেজ পিসিমার স্নেহবাৎসল্য আমি সবচেয়ে বেশী পেয়েছি । কথাটা অন্যভাবেও বলা যায়, মা,—মা বলেই তাঁর স্নেহ-মমতার রংটা ছিল অন্য রকম । পিসিমা একটু তফাৎ বলে তাঁর বেলায় সেটা ছিল যেন আরও গাঢ় । পিসিমা ছিলেন আমার সে-যুগের শেষ বন্ধন । তাঁর স্নেহ-মমতা দিয়ে তিনি যেন আমায় তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আগলে আগলে রেখেছিলেন । সে স্নেহ-মমতার একদিকে যেমন পলাতক-বৃত্তির ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য আশঙ্কা ছিল, তেমনি উত্তরকালে যখন একটার পর একটা বিবাহের সম্বন্ধ বাতিল করে দিয়ে গেছি, নিজের ভবিষ্যৎবাণীর সাফল্যে,

স্নেহের সঙ্গে যেন একটি প্রশ্রয়ের হাসিই ফুটে উঠেছে পিসিমার মুখে। তার সঙ্গে মিশে গেছে অটল বিশ্বাস। হাসিটুকু ভাষায় রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়—এ তো বলেই দিয়েছিলাম। তবে যাবে কোথায়?—মায়ের কবচ এঁটে দিয়েছি না?

এটুকু আত্মাভিমানও থাকবে না মানুষের মনে?

পাণ্ডুল। আমার জন্মভূমি পাণ্ডুল। কোনও বড় শহর নয়। একটা ভালোরকম গণ্ডগ্রামও নয়। সেকালে সুদূর মিথিলার একটি সামান্য পল্লী। এক প্রান্তে একটি নীলকুঠি, নূতন যুগের পদক্ষেপ। তাই অবলম্বন করে গায়ে-গায়ে-লাগা আমাদের দু' ঘর বাঙালী পরিবার। সম্বন্ধে মামাতো-পিসতুত ভাই। তাতেই যা একটু আছে নূতন যুগের। মেটে বাড়ি, সে সব দিনের বাবুদের কোয়ার্টারস। সামনে দিয়ে গ্রাম্য পথ। তার ওধারে ঘন শাখাপল্লবে দুটি পুরাতন বৃক্ষ, পাশাপাশিই, একটি বট, একটি অশথ, কত যুগের সাক্ষী কে বলবে? এর পরেই 'জিরাৎ', নীল চাষের দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ। আমাদের বাসার সামনের রাস্তাটা বাঁ-দিকে আর ডান দিকে ঘুরে পাণ্ডুলের স্বল্পপরিসর বাজারটাতে গিয়ে মিশেছে। মাঝখানে, বাসার পেছনেই বামনটুলি, ডাইনে দুসাদপাড়া, বাঁয়ে 'পনডুব্বি' পুকুরের উঁচু পাড়ে কয়েক ঘর কুর্মি। পুকুরটা বড়ই, তার ওধারে হাটের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, আম-জাম-অশথের ছায়ায়। পাশ দিয়ে কমলা নদীর একটা সরু সুঁতি বয়ে গেছে। আর সব সময়ে একটু ঝির-ঝিরে স্রোত, বর্ষায় দু'কুলপ্লাবী বন্যা। শান্ত কমলা তখন দুর্মদ, বিপুল

আর দুটো কথা বললেই পাণ্ডুল যায় ফুরিয়ে! আমাদের সামনের রাস্তাটা বাঁয়ে খানিকটা এগিয়ে তিন ভাগ হয়ে তিন দিকে বেরিয়ে গেছে। একটা ঘুরে দুসাদটোলি হয়ে বাজারের দিকে, একটা সোজা 'পণ্ডিতজী -পোখরা।' সেখানেও একটা আম-জাম-কাঁটাল-বাঁশ ঝাড়ের নিবিড় শ্যামলিমার মধ্যে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণেরই বাস। তৃতীয়টা সোজা দক্ষিণে সকরি ষ্টেশনের দিকে চলে গেছে।

পাণ্ডুলের স্মৃতি আমার ঠিক কি নিয়ে, কবে থেকে আরম্ভ বলা শক্ত। পাণ্ডুলের নিস্তরঙ্গ জীবনে কিছু ঘটত না। ঘটলেও এখানকার সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন দুটি বাঙ্গালী পরিবারের জীবনে তার ঢেউ এসে পৌঁছাত না। যদিবা কালে ভদ্রে তরঙ্গাঘাত হোল—দু'পুরুষের জীবন, খানিকটা অন্তরঙ্গতা হয়েছে—তবু একটি শিশুর মনে তার কোনও দাগ পড়ত না। নিত্যদিনের দু-একটা ঘটনা, নিত্য দেখা কিছু দৃশ্যের মধ্যে দু-একটা দৃশ্য কি করে আলাদা হয়ে আঁকা হয়ে গেছে মনের পটে তাই

নিয়ে আমার সেকালের পাগুল। অত আদরের তুম্বা, আমার জীবনের পারিবারিক আলোচনায় যা অতখানি জায়গা জুড়ে ছিল—কিছুমাত্র মনে নেই আমার। সবচেয়ে শৈশবে আমি নিজেকে যা দেখছি তা একটি শিশু নীলকুঠিতে যাওয়ার রাস্তার মাঝখানে চওড়া-পাতা সেগুন গাছের ছায়ায় বসে আপন মনে ধুলার ঘর তৈরী করে যাচ্ছে, মনে আছে হয়তো গঠনের প্রণালীটা আজকের দৃষ্টিতে অভিনব বলেই। ডান পা-টি একটু হাঁটু মুড়ে বাড়িয়ে দিয়ে তার উপর একটু একটু ভিজে ধুলি চাপিয়ে ভালো করে চাপড়ে চাপড়ে পা-টি বের করে নিতে একটি ঘর হয়ে যাচ্ছে। এমনি করে দু-তিনটি ঘর। কে সঙ্গী ছিল, তারপর ঘরগুলো নিয়ে হোতই বা কি—সে সব কিছু মনে নেই। লক্ষণ মিলিয়ে মনে হচ্ছে বয়স তখন আড়াই পেরিয়ে তিনের কাছাকাছি হবে।

আরও একটু এগিয়ে—

বাবার আফিসের সময় ছিল দু-খেপ। প্রথম, সকালে বেরিয়ে দুপুরের কাছাকাছি পযন্ত। দ্বিতীয় দফা প্রায় দুটো আড়াইটে থেকে একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তাঁর এই বেরুবার সময়ের স্মৃতিটা বেশ স্পষ্ট। উপলক্ষ্য একটি দুর্লভ পানীয়। বাবা আফিসের সাজে প্রস্তুত হয়ে বসেছেন। মা রূপায় বাঁধানো হুঁকাটা এনে হাতে তুলে দিলেন।

শেষ করে এক গেলাস জলপান করে বাবা আফিসে চলে গেলেন। সরবৎও নয়, কর্পূর-বাসিত জলও নয়। অম্বুরী জাতীয় ভালো তামাকের যে মিঠে একটা গন্ধ লেগে থাকত জলে—খানিকটা ছেড়েই রাখতেন বাবা —সেইটুকু ছিল বাল্য রসনার মুখ্য আকর্ষণ। এটাতেও বোধহয় ভাবী সন্ন্যাসের সূচনা কিছু পেয়েছিল প্রকাশ। কিন্তু এ নিয়ে কোনও আলোচনা কানে যায় নি। হয়তো ততদিনে প্রথম আতঙ্কের ঝোঁকটা কেটে গিয়ে জাতকের ভবিষ্যৎ ছেড়ে বর্তমান নিয়েই পড়েছে বেশি সবাই।

আরও একটু এগিয়ে—

দুরন্তপনাটা তখন অন্য একটা মোড় নিয়েছে। তাতে বরং বলা যায় আমার ভাবী জীবনের ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি,—পরিব্রাজক বৃত্তি। শৈশব থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এটা আমার থেকে গেছে জীবনে। তীর্থ নয়, অন্তত তীর্থ বলেই তীর্থ নয়। নিতান্ত উদ্দেশ্য-হীনভাবেই ঘুরে বেড়ানো। সঙ্গী পেলাম তো ভালোই, নয়তো নিঃসঙ্গই। আমার মনে হয়েছে পিসিমার কবচ আমার অদৃষ্টের সঙ্গে একটা রফা করে বিদায় নিয়েছিল। যেমন একেবারে লোটা-কম্বলধারী সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে দেয় নি, তেমনি আবার আমার ভবঘুরে বৃত্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে যায় নি।

বাবা চলে যাওয়ার পর থেকেই আমিও বেরিয়ে পড়বার ফন্দি-ফিকির আঁটতে থাকতাম। খুব যে শক্ত ব্যাপার ছিল এমনও নয়। এই সময় বাড়িটা প্রায় নিশুতিই থাকত। ঠাকুরমার ঘরে ঠাকুরমা, ছোট পিসিমা, আমার পরের ভাই হরি, স্নেহ-বণ্টনে আমার ভাগেরও অনেকখানি তার উপর গিয়ে পড়েছে। ঠাকুরমার প্রিয় পাত্র, তারপর আর যদি কেউ এল। আমি এদিকে—যাতে মার অসুবিধা না হয় নজরে নজরে রাখতে। বাবা খেয়ে দেয়ে যতক্ষণ ঘুমুতেন, মা এ-ঘরের ও-ঘরের পাট সেরে নিতেন। আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থাকতাম। বাবা বেরিয়ে গেলে আমার মার পাশে শুয়ে ঘুমুবার কথা। এইবার আমার সময় হোত।

মা ছিলেন একটু নিদ্রাপ্রবণই। সে কালের হিন্দুর গৃহস্থালী, ঝি-চাকর থাকলেও আচার বাঁচিয়ে চলা, তাতে খাটা-খাটুনিও বেশী হোত। তখন চারটি সন্তানের মা, কোলেরটিকে সামলাবার ধকোলও আছে, শোওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ জুড়ে আসত মার। একটা প্রায় বাঁধাধরা হুঁসিয়ারী ছিল—'খবরদার, ওই দুপুর রোদ্দুরে বেরুবিনি ভূতোন, মানুষটিকে চিনিস তো ? ···টের পেলে···কৈ, দেখি, চোখ বুজেছিস ?'

কথা এলিয়ে আসার মধ্যেই কোলেরটিকে ঘুম পাড়াতে হঠাৎ ঘুরে চাইতেন।

চোখ অবশ্য আমার আঁটাই পেতেন রোজ।

এরপর অভিযানের স্মৃতিগুলি ধোঁয়াটে। হওয়ার কথাও। বৈশিষ্ট্য স্মৃতির গায়ে রেখাপাত করে। বৈচিত্র্যে পাণ্ডুলের দৈন্য, বিশেষ করে নিদ্রাহীন দ্বিপ্রহরে স্মৃতির সমস্ত ক্ষেত্রটাই যেন একাকার করে দিয়েছে। একটি ছেলে—শৈশব আর কৈশোরের মাঝামাঝি—ময়লা, লালপেড়ে ধুতি পরা, কোমর বাঁধা—ঘুরে ঘুরে ঘুরে নিত্য দেখা জিনিষগুলোর ওপর কৌতূহলের দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছে।

কী পাচ্ছে, জীবনের এ-প্রান্তে এসে তার কোনও হদিস পাওয়া যায় না। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। আজ আমার যেন নিজের কাছেই নিজে পর হয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ ভ্রাম্যমাণ ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকা, বিস্ময়ের সঙ্গে করুণার দৃষ্টি নিয়ে। কী তার অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা যা তাকে নিত্য দেখার মধ্যেও তৃপ্ত হতে দিত না।

কখনও কখনও পাওয়া যেত সঙ্গী। ওবাড়ির জ্যাঠামশায়ের ছেলে তারক ছিল সমবয়সী। তাকে, তার ছোট ভাই বিজয়কেও হয়তো। কি করে ঠিক বলা যায় না, কেন না এ বাড়ির চেয়ে ও বাড়ির ডিসিপ্লিন বা নিয়মের বাঁধাবাঁধি ছিল কড়া, তবু দু একটা চিত্রে তারক-বিজুকে পাচ্ছি আর ছুতোর পাড়ার পড়াউয়ের ছেলে—নামটা মনে আসছেনা—বট,

কি অশথের ঘন ছায়া—কি খেলা ঠিক মনে পড়ছে না—তবে গেছো দাঁড়া-টিকটিকিগুলো শিকার করা একটা বীরত্বের খেলা ছিল মনে আছে। মনে পড়ছে একদিন শিকারের মধ্যেই পড়াউয়ের ছেলে 'বিগোবা! বিগোবা!' করে চেঁচিয়ে উঠতে তিন জনে খেলা ছেড়ে ঘুরে চাইতে দেখি হঠাৎ জিরাতের মাঝখানে একটা ঘূর্ণি পাক দিয়ে উঠেছে। শুরুই, হয়তো হাত দশেক খাড়া—তারপর পাক খেতে খেতে ধুলো, পাতা, শুকনো ডালের টুকরো যা কিছু সামনে পড়ছে, গায়ে জড়াতে জড়াতে এক সঙ্গে দশখানা তালগাছের মতো মোটা হয়ে—মাথাও গেছে আকাশ উঠে—ছুটলো পশ্চিম দিকে। এমন কিছু নূতন নয় তবে সে দিন আকারে-উগ্রতায় আর সব দিনের দেখা-গুলার মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে। ....ভূত ছাড়া তো কিছু নয়। তিনজন কাঠ মেরে গিয়ে ঠায় চেয়ে আছি। ....ছুটেছে পশ্চিমে কুঠির দিকে, সেখানে লম্বা অশথ গাছটা জিরাতের মাঝখানে একলা আছে দাঁড়িয়ে। ছায়াটুকুও সঙ্গে নেই। কুঠির হাতির খাবারের জন্যে ডালপালা সব ছাঁটা—মাথাটা উঠেছে আকাশ লক্ষ্য করে। পড়াউয়ের ছেলে বলল—দেখবে ওই গাছে মিলিয়ে যাবে। তাই গেলও। ছুটতে ছুটতে গাছটায় খেল ধাক্কা। গাছের ডাল পাতাগুলা গেল একচোট মোচড় খেয়ে। তারপর আর কিছু নেই। গাছের পাতাগুলা থরথর করে কাঁপছে। পড়াউয়ের ছেলেটা বলল—'ভূতুড়ে গাছ—ও দিকটায় যাসনি তোরা। এ রকম উড়িয়ে তুলে নিয়ে যাবে।'

ওর বাপ ছিল ভূতের ওঝা।

ছেলেবেলার স্মৃতি বেশী আলোড়ন না করেও যাদের মুখ ওঠে ভেসে পড়াউ বড়হি তাদের মধ্যে একজন। জাতে ও ছিল ছুতোর। আমাদের বাসার পশ্চিম দিক ঘেঁসে একটা তরিতরকারির বাগান ছিল। তার পাশেই ছুতোর আর কামার পাড়া। পাশাপাশি মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তা বলাও চলে আবার দুদিকের বাড়িগুলার একফালি উঠান বলাও চলে। নীল কুঠিরই বস্তি। ছোটই। সব মিলিয়ে মুখোমুখি দু-সারিতে খান কুড়ি ঘর। ছেলেদের আর মেয়েদের ঝগড়ায় সর্বদাই গমগম করত পাড়াটা। দু-পাশের মেয়েরা যখন নানা মুদ্রায়, নানা ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে মেতে উঠত ঝগড়ায়—সে এক দর্শনীয় ব্যাপার হয়ে উঠত। বিশেষ করে সে সময় ওদিকে যাওয়া বাড়ির বারণ ছিল বলেই সাধ্যমত বাদ দিতাম না। শুধু দর্শনীয় নয়, শ্রবণীয়ও। বয়সটা তখন অর্থ ধরে শ্রাব্য—অশ্রাব্য বাছবার মতো নয়। পারস্পরিক বাক্যবাণের অনেকগুলি ছিল ছড়ায় বাঁধা। অভ্যাসের অভাবে বিস্মৃতির

অতলে তলিয়ে গেছে, তবে ছন্দোবদ্ধ বলে দু-এক কলি এখনও মনে আছে। যেমন 'ভৌজো, দাদি, নানি, চাচি, সৌতিন নেহিতন।'

একক কোনও শব্দটিই অশ্রাব্য নয়, কটু তো নয়ই, সাধারণ গালাগালের মতো অশুচিও নয় বরং শেষেরটি ছাড়া সবকটিই অর্থ গৌরবে ঠিক বিপরীতই। কথা হচ্ছে—একই প্রতিপক্ষকে একসঙ্গে ভাজ, ঠাকুরমা, দিদিমা, কাকি আর সতীন আখ্যা দিলে যা অর্থ হয়। নেহিতনটা ছিল পাদপূরণে, কোনও বিশেষ অর্থে নয়। একটা কথা অবশ্য বলে রাখতে হয়। সে বয়সে এই অদ্ভুত অর্থবিকৃতি অনুধাবন করবার ক্ষমতা ছিল না। ছন্দের সঙ্গীতটাই ছিল আকর্ষক। পড়াউ আর তাদের বস্তি আমার এত বেশী করে মনে ছাপ রেখে যাওয়ার কারণ দিনের এই মুক্তাঙ্গন নাট্য, তার সঙ্গে রাত্রে এর রহস্যরূপ।

রাত্রে পড়াউ ভূত খেলাত।

শৈশবের সে এক অনুভূতি। কোনদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সমস্ত পাণ্ডুল একেবারে নিস্তব্ধ—জেগে উঠলাম একটি মাত্র শব্দের মধ্যে—পড়াউ ভূত খেলাচ্ছে—একটা টানা আওয়াজ, দু-একটা অস্পষ্ট কথা—মাঝে মাঝে হুঃ—হাঃ করে বিসর্গের ঝোঁকে শেষ হয়ে আবার নূতন করে চাগিয়ে উঠছে—দিনের সেই রোদে ঝলসান সারা পাণ্ডুলটাই যেন পড়াউয়ের ভূত খেলানোয় কি করে ঘুটঘুটে অন্ধকারের সঙ্গে গলে মিশে গিয়ে একটা প্রেতপুরী হয়ে গেছে। শুধু একটা ভূতের নৃত্য রয়েছে জেগে—দিনের বেলায় মেয়েদের সেই অঙ্গভঙ্গি সহযোগে। পনডুব্বি বাগের 'ভূতাহা পোখরায়' ডুবে মরা কাদের বধূ থেকে নিয়ে জিরাতের লম্বা অশত্থ গাছের ঘূর্ণিভূত পড়াউয়ের মন্তরের টানে এসে জড়ো হয়েছে। আর জড়ো হয়েছে ছুতোর কামার পাড়ার দিনের বেলার সেই মেয়েদের ঝগড়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে—সব ভূত হয়ে মাথার উপর বেত বেঁকিয়ে পড়াউয়ের গা দুলিয়ে দুলিয়ে বিসর্গ চন্দ্রবিন্দুর ঝোঁকে ঝোঁকে ছড়া কাটার সঙ্গে তাকে ঘিরে এক সে বিচিত্র ভূতের নাচ। নিঃশব্দ। আমার আতঙ্কিত কল্পমানসে গান আছে, ওদের ঝগড়াও আছে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে এক পড়াউয়ের হুঁঃ—হাঁঃ ছাড়া কিছু শোনার উপায় নেই। ভূতেদের শব্দও যে ভূত।

ভূতের কথায় হঠাৎ খজনীর মুখটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। কুচকুচে কালো বড় বড় গোল গোল চোখ, একটু যেন ট্যারাও, যতটা মনে পড়ছে, উঁচু বড় বড় দাঁত, হাড়-কাট মোটা, নোংরার একশেষ।

তবু ভূত প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যাওয়ার জন্য আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। কেন বলি।

রূপের বিচার, অনেকগুলা বছর পেরিয়ে এলে বদলে আসে মানুষের মনে। যে সময়ের কথা বলছি আমি—সে সময়ে ছেলেমেয়েরা রূপের বিচার করে ভালবাসার নিক্তিতে; মুখ-চোখ, রং আর সাজের সে নিরিখে খজনী কুরূপা তো ছিলই না, একটা নয়নাভিরাম সাধারণ মানবীও নয়, একেবারে পরী, এঞ্জেল।

খজনী যে স্বর্গের পরীই ছিল, তার হাতের অমৃত, মেরুয়ার রুটি ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ছোটখাট একটি চাটুর আকারের প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা একখানি কালচে-বাদামি রংএর রুটি, সোঁদা সোঁদা গন্ধ, রুটি সমাজে তার কোনও প্রতিষ্ঠাই নেই, বরং অবজ্ঞাই আছে। কিন্তু শৈশব রসনার কাছে সে যে কী অপূর্ব বস্তু ছিল তা বলে বোঝাবার নয়। একথা সবারই জানা যে গোপন অভিযান, অপহরণ সব বস্তুরই মর্যাদা বাড়ায়। দেব-ভোগ্য অমৃতের আহরণের জন্য এরকম অপপ্রয়াসের দৃষ্টান্ত পুরাণে-ইতিহাসে ভূরি ভূরি পাওয়া যাবে। বাড়ি থেকে লুকিয়ে বামনটুলির ওদিকে খজনীদের ছ্যাঁচা-বেড়া দেওয়া ঘরে এক কোণে বসে তার সঙ্গে মেরুয়ার রুটি খাওয়া ছিল আমার প্রায় সেই ধরণের পুলক-অভিযান। একটা থ্রিল। খজনী নিজে খাচ্ছে, ভেঙ্গে আমায় দিচ্ছে, সঙ্গে একটুখানি শাক্, বা চুনোমাছের ঝাল, মাঝে মাঝে সাদা গোল গোল চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন—'কেমোন লাগছে রে খোঁকা?' —চিত্রটি আজও আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি চিত্র। অবশ্য উজ্জ্বল নয়, সকরুণ। কথাটা তো চাপা থাকতে পেত না। সন্ধ্যায় আমাদের উঠানে বিচারের আম দরবার বসেছে। বিচারক বাবা নিজে, ছেলে শূদ্রের অন্ন খেয়েছে, সাক্ষী সাবুদ নিয়ে তাকে জাতিচ্যুত করা হবে। নিয়ে যাবে খজনী তার বাড়িতে। পুষবে মেরুয়া রুটি খাইয়ে। তারও বাড়ি আসা বন্ধ। ঠাকুরমা, পিসিমারা, ও-বাড়ি থেকেও কয়েকজন এসেছেন—সবাই নিরুপায় দর্শক। মা একটা খুঁটির পাশে আধ-ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। নিরুপায় আসামী আমি সবার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছি, কঠোর বিচারকের সামনে সবাইকেই নিরুপায়—মৌন দেখে চোখের জলের সঙ্গে ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে এসেছে —ঠাকুরমা বা পিসিমাদের কেউ নেমে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—

'এবারটা ছেড়ে দে বিপিন, আর করবে না। বা, এবারে ছেড়ে দাও দাদা। গোবর খাইয়ে শুদ্ধ করে নিচ্ছি।—পরের দৃশ্যে খজনীর গঞ্জনা মেয়েদের কাছে।

স্বর্গের পথ বন্ধই থাকতো কিছুদিন। তারপর আবার সেই রকম গোপন অভিযানের পর দেওয়ানী-আমে প্রকাশ্য বিচার।

খঞ্জনী ছিল, যাকে বলা হয় হুড়কো মেয়ে। যথাসময়ে বিবাহ হয়েছিল—দু-তিন বছর বয়সে যেমন ওদের হয়—কিন্তু আমাদের পাশুল ছাড়া পর্যন্ত ওকে কখনও শ্বশুরবাড়ি যেতে দেখিনি বা গিয়ে থাকতে দেখিনি। জোর করে নিয়ে গেলে পালিয়ে আসতো। ওর প্রধান আকর্ষণ ছিলাম আমরা—ভাইয়েরা। একে একে এসে মায়ের কোল ছেড়ে খঞ্জনীর দখলে চলে গেছি। ধোওয়ানো-মোছানো, খাওয়ানো—এক ভাত ছাড়া, কোলে করে টহল দিয়ে বেড়ানো, খেলনা দিয়ে সামনে রাখা—সব খঞ্জনীর চার্জে। আমার থেকে হয় আরম্ভ, কেননা দাদা প্রথম সন্তান বলে স্নেহের একটা কাড়াকাড়িই লেগে থাকত সবার মধ্যে। তখন দুই পিসিমাই বাড়িতে অবিবাহিতা, কাকিমা নূতন এসেছেন—আদর করা আগলানোর লোকের অভাব তো ছিলই না, বরং একটিকে কেন্দ্র করে কারুর স্নেহ-বাৎসল্য ফুরিয়ে যাওয়ার অবসরই পেত না। যতদূর জানি খঞ্জনী আমাদের চারটি ভাইকে একে একে কোলে নিয়ে, একে একে ফিরিয়ে দিয়ে কাটিয়ে গেছে আমাদের বাড়িতে। গড়ে তিনটে বছর করে, যার জন্য মায়াটা কারুর উপর তেমন করে জমে বসতে পায়নি, এক আমি ছাড়া। এর কারণটা সময়ের এত দূরত্ব থেকে অনুমান করা শক্ত। হয়তো ওর নারী হৃদয়ের প্রথম স্নেহ আমায় অবলম্বন করে ফুটে উঠেছিল বলেই। শুধু এইটুকুই মনে আছে—আর তিনজনেই এসে সরে গেছে, আমি কিন্তু বরাবর খঞ্জনী থেকে অবিচ্ছিন্নই থেকে গেছি।

অনেক পরের কথা, তখন আমার কিছু বোধশক্তি হয়েছে। পড়াশুনার জন্য আমাদের দু-ভাইকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা উঠেছে একটু একটু, একদিন মেরুয়ার রুটি ভেঙ্গে দেওয়ার সঙ্গে. গল্প করতে করতে খঞ্জনী হঠাৎ বলে উঠল—'না, তুই কোখোনো হামিকে ছেড়ে যাবিনি খোঁকা। চেল্লাবি, মাটিতে লোটাবি—হামির মোতোন তোকে কেউ ভালবাসেনা—দ্যাখ, তোকে হামির চোখের মধ্যে ধরে রেখেছি।'

সাদা সাদা গোল গোল চোখের নীচের দিকটা টেনে ধরল। দেখি, সত্যিই একটা ছোট পুতলী ওর চোখের মণিতে। আমি দোলার সঙ্গে দুলেও উঠল।

শৈশবের কথাগুলো যেন এলোমেলো হয়ে জমা থাকে স্মৃতির খাজনা-ঘরে, তাই হাতড়ে বের করতে গেলে একটার ঠেলায় একটা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই আসে বেরিয়ে।

দাদার কথা মনে পড়ে গেল। খঞ্জনী থেকে একেবারে দাদা—একটু অদ্ভুত বোধ হচ্ছে। কারণটা বোধহয় এই—খঞ্জনী যেমন তার অন্ধকার

মূর্তি নিয়ে আমার কাছে আলোর রূপে ছিল, দাদা তাঁর সুগৌর শান্তরূপে আমার তখনকার জীবনে খানিকটা ছায়ার মধ্যেই ছিলেন, এবং খানিকটা ব্যবধানেও। আমার সে সময়ের উদ্দাম, অবাধ্য জীবনে একদিকে ছিল অশান্ত খেলাধুলা, বাউণ্ডুলেপনা, একদিকে ছিল খজনী। মেরুয়ার রুটি অভিযানের সঙ্গে নিত্য-জাতিচ্যুতি আর নির্বাসনের আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে খজনী ছিল আরও নিবিড় হয়ে। 'তুই খা খোঁকা পেট ভরে, তোকে বেলায়ে দেয় তো হামির কাছে থাকবি।'

দাদা ছিলেন সুগৌর, শান্ত। কে মনে পড়ছে না, হয়তো পিসিমাদের কেউ বলেছিলেন—দাদার নাম শশী মানে চাঁদ। হয়তো আমার ধূলি-লাঞ্ছিত মলিন দেহের প্রতি লক্ষ্য করেই। তাতে অবশ্য ধূলি-কাদার উপশম হয় নি, তবে একটা স্নিগ্ধ গৌরবে দাদা আমার মনে চাঁদের সঙ্গে যেন এক হয়ে গিয়েছিলেন। আর দূরত্বেও।

দূরত্বের প্রধান কারণ ছিল দুটি।

প্রথম সন্তান তায় শান্তশিষ্ট—দাদার ওপর সবার স্নেহটা ছিল যেন একটু বেশীই। তাঁকে চেয়ে এবং শান্ত-শিষ্ট হওয়ার জন্য আমাদের থেকে সুলভ বলেই বেশী করে পেয়ে সবাই স্নেহ দিয়ে যেন খানিকটা আপনার করে রেখেছিলেন। এছাড়া দাদা আমাদের খেলার জগৎ থেকেও ছিলেন আলাদা। ভরা দুপুরে নির্জন বট-অশথ তলায় কিংবা কুঠির নির্জন জিরাতের সেই ঘূর্ণি ভূতের পুলক-আতঙ্কের দৃশ্যের মধ্যে দাদাকে খুঁজে পাচ্ছি না। এর সঙ্গে আরও একটা জিনিস দাদাকে আমাদের থেকে পৃথক করে রেখেছিল। দাদার তখন ছাত্রাবস্থা চলছে।

মা দাদাকে সকালে জল-টল খাইয়ে পাঠশালায় পাঠাচ্ছেন। ধুইয়ে-মুছিয়ে। চুলটা আঁচড়ে দিয়ে বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটায় একটু কামড়ে দিলেন, পথে-ঘাটে 'ডাইন-যোগীন'দের কুনজরের ভয়। হয়তো আমিও আছি, অভিনবত্বের জন্যই, 'মা আমারও' বলে হাতটা বাড়িয়ে ধরলাম। জানিনা এ ছেলের সম্বন্ধে একটা নিশ্চিন্ততা ছিল বলেই কিনা, তবে কামড়টুকু দেওয়ার সময় 'সাধ একটা!' বলার সঙ্গে প্রায় একটি হাসি ফুটে উঠত মার মুখে। বই স্লেট ধরিয়ে 'দুরুক্ষী' পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নিজে একটু আড়াল হয়ে বের করে দিলেন দাদাকে। পাণ্ডুলের কঠিন পর্দা, বাড়ির ঝিউড়ি মেয়ে হলেও একটু বয়স হলেই পিসিমাদেরও সীমা ঐ পর্যন্ত। 'দুরুক্ষি' হোল বাড়ির সদর দরজা, যাতে বাড়ির ভেতর পর্যন্ত দেখা না যায় তার জন্য ভেতর দিকে একটা ছোট দেওয়াল বা ছ্যাঁচা-বেড়ার 'টাট্টি'।

বাইরে চাকর মনরাখনা দাঁড়িয়ে থাকত। সঙ্গে করে জ্যোৎখীজীর

(জ্যোতিষীজির) পাঠশালায় নিয়ে যেত দাদাকে। দেখেছি, অন্তত শৈশবে সব ছেলেরই 'বিদ্যা-স্থানে ভয়ে বচ'। জানিনা অমন উঁচুদরের মন্ত্রটা কে তুমড়ে-দামড়ে এ রকম করেছে, তবে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই যে একক, অনন্য এমন নয়। আসল কথা, যত নিরীহই হোক, যতই বাধ্য হোক, ও-সময়টা কোনও রকম আগল, কোনও রকম নিয়মের বেড়া মানবার সময়ই নয়। অত শান্তশিষ্ট দাদা, তাঁকেও পালিয়ে আসতে দেখেছি। মনরাখনা পাঁজা করে নিয়ে যাচ্ছে, দাদা হাত-পা ছুঁড়ছেন, অনর্গল গালি বর্ষণের সঙ্গে—এমন দৃশ্য নিত্যকার না হলেও খুব বিরলও ছিল না।

এ থেকে আর একটি ব্যাপার হয়। আমার বা আমাদের মুক্ত জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকা বা নিজেকে বঞ্চিত রাখার জন্য দাদার প্রতি যে একটা করুণার ভাব ছিল সেটা পূর্ণ হয়ে উঠে তাঁকে একপ্রকার কনিষ্ঠের স্তরেই নামিয়ে দিয়ে একটা যেন অভিভাবকের ভাবই মাঝে মাঝে জাগিয়ে তুলত আমার মনে। মনরাখনাকে শায়েস্তা করবার নানা রকম ষড়যন্ত্র চলত আমাদের। এমন কি ইহজগৎ থেকে সরিয়ে ফেলবারও। কোন্ বাধার জন্য সে সব কাজে পরিণত করা হয়নি তা মনে পড়ছে না।

পাঠশালার ছুটো সময়, সকাল আর বিকেল, বাবার ছু'বার আফিসে যাওয়ার সঙ্গে এক ছিল। সুতরাং দাদার এই পাঠশালা-পলায়ন বাবার এক রকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরেই ছিল। অবশ্য শুনতেন ক্বচিৎ কখনও, দৈবযোগে নজরে পড়ে যাওয়াও সম্ভব। কিন্তু এর জন্য তাঁকে মেজাজের তারতম্যে মৃদু বা চড়া গোছের তিরস্কার ভিন্ন অন্য রকম শাসন করতে দেখি নি। অথচ সে যুগের মানুষ, বাবা ছিলেন বেত্রদণ্ডে বিশ্বাসী, এমন মাস ছিল না যাতে তাঁর ছু-একটা প্রমাণচিহ্ন কয়েক দিন ধরেই আমার পিঠে, কাঁধে বহন করে থাকতে না হয়েছে।

দাদার বেলায় ছিল যেন একটা ক্ষমা, প্রশ্রয়। হতে পারে বাবার নিজের পাঠশালা-পর্বের স্মৃতি বোধহয় এই ধরণেরই কিছু ছিল, সুতরাং দাদার পক্ষে স্বাভাবিক এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বলেই। এছাড়া দাদা আমাদের তুলনায় একটু যেন ক্ষীণজীবীই ছিলেন।

বিধাতা ডানপিঠেদের খানিকটা শক্ত-সমর্থ করেই সংসারে পাঠান, নৈলে ওঁরই সৃষ্ট বেত, কঞ্চি, খেজুরের ডাল একদিক দিয়ে নিরর্থক হয়ে পড়ে।

তবে বাবা দাদার বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পাণ্ডুলে থাকলে যে বাংলাভাষা এবং বাংলা কৃষ্টি থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন সেটার

সম্বন্ধে তাঁর কোনই সন্দেহ ছিল না। এখানেই জন্ম এখানেই সব, পিসিমাদের মুখে এখানকার শব্দের ছুট তো প্রচুর ছিলই—আমার মা কাকিমাদের বড়-বৌদির জায়গায় বড়্কি ভৌজি, ছোট্কি ভৌজি, বাটিকে 'কটোরা' বেগুনকে বৈগন—এসব তো ছিলই, তাছাড়া বাংলা শব্দও যা বলতেন তার উচ্চারণে ও টানে, এখানকার ঝোঁক ক্রমেই বেশী এসে যাচ্ছিল। একটা যে ব্যালেন্স কোন রকমে বজায় ছিল, তা দুটি বাঙ্গালী পরিবার পাশাপাশি থাকায় আর বৈবাহিক সম্বন্ধ দেশের সঙ্গেই রক্ষা করে যাওয়ায়। যাঁরা বাঁকা কথা ঠোঁটে জিভে করে যেতেন তাঁরাই বাপের বাড়িতে এসে কঠোর সমালোচক হয়ে উঠতেন। বড় পিসিমার দেশ না হলেও, শ্বশুরবাড়ী ভাগলপুর। মেজো দত্তপুলিয়া, সেজো কোন্নগর, ছোট পেনিটি। ও-বাড়ির ছোট দিদি খাস কলকাতা। বলতে গেলে তিনি আমাদের একটা বিস্ময়ই ছিলেন।

বাবারও এ-বিষয়ে একটা কঠোর নিষ্ঠা ছিল। যখন মৈথিল ভাষায় কথা বলতেন, যারা জানে না তাদের বাঙ্গালী বলে বোঝাই শক্ত হত। সেকালের রেওয়াজ মতো বেশ কিছুদিন মক্তবে ফারসী-উর্দুর তালিম নেন, কেরানীগিরির প্রস্তুতি হিসাবে। সেই সূত্রে উর্দু কবিদের বয়েৎ আউড়ে, উর্দু জবানীতেও ছিলেন দক্ষ। এদিকে যখন বাংলায় কথা কইতেন তখন ভঙ্গিতে, উচ্চারণে অন্য কোন ভাষারই প্রভাব খুঁজে পাওয়া যেত না। যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন আমার বিচার-বিশ্লেষণের বয়স নয়, তবে উত্তরকালে আমি যখন দ্বারভাঙ্গায় বাংলা স্কুলের ছাত্র, বাবার আমাকে বাংলা পড়াবার কথা বেশ মনে আছে। বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আখ্যান মঞ্জুরী—একে তাঁর গুরুগম্ভীর ভাষা, তার ওপর বাবার অনুস্বার, বিসর্গ আর যুক্তাক্ষরাদির শুদ্ধতা বজায় রেখে পড়া—দুয়ে মিলে যে ঝঙ্কার সৃষ্টি হোত তা এখনও আমার কানে লেগে রয়েছে।

একটু সবিস্তারে বাবার ভাষা-প্রীতির কথা বলতে হোল, নৈলে আপাত-উদাসীন্যের নীচে ওঁর যে একটা দুশ্চিন্তা লেগেছিল তার গভীরতাটা বোঝা যাবে না। দ্বারভাঙ্গা তাঁর পছন্দ ছিল না, আবার সেই তো ভ্যাজালেরই আশঙ্কা। ওঁর নজর ছিল আমাদের আদি বাসস্থান চাতরা-শ্রীরামপুরের ওপর। তখন চাতরার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এত আলগা হয়ে যায় নি। বড় ঠাকুরদাদা—মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ ভগবতীচরণের পরিবারবর্গ ওখানে, দেশে গেলে ওখানেই ওঠা। তবু ছেলেকে কায়েমীভাবে লেখাপড়ার জন্য পাঠাতে হলে একেবারে নিজের কেউ না হলে ভরসা হয় না। নিতন্তেই ছেলেমানুষ, মা ছাড়া হয়ে থাকা।

ঠাকুরদাদার মৃত্যুর পর থেকেই ঠাকুমার মনটা পাণ্ডুল থেকে উঠে গিয়েছিল। রাণীর মতো কাটিয়ে এসেছেন, সে প্রতিপত্তি একরকম ধূলিসাৎই তো হয়ে গেল। ওঁর ইচ্ছা ছিল এবার সব গুটিয়ে নিয়ে চাতরায় ফিরে আসা, ছেলে একটা কিছু কাজ ধরে চালাক। পাণ্ডুলের কুঠিতে একটা কাজ পাবেন বলে সায়েব যে ভরসা দিয়েছে, সেটা তো নীচের দিকেই। চাতরা কিন্তু নানা কারণেই হয়ে ওঠে নি। তার মধ্যে প্রধান কারণ, বাবার ঝোঁক ছিল পাণ্ডুলের দিকেই। আরও কারণ ছিল। ঠাকুরদাদা নিজে ঠিক বৈষয়িক মেজাজের মানুষ ছিলেন না। তবে উপযুক্ত ছেলে হিসাবে বাবার হাতেই এদিকটা ছেড়ে দেওয়ায় হাতে-কলমে কাজ করতে করতে বাবা আপনা হতেই একটা বেশ বৈষয়িক তালিম পেয়ে যান। প্রখর দৃষ্টি, তাঁর নজর ছিল জমির দিকে, ত্রিহুতের সোনা-ফলানো জমি।

জমি সে-সব দিনে চলতি ভাষায় 'মাটির দরেই' পাওয়া যেত। কুঠির তহবিলে একটা টাকা জমা দিলে বিঘে-খানেক জমির ইজারা নেওয়া কিছুই শক্ত ছিল না। কিন্তু সায়েব-ম্যানেজারের পরেই কুঠির সর্বেসর্বা পিতা। তিনি জমিকে, চাষ-বাসের বৃত্তিটাকেই কিছুটা নীচু চোখেই দেখতেন। হয়তো তাঁর পক্ষে এটা খানিকটা স্বাভাবিকই ছিল, ছেলে কিন্তু তার মধ্যে কিছু চাষের জমি গুছিয়ে নিয়েছিলেন। কিছুটা পিতার জ্ঞাতসারেই, তাঁর আজ্ঞা নিয়েই—একটা সখ মেটাবার প্রশ্রয় হিসাবেই, তারপর সেই আজ্ঞারই সূত্র ধরে আরও কিছু।

সেই জমিই এখন ভরসা। যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই বাবা পাণ্ডুলে চলে আসেন, সেখানেই বন্ধু-বান্ধব। ঠাকুরমার পাণ্ডুলের প্রতি বৈরাগ্য যে ঠাকুরদাদার মৃত্যুর জন্যই, একথা বুঝতে দেরি হয় না। বাবা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাণ্ডুলে ফিরে আসার মত করিয়ে নিলেন মায়ের।

শোকের বেগ ক্রমে তরল হয়ে আসতে আসতে আমরাও একে একে আসার সঙ্গে মায়ার বাঁধনে পাণ্ডুল আগেকার মতো সহজ হয়ে আসতে লাগল। ক্রোশ দুই দূরে সাকরিতে রেল এসে গেছে। যাতায়াতের সুবিধা হচ্ছে, মনটা একটু উতলা হলে, হয়েও আসেন চাতরা থেকে। তিনটি মেয়ের বিবাহ সপরিবারে সেখানে গিয়েই দিয়ে এলেন।

এই করেই গোটা দশেক বছর এক রকম ভালোই কেটে গেল।

তারপর বাবা যখন বেশ নিশ্চিন্ত, ধীরে ধীরে একটা যেন পরিবর্তন এসে পড়তে লাগল মায়ের মধ্যে। কথাবার্তায় একটা কথা মাঝে মাঝে মুখ থেকে খসে পড়ে—'আমি পড়ে রইলাম······আমাকে ঠেলে দিলেন মা গঙ্গা······আর কেন?'—প্রতিবেশিনী মৈথিল গৃহিণীদের কাছে।

পাশের বাড়ীতে কৈলাসচন্দ্রের শাশুড়ীর কাছে, জ্যাঠাইমার কাছেও। একটু যেন অনুযোগের সুর, অধৈর্যের সুর। সুবিধা থাকলে একবার হয়তো ঘুরিয়ে আনলেন দেশ থেকে। হয়তো বড় মেয়ে বিরাজমোহিনী বা দেশ থেকেই কোনও মেয়ে এসে পড়লেন, চাপা পড়ল ও-ভাবটা। এই করে চলছিল। তারপর হঠাৎ একটা ব্যাপার হোল।

প্রতিবেশিনী দুলারমনের মা ছিলেন ঠাকুরমার প্রিয়পাত্রী। প্রায় সমবয়সী, ঠাকুরমার বিবাহ হয়ে পাণ্ডুলে আসা থেকেই ভাব, মার যেমন তাঁর মেয়ে দুলারমনের সঙ্গে। বেশ আমুদে গোছের স্ত্রীলোক, ঠাকুরমার সঙ্গে বেশ জমত। আমরা দাদী অর্থাৎ ঠাকুরমা বলেই ডাকতাম। মিথিলায় বা বাংলার বাইরে কোথাও নাতি-নাতনির সঙ্গে ঠাট্টার রেওয়াজ নেই। তা সত্ত্বেও ঠাকুরমার সুবাদে তাঁর এক আধটা ঠাট্টা আমাদের ওপর এসে পড়ত।

সাধারণ মৈথিলদের মতো তাঁরও একটু তীর্থস্থানের দিকে ঝোঁক ছিল, বিশেষ করে গঙ্গাস্নান। এ প্রান্তের মিথিলার স্নান ক্ষেত্র সিমরিয়া ঘাট।

ঠাকুরমার সঙ্গে জমত বিশেষ করে গঙ্গাস্নানের আলোচনাতেই। একদিন একটা গোপন চক্রান্তের কথা লঘু আলাপের মধ্যে ঠাকুরমাকে জানিয়ে দিলেন দুলারমনের মা।

শাশুরী বৃদ্ধা, স্বভাবতই ছাড়তে চায় না। একদিন সিমারিয়া ঘাটে ডুব দিয়ে আসার নাম করে দুটো দিনের অনুমতি নিয়ে একেবারে সাগর-সঙ্গমে চলে যাবেন। দুলারীর বাপকে রাজি করিয়েছেন, সেও অবশ্য সিমারিয়ার নাম করেই, তারপর......

......দুদিন পরে হঠাৎ বামনটুলিতে কান্নার রোল ওঠায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল দুলারমনের মা হঠাৎ হৃদরোগের আক্রমণে মারা গেছেন।

ঠাকুরমা একেবারে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। জিদ ধরে বসলেন তিনি আর একটা দিনও গঙ্গা ছাড়া হয়ে থাকতে পারবেন না। যে কোনও মুহূর্তে একটা কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায় এতই বিচলিত হয়ে উঠেছেন যে বাবা দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার পর যখন আফিস যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, মা তামাক সেজে অপেক্ষা করছেন, আমি আমার অম্বুরী-সুবাসিত জলটুকুর জন্য দাঁড়িয়ে আছি, ঠাকুরমা একটু হন্ত-দন্ত হয়ে এসে বিনা ভূমিকাতেই কথাটা পেড়ে বসলেন—'আমায় এবার চাতরায় পাঠিয়ে দে বাবা, আর দেরি করিসনি। আজই সাহেবকে বলে ছুটি নিয়ে আয়। হ্যাঁ বাবা, লক্ষ্মীটি, আর তো সামলে-সুমলে দিলাম—চরকালই পড়ে থাকতে হবে এখানে?'

বাবাও থমকে গেছেন, এতই হঠাৎ আর গুরুতর কথাটা।

একটু কিছু বিচলিত হয়ে উঠলে বাবার মুখটা রাঙ্গা হয়ে উঠত—সুখেরই হোক বা দুঃখেরই হোক। শুনতে শুনতে, আফিসের জামায় বোতাম পরাতে পরাতে শুধু বললেন—'মা, আমি পরের চাকর।'

'তা হোক্, তুই বুঝিয়ে বললেই বুঝবে। এতই কি পাষণ্ড হতে পারে? কর চেষ্টা, আর অমত করিস নে।'

একবার এ মুখ একবার ও মুখের দিকে বিমূঢ়ভাবে চাইছি। মা ঘোমটা নামিয়ে দিয়ে কাঠের পুতুলের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য সময় ঠাকুরমা কোনও কারণে এসে পড়লে উনি বাইরেই চলে যান।

ঘরের ভেতরটা থমথমে হয়ে গেছে। অস্বস্তিকর। বাবা একটা বোতাম আঙ্গুল দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে মাথা হেঁট করে কি ভাবলেন একটু। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে ওঁর দিকে চেয়ে বললেন—'বেশ দেখব ব'লে।' অতকরে বোঝবার বয়স নয় তখন, তবু কয়েকদিন শিশুমনে একটা মান-অভিমানের ছায়া এসে পড়ছে—এরকম একটা অস্পষ্ট অনুভূতি কটা দিন ধরেই লেগে রইল মনে। উত্তর জীবনে সে দিন, আর পরে যা ঘটল তা নিয়ে মা-পিসিমাদের কাছে অনেক কথা শুনেছি—আমাদের পারিবারিক জীবনে একটা মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ারই ঘটনা তো।

এখানে শুধু আমার মনের প্রতিক্রিয়াটুকু বলে রাখলাম।

প্রায় ছ-সাত দিন পরেই আর একটা ঘটনা ঘটে ব্যাপারটাকে একটা ক্লাইম্যাক্সে তুলে দিলে।

ছুটি পেয়ে গেছেন। মা স্থায়ীভাবে দেশে যাচ্ছেন। বড় পিসিমা বিরাজমোহিনী আর কাকা চণ্ডীচরণ এসেছেন। দু-দিন পরেই যাত্রা। তোড়জোড় চলছে।

বাবা সন্ধ্যার একটু আগে আফিস থেকে ফিরছিলেন। একটা তুমুল হুল্লোড়ের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ঘুরে দেখেন ছুতার পাড়ার দু-সারি কুটিরের মাঝখানে যে একটা উঠানের মতো খালি জায়গা আছে, তাতে ছেলেরা কি একটা খেলায় মেতেছে। ধুলা-বালি-ছাই উড়িয়ে। মুখে একটা ছড়া এবং তার সঙ্গে ছুতার পাড়ার ভাষার ছুট।

এবং তার মধ্যে আমরা তিন ভাই। ছোট হরিভূষণকে নিয়ে। দাদার মুখ থেকেও মাতুনির উল্লাসে কয়েকটা শব্দ ছিটকে বেরিয়ে এল। কথাটা হচ্ছে, সমুদ্রে ঝাঁপাই ঝুরলে নোনা জলের কিছুটা যাবেই পেটে।

আর না দাঁড়িয়ে বাবা সোজা বাড়িতে চলে এসে চাকর মন-রাখনাকে আমাদের ধরে আনতে হুকুম দিলেন। কথাটা চারিয়ে যেতে দেরি হলো না। আমরা এসে দেখি বাবা আফিসের পোষাকেই উঠানের একধারে

কঞ্চি নিয়ে বসে আছেন। চারিদিকে সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ছোটদের চোখে তামাসা দেখবার আগ্রহ। বড়দের মুখ শুক্‌ন। মা থামের আড়ালে আধা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে, ঠাকুরমার মুখে যেন একটা অপরাধীর ভাব। আজকের এটা যে খজনীর বাড়িতে মেরুয়ার রুটি খাওয়ার মতো নয়, দেখে শুনে আর সন্দেহ রইল না।

বাবা বললেনও,—ঠাকুরমা চলে যাচ্ছেন, আমাদের নিয়েই ভাবনা তো। সে ভাবনা বাবা ওঁর সামনেই ঘুচিয়ে দিচ্ছেন। বাবাকে রাগতে অনেক দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু অত কোপ, অত উদ্বেগ, অত আশঙ্কা, একটা যেন এ্যান্টি ক্লাইম্যাক্‌সে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল।

বড় পিসিমা তাঁর কোলের মেয়ে ছকুকে নিয়ে আমাদের সরিয়ে ফেলবার জন্যে এগিয়েছেন সাহস করে, সে আমাদের ধুলো-ছাইমাখা চেহারা দেখে একেবারে আঁৎকে উঠে এমন করে তাঁর গলা জড়িয়ে সেঁটে রইল যে হাসি চাপবার চেষ্টা করেও সেটা আর সামলাতে পারলেন না। ঠাকুরমা, মা মুখ ঘুরিয়ে ঘরে চলে গেলেন। বাবারও সেই অবস্থা, রাগী মানুষ, হাসিতে খেলো হয়ে পড়বার ভয় সবচেয়ে তো তাঁরই বেশি। পিসিমা ছকুকে অন্যের কোলে দিয়ে চাপা হাসির সঙ্গে—'মরিঃ, কী হয়েছে, কী রূপ খুলেছে!'—বলতে বলতে আমাদের চৌবাচ্চায় দিকে নিয়ে গেলেন।

ছকুর নাম পড়ে গেল 'বিপত্তারিণী'। এর অর্থ তখন কিইবা বুঝি? তবে কৌতুকরস কিসে ছলকে উঠে সেটা বোঝবার ক্ষমতা তখন না থাকলেও এটা তো বুঝলাম ওর হঠাৎ আঁতকে ওঠার পর থেকেই ব্যাপারটা গেছে সামলে। এর পর লক্ষ্যও করলাম সমস্ত বাড়ির বাতাসটা যেন হাল্‌কা হয়ে গেছে। ভেতরকার কথা সবিস্তারে এ-সম্বন্ধে গল্পচ্ছলে পরে শোনা। তখন যা চোখে পড়ল তা এই যে, বাবার মুখের সে থমথমে ভাবটা একেবারেই কেটে গেছে, প্রসন্ন ও স্বাভাবিক হাসি-খুশীর ভাবই। ঠাকুরমারও যেন সেই অপরাধী-ভাবটা নেই।

শুধু মা বিষণ্ণ। কাজে-অকাজে চোখে আঁচল দিচ্ছেন, অন্তরালে আমাদের পেলে বুকে চেপে ধরে বলছেন—'লক্ষ্মী হয়ে থাকবি সেখানে বাবা। খুব মন দিয়ে পড়াশোনা......'

—যাই বলতে যান, শেষ করতে পারছেন না কিন্তু।

দাদার আর আমার ঠাকুরমার সঙ্গে চাতরায় যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে। সেখানেই পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হবে।

পাণ্ডুল-জীবনে প্রথম পর্ব শেষ হোল আমার। বয়স তখন সাত-আটের মাঝামাঝি হবে।

আমার চাতরার অনুভূতিটা অদ্ভুত ধরনের। মার সঙ্গে মামার বাড়ি গেছি মাত্র একবার, অনেক ছেলেবেলায়। তার একটা নেহাৎই অস্পষ্ট স্মৃতি যে লেগেছিল মনে—রেলগাড়ি—জাহাজে গঙ্গা পেরুনো—তারপর আবার রেলগাড়ি—এবারে উপভোগ করবার ক্ষমতা খানিকটা বেড়ে যাওয়ায় আরও খানিকটা স্পষ্ট আর নূতন হয়ে দেখা দিতে লাগল। গাড়ির গতিবেগ, স্টেশনের বিচিত্র কলরব, চঞ্চলতা, গঙ্গার প্রসার। এদিক থেকে ওদিকে নজর যায় না। পাণ্ডুলের কমলাও তো একটা নদী, বর্ষাতেও দেখেছি—কি করে নীল কুঠির বিরাট হাতি 'রামপিয়ারীর' পাশে তার এতটুকু বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে যায়—তারপর এপারে এসে আবার রেলগাড়ি—এও কত বড়। ওপারের গাড়ির তুলনায়। তারপর তার দাপট! ছোট ছোট স্টেশনগুলোকে গ্রাহ্য মাত্র না করে প্রকাণ্ড নিঃশ্বাস ছেড়ে একেবারে একটা বড় স্টেশনে এসে দাঁড়ায়।

উল্লাস-বিস্ময়ে মেশানো একটা বিচিত্র অনুভূতি, পাণ্ডুলের কোন কিছুর সঙ্গেই মিল নেই। কিন্তু একটানা ধরে রাখতে পারছি না উল্লাসকে। যখনই চরমে এসে উঠছে, হঠাৎ জেগে উঠছে মার ছলছল চোখ, খঞ্জনীর বুকফাটা কান্না, বিদায়ের সময় বলদে-টানা সাম্পেনির পেছনে এ-বাড়ি ও-বাড়ির সবার মলিন মুখে দাঁড়িয়ে থাকা।

দাদা যেন বরাবরই বিষণ্ণ। সবার আদরের মধ্যেই ছিলেন তো। বাবা আড়-চোখে লক্ষ্য রেখে রেখে যাচ্ছেন। একটু বেশি রকম যতি-ভঙ্গের লক্ষণ দেখলেই ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা—'হ্যাঁরে, তোরা কেউ কিছু খাবি? এইবার এই স্টেশনটা আরও বড়......আর এবার যা পুল আসছে—দেখবি।

মিলিয়ে যতটা বুঝছি, সেটা ছিল কিউল। বুক-কাঁপানো গমগম আওয়াজের মধ্যে লম্বা পুল পেরিয়ে আলোর মালার স্টেশন। রাত্রি হয়েছে। ওখানে খাওয়াও সারলাম আমরা। বাড়ী থেকে আনা ছিল। কিছু মেঠাইও কিনলেন বাবা। ধরনটা পাণ্ডুল থেকে কতকটা আলাদা।

ক্লান্তিতে ঘুম আসছে।

সকালে উঠে আর এক দৃশ্যপট। এক, যারা বেচছে তাদের ছাড়া আর সবাই আমাদের মতোই কথা বলছে—আরও যেন বিস্ময়—বাবাকে প্রশ্ন করছি 'এরা কারা বাবা?'

'এরা বাঙ্গালী'—উত্তর করলেন বাবা।

'আমরাও তো তাই।'—কচিৎ-কখনও কথাপ্রসঙ্গে শুনে নিজেদের সম্বন্ধে ঐটুকুই জ্ঞান ছিল।

বাবা একটু হেসে বলছেন—'হ্যাঁ, তাছাড়া কি হব ?'

দাদাও একটু আড়ে-চেয়ে হাসছেন।

'তা এত কোথা থেকে এল বাবা ?'

উত্তর দিলেন দাদা—'এটা যে বাংলাদেশ রে।'

হাসিটা বাড়িয়ে বাবার দিকে চেয়ে বললেন—'কী বোকা বিভূতিটা, বাবা।'

বাবা বললেন—'এর আগে যখন আসিস তোদের মামার বাড়ি, তুই-ই খানিকটা বড় হয়েছিস, ও তো ছোট।'

আমার দিকে চেয়ে বললেন—'বুঝলি তো ? এবার তোকে বাংলাদেশের একটা মিষ্টি খাওয়াব। কখনও ভুলতে পারবি না। দুটো স্টেশন পরেই। একটু সবুর কর।'

বর্ধমানে এসে সীতাভোগ। পারিনি আজ পর্যন্ত ভুলতে।

বাল্যাবস্থার প্রথম স্বাদটি আজ পর্যন্ত লেগে রয়েছে জিভে।

ঠাকুরমা খুব কম কথাই কইছেন। সমস্ত পথটি জলস্পর্শ করলেন না। একরকম বলতে গেলে মালা নিয়েই রইলেন। তারই মধ্যে দু একটা মাথা নেড়ে সায় দেওয়া, বা তেমন কিছু হোল তো মালা জপতে জপতেই একটু হাসা। একটা সীতাভোগ শেষ করে (তখন আকারেও বড় হোত) আর একটা চাইতে বাবা একটু আপত্তি করাতে বললেন, 'দে কিছু হবে না, হাঁদারাম গোবিন্দ, পেট ভরলেই আনন্দ।' হেসে মালা কপালে ঠেকিয়ে আবার জপ করতে লাগলেন। তা ছাড়া কবার নজরে পড়ল আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিচ্ছেন। একবার বাবার সঙ্গে কি একটা কথা কইছি আমরা দুজনে, উনি হঠাৎ বলে উঠলেন—'তুই নিজে গিয়ে পারিস তো বিরাজকে দিনকতক আটকে রাখিস বিপিন। বউমা বড্ড একলা পড়ে যাবেন।'

ছুটে চলেছে গাড়ি। যতই চলছে গাড়ি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। বাড়ির সঙ্গে ছোট, বড়, মাঝারি পুকুর, মেয়েরা বাসন মাজছে, নাইছে, গল্প করছে, কারুর ঘোমটা, কারুর বা নেই। সব বাঙ্গালীর মেয়েই মনে হয়তো। পাণ্ডুলের দুটি বাড়ির কঠিন পর্দায় অভ্যস্ত চোখ যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। দাদার ঠাট্টার ভয়ে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছে না। একটা ঘাটে কজনে মিলে তুমুল ঝগড়াও হাত নেড়ে নেড়ে। বাঙ্গালীর মেয়েরা পাণ্ডুলের ছুতোর পাড়ার মতো এ রকম ঝগড়া করতে পারে।

পাণ্ডুলেও আছে জঙ্গল, তবে এখানে অনেক বেশী। তারই মধ্যে বাড়ি, ঘর, মেটে, আবার কোঠাও। রং করা কোঠা বাড়িও গাছপালার মধ্যে ঝিকমিক করছে। দেখতে কী সুন্দর! পাণ্ডুলে শুধু নীলের গুদাম, প্রকাণ্ড 'গোটিঘর'-টাই রং করা। গাছপালার মধ্যে ও ছুটো কি? লম্বা তালগাছের মতো। একটা আবার তারই মধ্যে খুব সরু। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন—যেগুলো মোটা, পাতা লম্বা, সেগুলো নারকেল গাছ, আর যেগুলো সরু, পাতাও ছোট, সেগুলো সুপুরির। আশ্চর্য লাগছে, নারকেল গাছটা তবু মেনে নিচ্ছে মন, কিন্তু বটফলের মতো গোল গোল সুপুরির গাছ যে আমাদের বাড়ির সামনে অর্ধেক খড়িয়ান-জোড়া প্রকাণ্ড বটগাছটার মতো না হয়ে এই রকম লিকলিকে ঢ্যাঙা কি করে হতে পারে যেন মাথায় আসছিল না। মিথিলার (আমার পক্ষে পাণ্ডুলের) ব্রাহ্মণদের মধ্যে সুপুরি খাওয়ার রেওয়াজ খুব বেশী। প্রায় সবারই বটুয়ায় কিছু আছে সুপুরি আর একটি করে ছোট্ট জাঁতি। ইচ্ছে মতো খেলে, কারুর সঙ্গে দেখা হলে কুঁচিয়ে দিলে। সেই সুপুরির গাছই কিনা, দাদার ভয়ে প্রশ্ন করতে আগু-পিছু হচ্ছি, গাড়িটার গতিবেগ কমে এল, বাবা বললেন—'এবার আমাদের নামতে হবে, শ্রীরামপুর এসে গেছে।' একটু পরেই একটানা বাঁশি বাজিয়ে স্টেশনে ঢুকে পড়ে ফোঁস করে দম ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ীটা। নেবে, গেটে টিকিট দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। বিস্ময় আর কাটতে চাইছে না। চারিদিকে বাংলাবুলি সেই কোন্ সকাল থেকে শুনে শুনে এক রকম অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে মনটা। তবে এর পরই আর একটা নূতন কাণ্ড। স্টেশনের বাইরে এসে হাঁক দিতে ছু ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। পাণ্ডুলের মতো জোড়া বলদের সাম্পানি নয়—সেটাই একটা বিস্ময়ের বস্তু, তার উপর কুঠির দপ্তরী মিয়ার মতো সরু দাড়ি, মাথায় লম্বা লাল টুপি, গাড়োয়ান, তারও মুখে বাংলা কথা। আমরা উঠে বসলে ছিপটি মেরে ঘোড়া ছুটোকে গালাগাল দিয়ে যে গাড়ি হাঁকল—ঠিক না বুঝলেও কথাগুলো যে বাংলাই—সে যেন আবার বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। পাণ্ডুল ছেড়ে চাতরা আসার কথা ওঠা পর্যন্ত নিতান্ত শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতির ওপর যে একটা কল্পলোক গড়ে তুলেছিলাম—বিস্ময়ের সংখ্যায় আর বিপুলতায় সে যেন এই প্রত্যক্ষের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারে না।

চাতরার জীবন আরম্ভ হল।

বাবা যে কটা দিন ছিলেন—দিন চার-পাঁচের বেশী নয়—ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে দেখাশোনা করে কাটালেন। হেঁটে চাতরা শ্রীরামপুর, আবার বাইরেও। একদিন আমাদের ছুজনকে নিয়ে কোন্নগরে সেজো

পিসিমার বাড়ি হয়ে এলেন। একদিন বেলে-প্রতাপপুরে আমাদের মামার-বাড়ি। এখানকার তবু একটা ক্ষীণ স্মৃতি জমা ছিল, কিন্তু সেই পাণ্ডুলের সেজ পিসিমাকে সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে দেখার মূঢ় বিস্ময়, সেই অন্তর্গূঢ় সলজ্জ উল্লাসের কথা বলে বোঝান যায় না। একান্তই যে শৈশব মনের সম্পত্তি সেটা। অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তার ওপর হঠাৎ দেখা, তাঁর আনন্দও সেই রকম চাপা। বাড়ির বৌ, শ্বশুর-শাশুড়ী বেঁচে, কোনও রকম কিন্তু উচ্ছ্বাসের পথ নেই।

আমাদের দু-ভাইকে নিয়ে ওপরে ছাতে গিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

ফিরে যাওয়ার আগের দিন বাবা আমাদের পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়ে এলেন।

এইখানে আমার স্মৃতির গায়ে খানিকটা কালি পড়ে গেছে, ইংরাজিতে যেটাকে বলা হয় 'ব্ল্যাক-আউট।' দাদাকে পাঠশালায় দেওয়া হয়নি, সেদিন আমাদের সঙ্গে তিনি ছিলেন না। ওখানকার পড়ার ব্যাপার নিয়ে দাদাকে যখনই মনে পড়ে তখনই তাঁকে গঙ্গার ধারের সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে দেখতে পাই। অথচ পাঠশালা ছেড়ে তাঁকে স্কুলে দেওয়া হয়েছিল কেন তার, কালের এত দূর থেকে, কোনও কারণ খুঁজে পাই না। পাণ্ডুলে দাদা জ্যোৎখীজীর পাঠশালাতেই পড়তেন—হিন্দী। যাইহোক, সিদ্ধেশ্বরী স্কুলেই দেওয়া হয়েছিল দাদাকে। কথাটা আমার জীবনীতে অবান্তরই মনে হবে, তবে একটু দুর্বল, বাড়ির সবার আদরে-লালিত, খেলা-ধূলার বিশেষ সম্বন্ধ নেই—প্রবল দামাল ভাইয়ের দৃষ্টিতে দাদা যেন কতকটা কনিষ্ঠের মতই ছিলেন; স্নেহের পাত্র, করুণার পাত্র। এইবার পাঠশালা আর স্কুলের সম্ভ্রম-জাগানো ব্যবধানটা ওঁকে যেন খানিকটা তুলে দিয়ে ওঁর ন্যায্য আসনে বসিয়ে দিল আমার দৃষ্টিতে; ওঁদের স্কুলটা আবার দোতলা হওয়ায় আসনটা বেশ উঁচুতেও পাতা রইল। ফলে বাবাও ফিরে যাওয়ার আগে যখন উপদেশচ্ছলে আমাদের এক জায়গায় করে দাদাকে বললেন—বড় ভাইয়ের মতনই আমার ওপর নজর রাখতে হবে, আমাকেও ছোট ভাইয়ের মতো বাধ্য হয়ে থাকতে হবে, তখন দেখলাম কথাগুলো অবজ্ঞার সঙ্গে নেওয়ার সেই দৃপ্ত অহমিকাটা কি করে খুইয়ে বসে আছি। দাদাকেই সাক্ষী মানলাম—'কবে কথা শুনিনি—হ্যাঁরে দাদা?'

মাত্র দু-বছরের বড় আমার চেয়ে, একেবারে পিঠোপিঠি যাকে বলা যায়, সিদ্ধেশ্বরী স্কুল কিন্তু সেদিন যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধটা বেঁধে দিয়ে ছিল সেটা শেষ পর্যন্ত অটুট থেকে গিয়েছিল। জীবনে অনেক ভুল ভ্রান্তিই হয়, সিদ্ধেশ্বরী স্কুল কিন্তু বেশি হতে দেয়নি। জীবনের এক

রকম মাঝপথেই তাঁকে হারাতে হয়েছে, কি জানি, কী একটা মলিন স্মৃতি থেকে যেতে পারত।

প্রণাম করি সিদ্ধেশ্বরী স্কুলকে।

প্রণাম করি আমার পাঠশালাকেও।

মহাদেব মাস্টারের পাঠশালা। গঙ্গায় যেতে যে রাস্তাটা পূবে এসে গঙ্গার রাস্তাটায় মিশেছে তার কোণাতে একটা ঘর, বোধহয় গোল-পাতার ছাউনি, ঠিক মনে পড়ছে না। সামনে এক চিলতে রক, তার পরেই একটা শুক্‌নো নালা, তার পরেই সদর রাস্তা। রক আর রাস্তা প্রায় এক সমতলে, নালাটা প্রভেদ রচনা করেছে। সমস্ত জায়গাটুকু ছেয়ে একটা বাদামের গাছ, চওড়া চওড়া সবুজ আর রাঙ্গা পাতা। যেতেই একটা সুমিষ্ট গন্ধ আমায় অভ্যর্থনা করে নেয়। এ-রকম রোজই নিত, এখনও নাকে লেগে আছে। পরে জানতে পারি রাস্তার ঠিক ওপারে, গঙ্গা পেছনে রেখে ছিদাম ময়রার দোকান, তার থেকেই প্রতিদিন পুনরাবৃত্তির কারণ, ছিদাম এই সময়ই বাতাসা পাতত।

কোন ক্লাসে ভর্তি করা হোল মনে নেই। পাঁচ বছর বয়সে যথারীতি সরস্বতী পূজার দিন হাতেখড়ি হয়ে এই আড়াই তিন বছরে দ্বিতীয় ভাগ আর ধারাপাতের কিছু নামতা আয়ত্ত করে থাকব। দু চারটে প্রশ্ন করে খাতায় নাম তুলে নিলেন মহাদেব মাষ্টার, বোধহয় উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে থাকব।

'আঁক জানে?'—কথাটা জিজ্ঞেস করলেন আমাকে। আমি বাবার দিকে চাইলাম। বাবাই দিলেন উত্তরটা। গোড়া থেকেই অঙ্কে কাঁচা আমি, মন বসতে চাইত না। যোগ নিয়ে বেশিদূর এগুনো অসম্ভব দেখে আমায় বিয়োগে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তারও তখন মাত্র দু-তিনটি সংখ্যা নিয়ে কসরৎ চলছে। বাবা হয়তো আমার দৃষ্টিতে কিছু দেখতে পেয়ে বললেন—'সরল যোগ এই করেছে শুরু। ওদিকটায় মাথাটা একটু কাঁচা, আপনাকে দেখে নিতে হবে একটু।

'ভাববেন না আপনি। মহাদেব মাস্টারের এখান থেকে আঁকে কাঁচা থেকে বেরোয়নি কেউ আজ পর্যন্ত।'

বাবা জানালেন সেই ভরসাতেই এখানে নিয়ে এসে সঁপে দিলেন ওঁর হাতে। থাকেন পশ্চিমে। অনেক দূরে। মনে করলেই আসার উপায় নেই। এই ধরণের আরও সব কথা। পশ্চিম নিয়ে কিছু গল্পও হোল। তারপর সেদিন বাবা আমায় সঙ্গে করে নিয়েই বেরিয়ে এলেন। ওঁর

সঙ্গে রাস্তায় নেমে এসে আমি মুখ তুলে মগ্নস্বরে বললাম—'আর সেই কথা বাবা……'

—গুরুমশাইয়ের চিরন্তন বেত। প্রবাদবাক্যই একরকম।

'আর হ্যাঁ।' বাবা ঘুরে দাঁড়ালেন, বললেন—'একটা কথা মাস্টার-মশাই।' 'কি বলুন'—বলে মহাদেব মাস্টার এগিয়ে এলেন। 'মারধোরটা …মানে, মা-বাপ ছাড়া হয়ে থাকবে, এতদূরে...এই প্রথম বেরুল—'

মহাদেব মাস্টার বললেন—'পারি তা কখনও ? আমার পাঠশালায় সে বদনাম নেই-ও, আপনি নিশ্চিন্দ থাকুন। আর, মার খাওয়ার মতন ছেলেও তো বলে মনে হচ্ছে না। দেখলাম তো কটা কথা জিজ্ঞেস করে।'

আমায় উদ্দেশ্য করে বললেন—'কাল থেকে বই শ্লেট নিয়ে চলে আসবে, কোন ভয় নেই। যাও।'

তাঁর প্রথম কথাটা ফলেনি। এখন পর্যন্ত কোন হিসাবের কথা এলেই আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। এনট্রেনসের পর উনিশশ' দশ সাল থেকে আশু মুকুজ্যে ম্যাট্রিকুলেসন্‌টা অঙ্কের দিকে অত সহজ করে দিলেন বলেই আমি কলেজের মুখ দেখতে পাই, এই আমার বিশ্বাস।

দ্বিতীয় কথাটাও যে রাখতে পারেননি তার জন্যেও তাঁকে দোষী করা চলে না। শুধু এইটুকুই হয়তো বলা চলে, আশ্বাসটা দেওয়ার সময় গোড়াতেই একটা ভুল করেছিলেন। ভুলই বা কি এমন ? পাণ্ডুলের আমাকে তাঁর তো জানবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

সেই হয়েছে কথা।

পাঠশালে পড়াশোনার দিকটা আমার মোটামুটি ভালোই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু আমার সত্তার আর একটা যে দিক, তাকে কোন গুরুমশায়েরই—দায়িত্বশীল গুরুমশায়েরই বলি—বেত্র-সংযমে সংকল্প রক্ষা করার উপায় ছিল না। সদ্য-সদ্য নয়, তবে কিছুদিনের মধ্যেই আমার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। সেই বাউণ্ডুলেপনা। ফল, পাঠশালা থেকে মাঝে মাঝে গরহাজির। কয়েকবার সতর্কীকরণ, তারপর বেত নামল।

না, চ্যাংদোলা করে শির-পোড়ো আর কয়েকটা তাগড়া তাগড় ছেলে হৈ-হল্লা করতে করতে পাঠশালায় নিয়ে আসছে—বন্দী হাত-পা ছুঁড়ে—মুখে গালাগালের তুবড়ি ফোটাচ্ছে, সেই অ-কিণ্ডারগার্টেনের যুগে পথেঘাটে এ দৃশ্য দুর্লভ না হলেও, আমায় নিয়ে কখনও হয়নি। আমাদের পাঠশালাতেও বাদ যেত না, মহাদেব মাস্টার হুঁশিয়ারীও করে দিতেন—'দেখ এবার থেকে তোরও ঐ দশা হবে,'—তবু যে হোত না তার কারণ আর কিছু নয়। আমায় ধাড়িতে পাবে, কি বাড়ি থেকে কোন নির্দেশ-নিশানা পাবে তবে তো ধরে নিয়ে আসবে !

পাঠশালা সে সময় দুবার করে বসত; সকাল আর বিকাল। সকালের হাজরিটা একরকম নিয়মিত ছিল। খালি গা, কোমরবাঁধা কাপড়, বাঁহাতে বই স্লেট। বাড়ি থেকে কোঁচড়ে মুড়ি-মুড়কি নিয়ে, না থাকলে পথে হরি-দাসীর দোকান থেকে এক-আধলার কিনে নিয়ে যেতে যেতে খাচ্ছি—নিজের এই শৈশব মূর্তিটি এখনও আমার কাছে স্পষ্ট। তার কয়েক বছর আগে কড়ির যুগ চলে গিয়ে তামার আধলার যথেষ্ট খাতির। নীচের দিকে সিকি পয়সারও ক্রয়শক্তি রয়েছে। এর ওপরে ছিল পয়সা আর ডবল পয়সা। যার সিকি পয়সারও ওজন নেই এমন কাগজীমুদ্রার যুগে ডবল পয়সার গুরুত্ব বোঝানো আর বোঝা—দুটোই শক্ত।

হাজ্‌রীর কথাই আসা যাক।

সকালটায় প্রায় নিয়মিত যেতাম। তেমন বিকালের অধিবেশনে প্রায় নিয়মিতই অনুপস্থিত থাকতাম।

পাণ্ডুলের ভূত আমার মাথায় চেপে বসে থাকত। পড়াউয়ের ভূত-খেলান-নামানো কোনও গেছো বা মেঠো ভূত নয়, আমার মধ্যেই সে ভবঘুরে ভূতটা বাসা বেঁধে ছিল।

কিন্তু তাকে ভূত বলব, না পরী বলব, আমার গার্জেন-এঞ্জেল বলব—তা তো এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি। একটা পাঠশালা-পালানো ছেলের যা প্রাপ্য—সাজা, ধিক্কার, উপদেশ হলেও তিক্ত উপদেশ—সব পেয়েছি, তবু উত্তর-জীবনে সামান্য যা কিছু পেয়েছি সে তো ঐ ভূত বা এঞ্জেলের কৃপাতেই।

আমার সাহিত্যের গোড়াতেই রয়েছে এ বাউণ্ডুলেপনা, ভবঘুরেবৃত্তি। বাংলাকে আমি বাল্যে-কৈশোরে-যৌবনে পেয়েছিলাম মাত্র দুবার, দু'তিন বৎসরের দুটি সংক্ষিপ্ত প্রবাসে—একবার এই চাতরায় আড়াই থেকে তিন বৎসর, আর একবার প্রথম যৌবনে, শিবপুরে। অনেক অনেক পরে, ম্যাট্রিকুলেসনের বেড়া টপকে শিবপুর থেকে রিপন কলেজ পড়া।

শিবপুর এখন থাক। চাতরার কথাই বলি।

পথের কথাতেই বলেছি, পাণ্ডুল থেকে চাতরা আসাটা যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে আসা—সব নূতন, সব অবাক-লাগানো চাতরায় এসে পড়ে আমি স্বপ্নপুরীর মাঝামাঝি পৌঁছে গেলাম।

পাঠশালা-পর্ব শুরু হতে আমি পড়ে গেলাম এক ধরণের দো-টানায়। দুটি রূপে। পাঠশালা, পাঠশালা বলেই আমার যে 'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ'—ছিল এমন নয়। পড়ুয়া হিসাবে আমি খারাপ ছিলাম না। ওদিকটা ঠিক

থাকায় আমি পাঠশালা মাত্রেরই যে আর একটা দিক আছে, সেটা বেশ মুক্ত মন নিয়েই উপভোগ করতে পারতাম। যতদূর মনে পড়ছে—সেকালের সব গুরুমশাইদেরই একটা করে আলাদা বৃত্তি থাকত। প্রায়শঃ একটা করে ছোটখাট দোকান। যতদূর মনে হয় মহাদেব মাষ্টারেরও একটা যেন ছিল, রকটার এক কোণে। কিসের ঠিক মনে নেই, যেন তামাকের গন্ধ ভেসে এসে নাকে লাগছে। একটিমাত্র শিক্ষক—একে ডেকে পড়া ধরছেন, ওকে পড়া শুধরে দিচ্ছেন—সে কেন চুপ করে বসে ? দূরে ওখানে কে স্লেটে মাষ্টারের মুখ আঁকছে—উঠে আসুক। .....এর মধ্যে নালিশ-ফরিয়াদ আছে, তার বিচার, দণ্ড—এর ওপর যদি কখনও কোন ছেলেকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এল।...একটা মিশ্র কলরব। এর মধ্যে কোন খদ্দের এসে পড়ল, মহাদেব মাষ্টার সওদা দিতে ওদিকে চলে গেলেন। ঘুরে এসে সামনে রাখা জল চৌকিটার ওপরে বেত আছড়ে প্রশ্ন করলেন—'এত গোল কিসের তোদের ?'

নীচেই বসতেন মহাদেব মাষ্টার। চেহারাটা বেশ মনে আছে। প্রায় বৃদ্ধ, মাথায় অল্প কেশ, প্রায় সব পাকা। রংটা ফর্সার দিকেই। যতদূর মনে পড়ছে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। মোটের ওপর স্নেহ-প্রবণই ছিলেন। তবে অতগুলি ঐ বয়সের ছেলে, নিত্য কিছু না কিছু হচ্ছেই, চৌকির ওপর শুধু বেতটা মাঝে মাঝে আছড়ালেই চলত না। অর্থাৎ চৌকি ছাড়া অন্যত্রও আছড়াতে হোত। আমার পিঠেও পড়েছে।

এই থেকে আমার দ্বিতীয় রূপ বৈকালিক রূপের কথা এসে পড়ে।

পাঠশালা থেকে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া সেরে আমার বাড়ির পড়া করা, তারপর ঠাকুরমার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়া। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালের এই ব্যবস্থা ছিল, সময়টা যখন দীর্ঘ। ঠাকুরমা জেগেই থাকবার চেষ্টা করতেন। কোনও কোনও দিন—'হোল রে ? তোর হোল রে ?'—বলতে বলতে কথা এলিয়ে আসত, ঘুমিয়ে পড়তেন।

এও একটা অদ্ভুত যোগাযোগ, মাঝে মাঝে ভাবি, কৌতুক লাগে। যে বিধাতা আমায় এমন ঘর-ছাড়া বাঁধন-ছাড়া করে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি তার ব্যবস্থাও করে গেছেন। গার্জেন করে দিলেন ঠাকুরমাকে। একে তো সম্বন্ধটা গার্জেনের নয়, বরং বরাবর গার্জেন থেকে বাঁচাবার দিকেই লক্ষ্য ছিল, তার ওপর ধর্ম-কর্ম, ব্রত-উপচার আছে। সময় যা বাঁচত মা-বাপ-ছাড়া নাতি দুটিকে যত্ন-আত্তি করতেই কেটে যেত, যতটুকু সাধ্য। এছাড়া কথকতা ছিল, যাত্রা ছিল, সেকালে সব যাত্রাই রামায়ণ মহাভারত অবলম্বন করে।

গার্জেনের দিকে এই।

দ্বিতীয় যোগাযোগ, দাদা স্কুলের ছাত্র। আমি যখন বাড়িতে বা বাড়িতে থাকবার কথা আমার, উনি তখন স্কুলে। দাদা নিজে যে মস্ত বড় গার্জেন ছিলেন সুবোধ, বাধ্য ভাইটির—এমন নয়, তবে, দুপুরে আমারই মতো বাড়িতে থাকলে, আমার ইচ্ছাকে তো অতটা লাগাম ছেড়ে দিতে পারতাম না।

রোজই হোত না। দাদা অসুস্থ হয়ে পড়েও মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতেন। তাছাড়া সেজো পিসিমা আর ছোট পিসিমা দুজনেই কাছে—একজন কোন্নগরে, একজন পেনিটিতে, মাঝে মাঝে এসে দু'চার-দিন করে থাকতেন; রোজ হওয়ার উপায় ছিল না, তবে পথ খোলা পেলে আমি পড়তামই বেরিয়ে। প্রতিবন্ধক একটু স্থায়ী হলেও, উপায় দেখিয়ে দেওয়ার পথে মস্তিষ্ক কার্পণ্য করত না বা বিবেক বিরূপ হোত না। একটা ছিল—দাদার অসুখ, বা পিসিমাদের কেউ রয়েছেন—বসে কাপড়ে ফুলতোলা বা উলবোনার বিরাম নেই, নজর মাঝে মাঝে আমার পড়ার দিকে—আমি সময় হয়ে এলে বই স্লেট নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম...ভাবটা, আর তো কিছু বলবার জো নেই, চললাম পাঠশালায়।

কতরকমে যে হাতছানি দিয়ে ডাকত চাতরা আমায় আড়াই-তিন বছরের প্রতিদিনের ঘটনা অত কি মনে থাকতে পারে? একে অতদূর, তায় উত্তর জীবনে কত ভালোয়-মন্দয়, কত গুরুতর ঘটনা ঘটে সেসব নগণ্য অর্থহীন ঘটনা সমষ্টিকে আরও বিস্মৃতির গর্ভে ঠেলে দিয়েছে। কত যে একেবারেই মুছে গেছে তারও ইয়ত্তা আছে? অন্ধকারের পটভূমিতে জোনাকির মতো একবার চিক্ করে জলে উঠে বিস্মৃতির অন্ধকারে যায় মিলিয়ে। তারই মধ্যে কতকগুলা স্থিরশিখা অনির্বাণ প্রদীপের মতোন তাদের আলোকবৃত্ত নিয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে। সুপ্ত ছিল, সোনারকাঠির স্পর্শ দিয়ে তাদের জাগিয়ে এনে আমার সাহিত্যে স্থান দিয়েছি। তাই আমি হয়তো আমার চাতরার জীবন দিয়ে আমার অভিভাবকদের নিরাশ করেছি, কিন্তু আমি নিজেকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছিলাম।

স্থান পেয়েছে অনেকগুলিই আমার লেখার মধ্যে। 'নীলাঙ্গুরীয়' অনেকখানিই চাতরা নিয়ে। 'বর্ষায়' বইখানির দুটি গল্পের পটভূমি চাতরা। শ্যামলী নয়নতারাকে ভালোবেসেছিলাম—কাঁচা শৈশবে একজন পূর্ণ যুবতীকে—সেটা যে এ্যাডোলেসেণ্ট লাভ, একটা অবুঝ মোহমাত্র—তাতে কিছু আসে যায় না। জিনিসটা পরম সত্যে যে ঘটেছিল আমার জীবনে একদিন। উত্তরকালে, যৌবনের শেষপ্রান্তে—এক বর্ষাদিনে আবার আমার কাছে ফিরে এল। বর্ষার মতোই তার স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি নিয়ে।

ভালোবেসেছিলাম গৌরাঙ্গী চারুকে। আমার পাঠশালা পালানো খেলার সাথী। সমবয়সিনী। ওরা দুজনের কেউই আমায় ভালবাসত না। নয়নতারার পক্ষে সম্ভবই ছিল না। বাজার থেকে ওর এটা-ওটা শখের জিনিস লুকিয়ে কিনে এনে দেওয়া, বর অক্ষয়কে লেখা চিঠি ডাকে দেওয়া—এই সবের জন্যই আমার ছিল যা খাতির, হয়তো খানিকটা স্নেহমিশ্রিত। খেলার সঙ্গিনী চারুর (প্রধানত যাত্রা থিয়েটার খেলার কো-এক্টার) এটুকুও ছিল না। আমারই মতো প্রায় অভিভাবকহীনা, আমারই মতো মুক্ত জীবনে তার মধ্যেও এনে দিয়েছিল একটা পুরুষালি ভাব। বয়সকালে সে-ভাব কাটিয়ে আদৌ সে কোনও পুরুষকে নারীর মতো ভালবাসতে পেরেছিল কিনা আমার জানা নেই। চাতরা একবার মাত্র নীলাঙ্গুরীয়'তে এসে আমার কাছে সেই মধুময় নিবিড় সান্নিধ্যে তো আর আসে নি। অনেক কাহিনীরই প্রথম অধ্যায়ের টুকু শুধু জানা, মাঝের ও শেষের অধ্যায় অজানাই থেকে গেছে। তবে আমার জীবনে সেই একটি করে অধ্যায়ই যে নিটোল হয়ে পরিপূর্ণ। একটা কথা এখানে অকপটেই বলে রাখি, যখন নিজের কাহিনীই ফেঁদে বসেছি। ভালবাসা আমার জীবনে বহুদিন পর্যন্ত একটা যেন ব্যাধিই ছিল। ভালো দেখলেই ভালোবাসায় পড়ে যেতাম। কোন কোন ক্ষেত্রে মর্মান্তিকই।

আমার বিধাতা যখন আমার কপালে সন্ন্যাসী-বৈরাগীর ত্রিপুণ্ডকই এঁকে দিলেন, তখন নয়নে অমন ভালবাসার (না ভালোলাগাই বলি) অঞ্জন বুলিয়ে দিয়ে রসিকতা করলেন কেন বুঝে উঠতে পারি না।

তা বলে আমার সমস্ত চাতরা প্রবাসটুকু আমার শুধু ভালোবাসা নিয়েই কেটেছে এমন কথাও নয়। কত দিনের কত বিচিত্র যে স্মৃতি, কাহিনীতে স্থান পাওয়ার জন্যে ভিড় করে আসছে।

চাতরা জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে শীতলাতলা। এখনকার মতোই শীতলাতলা তখনও ছিল চাতরার প্রাণকেন্দ্র—হয়তো এখনকার চেয়ে বেশীই, কেননা এখন চাতরা একটা শহরই। চারিদিক থেকে তার প্রাণের ডাক। তখন একটি শান্ত পল্লী, তার যা কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান শীতলাতলায় কেন্দ্রীভূত।

যাত্রা হবে তার আয়োজন চলছে। তার মধ্যে আমার একটা কাজ বাঁধাই ছিল। অবশ্য একা নয়, আমারই মতো কতকগুলো ছেলের সঙ্গে যাদের ঘরের টানটা শিথিল। ······আসর সাজানো হবে তার জন্যে রঙ্গীন ফুল, শেকল, পতাকা চাই। বসে গেছি সবাই লেই আর কাগজ নিয়ে। বড়দের কেউ কেটে কেটে দিচ্ছে, দেখিয়ে দিচ্ছে, জুড়ে চলেছি।

অল্প তো নয়। মন্দিরের সামনে প্রশস্ত উঠানটার সমস্তটুকু নিয়ে বড় আসর। আজ আচ্ছাদন হয়েছে, তখন কিছুই নেই। সমস্ত জায়গাটা ঢেকে বিরাট সামিয়ানা তোলা হচ্ছে। অতগুলো খুঁটি, সব রঙ্গীন কাগজে মুড়ে রং বেরংয়ের পতাকা বাধা হবে। শামিয়ানার এমুড়ে-ওমুড়ো ঝোলাবার মতো শেকল চাই। জুড়ে যাচ্ছি। বড়দের কে একজন এসে দাঁড়াল।···'দেখিস রে, কাল সন্ধ্যে থেকেই যাত্রা। দুপুরেই দল এসে যাবে। তারপরেই তাদের হাতে আসর ছেড়ে দিতে হবে। হাত চালা।'

ম্যারাপ বাঁধা হবে। বাঁশ কাটা হচ্ছে। দেবদারু পাতা এসে পড়ছে। রাস্তার ধারে ধারে দোকান উঠছে, তার হট্টগোল। মন যে চারিদিকের টানে গিয়ে গিয়ে পড়ছিল, গুটিয়ে এনে মাথা হেঁট করে শেকল জুড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ বেড়ে গেছে আসরের গুরুত্ব। শেকল তোয়ের না হলে আসর নিতে চাইবে না অধিকারী। হয়তো হবেই না যাত্রা।···চালা। হাত চালা।

উপলক্ষটা শীতলা পূজা নয়। ঠিক কি তা মনে নেই। বাড়ির না হয়ে সাধারণ বা বারোয়ারী কিছু উৎসব হলে তখন শীতলাতলাতেই হোত। সেই রকম কিছু একটা। খবরটা পাঠশালেই হঠাৎ পাই। সোজা চলে এসেছি। এই পাড়ারই কোন এক পড়ুয়া-সাথীর বাড়িতে বই স্লেট রেখে, মুড়ি-মুড়কি খেয়ে এসে বসে গেছি। সে-ই খবরটা দিয়েছিল। নিজের পাড়ার ছেলে নয়, বেশি অন্তরঙ্গ নয় বলে নামটা মনে নেই।

রাত হয়ে গেল। চোরের মতো টিপি টিপি বাড়ি ঢুকেই একেবারে আগুনের মুখে।

আমাদের বাড়ির সামনের দিকটা আমাদের বড় ঠাকুরদাদা ভগবতী-চরণের ভাগে পড়ে। তাঁর ছেলে হয় নি। কন্যা মনমোহিনী পিসিমা ছিলেন ওয়ারিশ। তাঁর ছেলে খেতন কলকাতায় চাকরি করছেন ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। ভাগাভাগি হলেও দেওয়াল উঠে নি। একটা যে সদর দরজা যেতে আসতে, সেটা ওঁদেরই দিকে। খোলাই ছিল, চুপিসারে ঢুকছি, অন্ধকার ঘেঁসে, নজরে পড়ে গেলাম।

'কে ?'—খেতনদার গলা।

তার পরেই—'ও বুঝেছি।...ওই তোমার গোপাল এলেন গো।'—বলেই একটা হাঁক।

অফিস থেকে এসে মাত্রা আফিম খেতেন। উনি, অবশ্য, নেশা চটে যাওয়ার ভয়ে খবরটা দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। কিন্তু হৈ-চৈ পড়ে গেল। ঠাকুরমা বেরিয়ে এলেন, সেজ পিসিমা, এসেছেন, তিনিও।

ওদিক থেকে মনমোহিনী পিসিমা, বৌদিদি, খেতনদাদার বউ, আধঘোমটা দিয়ে ঘরের দরজায়। দাদা অসুখে পড়ে বিছানায় শুয়েছিলেন তিনিও টলতে টলতে একটা ছড়ি হাতেই বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—'কোথায় ছিলি ? ভেবেছিস কি তুই ? কেউ বলবার নেই ?'

—আমার অপরাধ ওঁকে পুরোপুরি গার্জেন করে তুলেছে।

ঐতেই তখন তখন ব্যাপারটা এক রকম ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

পিসিমাও রেগে বেরিয়ে এসেছেন। অসুখের ওপর ওঁর উত্তেজিত হয়ে ওঠার জন্য গলা নরম করে ওঁর হাতটা ধরে বললেন—'যাবে আর কোথায় শেতলাতলা ছাড়া। শুনছি যাত্রা হবে। তুই ভেতরে আয়। কাল আমিই ওকে নাইতে যাবার সময় ধরে নিয়ে গিয়ে ওর গুরুমশাইকে বলব—এই আপনার শাক্‌রেদ, নিন।'

সেদিন আর উঠল না, ঐ পর্যায়েই শেষ হল।

মনমোহিনী পিসিমা বললেন—তোমার কম্ম নয় কাকীমা, ওকে বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দাও। শায়েস্তা করে দেবে। বুড়ো মহাদেব মাষ্টারের কম্মও নয়।

ঠাকুরমা হতাশায় আরও গলাটা নামিয়ে ক্লান্তভাবে বললেন—'কিছুই করব না মা, কাল লিখে দিচ্ছি যার ছেলে সে এসে নিয়ে যাক্। একটা অঘটন ঘটিয়ে বুড়ো বয়সে একটা কলঙ্ক লাগিয়ে না ছাড়ে।'

বোধহয় জুড়িয়েই যেত, সেদিন একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেলেও আমার বাউণ্ডুলেপনায় খানিকটা খানিকটা অভ্যস্তই হয়ে পড়েছিলেন সবাই। তবে খেতনদাদা আবার চাগিয়ে তুললেন। সকালে আফিমের ঝিমনো নেশাটা আর নেই। নেশা ছেড়ে গেলে নিঝুম নেশার সময়ের কথা—তেমন কিছু গুরুতর হলে মনে পড়ে গিয়ে একটু খিটখিটে হয়ে থাকতেন।

সকালে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন, বুকে তেল রগড়াতে রগড়াতে এগিয়ে এসে বললেন—'বিভূতিটার কি ব্যবস্থা করলে ? না, ছেড়ে দিলে চলবে না তো। কাকা আমায় পই পই করে বলে গেছেন ওর ওপর নজর রাখতে। নিজে আর বেত ধরব না—হয়তো ধরতেই হবে একদিন—আজ ও চলুক, আমার সঙ্গে, মহাদেব মাস্টারকে সোপর্দ করে দিই।'

ঠাকুরমা ভোরেই স্নানে বেরিয়ে যেতেন, মেজো পিসিমা ওঁর গলা শুনে এগিয়ে গেলেন, আমি আড়াল থেকে ওঁর দিকে চেয়ে কাতরভাবে হাত কচলাতে লাগলাম। পিসিমা বললেন—'পাঠশালা পালানও তো অভ্যেস আছে। তার চেয়ে ওকে আজ ঘরে বন্ধ করে রাখছি।'

খেতনদা বললেন—'তোর কম্ম নয়। আদুরে ভাইপো, তুই-ই তো ওকে আরও লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছিস'

ঠিক কিভাবে কি হোল মাঝখানে খানিকটা মুছে গেছে স্মৃতির পাতায়। মনে পড়ছে বাইরে থেকে শেকলটানা রান্নাঘরের মেঝেয় একটা মাদুরের ওপর ঘুমচ্ছিলাম। শেকল খোলার ঝনাৎ করে শব্দে জেগে উঠে দেখি কোলের কাছে বই-স্লেট, ঠাকুরমা, মনমোহিনী পিসিমা, দাদা, সেজো পিসিমা, বৌদিদি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। সেজো পিসিমাই জিজ্ঞেস করলেন—'আর এরকম হবে ?'

কাঁদ কাঁদ হয়ে বললাম—'না'

'উঠে আয়।'

দাদা আপত্তি করলেন—'ও কান ধরুক, নাকে খৎ দিক।' পিসিমা আর বৌদিদি ঠোঁট টিপে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। অর্থাৎ মস্ত বড় অভিভাবক।

এখন যেমন বুঝছি অর্থটা।

একটু গোঁজ হয়ে রয়েছি। মনমোহিনী পিসিমা বললেন—'তাহলে থাক সমস্ত রাত, দাও শেকল টেনে ; প্রথম কথাতেই অবাধ্য।'

"তাও বড় ভাইয়ের"—বলে বৌদিদি মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

খেয়ে দেয়ে যাত্রা দেখতে গেলাম। আমি, পিসিমা, বৌদিদি, বেরিয়ে, পাড়ার আরও কজন মেয়ে।

সমস্ত পথটা দাদার কাছে মনটা পড়ে রইল।

আসতে পারলেন না, মাত্র সেইদিনই ভাত খেয়েছেন। ঠাকুরমাও অবশ্য আটকে পড়লেন।

আমি, আর চাতরার যাত্রা ! ছোটখাট কত ঘটনা দিয়ে একসঙ্গে গাঁথা। কাছাকাছি হলে কদাচিৎই বাদ গেছে এক আধটা। শীতলাতলা হ'লে তো নিজের ঘরবাড়ির ব্যাপার। সে কালের যাত্রা। সন্ধ্যা থেকে সমস্ত রাত, পালা বড় হলে দিনের বেলা পর্যন্ত উপচে পড়ছে। মন থেকে প্রায় সবগুলিই খামচা-খামচা মুছে গিয়ে আর পূর্বাপর যোগসূত্রই খুঁজে পাওয়া যায় না। তার মধ্যে এইটি ছাড়া আর একটি বেশ স্পষ্ট—কারণটা বোধহয় সে রাতের অভিজ্ঞতার রসটাই ছিল অন্য ধরণের।

ঘটনাটা অনেক পরের। দাদা তখন পাণ্ডুলে চলে গেছেন, বাড়ি একেবারে খালি। পিসিমাদের কেউই নেই। বাড়িতে শুধু ঠাকুরমা আর আমি। খেতন দাদাদের সঙ্গে একটু মনোমালিন্যই চলছে। সমস্ত বাড়িটা ভোগ করছিলেন, আমাদের আসাটা ভালো মনে নিতে পারেন নি। সত্ত উপলক্ষটা কি হয়েছিল জানি না। একদিন পাঠশালা

থেকে ফিরে এসে দেখি উঠানে আমাদের আলাদা একটা দোর ফোটানো হচ্ছে। ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস ক'রতে বললেন—"তোমার অত কথা জানবার কি দরকার? কাল থেকে এ দোর দিয়ে যাবে-আসবে।"

একটা ছাড়া ছাড়া ভাব এসেই যাচ্ছিল। বেড়ে গেছে কদিন থেকে।

শীতলাতলারই যাত্রা, পালা দক্ষযজ্ঞ নাশ। ঠাকুরমা আর মনমোহিনী পিসিমার সঙ্গে দেখতে গেছি। একেবারে কথা বন্ধ নেই ছুদিকে, তাছাড়া পিসিমা ছিলেন ঠাকুরমার প্রায় সমবয়সী। যাত্রা কথকতা—এই সব উপলক্ষ্যে আবার কাছাকাছি এসে পড়তেন; সঙ্গীও তো দরকার। আমাদের অংশটাতে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কি যেন একটা নাম-করা দল; চুটিয়ে যাত্রা করছে। দেখছি এক মনেই, তবে একটা খুঁৎ থেকে গিয়ে স্বাদটা পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে না। আমায় বসতে হয়েছে ঠাকুরমার সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে, সঙ্গীরা আসরের ওদিকে, দাবড়ানি খাওয়া সত্ত্বেও যে মাঝে মাঝে তেমন তেমন সীনে খানিকটা করে হাততালি, কলরব হয়েই যাচ্ছে তাতে যোগ দিতে পারছি না, মনে মনে ছটফট করছি, একবার কপাল ঠুকে জিজ্ঞেস করলাম—'আমি ওদিকে গিয়ে বসব ঠাকুরমা? বড্ড গরম হচ্ছে।'

খাটল না। ঠাকুরমা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন—'বুঝেছি, বোস চুপ ক'রে।'

আটকে দিতে কল্পিত গরমটা আরও বেড়ে গেছে, এই সময় যাত্রায় একটা বিরতির সঙ্গে সঙ্গে ছু'জন জুড়ি উঠে কানে হাত দিয়ে তান ধরল। মনমোহিনী পিসিমা বললেন—'আমার মাথাটা যেন একটু ধরে আসছে কাকিমা। আমি না হয় উঠছি—পালার তো এখনও আদ্দেকও হয়নি। দেরি হবে ভাঙ্গতে।'

উপস্থিত বুদ্ধিটা মন্দ ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'গরমেই নাকি পিসিমা। বোধহয় কার্তিক মাস, একটু শীতেরই আমেজ।' পিসিমা উঠতে উঠতে ঠাকুরমারই জবাবটা দিলেন—'হ্যাঁ গরমে। তুই না হয় চলে যাবি মোনোর সঙ্গে?

[illegible] বললেন—'তাই আয়, শুয়ে থাকবি আমার কাছে।'

খুব ভিড়। জুড়ি তান ধরতেই বাইরে যার যা কাজ সেরে আসবার জন্যে উঠে পড়ায় যে একটা বিশৃংখলা এসে পড়ল তার মধ্যে পিসিমার থেকে ছটকে পড়তে আমার মোটেই অসুবিধা হোল না। শামিয়ানার বাইরে গিয়ে পিসিমা আমায় খানিকটা খুঁজলেন মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, নাম ধরে ডাকতে ডাকতে। একেবারে অন্যদিকে সরে গিয়ে চুপটি করে নজর রেখে যাচ্ছি। না পেয়ে কি একটু ভাবলেন; তারপর গোলমালের

মধ্যে একটু গলা তুলেই অনির্দিষ্টভাবেই বললেন—'তাহ'লে তুই থাকই কাকিমার কাছে।'—বলে চলে গেলেন।

মাথা ধরা রোগই ছিল তাঁর, আমার মত গরম লাগা নয়।

যাত্রা ভাঙ্গল শেষ রাত্রে। কে একজন কাকে জিজ্ঞেস করতে, বুক পকেটের ঘড়ি বের ক'রে বলল, তিনটে কুড়ি।

চঞ্চল ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গলে ঠাকুরমাদের ওদিকে পৌঁছাতে খানিকটা গেলই সময়। গিয়ে দেখি ঠাকুরমা নেই। ভিড়টাও পাৎলা হয়ে গেছে, যাতে করে খুঁজতেও হোল না; বোঝাই গেল, আরও জনকয়েক যাঁরা এসেছিলেন ওপাড়ার তাঁদের সঙ্গে চলে গেছেন। থাকবার কথাও তো নয়, জানেন আমি পিসিমার সঙ্গে আগেই চলে গেছি।

ভয় করতে লাগল। এত রাত্রে একলা কখনও বাড়ি যেতে হয়নি। শুক্‌নো মুখে একটু ঘুরলাম এদিক ওদিক, যদি কারুর পাই দেখা। অল্পক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা খালি হয়ে গেল। জাজিম কয়েকজন আগেই গুটিয়ে নিয়ে গেছে। একজন এসে ঝাড়লণ্ঠনের মোম-বাতিগুলা আঁকশির মতন কি একটা দিয়ে নিবিয়ে দিল। মাত্র দু'তিনটি রইল জ্বালা। সতরঞ্চিগুলা গুটিয়ে রোল করা রয়েছে; কাল আবার হবে যাত্রা।

রীতিমতো গা ছমছম করছে। ঠিক এরকম অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। যাত্রা ভেঙ্গেছে, সঙ্গে সঙ্গেই গেছি চলে। এ যেন একটা ভুতুড়ে কাণ্ড হয়ে গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই অত ভিড় হট্টগোল থেকে একেবারে চারিদিক নিস্তব্ধ অন্ধকার। কি ভেবে কি ঠিক ক'রেছিলাম মাঝখানটা গেছে মুছে। রেল লাইনের পাশে, লাইনের দিকে পাঁচিল দেওয়া রাস্তা ধরে চলেছি। বাঁদিকে আমার মাথার সমান উঁচুতে লাইন। ডানদিকে গোটা তিন ডোবা আর টানা ঝোপঝাড়। রাস্তার ধারেই দূরে দূরে গোটা দুই পোড়ো বাড়ি, জঙ্গলে ঢাকা। ভালো বাড়ি যা আছে ডোবাগুলার ওধারে। চলেছি, কোনও রকমে যেতেই হবে বলে, সাড় নেই। শীতলাতলা খুব দূরে নয়, বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা দু ফার্লং হবে। মাঝামাঝি রেল পেরুবার একটা চরকি পড়ে। কাছাকাছি পৌঁছেছি, একটা গুমগুম শব্দ, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একটা ট্রেন সিগ্‌ন্যাল না পাওয়ায় হুইসিল দিতে দিতে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেঁপে উঠেছিল বুক, কিন্তু ঐতেই আবার সাহস ফিরে এল। গাড়িগুলা থেকে খানিকটা ক'রে আলো এসে পড়েছে।...মানুষ গলা বাড়িয়ে দেখছে স্টেশনের দিকে। কথাও বলছে। শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে, এমন কি

এগিয়ে নিজেও ছুটো কথা কইতে। কি কথা, কি ভাবে বলব ভাবতে ভাবতে চরখিই ঘুরিয়েছি, ভোঁস ভোঁস করে ছেড়ে দিল গাড়িটা।

আরও যেন বিকট হয়ে উঠল চারিদিক। আরও যেন নিঃসাড় হয়ে গেছি। শুধু পথের জ্ঞানটা আর আর আমি চলেছি এইটুকু বোধ আছে। এর পরেই রাস্তাটা ডানদিকে ঘুরেছে! আরও সরু, তবে বাড়ি আছে ছু'দিকেই। এসে পড়েছি পাড়ার মধ্যে। যদিও ডোবা-বন জঙ্গলের কমতি নেই। তবে সব বাড়ি সংলগ্ন। পা চালিয়ে দিলাম। সাড় আছে কি আরও নিঃসাড়ই ঠিক ধরতে পারছি না। তারপর হঠাৎ আর একটা ডানদিকে মোড় নিতে গিয়ে আচম্‌কা একটা কথা মনে পড়ে যেতে সমস্ত শরীরটা যেন ঝন্‌ঝনিয়ে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে উঠল। শেষ গলি, ছোটও, তবে একেবারে সরু, আর ছু'দিকেই বাড়ি বলে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মনে পড়ে গেল ডানদিকের দোতলা বাড়িটা আস্তই, তবে ভুতুড়ে বলে ভাড়াটে হয় না। চেঁচাতে ইচ্ছে করছে···কিন্তু যদি দোতলা থেকেই উত্তরটা আসে। তা সত্ত্বেও চেঁচাতেই যাব, গলা থেকে আওয়াজ বেরুল না। এর পরে আমার মনের অবস্থাটা আমি সময়ের এতদূর থেকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। নিজেরই স্মৃতি একেবারেই ধোঁয়াটে। শুধু এইটুকুই মনে আছে—একাই পার হই গলিটা, কাউকে ডাকিনি, বোধ হয় পারিনি বলেই, ছুটিও নি, সেও পারিনি বলেই।

আলাদা দরজা ফোটালেও, কি জানি কেন তখনও কপাট বসানো হয়নি। উঠান পেরিয়ে ঘরের দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলাম—'ঠাকুরমা।' ছু'বার ডাকতে হোল। উঠে দোর খুলে ঠাকুরমা অবাক হয়ে একটু দাঁড়িয়েই রইলেন। তারপর প্রশ্ন—'তুই মোনোর সঙ্গে আসিস নি?

...আমি নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমুচ্ছি···ভাঙ্গতেই চলে এসে।'

বললাম—'ভিড়ে কোথায় যে গেলেন পিসিমা, হাজার খোঁজাখুঁজি করেও পেলাম না।'

'একলা এলি? ভয় করল না?'

ততক্ষণে বেপরোয়া ভাবটা ফিরে এসেছে, বললাম—'হুঁঃ, ভয় কিসের? রাম নাম ক'রতে ক'রতে চলে এলাম।'—রাম নাম মনের কোণে একবার উঁকি মারবারও অবসর পায়নি।

ভিন্ন রসের বলে আরও বেশি করে মনে আছে বলেছি না?

রসই বৈকি। এক সময় হয়তো রুদ্র রসই ছিল। যতই দূরে সরে আসছি—সেই রসই স্নেহে, কারুণ্যে আরও একটা অনির্বচনীয়, কিসের সঙ্গে মিশে মধুর হয়ে উঠেছে। যখন বর্তমানে কিছু নিয়ে হয়ে পড়ি ক্লান্ত, মনটাকে আটকে না রেখে ছেড়ে দিই। চলে যায় সেই সব দিনে।

কাগজের শেকল তৈরী থেকে সব কিছু—সাদা, লাল, সবুজ ঝাড়-লণ্ঠনের কম্পমান আলোর শিখা—হাওয়ায় কাগজের শেকলের খসখসানির সঙ্গে আলোর বেলোয়ারি কাঁচের দোলায় ঠুনঠুন শব্দ।

...এইবার আরম্ভ হবে যাত্রা—বেহালার টান, তবলার ডিমডিম, মন্দিরার তরল টিনটিন। ঝপ করে শুরু হয়ে গেল কনসার্ট। একটি ছেলে—অদম্য তার কৌতূহল—ভয় লাঞ্ছনা, যত রকমের বিপদ হতে হয়—অতিক্রম ক'রে চলেছে কতদিন কত পথ দিয়ে। তার সঙ্গে একদিনের এই কাহিনী।

সমস্তটুকু আবার দেখে যাই মানসচক্ষে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। কী যে অমৃত লাগে!

সদ্য প্রত্যক্ষের ফুলগুলাই যায় আগে ঝরে। স্মৃতির বাগিচায় কিন্তু আলাদা নিয়ম। কাঁটাই আগে গলে ঝরে যায়—ফুলগুলা থাকে তাদের অম্লান সুষমায় বৃন্তে লেগে। যা দূরের স্মৃতি তাই অম্লান। শৈশব স্মৃতি দূরতম বলে আরও যেন বেশি ক'রেই।

চাতরা জীবনে যেমন শুধু ভালোবাসাই নিয়ে ছিলাম না, তেমনি আবার যাত্রা অপেরা নিয়েও নয়। চাতরায় আমার সবচেয়ে বড় ব্যসন ছিল ঘুরে বেড়ানো। যেদিন যেদিক টানলে। 'বর্ষায়' গল্পের নয়নতারার দ্বিপ্রাহরিক তাসের মজলিসে যে গেছি, তাও প্রায় নিরুদ্দেশভাবেই ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক সময় মনে পড়ে গিয়ে। সমবয়সিনী চারুর থিয়েটার-যাত্রা খেলাতেও তাই। চাতরার জীবনধারার ভাষা থেকে নিয়ে সর্বাঙ্গীণ বাঙালীত্বের বিস্ময় অনেকদিনই গেছে মিটে। নিত্য-ভ্রাম্যমাণের কাছে, রাস্তাঘাট, বনবাদাড়, ডোবা-পুকুর, বাড়ি-মন্দির—সব নিবিড়ভাবেই পরিচিত। তবু যে কী পেতাম—আশা আর মিটতে চাইত না। যেদিন জাগত মনে নূতন আবিষ্কারের নেশা, চলে যেতাম পশ্চিমে বড় পুকুরের দিকে, আরও এগিয়ে 'বড়ায়'। এ জায়গাটা তখন আরও জঙ্গলে ঢাকা, একেবারে অজ পাড়াগাঁ, দিনদুপুরেও যেন রাতের নিশুতি। গা ছমছমই করে জায়গায় জায়গায়। তবে লোভটাও ছিল গা ছমছমানিরই।

প্রধান আকর্ষণ ছিল রেলের দিকে শ্রীরামপুর স্টেশন। আর গঙ্গার দিকে গোঁসাইপাড়া হ'য়ে যে পথটা শ্রীরামপুর গিয়ে পড়েছে। স্টেশনে যেতে একটা বড় রকমের দুর্ভোগ আমার একরকম বাঁধাই ছিল। যেতে যেতে ঘোড়ার গাড়ি দেখে তাইতে চেপে বসা। কথাটা বুঝতে ভুল হ'তে পারে। দাঁড় করিয়ে ভাড়া করে চাপা নয়। আগেই বলেছি তখন আমার

আধলার যুগ যাচ্ছে, পয়সাটা ক্বচিৎ এসে পড়ত পালে পার্বণে। ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া—দোয়ানি, চারানি ছিল স্বপ্নের জগতে।

আমি উঠে বসতাম গাড়ির একেবারে পেছনে যে একটা তক্তা আটা থাকে, ভাড়াটেদের চাকর-বাকরদের...দাঁড়াবার-বসবার জন্যে, তার ওপর। দুর্ভোগটা হোত প্রতিবারেই একটা লোভে। বা হয়তো ভুলেই। লোভ আর ভুল তো নিতান্ত এ-পাড়া-ও পাড়ার বস্তু নয়। যদি তক্তাটার ওপর বুক চেপে পা দুটো লট্‌কাতে লট্‌কাতে যাই, হয়তো শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেও যেতে পারি। তা না করে প্রায়শঃ চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠে গাড়িতে পিঠ দিয়ে উল্টো মুখ করে বসতাম। পৃথিবীটা ঈর্ষারই জায়গা। এটুকুও ভালো মনে না নেওয়ার মতো লোকের অভাব হোত না, সব বয়সেরই। একটি ছেলে রাজার হালে গাড়ির পিঠে ঠেস দিয়ে আরাম করে যাচ্ছে এটা তাদের সহ্য হত না। গাড়োয়ানের কাছে নালিশ। ছপাৎ ক'রে ছিপটির দড়িটা মুখে, মাথায় বা কাঁধে এসে পড়া, লাফ দিতে গিয়ে একেবারে চিৎ হয়ে রাস্তার ধুলার ওপর।

উঠে, একবার এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে ধুলার সঙ্গে লজ্জাটুকু ঝেড়ে নিয়ে আবার এগুনো। আঘাতটা সহ্য করেই নিতে হোত। এদিক থেকে গঙ্গার দিকটা আরও লাগত চমৎকার। এক তো গঙ্গাই। কখনো পুরনো হওয়ার নয়। রাস্তার সমান্তরালে চলেছে, কখনও এগিয়ে আসছে, কখনও পেছিয়ে গিয়ে কোন বাড়ি-বাগানের আড়ালে চলে যাচ্ছে—মাছ ধরা ডিঙ্গি থেকে নিয়ে কতরকম জলযান—একটা স্টীমার গেল তো দাঁড়িয়ে পড়ে তার ঢেউয়েরই খেলা দেখে শেষ করা যায় না। বড় বড় ভাউলে গুলাকে দোল খাইয়ে, ডিঙ্গিগুলাকে নাচিয়ে। সচল, নিত্যনূতন। ডানদিকের দৃশ্য স্তব্ধ। গোঁসাই জমিদারদের বড় বড় থামওলা বাড়ি, একের পর এক, লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা বাগানে কতরকম ফুলের গাছ, লতা, পাতাবাহার। গেটে দরোয়ান বসে। যদি বিকেলের দিকে হোল তো বাবুরা জুড়ি-ঘোড়ার গাড়িতে হাওয়া খেতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। স্তব্ধতার মধ্যে এইটুকু প্রাণের চঞ্চলতা আরও যেন ফুটিয়ে তুলতো স্তব্ধতাটুকু।

বিরাট বিরাট বাড়ি। তখনকার দিনে বড়লোকেরা দুর্লভ-দর্শনই ছিল। নিজেদের আভিজাত্য নিয়ে বাড়িতেই থাকত বেশী। স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগ নয়। সত্যের চেয়ে কল্পনার প্রসার অনেক বেশি। একটুখানি আভাস দিয়ে বাকিটা আড়ালে থেকে গেলে কল্পনা একেবারে ডানা মেলে দেয়। অতবড় বাড়ি, কত লোকজন, মেয়ে-পুরুষ, গৃহিণী, কন্যা, বধূ, ছেলেমেয়ে, দাসদাসী—কত বা বৈচিত্র্যে ভরা সংসার। ঘুরে দেখতে দেখতে চলছি,

গতি কিন্তু মন্থর হ'য়ে গেছে। দোতলায়, অলিন্দে যদি কাউকে ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া গেল তো হয়তো দাঁড়িয়ে পড়েই হাঁ ক'রে দেখছি। সব বাড়িই বেশ খানিকটা ক'রে দূরে, দেখাকেও স্পষ্ট করে দেখা যায় না; বড় বড় গোল থামওলা বাড়ি। কোন বাড়িতে থামগুলো উঠে গেছে একেবারে সেই দোতলা পর্যন্ত। সবগুলিই অবশ্য এ ধরণের নয়, তবে সবগুলাতেই এই রকম প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাচুর্যের ভাব আছে।

একটা প্রশ্ন এইখানে করে রাখা যায়। সৌন্দর্য কি প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়? দু'টা সৌধই পাশাপাশি রাখলে উত্তরটা যেন মেলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সিনেট হল, আর আজকের কি নাম দেওয়া যায়? —সিনেট ঘরই বলি। অবশ্য আগেরটা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝবেন ভালো। প্রশস্ত, অনাবশ্যকভাবে উঁচু সিঁড়ি, প্রশস্ত বারান্দা, বিরাট হল। সামনে গোল গোল বিরাট স্তম্ভের ওপর বিরাট ত্রিকোণাকার কার্নিশ বা অলিন্দ। সব মিলিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনের অংশ বেশি। তবে একবার সামনে দিয়ে যেতে হ'লে মাথা ঘুরিয়ে না দেখলে চলত না।

তার জায়গায় আজকে সিনেট গৃহ। ক'তলা, আরও উঁচু মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিঁড়ি, ঘর করিডোর প্রত্যেকটি প্রয়োজনের ফিতে পেতে তৈরী, অপচয় নেই এক ইঞ্চি।

শুধু একটা জিনিসের অপচয় কিন্তু ঘটেছেই; সেই সম্ভ্রম-জাগানো সৌন্দর্যের।

এ যুগে অবশ্য জীবনের সর্বস্তরেই প্রয়োজনের অগ্রাধিকার অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া আমি আমার শৈশব মনেরই প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে বসেছি এখানে। শৈশব—কৈশোর নিজেই অনেকটা অপ্রয়োজনের কাল। সে সময়ের দৃষ্টিতে সম্ভ্রম-প্রশংসা থাকবার কথা, বিচার বিশ্লেষণের নয়। সবই সত্য, তবু কি একটা যায়ই যেন থেকে—একটা হারিয়ে যাওয়ার শূন্যতা। যেটাকে যুক্তি দিয়ে পূর্ণ করা যায় না।

চাতরার এই গোঁসাইগোষ্ঠী, একদিক দিয়ে নিজেদের আভিজাত্য নিয়ে স্বতন্ত্র থাকলেও, অন্যদিকে কতকগুলা আচার-আচরণ প্রথা দিয়ে সমাজের সঙ্গে গাঁথা হয়ে থাকতেন। এঁদেরই মধ্যে কেউ হতেন সমাজপতি। দোল দুর্গোৎসবে প্রাসাদ অবারিত দ্বার তো থাকতই, এ ছাড়া আরও হয়তো যোগসূত্র রক্ষায় কিছু কিছু বিধি-বিধানের মধ্যে একটা ছিল 'সামাজিক' দেওয়া (যার এখনকার দিনে কল্পনাই শক্ত)। সে সময় চাতরার সমাজপতি ছিলেন নন্দলাল গোস্বামী—সংক্ষেপে নন্দ গোঁসাই। হয়তো গোষ্ঠীর মধ্যে অগ্রগণ্য বলেই। এই 'সামাজিক করা' জিনিসটা ছিল তৈজসপত্র দান। চাতরা খুব বড়, পুরাতন জায়গা। কোনও একটা উপলক্ষে—এখন মনে

নেই আমার, প্রতিটি ঘরে, সম্ভবত ব্রাহ্মণ পরিবার থেকেই কিছু তৈজস-পত্র উপঢৌকন দিতে হোত। আমরাও পেয়েছি। আমার দেখা একবারের কথাই মনে পড়ে। জিনিসটা একটা পেতলের ঘড়া ছিল কি একসেট থালা-বাটি গেলাস ছিল স্পষ্ট মনে পড়ছে না। দক্ষিণে শ্রীরামপুর, উত্তরে শ্যাওড়াফুলি—এই দুইয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজকে এইভাবে তোয়াজ করা, হাতে রাখা, অল্প কথা ছিল না।...এই সমাজপতিত্ব নিয়ে একটা রেষারেষি ছিল, যেন হস্তান্তর হ'য়ে যাওয়ার আশংকা। আমার সময়েও যেন একটা উঠেছিল গুলতান। তবে নিতান্ত ছেলেমানুষ, তার স্বরূপ এবং তাৎপর্যটা মনে নেই। তবে একটা কথা মনে আছে—

কোনও একটা বড় রকমের সামাজিক নিমন্ত্রণে আমরা ছেড়ে যাওয়ায় ঠাকুরমা বেশ একটু হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছিলেন, কারণটা অবশ্য আর কিছু নয়। আমরা নূতন গিয়ে থাকব বলেই এ ভুলটা হ'য়ে থাকতে পারে। কিন্তু ঠাকুরমা শুধরিয়ে ছাড়লেন। সমাজ-ব্যবস্থা এতই নিরেট-নিশ্ছিদ্র ছিল যে কোনও খুঁতই অবহেলিত হওয়ার মতো ছিল না। অন্যদিকে উপায়ও ছিল না। কথায় কথায় একঘরে হওয়ার আশংকা তো কম ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে দাবি মিটিয়ে নিতে হোত, মিটিয়ে দিতে হোত। ভিক্ষা নয়, অধিকার।

গোঁসাই পাড়ায় আমার মুক্ত পরিব্রাজনের খানিকটা একথা-সেকথায় এসে পড়ে আটকে দিলে। চাতরা এইখানেই শেষ। একটা খাল, ওপর দিয়ে উটের পিঠের মতো একটা পুল। পেরিয়ে শ্রীরামপুরের সীমানা। গঙ্গা ঘুরে এগিয়ে এসেছে, ধারেই একটা সুরকির কল।

শ্রীরামপুরের এদিকটায় আমি আর বড় একটা যেতাম না। তবে এইখানটা আমার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রায়ই পুলের ইটের রেলিংটায় বুক চেপে সতৃষ্ণনয়নে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতাম। একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করতাম। তারপর ফিরে আসতাম। অতি সামান্য জিনিসই, কিন্তু প্রতিবারের লুব্ধ দীর্ঘশ্বাস জমে জমে তাকে আমার কাছে অসামান্য ক'রে তুলেছিল।

বোধহয় আমার অন্য কোন বইয়ে ব'লেও থাকব এর কথা।

পুলের নীচে দিয়ে যে নোংরা খালটা ভেতরের দিকে চলে গেছে, তার ওপারে তদনুরূপ একটা সরু নোংরা রাস্তাও গেছে সমান্তরালে ঢুকে। তার ওপর খানিকটা দূরে পরিবেশটার সঙ্গে তাল রেখে পাশাপাশি গুটি তিনেক ঘর। তার প্রথমটিতে অন্যান্য আর কি সব আহার্যের সঙ্গে একটা এনামেলের থালায় থরে থরে সাজান, গায়ে ভালো করে রাঙ্গা-হলদে মসলা মাখানো আস্ত আস্ত ডিম সিদ্ধ। নশ্বর দেহে

সোনার রঙে সমস্ত জায়গাটা যেন আলো ক'রে রয়েছে, কিছু কিছু বেচা-কেনাও চলছে। কিন্তু আমার নাগালের বাইরে। প্রথমত মূল্য; গল্পের হাঁসের সোনার ডিমের মতো অমূল্যই মনে হোত। আধলা জমিয়ে জমিয়ে কোনও জন্মেই পৌঁছাতে পারার মতো নয়। দ্বিতীয়তঃ নির্জন, দিনেও খানিকটা অন্ধকার, জায়গাটাতে যেতেও কেমন গা ছমছম করত, ফলে এব্যাপারে পুলটাই ছিল আমার বাঁধা সীমানা।

তাও যদি শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়েই ছেড়ে দিত?

অনেক দিন পরের কথা।

বাবা এসেছেন পাণ্ডুল থেকে। অনেক দিনের বাৎসল্য জমা মনে; কী নোব, কী দেখবার ইচ্ছা—কী খাওয়ার সাধ?

পথে ভাল ভাল খাবারের দোকান বাদ দিয়ে তাঁকে মাইলখানেক পথ হাঁটিয়ে পুলের ওপর নিয়ে এসেছি। বাবা যেন বেশ একটু ধাঁধায় পড়ে গেছেন। কথা গেছে কমে, তাইতে আমিও যেন কোনও কিছু গলদ থাকতে পারে ভেবে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেছি। তারপর যখন চারিদিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"কোথায় সে জিনিস?"—আমি একেবারে অবাক মেরে গিয়ে চুপ ক'রে রইলাম—অমন সোনার বরণ ডিমের গাদা, অথচ নজরে পড়ছে না, তা হলে একটা বড় রকমেরই গলদ হয়ে গিয়ে থাকবে আমার।

সেদিন বাবার যা দীর্ঘশ্বাস পড়ল যেন এখনও লেগে রয়েছে আমার কানে। বললেন—ছিঃ, ওসব খায় না। নেশাখোরদের চাট।...বাড়ি চলো।"

রাস্তায় মাত্র আর একটিবার কথা। যতদূর মনে পড়ছে, জিজ্ঞেস করলেন—"কখনও যাও না তো ওদিকে?"

বাবা এসেছিলেন দাদাকে পাণ্ডুলে নিয়ে যেতে; চাতরার জল হাওয়া ওঁর একেবারে বরদাস্ত হচ্ছিল না। একটু খাওয়া-দাওয়ারও অত্যাচার ছিল। ইস্কুলে একটানা অনেকক্ষণ থাকতে হোত বলে আমার চেয়ে ওঁর বরাদ্দ কিছু বেশি ছিল। মুখরোচক 'যা-তা' কিনে খাওয়ার সুযোগও ছিল বেশি। প্রায়ই পেটের ব্যারাম লেগেই থাকত, শেষে আমাশায় একেবারে শয্যা নেওয়ার মতো হল। রথযাত্রার মেলায় অত্যাচারটা বেশি হয়ে হোল এটা—বাবাকে লেখা হল।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় রেলের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। একটা গাড়ি আসছে, বেরিয়ে গেলে 'চরকী' পেরুব। গাড়িটা তীব্র আওয়াজের সঙ্গে মনে হোল যেন আমার নামটাও গেল মিশে। জায়গাটা ভূতুড়ে,

সময়টাও সেই রকম। সঙ্গী পেয়ে তারই সঙ্গে বাড়ি ফিরে দেখি বাবা এসেছেন। খবর পেয়েই চলে এসেছেন।

বললেন—'তোকে গাড়ি থেকে ডেকেছিলাম, পেয়েছিলি শুনতে?

বড় আশ্চর্য লাগছে। ফ্যাল ফ্যাল করে একটু চেয়ে থাকবার পর অল্প হেসে মাথা হেলিয়ে জানালাম—হ্যাঁ, পেয়েছিলাম।"

এবারেও প্রথমবারের মতো দিনকতক যে রইলেন, তাতে আমায় মামার বাড়ি আর শিবপুর থেকে ঘুরিয়ে আনলেন। বড় মামা তখন একটা জুটমিলে চাকরি নিয়ে শিবপুর থেকে মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করছেন।

দাদাই শুধু যাবেন। আমি এখানে থেকে লেখাপড়া করব—এ কথাটা গোপন রাখা হয়েছিল আমার কাছ থেকে। উনি চলে গেলে একটা অদ্ভুত শূন্যতা এসে গেল আমার মনে। অবশ্য প্রথম ধাক্কাটা ছিল আমার না যাওয়াটা; এই অপ্রত্যাশিত প্রবঞ্চনা। একদিন কান্নাকাটি লুটোলুটি এরপরই এল দাদার অভাববোধটা। দুজনের জীবনধারা ছিল ভিন্ন, যার জন্য বরাবরই একসঙ্গে থাকলেও মাঝখানে এক ধরণের একটা দূরত্বই ছিল, দাদা চলে যেতে, কত যে কাছের, কত যে নিবিড়ভাবে আপন সেটা এই প্রথম উপলব্ধি করে নিজেকে নিতান্ত একা, অসহায় মনে হতে লাগল।

বাড়ির আকর্ষণ আরও ক্ষীণ হয়ে এল।

বাইরেরও সে-মোহ যেন আর নেই। ঘুরে বেড়ানর সে মুক্ত আনন্দ গেছে। একটা জায়গায় বসে, দাঁড়িয়ে, মনে মনে গোমড়াতে থাকি। গৌরাঙ্গ মন্দিরের রকে পা ঝুলিয়ে, কখনও বা রেলের চরকিতে বুক চেপে, কখনও কোন নির্জন পুকুর বা ডোবার ঘাটে বসে। ক্রমে বিচ্ছেদটা গা-সওয়া হয়ে এসে এ-ভাবটা গেলেও ব্যাপারটুকু নিয়ে চিন্তাটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে আবর্তিত হ'তে লাগল। অনুভূতিটা এতই নূতন সে বয়সে আমার পক্ষে যে, তার অভিনবত্বেই সেটা আমার কাছে কখনও পুরনো হ'তে পারেনি। অস্পষ্টতার কুহেলী আসতে পারেনি তার মধ্যে।

মনে থাকার একটা বড় কারণ, এই অনুভূতি থেকে এমন একটা ব্যাপার হোল আমার জীবনে, যার রহস্য আমি আজ পর্যন্ত ভেদ করতে সমর্থ হইনি।

দাদার চলে যাওয়ার কতদিন পরের কথা এখন ঠিক মনে পড়ছে না। তবে অনেকদিন, হয়তো কয়েক মাসই হয়ে গিয়ে থাকবে। এর মধ্যে পুরনো ছাত্ররা ফিরে ফিরে এসেছে—সেই নয়নতারাদের দ্বিপ্রাহরিক মজলিস; সেই চারুর বীররসের অপেরা-থিয়েটার, শ্রীরামপুরের গঙ্গার

ধার, স্টেশনের ঘোড়ার গাড়ি—সবই আছে, শুধু দাদা-ঘটিত ব্যাপারটা হঠাৎ কোথা থেকে মনে উদয় হ'য়ে যেন ফিকে পান্‌সে করে দিয়ে যাচ্ছে —এই যখন অবস্থা, একদিন আমার চিন্তাটা হঠাৎ অন্য এক রূপ নিয়ে যেন জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল আমার মনের এক জায়গায়।

আমি বাধ্য ছিলাম না কোনকালেই, তবে বিদ্রোহের ভাবও কখনও আসেনি মনে। সেদিন একেবারে উগ্র ধরণের বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলাম।

হঠাৎই বা কেমন ক'রে বলি। সমস্তটুকু বলে গেলে হয়তো বোঝা যাবে। আঘাতটা কোন প্রশ্নে কি ক'রে এসে মনটাকে দিয়েছিল জাগিয়ে।

বর্ষার দিন আকাশটা মেঘাচ্ছন্নই রয়েছে।

তবে বৃষ্টিটা একটানা নয়। সকালে বেশ এক পশলা হ'য়ে গিয়ে সেই যে পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করল, তারপর থেকেই মনটা বড় অন্তর্মুখী হ'য়ে এল। অনেকদিন পরে। প্রথমে চিন্তাগুলো যেন একটা অব্যক্ত বেদনার আকারে, তারপর আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে লাগল। দাদা, বাবা, মা, পাণ্ডুল। বাইরে বর্ষা, ঘরে মনটাও আমার একটা অবুঝ অভিমানে সজল হয়ে উঠল।... অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ব, শুধুই পড়ে যাব।··· অবশ্য বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা ছাড়া হোল না কিছুই।

দুপুরেও ছোটবড় কয়েক পশলা হ'য়ে গেল। বিকালের আকাশ থমথমে। বই শ্লেট পাঠশালায় যাওয়ার থলের মধ্যে পুরছি দেখে ঠাকুরমা বললেন—"নাইবা গেলি আজ আর, নামবেই বৃষ্টি আবার।" সমস্ত দিনের সেই অবুঝ অভিমানের শিখাটি শুধু উস্কানি পেল একটু। বললাম—"কত আর কামাই করব ?"

"ছাতাটাও তো ছিঁড়ে এনেছিস কাল। দেখ, বৌমা সেলাই করে রেখেছেন কিনা।"

শিখাটা শুধু আর একটু বাড়ল, বললাম—"আমি কোথাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে যাব'খন।

পথে দু'বার পাশের বাড়ির বারান্দায় উঠে দাঁড়াতে হ'য়েছিল। তারপর যখন পাঠশালার কাছাকাছি এসে গেছি, পাঠশালার আকর্ষণটা হঠাৎ গেল কেটে। বাঁ দিকে একটা সরু রাস্তা বেরিয়ে গেছে, দুদিকে ভাঁট-আশশাওড়ায় ভরা পোড়ো জমি। সেই রাস্তাটায় ঢুকে পড়লাম। রাস্তাটা শেওড়াফুলির দিকে চলে গেছে। জঙ্গুলেই। আগে গেছি খুব কম। বেশ অনেকখানি গেলে কিছু ডোবা, আম-কাঁঠালের বাগান আর ছাড়া ছাড়া কিছু বাড়ি, প্রায় সবই গোলপাতায় ছাওয়া।

অর্থাৎ বৃষ্টি নামলে আশ্রয় নেই।

নামল বৃষ্টি। ছুটে গিয়ে একটা মেটে ঘরের ছেঁচতলায় দাঁড়ালাম। নীচেটা শান বাঁধানই। প্রায় হাত দেড়েক বাদ দিয়ে দেওয়ালটা, একফালি রকের মতো থেকে গেছে। ওপরের গোলপাতায় ছাউনিটা নেমে এসে খানিকটা এগিয়েই যাওয়ায় জলটা বাইরেই গিয়ে পড়ছে। আমি গুটিয়ে-সুটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হাত দুয়েক পরেই একটা জানলা ; ছোটই, যেমন এধরনের ঘরে হয়। একটা পাল্লা খোলা।

বেশ লাগছে। ছেঁচ বেয়ে হাতখানেকের মধ্যে জলের ধারা, অথচ ভিজছি না। বেশ একটা ছেলেমানুষি কৌতুকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছি, হঠাৎ ঘুরে চাইতে হোল।

"ওকি দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন ?"

—একজন স্ত্রীলোক, বৃষ্টির জন্যই জানলার অন্য পাল্লাটাও টেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যে হাতটা গরাদের মধ্যে দিয়ে খানিকটা বাড়িয়ে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

বললাম—"ভিজছি না তো।"

হাতটা টেনে নিলাম।

"ভিজছ বৈকি। আরও ভিজবে, জোরে নামছে বৃষ্টি। ভেতরে চলে এসো। ···দাঁড়াও একটু, আমি টোকা নিয়ে আসি···দাঁড়িয়ে থাকবে ···যেও না···"

ব্যস্ত হ'য়ে ভেতরের দিকে চলে গেলেন। একটু পরেই নিজের মাথায় একটা বড় টোকা দিয়ে, হাতে আলাদা একটা নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে হাতের টোকাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—"নাও, মাথায় দিয়ে আস্তে আস্তে এসো। দেখো, পেছল।"

পেছনে পেছনে গিয়ে উঠান ঘুরে ঘরে উঠলাম। সামনের বাঁশের আলনা থেকে একটা শুকনো গামছা নামিয়ে বললেন—"নাও মুছে নাও। ···থাক আমিই দিচ্ছি মুছিয়ে। ···সারা অঙ্গ জলের ছাটে ভিজে গেছে, বলে, কৈ ভিজিনি তো।···পাঠশালে যাচ্ছিলে দেখছি তো···কাদের ছেলে তুমি ? এই বিষ্টিতে বের হ'তে দিয়েছে ! ছাতা নেই !···গায়ে একটা পিরান পর্যন্ত নেই !···

আমার গা মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে গরগর ক'রে যাচ্ছেন, দাদার জামা, জুতো পরে স্কুলে যাওয়ার কথা মনে পড়ে গিয়ে বললাম— "পাঠশালের এই ড্রেস।'

"তার মানে ?"—হাত থামিয়ে ঘুরে প্রশ্ন করলেন "ছাতা নিয়ে,

পিরান গায়ে পাঠশালার ঢুকতে দেয় না? তা নয়—বাপ মায়ের গা নেই, নৈলে এ দুর্যোগে...”

হঠাৎ গলাটা ধরে এল। বললাম—“মা এখানে নেই।”

থেমে গেলেন—

“বাবা—?”

“তিনিও এখানে নেই।”

দু’চোখে হাত দিয়ে হু হু ক’রে কেঁদে উঠলাম। এতক্ষণ বাবা মাকে টেনে একটু যেন তিরস্কারের টোনে বলে যাচ্ছিলেন, গলাটা নরম করে বললেন—“নেই তাঁরা এখানে?...তাইতো বলি...তা থাকো কার কাছে”

“ঠাকুরমার কাছে।”

“বুড়ো মানুষ নিশ্চয়?”—একটু ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

—হাঁটু মুড়ে বসে মুছিয়ে দিচ্ছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে একটু চেপে ধরলেন আমায়; বললেন—“চুপ করো। কাঁদে না।...দাঁড়াও, তোমার কাপড়টা একটু স্যাঁৎসেঁতিয়ে গেছে...”

ঘরের চারিদিকে একবার চেয়ে নিতে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল যেন। বললেন—“অত ছোট কাপড় তো নেই, তুমি এই শাড়িটুকু পরে ওটা ছেড়ে দাও। আমি রান্নাঘরে আগুন জ্বেলে এখুনি শুকিয়ে আনছি।”

আলনা থেকে একটা ছোট ডুরে শাড়ি নামিয়ে আমার হাতে দিয়ে, টোকাটা মাথায় বসিয়ে উঠান পেরিয়ে ওদিকে চলে গেলেন। একটু পরে এসে বললেন—“দেরি হবে না আমার। তুমি একটু স্থির হ’য়ে বসে থাকো ততক্ষণ।...কি যে কাণ্ড সব! একটা দুধের ছেলেকে!”

বাকি কথাগুলো টোকার ওপর বৃষ্টির ছাটের শব্দে ডুবে গেল।

বড় অদ্ভুত লাগছে সমস্তটুকু। তার কারণ, স্ত্রীলোকটির চেহারা। মার চেয়ে বোধহয় একটু বড়, তবে এটুকু ছাড়া মায়ের সঙ্গে এত মিল আমি আর কারুর মধ্যে দেখিনি। সাজে অলঙ্কারেও। রাঙাপেড়ে শাড়ি, কানে পাশি মাকড়ি, নাকে সোনার নাকছাবি। কথা বলার ভঙ্গিতেও বেশ খানিকটা মিল, শুধুমাত্র কথা কম—আর বাবা-ঠাকুরমা-জ্যেঠাইমার মধ্যে মার স্বর থাকতো চাপা, এঁর বেশ মুক্ত তো, আমার ব্যাপারটাতে যেন মনটা আরও বিচলিত ক’রে দিয়ে আরও মুখর ক’রে দিয়েছে।

বৃষ্টি বেশ জোরেই নেমেছে।

একটু পরে একহাতে আমার কাপড় আর এক হাতে একটা ছোট জামবাটি নিয়ে এসে ঘরে উঠলেন। আমায় বললেন—“এই ক’টা খেয়ে নাও...কী জ্বালা বাবা, এমন দেখিনি!”

বাটিতে চিঁড়ে ভাজা, ঘি-মরিচ দিয়ে মাখা। চারটে মুড়ির মোওয়াও ছিল, একটা রেকাবিতে তুলে নিয়ে বাকিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন —"খাও। একটু বোস; পিদিমটা জ্বেলে দিই। বোধহয় সন্ধ্যেই নামল।"—আলো জ্বেলে আরম্ভ করলেন।

"তা তোমার বাবা-মা থাকেন কোথায়? কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়? মাঝে মাঝে এসে দেখে যান তো? তুমিও তো যাও?"

বললাম—"না, অনেক দূরে থাকেন তাঁরা।"

"কোথায়?"

"পশ্চিমে।"

চিঁড়ে ভাজা খেতে খেতে শরীর-মন বেশ চাঙ্গা হয়ে এসেছে।

তিনশ মাইল কথাটা প্রায় শুনতাম। পরিমাণটা না বুঝলেও গালভারি কথাটাও জুড়ে দিয়ে বললাম "এখান থেকে তিনশ মাইল।" গুরুত্বের জন্য সময়ের দিকটাও দিলাম বাড়িয়ে—

"তিনদিন তিন রাত লাগে।"

"ওমা, কোথায় যাব!"—

মাদুরের ওপর বসে খাচ্ছি, উনি দুটো হাঁটুর ওপর চিবুকটা চেপে গল্প করছেন। একেবারে শিউরে উঠলেন। বললেন—"অত দূর থেকে বুড়ো ঠাকুরমার হেপাজতে ছেলেকে রেখে...না বাপু এ কেমন মা-বাবা বুঝিনে···যাই বলো..."

বললাম—"মা ভালো, তাঁর ইচ্ছে ছিল না তো···"

"তবু ভালো! ...থাকে কখনও? ...আর বাবা?"

নীচু মুখেই চোখ দুটো তুলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, মনে হোল যেন দোষ খোঁজবার জন্যে। একগাল চিঁড়ে মুখে ফেলে দিয়ে চিবোতে চিবোতে বললাম—"বাবা তো আরও ভালো..."

তবে?"

লেখাপড়া চাইতো। ওঁরা কি করবেন? ছেলে যদি চিরকাল মুক্‌খু হয়ে...

বাঁধা বুলি আওড়াতে গিয়ে আবার গলায় কি যেন ঠেলে এল একটা। সেটা গিলে ফেলবার চেষ্টা করে একটু ধরা গলাতেই বললাম—"একটু জল দেবে?"

"ওমা, দেখছ ভুল, জলই দিইনি।"

—উঠে পড়ে একটা কলসী থেকে জল গড়িয়ে সামনে রেখে দিয়ে বললেন—"খেয়ে নাও।...থাক ওসব। বাবা, মা ভালো না হ'য়ে কি মন্দ হয় কারুর? তুমি খেয়ে নাও আস্তে আস্তে। ...সত্যি তো,

ছেলে মুখ্যু হয়ে থাকুক, কোন মা-বাপে চায়? ...তাঁদের কথা ভেবে মন খারাপ কোর না। ...বরং সেখানকার গল্প বলো, শুনি। সব হিন্দুস্থানী তো? সেখানে তোমার আর কে কে আছেন? ...আর দুটি চিঁড়ে দিই, দাঁড়াও।"

এরপর পাণ্ডুলের গল্পই চলল। আমাদের দু'বাড়ির, নীল কুঠির, বামনটুলির, পড়াউয়ের পাড়ার। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস ক'রে যাচ্ছেন— গল্পের মোড় ফিরে যাচ্ছে। খাওয়ার হাত বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। অনর্গল বকে যাচ্ছি—চাতরায় আসার পর এই প্রায় আড়াই বছরের মধ্যে পাণ্ডুলকে এত কাছে ক'রে আর কখনও পাইনি। ঠিক এই ধরনের একটি দিনও।

বৃষ্টিটা কখন থেমে গেছে টের পাইনি কেউ। উনি বাইরের দিকে চেয়ে হঠাৎ ব'লে উঠলেন—ওমা এখনও সূয্যি ডোবেনি ছাখো! অথচ আকাশের জন্যে মনে হচ্ছিল—কখন্ না সন্ধ্যে উৎরে গেছে। আষাড়াস্ত বেলা তো।...তা'হ'লে তুমি এক কাজ করো—আর দেরি না ক'রে বেরিয়ে পড়ো। ...রেলের ওপারে ভট্‌চাজ্জি পাড়া বললে না? দাঁড়াও দেখি।"

উঠোনে নেমে আকাশটা দেখে নিয়ে উঠে এসে বললেন—"না, মেঘে ফাটল ধরেছে, সন্ধ্যে হ'তে হ'তে পৌঁছে যাবে। আর দেরি কোর না। ...শাড়িটা না হয় গায়ে জড়িয়ে যেতে। পরে দিয়ে গেলেই হবে। একটু ঠাণ্ডা রয়েছে তো।"

কাপড়টায় কষি দিচ্ছিলাম আর কোমর না বেঁধে বাকিটা গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে বললাম—'থাক্, আর ঠাণ্ডা লাগবে না।'

'থাক তা'হ'লে। তিনি আবার তাঁর সইয়ের বাড়ি থেকে কি কাপড়ে আসেন দেখি। ...তুমি কিন্তু টোকাটা নিয়ে যাও। তেমন কিছু ভারি জিনিস নয়। ...বলা যায় না তো আকাশের কথা।"

বললাম—"টোকাটা দিয়ে যাব তো?"

"টোকার জন্যে নয়। ভারি তো জিনিস! এমনি আসবে তুমি। এই ছাখো, ভুলেই যাচ্ছিলাম। একটু দাঁড়াও।"

পেছল উঠোনে আঙ্গুল টিপে টিপে একটু তাড়াতাড়িই ভেতরে গিয়ে তখুনি ফিরে এসে কোঁচড় থেকে পাঁচটা মোওয়া বের ক'রে দিয়ে বললেন —"এগুলো নিয়ে যাও, খেও; ভাল লেগেছে বলছিলে। দাঁড়াও কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিই।"

বেঁধে দিয়ে বললেন—"দেখি।"

নিজেই আমার চিবুকের নীচে দুটো আঙ্গুল দিয়ে মুখটা তুলে একটু চেয়ে রইলেন। নিজের মনেই একটু গলাটা নামিয়ে বললেন—"যাকে দেন, ছালাফেলা করেই দেন।"

হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়েছি। প্রশ্ন করলাম—"কে দেন? কি দেন?"

"সে তুমি বুঝবে না।"

আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলেন। বললেন—"একা যেতে ভয় করবে না তো।"

"সপ্রতিভ হ'য়ে উঠে বললাম—'ভয় আমার করে না।'

একটু হাসি ফুটল ঠোঁটে, বললেন—"না, ভয় কিসের? ঠাকুর দেখছেন। এসো। আবার আসবে কিন্তু, আসবে তো?"

অনেকখানি ঘাড় কাত ক'রে নেমে পড়লাম রাস্তায়।

আর যাওয়া হয়নি। কেন হয়নি সে কথা মনে নেই। তবে সেদিনের ঘটনাটুকু যেমনভাবে মনটাকে নাড়া দিয়েছিল, সেভাবে চাতরায় থাকতে অন্য কিছুতে নাড়া দেয়নি। মায়ের সঙ্গে অতখানি সাদৃশ্য, মায়ের মতো যত্ন-আর্তি, মায়ের মতো চোখের জলে বিদায় দেওয়া—সব মিলিয়ে ওঁকে ঘিরে পাণ্ডুল যেন নূতন ক'রে জেগে উঠল আমার মনে। তারই সূত্র ধরে, যা বলছিলাম, একটা বিদ্রোহ। তারও চিত্রটা অদ্ভুত। বাবার বিরুদ্ধে। বাবা প্রবল, বাবা যা-খুশি করতে পারেন। মায়ের দিকে না চেয়ে দুই ভাইকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন। স্যাম্পেনি ছাড়বার সময় মার ছোট জানলার ঘুলঘুলি দিয়ে সেই নিরুপায়ভাবে চেয়ে থাকা। তারপর এই আমার ওপর দিয়ে সেই ব্যাপারেরই পুনরাবৃত্তি।

কিছু না বলে কয়ে, সব কথা শেষ পর্যন্ত গোপন রেখে, আর সবাইকেও কড়া শাসনে মুখবন্ধ রাখতে ব'লে নিয়ে গেলেন দাদাকে।

আমাদের পিতামহ ষোল-সতেরো বছর বয়সে চাতরার বাড়ি ছেড়ে পায়ে হেঁটে, নৌকায় করে, মাঝে মাঝে অনাহারে ও অনিদ্রায় পাণ্ডুলে গিয়ে উঠেছিলেন, নিশ্চয় এমনই কিছু হয়েছিল বলেই তো। তাঁর রক্ত আমার ধমনীতে চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি পাণ্ডুলে যাব। যাবই আমি।

টানটা মায়ের। সেদিন সন্ধ্যায় আসবার সময় হঠাৎ কি মনে হ'তে বেশ খানিকটা দূর থেকেই ঘুরে দেখি মেয়েটি তখনও একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই ছবিটুকু কি ক'রে এঁর সঙ্গে মাকে যেন এক ক'রে দিয়েছে। মার আবার সবার শাসনে ওটুকুও ক্ষমতা নেই যে বেরিয়ে দু'পা এগিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়াবেন বিদায়ী ছেলেদের দেখবার জন্যে; ছোট্ট জানলার ঘুলঘুলিতে মুখ চেপে দাঁড়িয়ে আছেন।

যাব আমি। কারুর অনুমতি নয়, কাউকে বলা নয়। ঠাকুরমা

জানতেন, বলেন নি। দাদা জানতেন, বলেন নি। বাবা তো সব কিছুর মূলেই।

সংসারে আমরা দু'টি মানুষ প্রবঞ্চিত, অবহেলিত। আমি তো তবু বেটাছেলে, মা যেন আরও অসহায়। গিয়ে দাঁড়াতে হবে মার পাশে।

সেবারে বর্ষাটাও ছিল খুব জোর, যেমন ঘন ঘন, তেমনি রইলও অনেক দিন ধ'রে। পাঠশালা, কি, বাইরের খানিকটা ঘুরে ফিরে আসা—সব একরকম বন্ধ। ভিজে গিয়ে বেশ দিনকতক অসুখে পড়ে থেকে আরও নিরুপায় হ'য়ে রইলাম। ফলে ঐ চিন্তাটাই সার হ'য়ে রইল, যতই বাধা, দুঃখে, অভিমানে ঐ সংকল্পটাই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হ'য়ে উঠল।

একদিন হঠাৎ বিশ্রীরকম জিদ ধরে কান্নাকাটি সুরু ক'রে দিলাম। অসুখ সেরে দিন দু'য়েক ভাত খেয়েছি, খুব দুর্বল, ওষুধ চলছে তখনও, াকুরমা কাচের গেলাসে ক'রে নিয়ে এসেছেন, আমি দাঁতে-দাঁত চেপে মুখ ঘুরিয়ে রইলাম—খাব না ওষুধ। আমি পাণ্ডুলে যাব—আজই পাঠিয়ে দিতে হবে আমায়।

বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন ঠাকুরমাও। একা মানুষ, পিসিমাদের কেউ এসে যে থাকবেন তার উপায় নেই অবিরাম বর্ষার জন্যে; অনেক কষ্টে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাওয়ালেন ওষুধ। পাঠিয়ে দেবেন আমায় পাণ্ডুলে—উনিও আর পেরে উঠছেন না—জ্বরের ঘোরে ক্রমাগতই নাকি পাণ্ডুল আর মার কথা বলেছি—পোড়া বৃষ্টির একটু ধরন নেই যে একটা পোস্টকার্ড আনিয়ে লিখে দেন বাবাকে—একটু থামলে না হয় তারই ক'রে দেবেন, বাবা এসে নিয়ে যাবেন।

এর পরেই সেই ব্যাপারটা হয় যার রহস্য আমি এখনও ভেদ করতে পারিনি বলেছি আগে। এমন কি যতই দিন যাচ্ছে, যার বাস্তবতা সম্বন্ধে—আদৌ ঘটেছিল কিনা—আমি সন্দিহান হ'য়ে উঠছি। বা, ঘটে থাকলেও তার কতটুকু এবং কি আকারে ঘটেছিল। এক একটা সময় আসে যখন কতকগুলি বিরূপ ঘটনা ঘটে সে সময়ের স্মৃতিটাকে অভিভূত ক'রে যেন স্থায়ীভাবে কুয়াশায় আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। কতদিনের কথা জানি না। হয়তো বর্ষা কেটে গেছে কিম্বা একেবারে শেষের দিকে। একটা দুর্ঘটনা ঘটে আমার বাঁ-কনুইয়ের হাড়টা ভেঙ্গে যায়, কিছুদিন শ্রীরামপুরের হাসপাতালে কাটাতে হয়। আরও নিরুপায় হ'য়ে গিয়ে পাণ্ডুল ন: য় আমার সেই 'অবসেশন' চিত্তের আবিষ্ট ভাবটা আরও চাগিয়ে উঠে। ওটা কি আমার একটা দুঃস্বপ্ন ছিল—একটা উৎকট নাইটমেয়ার?

হ'লেও কিন্তু জাগ্রত সচেতন মনের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন—সে ছিল এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

যেন সত্যই একদিন আমি বেরিয়ে পড়ি পাণ্ডুল অভিযানে। গাড়িতেই যাব, বাবা-পিসিমা-মামার কাছ থেকে পাওয়া যা কিছু সঞ্চয় ছিল—শ্রীরামপুর স্টেশনে তা সমস্তই এক প্রতারকের কাছে খুইয়ে জিদ্ ধরলাম পায়ে হেঁটেই যাব তাহলে—রেলের লাইনের পাশে পাশে বৈদ্যবাটী পেরিয়ে ঝড়-বৃষ্টি—সন্ধ্যাটা হঠাৎ গাঢ় রাত্রি হয়ে এল—লাইন থেকে নেমে একটা পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি—অচৈতন্য। চেতনা হ'তে দেখি একটা ঘরে খাটে শুয়ে আছি—ফাটা চুনবালি খসান দেওয়াল, একজন বর্ষীয়সী স্ত্রী-লোক, তিনিও অনেকাংশে মায়ের মতনই, গরম দুধ খাওয়ালেন—অবসন্ন হ'য়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ি—সকালে উঠে দেখি কেউ নেই, আমি একটা জঙ্গুলে বাড়ির দোতলায় একা শুয়ে। ...তারপরেই একটা ফাঁক দিয়ে চাতরার বাড়ি—সেইভাবে খাটে শুয়ে জ্বরের ঘোরে চোখ খুলে দেখি পাশে ঠাকুরমা।

—এত নিবিড় একটা অনুভূতি, ঘটনা পরম্পরাগুলি এত নিখুঁতভাবে সাজানো যে আমার জীবনে একটা সত্য ঘটনা বলেই মেনে নিয়ে এসেছি। তারপর যতই সরে আসছি, যুক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছে —সম্ভব ছিল কি ওরকম একটা অঘটন ঘটা? সে সময়ের আমার নৈরাশ্য, অভিমান, বেদনা, নিরুপায় কিশোর মনের আরও কত সব জটিল অনুভূতিই কী চরমে এসে ঐরকম একটা রূপকথায় পরিণত হয়নি? এর আগে কোথাও তাকে অঙ্গীভূতই ক'রে নিয়েছি আমার সাহিত্যে; মনের কী অবস্থায় এখন বলা শক্ত। কিন্তু এ আমার জীবনালেখ্য। অবশ্য এতেও আশি বৎসরের ওদিক থেকে টেনে এনে এতে বাস্তবের সঙ্গে কিছু কিছু অবাস্তব বা অর্ধ-বাস্তব হয়তো পড়বেই এসে—পরিপূরক হিসাবে; একটা মুছে মুছে যাওয়া চিত্রকে পূর্ণ করে তুলতে যেমন কাল্পনিক রেখা-রঙের প্রয়োজন হয়। তবু জীবনালেখ্য বলেই সেদনের ঘটনা সম্বন্ধে যে আমি সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন নয়, এ স্বীকৃতিটা এইখানে দিয়ে রাখলাম। দিলাম না তার একটা পূর্ণাবয়ব চিত্র।

আর সব সত্য-মিথ্যা যাই হোক, হাসপাতাল-সাৎ হওয়ায় তো ভুল ছল না। একদিন পাঠশালা থেকে ফিরে এসে দেখলাম—বাবা এসেছেন। দন চার-পাঁচ পরেই বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে আমরা সবাই পাণ্ডুল যাত্রা করলাম।

আমরা চাতরার জীবনে আপাততঃ পূর্ণচ্ছেদ পড়ল।

আবার পাণ্ডুল।

এক এক সময় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যখন নিজেই নিজের সমালোচক হয়ে উঠেছি, একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে বেশ কৌতুক অনুভব করেছি। যেখানে স্থায়ী বসবাস, সে জায়গা ছেড়ে যখনই একটা উন্নততর জায়গায় বেশ কিছুদিন কাটিয়ে ফিরেছি, এমন একটা মনমেজাজ দাঁড়িয়ে যায় যেটাকে উন্নাসিকতা ছাড়া কিছু বলা যায় না। হাসিই পেয়েছে, অবশ্য তখন নয় অনেক পরে, ঐ আত্মসমীক্ষার সময়। অল্পদিনের জন্য বা ঘুরে এলে এটা হয় না, বেশ কিছুদিন সেখানে থাকলে, সেখানকার জীবনের সঙ্গে মিশে গেলে।

বারকয়েক এরকম হয়েছে আমার জীবনে। জায়গাটার হাওয়া—উন্নততর হাওয়াই বলা যাক—যেন গায়ে লেপটে গিয়ে সঙ্গে মিশে চ'লে আসে। একটা সংক্রামক ব্যাধির মতোই; যদি বড় জায়গার উন্নাসিকতাকে একধরণের ব্যাধিই বলা যায়।

দেখলাম পাণ্ডুল যেন আমার দৃষ্টিতে খেলো হ'য়ে গেছে—তার মানুষ, পরিবেশ, জীবনধারা সবকিছু নিয়ে; সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিজের দৈর্ঘ্য হঠাৎ গেছে বেড়ে। এইভাবটা মনের মধ্যে থেকে আমার মধ্যে আর একটা পরিবর্তন এনে দিল; নিজের খেয়ালখুশি নিয়ে থাকার জন্যই হোক, বা, অন্য যে কারণেই হোক, আমি বরাবর একটু স্বল্পবাকই ছিলাম। সে স্থলে হ'য়ে উঠলাম বাচালই।

সেটা আর কিছু নয়—আত্মপ্রকাশেয় জন্য একটা উৎকণ্ঠা; কত জানি, কত বেশি দেখেছি, আর সে সব কত উচ্চঅঙ্গের, সেটা প্রকাশ করে না দেওয়া পর্যন্ত মনটা হাল্কা হতে চায় না।

—"এই সায়েবের কুঠি, নীলের গুটিঘর, আর বাগান দেখে তোমরা অবাক হয়ে যাও, সেখানে গোঁসাইদের উঁচু উঁচু থামওলা এক একটা বাড়ির মধ্যে ওরকম দশটা বাড়ীবাগান এঁটে যাবে।"

কল্পনাবিলাসী লেখক করে তুলতে হবে ব'লেই বোধহয় বিধাতাপুরুষ শৈশব-কৈশোর থেকেই আমার মানসক্ষেত্রে অলংকারশাস্ত্রের "অতিশয়োক্তি"-র বীজ কিছু আতিশয্যের সঙ্গেই ছড়িয়ে রেখেছিলেন। ওই প্রায় বছর তিনেকের প্রবাসে চাতরায় যা কিছু দেখেছি, শুনেছি, উপভোগ করেছি—যাত্রা, অপেরা, মাহেশের রথ; বড় বড় বাড়িতে, বারোয়ারীতে তুর্গা-জগদ্ধাত্রী-অন্নপূর্ণা পূজার সমারোহ—পূজায়, বিবাহে, উপনয়নে, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ—দ্বিগুণ, চারগুণ ক'রে বাড়িয়ে বর্ণনা করে তাক্ লাগিয়ে দেওয়ার একটা নেশা ধরে গেল। অভ্যাসটা অবশ্য খুব বেশী দিন রইল না। গল্পগুলা পুরাণও হয়ে এল, বার-তুইতিন ধমকও খেলাম বাবার কাছে; অবশ্য স্নেহের

ধমকই। আমার উচ্ছ্বসিত বর্ণনার মধ্যে কোনও কাজে হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে—"আনাড়ির দল পেয়ে 'বুড়ো' বুঝি জমিয়ে বসেছে তুদিন চাতরা দেখে এসে?"···কিংবা—"নে, চুপ কর তো বুড়ো, ঢের হয়েছে···"

শ্রোতা-শ্রোত্রী দলের মধ্যে ও বাড়ির জ্যাঠাইমা থেকে বড় ছোট অনেকে উপস্থিত; হয়ত জ্যাঠাইমা বললেন—"আহা, বলুক না, বেশ-মিষ্টি লাগে ছেলেমানুষের মুখে।"

শোনার আগ্রহের চেয়ে প্রশ্রয়ই বেশি, এটা যখন বুঝতে পারলাম, বলার উৎসাহটার ধারও ক্রমে মরে এল।

আরও ছিল। ঠাকুরমা এসেছেন খবর পেয়ে বড়পিসিমা সবাইকে নিয়ে দেখা করতে এসেছেন; পিসেমশাই তখন উত্তরবিহারেই সাপৌল ব'লে একটা মহকুমার কাছারিতে রয়েছেন। ওঁর মেয়েরা এসেছেন। বড় পাঁচু আমার সমবয়সিনী। নূতন শ্রোত্রী পেয়ে আমার গল্পের স্রোত বেশ তোড়ের সঙ্গেই নেমেছে, পিসিমা এসে উপস্থিত হলেন।

"ভূতনের কি গল্প হচ্ছে? দেশে যা দেখে এলে বুঝি?"

খুড়িমা বললেন—"ও বড় ঠাকুরঝি, তা জানো না? চাতরা থেকে এসে পর্যন্ত ওর মুখে আর অন্য কোন গল্পই নেই—চাতরার যাত্রা-অপেরা, চাতরার রাস্তা-ঘাট, এমনকি চাতরার মেঠাইমণ্ডা যা খেয়ে এসেছে, কিনেই হোক, নেমন্তন্নেই হোক। "আমি তো আবার এদিককারই মেয়ে, অবাক হয়ে শুনছি। 'গুলজামুন' ভালোবাসে ব'লে ফরমায়েস দিয়ে নিয়ে এসেচি, বল্লে শুক্‌নো ক্ষীরের পানতুয়া, সেখানে দেখলে সবাই হাসবে। কদিন দেশে থেকে ছেলে কি হ'য়ে এল বলতো! হাসব কি কাঁদব ভেবে পাচ্ছি না।"

পিসিমার স্বভাবে গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা হালকা রঙ্গপ্রিয়তা মেশানো ছিল, ছোট বড় কেউ বাদ পড়ত না। সবে একটু আগে এসেছেন, জিনিসপত্র গোছানোর মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, বললেন—"তাই নাকি? তা'হ'লে শুকনো খটখটে গজা ভালোবাসে ব'লে আমি যে নিজের হাতে তোয়ের ক'রে নিয়ে এলাম, সে-গুলোর কি হবে? হ্যাঁরে, পিসির মান রাখতেও তো খাবি তু'একটা?"

"খাবনা কেন?"—আমি একটু ভারিক্কে হ'য়েই খানিকটা হাতে রেখে টেনে টেনে বললাম—"খুড়িমার গুলজামুনও তো খেয়েছি, এখানে ছিদাম ময়রার মতন পারবে কেন?"

"তবু ভালো! ঠোঁটে যেন একটু হাসি। খুড়িমার সঙ্গে একটু দৃষ্টি-বিনিময়ও হয়ে গেল যেন। তারপরেই হঠাৎ মনে-পড়ে-যাওয়া গোছের ক'রে ব'লে উঠলেন—"তবে, হ্যাঁরে ভূতোন, কার মুখে যে শুনলাম

কবে নাকি সদররাস্তার ভালো ভালো খাবার ছেড়ে, ডিম সেদ্ধ কিনে দেওয়ার জন্যে দাদাকে একটা নোংরা এঁদো গলির মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলি ?”

আমার সমস্ত অমন জমাট অডিটোরিয়ামটা হাসিতে একেবারে উচ্চকিত হ'য়ে উঠল। নেহাৎ ছোটরা, যারা বুঝল না তারাও একযোগে ঘনঘন হাততালি দিয়ে উঠল।

“যাঃ!—কবে ?—কোথায় ?—কে বল্লে ? যাঃ!”—অপ্রতিভ ভাবটা কাটাবার চেষ্টা ক'রে শেষ পর্যন্ত চুপ ক'রে গেলাম।

পিসিমাই সবাইকে ধমক দিয়ে উঠলেন। তালের মাথায় কথাটা বেরিয়ে গেছে, তবে ভাইপো যে অতটা অপ্রতিভ হ'য়ে পড়বে ভাবতে পারেন নি। ধমক দিয়েই বললেন—“বাঃ, এত হাসির কি হয়েছে দেখতে পাচ্ছিনা তো ? দেশে ডিম খাওয়া দোষের নয়, এখানেই ঝি-চাকর টের পেলে পালায়। নোংরা গলি তাতে হয়েছে কি ? দেখে ভালো লেগেছে, খেতে চেয়েছে। এখানে যে অমন নোংরা মেছুনীরা—সাতজন্মে কাপড় ছাড়া নেই—গায়ের গন্ধে ভূত পালায়—তারা যখন শ্যাওলায় মুড়ে রুই-কাৎলা কই-মাগুরগুলা নিয়ে আসে খাসনা তোরা ? ফেলে দিস ? ···তুই বল্ ভূতোন, আমি এসে শুনব। উঃ, কতদিন যে যাওয়া হয়নি চাতরায় !”

কিন্তু তখন কি আর সামলায় ?

আমার জীবনে চাতরার ভূমিকা সম্বন্ধে আগে বলেছি, পরেও বোধহয় আসবে। কিন্তু কী কুক্ষণেই যে সেই 'সোনার ডিম'—এর মোহে প'ড়ে গিয়েছিলাম, অন্ততঃ তখনকার মতো ঐতেই যেন আমার চাতরার দম্ভ পাণ্ডুলের ধুলায় দিলে মিশিয়ে। 'সোনার ডিম' দিনকতক আমার খ্যাপানই হ'য়ে রইল। একসময় গেলও সেটা, তবে চাতরার সে লুব্ধ সজলতা আর আমার জিহ্বায় ফিরে আসেনি।

আবার চলল পাণ্ডুলের পরিচিত জীবন। কী একটা বোধহয় থাকেই মাতৃভূমির ধূলায়, সারা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের অতিরিক্ত কী একটা অমোঘ আকর্ষণ, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার মনটাকে আনেই টেনে। এ যেন রাজরানীর কাছ থেকে এসে গরীব মায়ের স্নেহমাখা দৃষ্টির সুধা। অবশ্য তিন বছরে বয়স বেড়েছে, নূতন নূতন অভিজ্ঞতায় জীবনের দিগন্ত হয়েছে খানিকটা প্রসারিত। জিরাতের ঘূর্ণিতে সে-বিস্ময় আর নেই, গভীর রাত্রে পড়াউয়ের ভূত নামানো গানে সে সভয় রোমাঞ্চ নেই, আরও অনেক কিছুর অনেক রং গেছে বদলে, চাতরার মুক্ত

পরিক্রমার পর পাণ্ডুল আর সে মোহ ফিরিয়ে আনতে পারেনি। তবু কোনও কোনও দিন অশত্থ-বটের ছায়ায় ব'সে থাকি—উষ্ণ দ্বিপ্রহরের বাতাসে কোন দূরের মাঠ থেকে পাকা শস্যের গন্ধের সঙ্গে আধ-ভোলা, আধ-চেনা বনফুলের সুবাস আসে ভেসে, মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। চাতরা যেন চাপা পড়েই যায়, মনে হয়, আবার পাণ্ডুল ছেড়ে যেতে হবে না তো সেখানে? সেখানে বা আরও অন্য কোথাও?

চাতরার স্মৃতি তো একেবারে যাবার নয়। চাপাপড়ার মুখে যেন ঠেলে ঠেলেই ওঠে এক একবার। স্নেহের, আশঙ্কার একটা অব্যক্ত মিশ্র অনুভূতিতে মনটা যেন টন্‌টন্‌ করতে থাকে।

চাতরাকে চাপা দেওয়ার আরও কারণ ঘটল।

এর মধ্যে ও-বাড়ির দুই দাদা, বড় আর মেজো, দ্বারভাঙ্গায় স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে জায়গাটার সঙ্গে অলক্ষ্য একটা যোগ সূত্র গড়ে উঠতে লাগল। একটা নামকরা জেলা সহর, তায় রাজধানী। ছুটিছাটায় এসে তাঁরা যে গল্প করেন রাজার প্রাসাদ নিয়ে, রাজদেউড়ির জাঁকজমক নিয়ে—হাতি, ঘোড়া, আস্তাবল, ঘোড়সওয়ারদের কুচ-কাওয়াজ, মিলিটারি ব্যাণ্ড—তাতে চাতরার গোঁসাইপাড়া যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়। সহরে অনেক বাঙ্গালী, সেদিক দিয়েও কোনও দৈন্য নেই, দেশের বাঙ্গালীর মতোই তাদের বৈচিত্র্যময় জীবন—কালীপূজা, ক্লাব, থিয়েটার। তখন রাজের বড় বড় অফিসার থেকে নিয়ে মাঝারি-ছোট কর্মচারী, এদিকে হাসপাতালের প্রায় সব ডাক্তারই বাঙ্গালী। এ ছাড়া গোঁসাইদের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে এমন একঘর বাঙ্গালী জমিদারও রয়েছে—প্রবল প্রতাপ—রাখাল সিংহির দাপটে বাঘে-গরুতে একসঙ্গে জল খায়। এদিকে সামাজিক ব্যাপারে দরাজ হাত। বাড়িতে একটা কাজ হোল তো ও তল্লাটের নির্বিচারে সবাই ছাড়া সহরের সমস্ত বাঙ্গালীদের নিমন্ত্রণ। ষ্টেশনে গাড়োয়ানদের বলা—কোনও বাঙ্গালী সহরে যে-কোনও কাজে নূতন এলে তাকে সোজা রাখাল সিংহির আস্তানায় নিয়ে আসতে হবে। সেখানে নিত্য-আতিথ্যের কায়েমী ব্যবস্থা রয়েছে। দেশ থেকে যাত্রার দলও আসছে মাঝে মাঝে জমিদার বাড়িতে। একটা বড় সহরে নিত্য কিছু না কিছু ঘটছেই শোনবার মতো। ওঁরা এলেই আসর মাৎ করে রাখেন। বিশেষ ক'রে বড়দাদা। সেখানে সবতাতেই যে রয়েছেন এমন নয়, তবে মনটা রোমাণ্টিক, গল্প সংগ্রহ করবার কান আছে, ঔৎসুক্য আছে, বলবার একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে। এলেই যে-কটা দিন থাকেন, আসর জমিয়ে রাখেন। চাতরা

যে শুধু তলিয়ে যেতে লাগল তাই নয়, দ্বারভাঙ্গা সম্বন্ধে আমার মনটা সজাগ হ'য়ে উঠতে লাগল।

চাতরার ওপর মোক্ষম চোটটা ছিল কলকাতা। তাতে অমন যে দ্বারভাঙ্গা, তার জলুসটাও বেশ খানিকটা ফিকে করে দিল।

আমার চাতরা থেকে আসবার কতদিনের কথা ঠিক মনে পড়ছেনা—বছরখানেক কি ঐরকম হবে, অরবিন্দ নামে এক ভদ্রলোক নীলকুঠিতে বেশ একটু ওপরের দিকে চাকরি নিয়ে পাণ্ডুলে এলেন। বয়স ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে। চেহারাটা মনে প'ড়ে এখন যেমন বোধ হচ্ছে, দোহারা শরীর, রংটা যে খুব ফর্সা এমন নয়, তবে খুব সুপুরুষ। আর তেমনি সৌখীনও। তখন কস্‌মেটিক্ দিয়ে গোঁফের ছু'প্রান্ত সূচালো ক'রে রাখবার ষ্টাইল চলেছে নূতন। এক নয়নতারার বর অক্ষয়কে দেখেছিলাম, আর দেখলাম অরবিন্দবাবুকে। তেমনি সৌখীন সাজপোষাকেও, হামেসাই ফিটফাট। অরবিন্দ বাবু এলেন যেন কলকাতারই এক টুকরো। বেশ একটু সাড়া প'ড়ে গেল।

ছেলেবেলায় অত বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার ক্ষমতা থাকেনা। প্রথম সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, বাইরে যাই হোক, অন্তরে মানুষটি ছিলেন নিতান্তই সাদাসিদে। শৌখীনি—ওটা কলকাতার লোক ব'লে যেন নিতান্তই দেহমনের অঙ্গীভূত এক স্বাভাবিক জিনিস ছিল, তার মধ্যে নিজের কলকাতাপনা প্রচার করবার কিছু ছিল না।

খুব মিশুকে লোক। এখন মনে হ'চ্ছে, অডিট-জাতীয় কোন কাজে কয়েকমাসের জন্য আসেন। বাসাটা ছিল কুঠির কাছাকাছি কোনও ভালো জায়গাতে। ধরাবাঁধা নিয়মের চাকর নয়। উনি জ্যাঠামশাই আর বাবার অফিস থেকে আসার বেশ খানিকটা আগেই অফিসের সাজ ছেড়ে আমাদের পাড়ায় এসে উপস্থিত হতেন।

তখন উপলক্ষ আমরাই। খুব ভালোবাসতেন আমাদের। দূর প্রবাসে বাঙ্গালীর ছেলেমেয়ে। আমরা ঘেরে ঘুরে বসতাম। গল্পও হোত কলকাতার। ···রাস্তার মাঝখান দিয়ে ইয়া তাগড়া তাগড়া ঘোড়ায় টানা ট্রাম—রাস্তাও সেইরকম, চওড়ায় আধখানা জিরাত আমাদের—ছু'ধারে বাড়িঘর, নীচে বড় বড় দোকান, ওপর দিকে চাইলে ঘাড় উলটে যায়। —কেল্লা, মাটির নীচে, ইডেন গার্ডেনে গোরার বাগ্যি—গড়ের মাঠে গোরাদের কুচ-কাওয়াজ—এদিকে পেশাদার থিয়েটার, ক্লাসিক, ষ্টার, মিনার্ভা—হাওড়া স্টেশন—পুল হাওড়ার—কবে কোথায় কি হ'য়েছিল—রোজ শুনেও শেষ হয়না গল্পের অভিনবত্ব।

এরপর সম্পূর্ণ আর এক জগৎ। এ হোল পাণ্ডুল থেকে চাতরা, চাতরা থেকে দ্বারভাঙ্গা, তারপর না হয় কলকাতা। যেটা যার চেয়ে যতই বড় হোক, জাত তো একই। অরবিন্দবাবু এমন একটা জিনিস আমদানি করলেন, পাণ্ডুলে ব'সে যা কখনও কেউ কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

বাবা আফিস থেকে এসে জলটল খেয়ে বসলেন আমাদের সঙ্গে, ও বাড়ির ছোট জ্যাঠামশাই, কাকাজি (এখানের সম্বোধনের ভঙ্গীতে) মাইল তিন-চার দূরে রৈয়াম কুঠিতে কাজ করতেন, তিনি এলে তিনিও। অরবিন্দবাবু নবীন সেনের 'রৈবতক' কাব্য পড়তে শুরু করলেন। সে যে কী মাদকতা একটা! ভরাট গলায়, অপূর্ব ঢঙে সুর ক'রে প'ড়ে যাচ্ছেন। আবেগে উত্তেজনায় গলার স্বর উঠছে নামছে, এক একবার পড়ার ঝোঁকে হাত যাচ্ছে উঠে—বুঝছিনা কিছু, শুধু শব্দগুলার গম্ভীর মন্দ্রে তন্ময় হ'য়ে শুনে যাচ্ছি। ওঁদের মধ্যে কেউ হয়তো এক একবার কোনও অংশ পুনরাবৃত্তি করতে অনুরোধ করলেন, আবার পড়ে গেলেন অরবিন্দবাবু, হয়তো আরও একটু বেশী ভাবাবেগের সঙ্গেই।

পড়া শেষ হোল। পাণ্ডুল নিশুতি হয়ে যায় সন্ধ্যার পরই। ঐ একটা মাত্র শব্দ আকাশটাকে ভরাট ক'রে রাখত, শেষ হওয়ার সঙ্গে একটা থমথমে ভাব রইল বাতাসে আটকে। কিছুক্ষণ কোনও কথাই হোত না, যেন সবাই মোহের ঘোরে চুপ ক'রে থাকতেন। তারপর আবার খানিকক্ষণ চলত আলাপ। যা পড়া হোল তাই নিয়েই হয়তো কিছু আলোচনা। তারই সূত্র ধ'রে সাধারণভাবে তখনকার সাহিত্য নিয়ে খানিকটা আলোচনা—অনেকগুলা ভালো ভালো নাম—মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, আরও অনেক। এক একটা নামেরই কী ওজন! অতদিন চাতরায় থেকেও যে-পাঠ হয়নি, অরবিন্দবাবুর আসায় পাণ্ডুলের মাটিতে ব'সে তা হোল। জীবনে এ সব বিস্ময়কর যোগাযোগ কার প্রসাদে কী ক'রে ঘটে বুঝে ওঠা যায়না।

একটা কথা এখানে ব'লে রাখা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। লেখার ঝোঁকটা কি ক'রে এল এ প্রশ্নের উত্তর সব লেখককেই দিতে হয়। আমারও হয়েছে। তবে দশ-এগারো বছরের একটা বালককে একদিন 'রৈবতক পাঠ' সাহিত্যে অনুপ্রাণিত করেছিল, এতটা বলার সাহস পাইনি কোনদিন, আরও খানিকটা অন্য সব কারণ দেখিয়ে গেছি। তবু এক একবার মনে হয়েছে, মনোবিজ্ঞান নিয়ে এত সব অতীন্দ্রিয় সুপ্ত মনের কথা হচ্ছে আজকাল, সেদিন জেগেছিল কি মনের কোন নিভৃতে সূক্ষ্মতমও একটা আকাঙ্খা, ঐ রকম লিখতে হবে?...অবশ্য

ঐ রকম কারুর ধারে কাছেও পৌঁছানো গেলনা, তবে জীবনের পথটা তো ছিল ঐ দিকেই।

এইখানে আর একটা কথা ব'লে দিলে বোধহয় ভালো হয়। বাবার, কাকাজীর খুব কড়া নির্দেশ ছিল, যেখানে বড়দের আলাপ-আলোচনা চলছে, যে-ধরণেরই হোক, সেখানে যেন কোনমতে উপস্থিত না থাকি। বাবা অনেক উঁচুতে, দূরে। আমাদের চরিত্র গঠনের দিকে কাকাজীর দৃষ্টি বেশি থাকত ব'লে তাঁর নির্দেশ ছিল আরও কড়া। কিন্তু এ আসরে আমাদের থাকা নিয়ে কোনদিন কিছু তিনিও বলেননি। তাঁদের এ শৈথিল্যটুকু কি ভেবে এসে গিয়েছিল জানতে ইচ্ছে হয়।

এদিকে আমাদের জীবনে একটা বড় পরিবর্তন ঘনিয়ে আসছিল। আমাদের লেখাপড়ার সমস্যা যে চাতরা মেটাতে পারবেনা এটা ভালো-ভাবেই নিশ্চিত হয়ে গেছে। দ্বারভাঙ্গা নিয়ে ইতিমধ্যে ও-বাড়িতে যে পরীক্ষাটা চলছিল, বাবার দৃষ্টিও সেইদিকে গিয়ে পড়ল। দ্বারভাঙ্গায় রেখে আমাদেরও পড়ার ব্যবস্থা করা। ও-বাড়ির ব্যবস্থাটা শুরু হয় বড়দাদাকে নিয়ে। তিনি এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন। আর একটা সুবিধা হোল। তাঁরা কোনও কারণে দ্বারভাঙ্গা ছেড়ে চলে যেতে বাড়িটা কিনে নিলেন জ্যাঠামশাই। চাতরা ব্যর্থ হওয়ায়, খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাচ্ছিলেন বাবা, বড়দাদের ব্যবস্থাটা কায়েমী হ'য়ে যাওয়ায় এ-সম্ভাবনার দিকে তাঁরও দৃষ্টি পড়ল।

এই সময় একটি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হ'য়ে মনে হোল যেন দীর্ঘ তিন পুরুষের পাণ্ডুল প্রবাসের দিন অনিবার্যভাবেই সংক্ষিপ্ত ক'রে আনছে। জার্মেনি রাসায়নিক নীল আবিষ্কার করতে আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে কৃষিজাত নীলের চাহিদা গেল কমে। এদিকে পূর্ব-থেকেই বাংলায় নীলকরদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চ'লে তাদের গোড়া আলগা ক'রে এনেছে। বিহারেও তার প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে; এই পরিস্থিতিতে এ নূতন দৈবের মার, ফলে এরা যে আর বেশিদিন সামলাতে পারবেনা এটা ক্রমেই বেশ স্পষ্ট হয়ে আসছে।

সুতরাং দ্বারভাঙ্গাই ভরসা।

কিন্তু কোথায় থেকে পড়ব আমরা দুই ভাই, কার অভিভাবকত্বে বা? জ্যাঠামশাইদের বাড়িতে না হয় কিছুদিন রইলাম, কিন্তু কায়েমী ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে। সেখানেও বেশ পাকা ব্যবস্থা নয়; অভিভাবক বড়দাদা, যতদূর মনে পড়ছে রাজস্কুলে এন্‌ট্রেন্‌স্ অর্থাৎ

আজকালকার স্কুল-ফাইনাল পড়েন। গৃহকর্ত্রী তাঁর বৃদ্ধা দিদিমা. অর্থাৎ সেখানেই একজন বয়স্থ অভিভাবকের প্রয়োজন। চাতরা খারিজ, দ্বারভাঙ্গার এই সমস্যা। কিছুদিন গেল, আমরা দু'টি ভাইয়ে গোকুলে বাড়তে লাগলাম।

যেমন শুনি, অনিশ্চিতের ছাড়পত্র পেয়ে চাতরার বাউণ্ডুলেপনা বাড়তে বাড়তে আমি এদিকে দিনদিনই একটা আলাদা সমস্যা হয়ে উঠেছি।

কিন্তু দ্বারভাঙ্গা যেন আমাদের ভেতরে ভেতরে টানছিল, আমাদের দু'জনকে নিয়েই নয়, সমস্ত পরিবারটিকেই। এক পুরুষেই নয় এখানে এখন তিন পুরুষ চলছে। এরপর দ্বারভাঙ্গা কি ভেবে রেখেছে সেই জানে।

উপরোউপরি দু'টো সুযোগ এসে গেল। তার মধ্যে একটা অবশ্য দুর্যোগেরই ছদ্মবেশে।

দ্বারভাঙ্গায় জ্যাঠামশাইদের বাড়ির সংলগ্নই একখণ্ড জমি পাওয়া গেল। একটা সরু খালের ধারে, আবর্জনাপূর্ণ, একজন গরীব কাল-ওয়ারের কাঠা দুয়েকের একটা পরিত্যক্ত ভিটা। এমনই দীন অবস্থা যে কারুরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি এতদিন। পরিবেশও তেমনি। প্রতিবেশীও। বিঘেখানেক উঁচুনীচু জঙ্গুলে জমির ওপর ক'ঘর দরিদ্র কালওয়ার, সুরখিকোটা বেলদার, একজন একমান্ অর্থাৎ একা-চালক। বাঙ্গালী বাঙ্গালী খোঁজে, সেদিকে হব আমরা পাণ্ডুলের সেই সনাতন দুই ঘর। ভালোর মধ্যে সেই রকম একেবারে পাশাপাশি। আর ভালোর মধ্যে সামনেটা খোলা। বাড়ির পরেই সরু নালাটা, তার ওদিকেই চওড়া সদর রাস্তা, দু'দিকেই ঘুরে ফিরে সহরের বাইরে চলে গেছে।

বাবা জায়গাটুকু কিনে নিয়ে বাড়ি তুলে ফেললেন। পাশাপাশি দু'টি বড় ঘর, পাকা দেওয়াল, ওপরে খাপরার ছাউনি, সামনে বারান্দা। এক পাশে নীচু পোতার ওপর ছোট একটি রান্না-ভাঁড়ার ঘর। মাঝখানে একফালি উঠান। বাইরে অল্প একটু জায়গা ছেড়ে সমস্ত বাড়িটুকু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। থাকার সমস্যা মিটল।

এর মধ্যেই, বাড়িতে হাত দেওয়ার কিছুদিন পরেই দুর্যোগের সুযোগটাও এসে গেছে, অভিভাবকের সমস্যাটা গেছে মিটে।

কাকা চণ্ডীচরণ পাণ্ডুলের মাইল তিন চার পশ্চিমে রৈয়াম নীলকুঠীতে চাকরি করতেন। সাহেবের সঙ্গে কি খিটিমিটি হওয়ায় একদিন হঠাৎই কাজে ইস্তফা দিয়ে পাণ্ডুলে এসে বসলেন। বাবার নিশ্চয় বেশ একটা

ধাক্কা লেগে থাকবে, ঠাকুরমার মৃত্যুর পর তুই ভাইয়ে গুছিয়ে আনছিলেন সংসারটা, কিন্তু প্রসন্নভাবেই নিলেন। বললেন—"ভালোই করেছিস্। যেমন দেখছি, এদের চাকরি আর করা চলবেনা বেশিদিন। নীলের বাজারে মন্দা পড়ে এদের মেজাজ কেমন দিন দিন চড়া হ'য়ে উঠছে। বাড়িটাও হ'য়ে এল। বউমা আর ছেলেতুটোকে নিয়ে বোস। সদর জায়গা। অতবড় রাজ রয়েছে, কোর্ট কাছারি রয়েছে, হয়েই যাবে একটা কিছু।"

জ্যেষ্ঠের ভবিষ্যৎবানীটা ঠিক এভাবে না ফললেও ভালোই হয়েছিল বৈকি। তার মধ্যে যা সবচেয়ে ভালো তা—চাতরায় পিতৃপুরুষের ভিটেটা বজায় রইল। মধুসূদনের তুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠের সন্তানেরা পরে বাংলায় গিয়েই উঠল আবার।

দ্বারভাঙ্গায় আমরা পাণ্ডুল থেকে উঠে এলাম তুই খেপে। কতদিনের তফাতে ঠিক মনে পড়ছেনা, হয়তো তিন থেকে চার বছরের মধ্যে। প্রথম খেপে কাকা, কাকিমা আর আমরা তুই ভাই। বাবা সঙ্গে এলেন। তুই ভাইয়ে মিলে দরকারি জিনিসপত্র কিনে এনে সংসারটা গুছিয়ে নিলেন। অবশ্য কিছু তৈজসপত্র-জাতীয়ই। —চাল, দাল, ঘি, তেল আর ফার্নিচার বলতে যা বোঝায়—গোরুর গাড়ি ক'রে এল পাণ্ডুল থেকে ক্ষেতের চাল, দাল। ফার্নিচার বেশির ভাগই পাণ্ডুলের বিশ্বকর্মা পড়াউ-মিস্ত্রির হাতের। শিল্প-সৌকর্যে সহরের ফার্নিচার-সমাজে লজ্জা পাওয়ারই মতো, তবে গতরে খুব মজবুত, কুঠির পুরণো পুরণো শিশুগাছের তক্তা চিরে তৈরি। তখন নিলামে তু'এক টাকাতেই গোটা গাছটা পাওয়া যেত। চিরিয়ে পড়াউ-মিস্ত্রির হাতে ছেড়ে দেওয়া। দৈনিক মজুরি দেড়, কি, তু'আনা। ...আমাদের বাড়িতে এখনও কয়েকটা নমুনা রয়েছে—অক্ষত শরীরে, এই প্রায় সত্তর-আশি বৎসরের সাক্ষী।

শুরু হোল দ্বারভাঙ্গার জীবন।

দীর্ঘপথ, তবে একটানা নয়। উত্তর জীবনে কয়েকবারই ছিটকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। এর মধ্যে লেখাপড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে যে ক'টা বছর গেছে যা অনেকের জীবনেই সাধারণ ব্যাপার—সেটা ধরছিনা। আমাদের সময়ে এখানে কলেজ না থাকায় সেটা আবশ্যিকও ছিল। আমায় ছিটকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে অর্থের সন্ধানেই, একদিন যেমন ঠাকুরদাদাকে পড়তে হয়েছিল। সহায় নেই সম্বল নেই, কলেজের পর্ব শেষ করে; বুকভরা নূতন আশার আলো নিভে গিয়ে একটা যে হতাশার অন্ধকার জমে উঠেছিল তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই বেরিয়ে

পড়ি আমি। কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে সবার আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা করা নয়। ঠাকুরদাদার মতো কাউকে কিছু না ব'লেই, ঠাকুরদাদার মতোই একটা উদ্বেগ—উৎকণ্ঠার অন্ধকার পেছনে রেখে দিয়ে। বার তিনেক। এর সঙ্গে অন্তত বার দু'য়েক যে এই পলাতক বৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার প্রকৃতি আবার একেবারে অন্য ধরণের। সে কথা বলতে গেলে আবার আমার জন্মদিনের সেই বৈদ্যনাথের সন্ন্যাসীকে টেনে আনতে হয়—তাঁর গঞ্জিকার কলিকা চুরি যাওয়ার উপলক্ষ্যে যে ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন—এ-নবজাতকের ললাট লিপি—গৃহত্যাগ, সন্ন্যাস। তার কাছাকাছিই গিয়ে পড়ি। এবং গার্হস্থ্য অর্থাৎ উদ্বাহবন্ধনের আতঙ্কেই।···ক্ষুণ্ণ করেছি সবাইকে। এক সেজোপিসিমা ছাড়া, কেননা আগেই বলা হয়েছে, তাঁরও এই ধরণের একটা ভবিষ্যৎবানী ছিল।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। কারুর ভবিষ্যৎবাণী না ফললেও বিবাহ-বন্ধনের আতঙ্কটা যেন মজ্জাগতই হ'য়ে তাড়া ক'রে ফিরেছে আমায়। সম্মতি দিয়েছি, একটা মদির অনুভূতিতে মনটা আচ্ছন্নও হ'য়ে গেছে, তারপর আলপনা-দেওয়া পিঁড়েয় ব'সে হঠাৎ চমকে উঠে পালিয়েছি—এ ধরনের স্বপ্নদেখা প্রায়ই ঘটত আমার জীবনে। ঘেমে জেগে উঠতাম। এ ব্যাধির মূল, আর অন্য কোথায় খুঁজতে যাব?

দ্বারভাঙ্গায় আমার স্মৃতিটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে বাংলা স্কুলকে অবলম্বন ক'রে। উনিশশত তিন সালের (১৯০৩) তেসরা জুলাই। আমরা দু'ভাইয়ে স্নানাহার সেরে, পরিষ্কার জামা কাপড় প'রে তোয়ের হলাম, কাকিমা ভালো করে চুল আঁচড়ে, কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে দু'জনের ক'ড়ে আঙ্গুল একটু ক'রে কামড়ে দিলেন, নজর লাগার প্রতিষেধক হিসাবে। কাকাজীর সঙ্গে আমরা ভর্তি হ'তে বেরিয়ে গেলাম। অনেক ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলা স্কুলের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আকৃতি প্রকৃতি দুই দিকেই। আজ নিজের বাড়ি, স্কুল হিসাবেও বোর্ড-অনুমোদিত মিড্‌ল্ স্কুল, তখন দ্বারভাঙ্গা-রাজের একটানা একটা দীর্ঘ ব্যারাকের তিনটি ঘর নিয়ে, রাজস্কুলের শাখা স্কুল; রাজের বাঙ্গালী আমলাদের বাংলা পড়ার সুবিধার জন্য, নীচের চারটি, কি, পাঁচটি ক্লাস নিয়ে। ঘর তিনটেও রাজের দেওয়া, পাশাপাশি, গায়ে গায়ে লাগা। তিনখানি ঘরে তিনজন মাষ্টার। মাঝেরটি হেডমাষ্টারের। সেইটি স্কুলের অফিসঘরও; যেমন হেডমাষ্টার একাধারে হেডমাষ্টার ও কেরাণী। তিন দিকে তিন সারি বেঞ্চ। মাঝখানে হেডমাষ্টারের চেয়ার টেবিল। পড়াচ্ছিলেন, বিষয়টা কি অবশ্য মনে নেই, কাকাজী

আমাদের নিয়ে প্রবেশ করতে ঘুরে দেখে বললেন "ও, এই যে এসে গেছেন। ...রামভজ্জু। একঠো কুর্‌সি লে আও।"

আমাদের নাম লেখানোর ব্যাপারটা নিশ্চয় আগেই দেখা ক'রে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন কাকাজী। স্মৃতি হ'তে স্কুলের অনেক চিত্রই মুছে গেছে, অনেক ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেছে, অনেক জ্বলজ্বলও করছে এখনও। তারমধ্যে প্রথমদিনের চিত্রটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। হেডমাষ্টার মশাইয়ের কালো দাড়ি, টানা টানা চোখ, প্রসন্ন দৃষ্টি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাকাজীকে 'আসুন' ব'লে অভ্যর্থনা করলেন। নমস্কার বিনিময় হোল। স্কুলের চাকর রামভজ্জু একটা চেয়ার এনে পেতে দিল। কালো, মাঝ-বয়সী মানুষ, কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা গোঁফ, বড় বড় চোখদুটো লাল। চাউনিটা নির্মম। আমাদের দিকে একটা দৃষ্টি হেনে বেরিয়ে গেল। একটা বড় বাঁধানো খাতা টেবিলেই রাখা ছিল, হেডমাষ্টার মশাই সেটা টেনে নিয়ে দাদার নাম, বাবার নাম, বয়স ইত্যাদি জেনে নিয়ে, দাদাকে দু'চারটে প্রশ্ন ক'রে নিয়ে সপ্তম শ্রেণীতে নাম লিখে নিলেন। তারপর আমার পালা। পাশে, দাদার জায়গায় ডেকে নিয়ে নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বাঁ হাতে কপালের চুলগুলা ওপরে তুলে দিয়ে বললেন—"এ কিন্তু তেমন শান্ত ব'লে মনে হচ্ছে নাতো!"

একটা হাসি উঠল কথাটাতে, কি জানি কেন। ছেলেদের মধ্যেও মুখ নীচু ক'রে একটু চাপা হাসি। তারই মধ্যে হঠাৎ—"এই! মেরে ফেলাব!" ব'লে এক গম্ভীর আওয়াজ। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, পরে যেমন আরও পরিচয়ে টের পাই। বাংলা স্কুলে নূতন নাম লেখানো, তাও বছরের মাঝখানে—একটা দর্শনীয় ঘটনা। এর ওপর আমরা বাঙ্গালী হ'লেও এখানকার এক সুদূর দেহাত থেকে এসেছি, সাজগোজের মধ্যেও হয়ত আড়ম্বর কিছু বেশী ছিল, দেহাতীভাব ধরা পড়বার ভয়েই, তাইতেই একটু উৎসুক চাঞ্চল্য পড়ে গেছে চারিদিকে। হেডমাষ্টারের মন্তব্যে ডান দিকের ঘরের মাষ্টারমশাই কখন উঠে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছেন, তাইতে ছেলেদের মধ্যেও যে বেঞ্চি ছেড়ে উঁকি মারবার হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে, তারই শাসানি। ...শুনে আবার হুড়োহুড়ি, ফিরে যে-যার আসনে গিয়ে বসার শব্দ। ...হেডমাষ্টার ওঁর কথার ওপরেই হেসে আমায় বলছেন, "ঐ শুনে রাখো, বড্ড কড়া লোক!"

দাদার মতোই আমায়ও কিছু প্রশ্ন করে অষ্টম অর্থাৎ এক শ্রেণী নীচে নাম লিখে নিয়ে বললেন—"ওঁর ঘরে গিয়েই বোস গে দু'জনে। ...দেখিয়ে দিন এদের ক্লাস মাষ্টারমশাই—সেভেন্থ আর এইটথ্‌।"

হেডমাষ্টারের 'শান্ত বলে মনে হচ্ছেনা-"র ওপরই ওঁর "মেরে ফেলাব!"

শুনে, চেহারা খানিকটা রুক্ষ দেখে দমেই গিয়েছিলাম, আবার ওঁরই ঘরে যেতে হবে শুনে শুষ্কমুখে, নিশ্চয় একটু সশঙ্ক কাতর দৃষ্টিতেই কাকাজীর দিকে চেয়েছি, উনিই বললেন—"আসুক্। ওদের বলব কেন?"

ডানদিকের ঘরের মাষ্টারমশাইও বেরিয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছেন, হেসে বল্লেন—"যা সিংহনাদ একটি ছেড়েছেন, পা উঠবে কেন?" উনিও আবার হেসে উত্তর করলেন—"ওদের বলব কেন? ···আসুক।" ওঁর পেছনে পেছনে আমরা পাশের ঘরে যেতে বেঞ্চ দেখিয়ে বললেন—"ঐ ডে এইট্‌থ্ ক্লাস ঐ ডে সেভেনথ্, গিয়ে বসুক দু'জনে।"

আমার দ্বারভাঙ্গার কৈশোর জীবনের যতটা বাংলা স্কুল দখল ক'রে আছে ততটা বোধহয় আর কিছু নয়। তার শিক্ষক, তার ছাত্র তাদের মধ্যে আমার সহপাঠী, বাংলা স্কুলের গৃহ, তার পরিবেশ। তার কারণ বোধহয় কৈশোরের সীমাবদ্ধ জীবনে যা হাতের কাছে পাওয়া যায়, মনটা সেগুলাকে একত্র ক'রে নিয়ে বেশি ক'রে জড়িয়ে থাকে। যৌবনে অনেক চাওয়া, অনেক পাওয়া-না-পাওয়ার বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে মনটা পড়ে ছড়িয়ে, তার পরের জীবনে এই অনুভূতিই বিচিত্রতর হ'য়ে মনটা যেন আরও উৎকেন্দ্রিক হ'য়ে পড়ে। পাওয়া-না-পাওয়ার বড় বড় ঘটনাগুলাই আনন্দে-উল্লাসে আর আশাভঙ্গের বেদনায় স্পষ্টতর হ'য়ে থাকে জেগে, বাকি যত যেন অস্পষ্ট হ'য়ে একাকার হ'য়ে যায়। এটা আরও হয় বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে স্মৃতি ক্রমে ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ার জন্যও।

তখনকার ক্লাসের ক্রমপর্যায় এখনকার হিসাবে উল্টো ছিল। একটি হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণী থেকে ঊর্ধ্ব দিকে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত। নামতে নামতে ওপরে ওঠা বলা যায়। প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ ফার্ষ্ট ক্লাসের নাম ছিল এন্‌ট্রেন্‌স্, কলেজের প্রবেশ দ্বার হিসাবে। বাংলা স্কুলে একেবারে নীচের দিকের অষ্টম আর সপ্তম মান-এর দুই বিভাগ 'এ' আর 'বি' নিয়ে পঞ্চম অর্থাৎ ঊর্ধ্বতম মান পর্যন্ত ছিল ছয়টি শ্রেণী।

আমার বাংলা স্কুলে কাটে সাড়ে চার বৎসর। পাঠ্য পূর্ণ করতে আমার লাগে রাজস্কুলে চার বৎসর, দু'টি কলেজে দু'বছর দু'বছর করে আরও চারটে বছর। অনেক কিছু ঘটেছে নিশ্চয়, কিন্তু বাংলা স্কুল নিয়ে ঐ ক'টা বছরের মতো অত প্রাণ-চঞ্চল নয়, অত মধুরও নয়। কারণ যা তিক্ত, যা কটু, যা অবসাদগ্রস্ত তাকে মনের মধ্যে পুষে না রাখবার একটা দৈবদত্ত ক্ষমতা আছে কৈশোরের মধ্যে। হরি মাষ্টারের বেত, তিনজনেরই বলিনা কেন; তার মধ্যে হরি মাষ্টারের সাজা দেওয়ার নব নব প্রণালী; রামভজ্জুর ভয়াবহতা, ছাত্রদের মধ্যে ঘোঁৎনা,

যুগল, উঁচু ক্লাসের আরও কয়েকটা ডানপিটে ছেলে, অত শাসনের মধ্যেও স্কুলে তাদের বেপরোয়া ভাব, ছোটদের ওপর মুরুব্বিয়ানা, অধিকন্তু স্কুলের বাইরে তাদের অসমসাহসিকতার নানা রকম গল্প মনে কেমন একটা সম্ভ্রম ভাব জাগিয়ে রাখত। পাঠশালার শিরপোড়োর মতো। এরা সবাই আমার সাহিত্যে কোথাও কোথাও ছড়ানো আছে। ...টিফিন-পিরিয়ডে একদিন কি একটা ডানপিটেপনা করার জন্য ঘোঁৎনার সাজা হবে। থার্ড মাষ্টারের ঘরে। কি কারণে মনে নেই তিনিই দেবেন সাজাটা। টিফিন-পিরিয়ড তখনও শেষ না হওয়ায় ক্লাস বসেনি, ঘোঁৎনার সাজা হবে খবর পেয়ে ছেলেরা ঘরের দরজায়, বাইরে জমা হয়েছে। ঘোঁৎনাকে রামভজ্জু ডাকতে গিয়েছিল, ছাত্রদের ভিড় ঠেলে বেপরোয়াভাবে গটগট ক'রে ঘরে ঢুকে সামনাসামনি হ'য়ে দাঁড়াল ঘোঁৎনা। কালো, লম্বাটে চেহারা, ফেল করে উঠ্‌তে উঠতে ফিপ্‌থ্‌ ক্লাসে তিন বছর আটকে আছে। এই শেষ ক্লাসের পরীক্ষাটা রাজস্কুলে নেওয়া হোত বলে আর এগুতে পারছেনা, ছাড়বেও না, স্কুল থেকে সরাতেও পারা যাচ্ছে না।

ঘোঁৎনা ছিল স্কুলের এক পরম বিস্ময়। তার বিচার হচ্ছে! সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, ডান হাতটা চিৎ করে বাড়িয়ে ধরল ঘোঁৎনা। গলাটা একটু খসখসেই ছিল, বলল—"এই হাত পেতে দিচ্ছি স্যার য' ঘা খুশি মারুন, কিন্তু তারপরে বেঞ্চের ওপর দাঁড়াতে বললে কথা রাখতে পারব না। দেখতেই পাচ্ছেন আমার গোঁফ বেরিয়ে গেছে—বাবা পর্যন্ত ঘোঁৎনা ছেড়ে 'ঘোঁতন' বলতে আরম্ভ করেছেন। ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে তো।"

হেডমাষ্টার টিফিন-পিরিয়ডে কাছে পিঠে কোথাও গিয়েছিলেন, ভিড় দেখে যখন এসে দাঁড়ালেন তখন ঘোঁৎনার জবানবন্দী শেষ অংশটা চলছে। পেছনে নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শুনলেন। কিছু না ব'লে ভেতরে চ'লে গিয়ে রামভজ্জুকে টিফিন শেষ হওয়ার ঘন্টি বাজিয়ে দিতে বললেন। তখনও মিনিট দশেক বাকিই।

জল্লাদের মতো রামভজ্জুর ধরে আনা, ঘোঁৎনার দৃপ্ত ভঙ্গি—নাটকটার শেষ অঙ্কের ক্লাইমেক্‌সটা আর দেখা হোলনা সেদিন।

ঘোঁৎনার পরেই ছিল যুগল। ক্লাস দুই নীচে তারও একরকম কায়েমী ব্যবস্থা, বছর তিনেক পরে আমার সঙ্গী হ'য়ে যায়। যুগল দাঁড়াবেনা বেঞ্চে। টাস্ক ক'রে না-আনার সাজা। সেকেণ্ডমাষ্টার খেজুরডালের ঘা দুই বসিয়ে দিতে উঠে পড়েই বেঞ্চে ধপাধপ পা ঠুকতে ঠুকতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

পরে অনেকদিন পর্যন্ত 'বীরদর্পের' কথা কোথাও পড়লে বা শুনলে আমার ঐ দৃশ্যটা আগে মনে প'ড়ে যেত।

কিছুদিনেই বাংলা স্কুলের আবহাওয়ার মধ্যে প'ড়ে আমার দেহমন থেকে পাণ্ডুলের দেহাতী বা গেঁয়ো-গেঁয়ো গন্ধটা মিটে যেতে লাগল। চাতরায় গিয়েও খানিকটা হ'য়ে থাকবে, তবে, ঠিক এই ধরণের কিছু নয়। তার একটা কারণ, তখন আরও অল্প বয়স। তাছাড়া, ঘোরাঘুরি বাউণ্ডুলেপনার মধ্যে মনটা থাকতো ছড়ানো। এখানে স্কুলের নিরেট পাঁচটা ঘণ্টার মধ্যে, নীচু থেকে উঁচু ক্লাসের ছাত্র, শিক্ষক, রামভজ্জু নিয়ে, আরও নিত্য বা দৈব-ঘটনা দিয়ে যে-জীবন সেটা মনের রংটাই দ্রুত বদলে দিতে লাগল।···কত নূতন নূতন কথা, কত প্রবাদ, কত ছড়া যা বাংলা স্কুলের বিশেষ সম্পত্তি, সব রপ্ত হ'য়ে গিয়ে, বাংলা স্কুলের একটা বিশেষ ছাপ নিয়ে মানুষ হ'য়ে উঠতে লাগলাম। ছড়া-প্রবাদের মধ্যে কতকগুলা ছিল মুক্ত, কতকগুলা প্রচ্ছন্ন বা অর্ধ-প্রচ্ছন্ন। কতকগুলা সাধারণ, কতকগুলা—যেমন বললাম—বাংলাস্কুলের বিশেষ সম্পত্তি। এর মধ্যে একটা ঘোঁৎনার বের করা, রাজস্কুলের হেড-মাষ্টারের টাক নিয়ে। আর একটা রাজস্কুল নিয়েই; তবে, কবে থেকে চ'লে আসছে, কে তার কবি, কেউ বলতে পারতো না। এটা মুখে মুখে চলত—

Raj school, has no rule
Boys are monkey

তার পরের লাইনটা শিক্ষকদের নিয়ে বেশ মিল ক'রেই, তবে লিখে রাখবার মতো নয়। তখন দারভাঙ্গায় ধরতে গেলে মাত্র ছু'টি স্কুল। এক রাজস্কুল আর বাংলা স্কুল। তিনটি ঘর, তাও দানই, তিনজন মাত্র শিক্ষক, আর নীচের ক'টি ক্লাস নিয়ে ত্রিশ-বত্রিশটি ছাত্র। কিন্তু তার দম্ভ, তার আত্ম-প্রত্যয়ের কথা ভাবলে আর জ্ঞান থাকে না।

আমার সঙ্গীদের মনে পড়ে কান্তি, বলাই, নকু, নগেন, অনিল, মদন, শম্ভু, পাঁচু, বিশে, সত্যেন, ভোম্বল, (ভালো নাম সুপ্রসন্ন)—এদের সবাই যে আমার সতীর্থ, অর্থাৎ একক্লাসে ছিল, এমন নয়। বয়সের জন্যও কেউ কেউ ছিল খেলার সাথী, তাই থেকে এক গোষ্ঠীর।··· কৈশোর সঙ্গীরা মন থেকে কখনও বিদায় নেয় না। যারা কাছে রয়েছে, ছু'তিন জনই, নিজের কেউ না হ'য়েও তারা যেন নিজের চেয়েও নিজের। ···বাল্যসখা নামটাতেই কী একটা মিষ্টি সুর। জীবনে কত মানুষের সঙ্গেই তো পরিচয় হোল—অন্তরঙ্গতাও—কত হোমরা-চোমরাই, নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট, কিন্তু "তুই—তোর—তোকে" বলবার বাল্য-

সখ্যের অধিকার নিয়ে নগেন—শম্ভু—মদন—অনিলদের সরিয়ে আমার মনের মধ্যেকার জায়গাটিতো কেউ দখল করে নিতে পারল না।... কেউ সঙ্গে আছে এখনও, কেউ দূরে, কোথায় তাও জানিনা। প্রয়োজনের পত্রাচারে ভরা জীবনে, তাদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অপ্রয়োজনের পত্রাচার বন্ধ হ'য়ে গেছে—কেউ হয়তো এক অমোঘ আহ্বানে আজ অজ্ঞাত কোন লোকে জানিনা, শুধু হঠাৎ স্মৃতির ঝলকে মনের মধ্যে একটি ঘর শূন্য দেখে একটি তপ্ত শ্বাস পড়ে। এইখানেই একটা কথা বলে নিই; একটা নূতন অনুভূতির কথা। বিশে যে বিশ্বনাথ সেটা টের পেলাম তার মেজো মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে। এমন একটা আনন্দ সংবাদের পাশে মনে হোল কাকে যেন হঠাৎ হারিয়ে বসলাম।

ভাবালুতা এসে পড়ছে। ফিরে যাই, তারা সবাই যখন প্রত্যক্ষ, প্রতি-দিনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

পাঁচুর একটা গুণ ছিল, অবশ্য তখনকার হিসাবে। আদুরে ছেলে ছল বাড়ীতে, প্রায়ই পয়সা চুরি ক'রে এনে আমাদের খাওয়াত টিফিন-পিরিয়ডে। ধূর্ত আর হাঁদা হাঁদা—দু'রকমে খানিকটা অদ্ভুত। ওর বাবা শিবনাথবাবু কখনও কখনও কোন কারণে জায়গা খালি থাকলে থার্ড-মাষ্টারের কাজ করতেন। পাঁচু একটু পায়াভারি হ'য়ে থাকত সে সময়। বাবাকে শিবুদা বলত। পরিচয় দিতে, আবার দরকার পড়লে স্কুলেও ঐ ব'লেই ডাকত। প্রশ্ন করতাম আমরা, তামাসা করেই, উত্তরটা শোনবার জন্যে। চোখ দুটো বড় বড় ক'রে নাকের কাছটা একটু কুঁচকে বলত—"পাড়ার সবাই ঐ ব'লে ডাকে। আমি তো তবু নিজের ছেলেরে!"

বলাইও নানা কারণে বেশী স্পষ্ট। ওর পদবী থেকেই ও ছিল বিশিষ্ট। জাতিতে মোদক, ওর পদবী ছিল কুরী। বাংলাস্কুলের ঐ ব্যারাকেই দু'টো খিলান বাদ দিয়ে ওদের একটা মিষ্টান্নের দোকানও ছিল। খাওয়াত ও, তবে পাঁচুর মতো দিলদরিয়া হ'য়ে নয়। ও খাওয়াতো আমায়, আরও নিতান্তই হয়তো দু'একজনকে। প্রচ্ছন্নভাবেই। যাকে খাওয়াবে সে অন্যকে বলতে পারবেনা।

বলাই ছিল নিভাঁজ চতুর। তার চেহারা থেকে নিয়ে বুদ্ধি পর্যন্ত সবটাই ছিল ধারালো। কালো, খর্ব, ছিপছিপে খাঁড়ার মতো টিকালো নাক। দাঁত আর চোখ একটু বড়; দুইয়ে মিলিয়ে ওর হাসি থেকেও যেন বুদ্ধি ঠিকরে পড়ত। হালকা শরীর নিয়ে বলাই যা খুশী তাই করতে পারত। দৌড়ে ওর সমান অল্প ছেলেই ছিল, কয়েকটা ক্লাস ওপর পর্যন্ত। আমাদের স্কুলের পর সদর রাস্তা, তারপরে রাজের

রমনা। টিফিন-পিরিয়ডে সেখানে কাবাডি আর "গোল-গোল" ব'লে একরকম খেলায় ছেলেরা নেমে পড়ত। দৌড় আর ছোঁয়াছুয়ির খেলা। তাতে বলাই যার দিকে, তার বিজয়ের সম্ভাবনা শতকরা নব্বই ভাগ। প্যাঁকাল মাছের মতো শরীরটায় মোচড় দিয়ে পিছলে যাওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তেমনি মার্বেল খেলায়, তেমনি গাছে উঠতে। রাস্তার এপার ওপার দশ বারো হাত উঁচুতে বলাই মোটা ন্যাড়া ডালের ওপর দিয়ে কুল পাড়তে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে, ধরবার কিছু নেই। এখন মনে হ'লেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বলাইয়ের মিষ্টি খাওয়ানোর কথা ছেড়ে যাচ্ছে। বলাই বন্ধু হিসাবে ভালোই ছিল—সেটা মোটামুটি সব-ভালোর সময়ও তো—তবে, মুফতে খাওয়াবে, পাঁচুর মতো, এমন হাঁদা দিলদরিয়া ছিল না। ওকে হোম-টাস্কে মদৎ দিতে হোত। আমি সব ভারই নিতে পারতাম, লেখা-পড়ায় ক্লাসে সুনামই ছিল, তবে অংকে কাঁচা ছিলাম। ও হিস্যেটা ছিল তারকের বাঁধা। তার ওদিকে বেশ মাথা ছিল। আরও এদিক-ওদিক কিছু বেরিয়ে যেত। সব প্রচ্ছন্ন। বলাইয়ের বলা থাকত—"তোকেই ভালবাসি, দিচ্ছি, আর কাউকে বলবিনি।"—উচ্চ অঙ্গের পলিটিক্সই বলতে হয়।

অবশ্য পরস্পরের মধ্যে জানাজানিই ছিল।···পান্তুয়া, রসগোল্লা—কে কি পেল। জানাজানিই, তবে বলাইয়ের আড়ালে।

এবার অনিলের কথাটা বললেই আমার বাংলা স্কুলের সঙ্গী-সাথী—সহপাঠীদের কথা এক রকম বলা হয়ে যায়। শুধু অনিলের কথাই স্কুলের পর আরও অনেকখানি টেনে নিয়ে যেতে হয়। প্রায় আমার জীবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

আমাদের ক্লাসে অনিল ছিল বোধহয় সবচেয়ে তীক্ষ্ণ-ধী ছাত্র। আর চৌকস। খেলায়, লেখাপড়ায়, একটু বড় হ'য়ে, যাকে বলে সব কাজে লীড্ (lead) নেওয়া, তাতে ওর মতো কেউ ছিলনা ; ভালো কাজে, আবার ঐ বয়সের নানা রকম দুষ্টামির প্ল্যান আঁটতেও, মাষ্টারদের ফাঁকি দিয়ে। কিন্তু আর সবাইয়ের কিছু না কিছু হয়েছে জীবনে শুধু অনিলেরই কিছু হোল না। স্কুল জীবনে অনিল ছিল আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। ওর মতোই আমারও স্কুলের বাইরের জীবনটা বই-খাতার ওদিকেও খানিকটা ছড়ানো ছিল ব'লে—পাণ্ডুল-চাতরার সেই স্বৈর-বৃত্তির ভগ্নাংশই বলি—গোড়া থেকেই ওর সঙ্গে মনের একটা মিল এসে যায়। তাই থেকেই একটা একাত্মতা, যা অত পরিবর্তনের মধ্যেও কখনও ঘোচেনি। জগতে প্রকৃত সখ্য ব'লে যে একটা বস্তু আছে, সব কিছুর

ওপরে, তা আমি অনিলের মধ্যে পেয়েছি। আজ আমার সান্ত্বনা, শত পরীক্ষার মধ্যে, দিয়েও গেছি তাকে।

"পরিবর্তনের" কথাটা না এনে ফেললে ঠিক বোঝা যাবেনা।

অনিল তীক্ষ্ণধী ছিল, পড়াশোনাতে ভালই ছিল, কিন্তু অনেক তীক্ষ্ণধী ছেলেরই যা দোষ, অল্প মেহনতে হ'য়ে যাওয়ার জন্যে টাস্ক ক'রে নিয়ে আসায় খুব নিয়মানুবর্তী ছিলনা। ফাঁক পড়ে যেত, যার জন্যে বেত খাওয়া, বেঞ্চে দাঁড়ানো, এসবও হ'য়ে যেত মাঝে মাঝে।

ক্রমে এই ভাবটা বেড়ে যেতে লাগল। বছরে বছরে পরীক্ষায় পাস ক'রে গিয়ে প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভালো ছেলের মধ্যে যে গণনাটা ছিল সেটা আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলছে। প্রশ্ন করেছি, সদুত্তর পাইনি। তারপর বিনা প্রশ্নেই অনিল একদিন চমক লাগিয়ে দিল।

প্রায় এক ফার্লং লম্বা নূতন বাজারের ব্যারাকটার একেবারে শেষের দিকে অনিলরা যে বাড়িটায় থাকত, তারপরেই ইতর-ভদ্রে মেশানো যে একটী পল্লী ছিল তার সুনাম ছিলনা। অনিলের একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল, খুব হাসতে পারত। এর মধ্যে শিক্ষক থেকে নিয়ে যারই মধ্যে হাসির কোন খোরাক পেত তার নকল করা যেমন ছিল, তেমনি ছিল নানারকম হাসির গল্পও। স্থূল কৌতুকরস, বিশেষ কমবয়সী ছেলেদের মনে যা বেশী ক'রে সুড়সুড়ি দেয়, তার মধ্যে ভাঁড়ামির সঙ্গে গ্রাম্যতার একটা সংমিশ্রণ থাকে। ঠিক অশ্লীল না হলেও ভাল্‌গার (Vulgar), —এই ধরনের গল্পেরও একটা ভালো রকম সঞ্চয় ছিল অনিলের, আমাদের শুনিয়ে হাসাত। ও-বয়সে রুচিকর জিনিষই, বেশ আমোদ পাওয়া যেত। শুধু তাই নয়, শোনার অভ্যাসে, এর মধ্যে যেটা দূষনীয় ছিল তার দিকে খেয়ালই যেতনা। প্রায় সিক্‌সথ্‌ ক্লাস অর্থাৎ বাংলা স্কুলের সর্বোচ্চর এক শ্রেণী নীচে পর্যন্ত এইভাবে চলল। অনিল আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিল—তখন পনেরর কাছাকাছি হবে। কালো, একটু লম্বা ছিপছিপে হ'লেও বেশ পেশিবদ্ধ, সিধা।

এই চেহারার মধ্যে কখন্ ঘুণ ধ'রে গিয়েছিল ভেতরে, কাছে কাছে থাকায় টের পাইনি। ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়ে পাণ্ডুলে চ'লে গেলাম আমরা দু'ভাইয়ে। খ্রিষ্টমাস্‌, নিউইয়ার্স-ডে নিয়ে টানা ছুটি, তারপর রেজাল্ট বেরুনো, ক্লাস প্রমোশন, নূতন বইয়ের তালিকা; বাংলা স্কুলের কাজ একটু মন্থর গতিতেই চলত, কাকাজী খবর দিতে প্রায় সপ্তাহ তিনেক পরে আমরা পাণ্ডুল থেকে ফিরে এলাম। স্কুলে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ল অনিলের চেহারার ওপর;

বেশ একটু শুকিয়ে গেছে যেন। বললাম—"তুই একটু রোগা হ'য়ে গেছিস যেন, কেন রে? অসুখ করেছিল?"

একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল, তখনই আবার মুখের ভাবটা বদলে নিয়ে একটু হাসি টেনে এনেই বলল—"ত্যুৎ, অসুখ ক'রতে যাবে কেন? —দেহাতের দুধ-ঘি খেয়ে মোটা হ'য়ে এসে তোর ওরকম মনে হচ্ছে। একবার যেতে হবে তোদের পাণ্ডুলে। যাবি নিয়ে?"

কথাটা তখন-তখন চাপা দিয়ে দিল বটে, তবে মনে হোল অনিল যেন আমায় এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। ক্লাস নেই, ছেলেরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে কয়েকবার দৃষ্টি গিয়ে পড়তে দেখলাম অনিলের মুখটা যেন শুক্‌নই। বার দুই চোখাচোখি হ'য়ে যেতে যেন একটু গুটিয়ে গিয়েই জটলার মধ্যে মিশে গেল তাড়াতাড়ি, হঠাৎ কি একটা মনে প'ড়ে যাওয়ার ভাব দেখিয়ে।

তার পরদিন রেজাল্ট বেরিয়ে ক্লাস প্রোমোশন হ'তে মনে হোল কারণটা যেন বুঝতে পারা গেল। এদিকে রেজাল্ট তেমন ভালো না করলেও, সব বিষয়ে মোটামুটি পাস ক'রে যাওয়ায় অনিলের একটা পজিশন ছিল, এবার অঙ্কে গ্রেসমার্ক পেয়ে পাস করায়, আর ইতিহাসে ফেল করায় সেটা হারিয়েছে। নাম ডাকায় বেশ পেছনে পড়ে গেছে। এরপর বইয়ের তালিকা লিখিয়ে সে দিনের মতো স্কুল ভেঙ্গে গেল। আমার পজিশন্‌টা ভালোই থাকত সেজন্য কুণ্ঠাবশেই কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। কয়েকদিন পর্যন্তই নয়। প্রশ্নটা মনের মধ্যে আটকে থেকে একটা অস্বস্তি জাগিয়ে রাখল। তারপর আবার পাঁচটা ব্যাপার আর ওর হাসি-তামাসার মধ্যে সহজ ভাবটা ফিরে আসতে কারণটা জিজ্ঞেস করতে বলল—"ও সব পাস করা, ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড হওয়া, তোদের ভালো ছেলেদের ব্যাপার। ও নিয়ে প'ড়ে থাকলে চলে না। তাহ'লে আর..."

একটু যেন খোঁচা দিয়েই থেমে গিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে নিরে বলল—"কোথায় যেন পড়েছিলাম—জীবনটা সব চেয়ে বড় স্কুল। একটু ঘেঁটে ঘুঁটে দেখতে হবে না?"

একটু হাসল।

এর পর পাস-ফেলের কথা চুকে গিয়ে স্কুলের জীবন আবার পুরনো খাতে বইতে লাগল। তারপর বছরের প্রায় মাঝামাঝি এসে সেই চমক-লাগানো রূঢ় শক (Shock)! সে কথা বলবার আগে হিতেনের একটু পরিচয় দিয়ে রাখতে হয়।

হিতেন বছরের গোড়াতেই দেশ থেকে ট্রান্‌স্‌ফর সার্টিফিকেট নিয়ে

এসে পঞ্চম অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে নাম লেখাল। বেশ একটু আলোড়ন জাগিয়েই। বয়স যুগল-ঘোঁৎনার মতোই। তবে মিল ঐ বয়স পর্যন্তই। ওরা ছিল বেশ গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের, হিতেনের চেহারাটা মোলায়েম। খুব কালো, তবে খুব সুশ্রীও; টানা-টানা চোখ, পুরন্ত, নরম মুখ। এ ছাড়া খুব সৌখিন। সবচেয়ে দেখবার মতো ছিল ওর মাথার চুল। আঁচড়ে, ঢেউ খেলিয়ে বাহার ক'রে যে-টেড়িটা কেটে আসত তাতেই আমাদের হিসাবে আধঘণ্টা লেগে যাওয়ার কথা। এদিকে অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির, স্বল্পবাক, অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশতই না একরকম।

হিতেনের বাবা রূপা আর হাতীর দাঁতের কাজ নিয়ে দ্বারভাঙ্গা রাজে চাকরি নিয়ে এসে অনিলদের ওদিকে সেই পাড়াটায় রাজেরই একটা খাপড়ার বাড়িতে উঠেছেন।

বাংলা থেকে ছেলে সে-সময় প্রায় আসতই না। হিতেন বাঙ্গালী ছাত্রের একটা টাইপ হিসাবে অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের কৌতূহল, বিস্ময় আর প্রশংসা জাগিয়ে রইল। ওর টেরিটা তাতে যোগই দিল। বাংলাদেশের স্কুলে নাকি এসবে আপত্তি করেনা, বরং পরিচ্ছন্নতা আর সৌন্দর্যবোধের লক্ষণ বলে উৎসাহই দেয়। ওর দেখাদেখি আরও দু'-একটা মাথায় উঠল। কারুর মাথায় টিকল, কারুর মাথায় মিলিয়ে গেল। আমি একদিন ভালো করে চুল আঁচড়ে পরীক্ষা হিসাবে আধ-ইঞ্চিটাক্ দু'ধারে সরিয়ে কাকাজীর কাছে কানমলা খেয়ে ছেড়ে দিলাম। চেহারার যশে ভেতরের অপযশ বেশিদিন চাপা থাকে না। ক্রমে একটা কানাঘুষা উঠল, হিতেন একনম্বরের বখাট ছেলে। ঘোঁৎনা-যুগলদের সঙ্গে মোটেই একজাতের নয়। কথাটা বেড়ে গিয়ে এমন কানাঘুষাও উঠল, ওকে নাকি সরাবার কথাই ভাবছেন মাষ্টাররা, হিতেন ধরা ছোঁওয়া দিচ্ছেনা। হয়তো আন্দাজই; কেননা হিতেন বাংলা স্কুলে যতদিন থাকবার, ছিলই। আমাদের সঙ্গেই, অর্থাৎ এক বছর ফেল ক'রে রাজস্কুলে আসে। ভালো ফুটবলার ছিল।

ওর কথা এখন এই পর্যন্ত থাক।

টিফিন পিরিয়াড্। অনিল একটা হাসির গল্প ফেঁদেছিল, শুনছিলাম; আর সব ছেলে রমনায় খেলতে বেরিয়ে গেছে বা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক পাড়াতেই বাসা বলে, ক্লাস আলাদা হ'লেও হিতেনের সঙ্গে ওর একটু আধটু কথাবার্তা হোত কখনও কখনও, পাশের ঘর থেকে এসে বলল—"তোমার চাকু আছে? তা'হ'লে আমার এই পেন্সিলটা কেটে দিয়ে যাও তো আমায় জলের ঘরে। খাবার খেতে যাচ্ছি।"

একটু খট্‌কা লাগল আমার, মনে হোল যেন একটা ইঙ্গিতই। পেন্‌সিল কেটে অনিল—"আসছি, বোস," ব'লে উঠে গেল। একটু ইতস্তঃত করে আমিও উঠে গেলাম। একটু আস্তে আস্তেই এগুচ্ছি, দরজার বাইরে থেকে কানে গেল—"আজ কিন্তু নিশ্চয়ই আসবে।"

"বেশ।"—ব'লে কোঁচার খুঁটে হাতমুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল অনিল। আমায় দেখে একটু যেন চমকে গিয়েই সামলে নিয়ে বলল—"জল খাবি? যা।"

ফিরে এসে প্রশ্ন করলাম—"কি 'নিশ্চয় আসবার' কথা বলল র‍্যা হিতেন?"

"কখন্?"

"এইমাত্র"—লুকাবার চেষ্টা দেখে আমি সোজাসুজি চার্জ করলাম, বললাম—"আমি নিজের কানে শুনলাম।"

একটু ছেড়ে দিয়ে বললাম—"হিতেনের বদনাম আছে—তাই জিজ্ঞেস করছি।···মিশিস ওর সঙ্গে?"

"না মিশে আমি তোদের মত দেবতা কোথায় পাব?"—বেশ রুক্ষ স্বরেই জবাব দিল অনিল।

"দেব-দানবের কথা নয়। একদিন বলেছিলি, বন্ধুর সব কথাই শোনবার অধিকার আছে, নৈলে বন্ধুত্বের কোনও মানেই হয়না, তাই জিজ্ঞেস করছি। ঘাট হয়েছে।"—আহত কণ্ঠেই উত্তর দিলাম আমি।

টিফিন-পিরিয়ড্ শেষ হওয়ার ঘন্টি পড়তে ছেলেরা হৈ হৈ করতে করতে এসে পড়ায় চাপা প'ড়ে গেল কথাটা।

খুব অস্বস্তিতে কাটতে লাগল। তারই মধ্যে একটা জিদ্ এসে গেল, মুখে যাই বলিনা কেন, কোনও রকমে কথাটা বের করতেই হবে ওর কাছ থেকে।

তারপর দিন কিসের একটা ছুটি ছিল। ভালো একটা কারণ দেখাতে না পারলে কাকাজী আমাদের দু'ভাইকে বাড়ি থেকে বেরুতে দিতেন না। তার সময়ও বিকাল, সন্ধ্যার আগে ফিরে আসা চাই। কি অজুহাত দেখাব ভাবছি, অনিল হঠাৎ একটা বই হাতে ক'রে—অজুহাত হিসাবেই—এসে উপস্থিত হোল।

আমাদের বাড়ীর পাশেই একটা হাত দশবারো নালার কথা হয়তো আগে কোথাও ব'লে থাকব। সেটার ওপারে আমাদেরই ছোট এক টুকরো জমি, ঘাসে ঢাকা, মাঝখানে সাবেককালের একটা পুরানো ইঁদারা, বেশ উঁচু পর্যন্ত বাঁধানো। একটা বাঁশের পুল বেয়ে পেরুতে হয়।

জমিটার পরই বড় রাস্তা, তবে সেকালে লোক-চলাচল ছিল খুবই অল্প, আমাদের এ অঞ্চলটাই তখন ছিল আধা-পাড়াগাঁ।

অনিল বলল—"চল, ও পারটায় গিয়ে বসিগে।"

পুল পেরিয়ে বলল—"আয় এইখানটায়।"

ইঁদারার ওদিকে, বাড়িটাকে আড়াল ক'রে বসলাম আমরা। অনিল বইটাকে বারদুই খুলল, বন্ধ করল, তারপর আমার দিকে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বলল—"তুই আমার ওপর চটেছিস ?"

আমি খানিকটা প্রস্তুতই ছিলাম এই ধরনের কথার জন্যে, উত্তর করলাম—"চটবার অধিকার রেখেছিস তুই আর ?"

"এই ছাখো কাণ্ড! আমি এলাম একটু গল্প স্বল্প করতে—যদুপাল একটা গুল ছেড়েছে, ও অমনি গুরুমশাই হ'য়ে উঠল!...বেশ, আজ আমিই ঘাট মানছি।"

এইখানে একটা কথা ব'লে রাখতে হয়। যদুপাল ছিল হিতেনের বাবা। আমরা অনেক পরে টের পাই। হাতের কাজ করবার সময় অনিল আর কয়েকটি ছেলে তার কাছে গিয়ে বসত আর মনে সুড়সুড়ি জমাতো নিম্নস্তরের হাসির গল্পগুলা, সেই শোনাতো, ভাল্‌গারও (vulgar) বাদ যেতনা।

কথাটা ব'লে অনিল একটু চুপ করে ভেবে নিল, তারপর বলল—"বলতেই হবে ?" একটা চোখ একটু টিপে নিয়ে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল—"একটা তামাসা আছে। তাই ডেকেছে।...গেল রাগ ?"

ওর চতুরালির জন্যই আমিও একটু হেসে বললাম—"অত সাঁটে সারলে যায় রাগ ?"

তর্কের লড়াই হিসেবেই একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—"বেশ তো, তামাসাই বলছিস তো আমাকেও নিয়ে চলনা। আপত্তি আছে হিতেনের তাতে ? না হয় তাকে জিজ্ঞেস..."

"তুই যাবি...সে তামাসা দেখতে !!"

"কি হয়েছে ?...তুই তো যাচ্ছিস..."

"হ্যাঁ,...যাচ্ছি...আমি...আমি যাচ্ছি বিভূতি..."—বলতে বলতেই হঠাৎ একটু সরে গিয়ে দু'হাতে বইটা দিয়ে মুখ ঢেকে হু হু ক'রে কেঁদে উঠল অনিল। রুদ্ধ গলায়, চাপা স্বরে বলে চলল—"আমায় আর ছুঁসনি—আমি গেছি—আমি যাব—আমি একেবারে গেছি—আমার আর উপায় নেই..."

এত হঠাৎ যে আমি একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গিয়ে কী করব, কী যে বলব খানিকক্ষণ যেন ভেবেই পেলাম না, তারপর সরে আরও ঘেঁসে

বসে ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললাম—"হঠাৎ কি হোল ?…না হয় না-ই বললি ।…ঠাট্টা ক'রে ব'লেছি ব'লে…"

"না, আমি বলব। বলবই আমি—সেই জন্যেই এসেছি আজ—আমার ওপর ঘেন্না বাড়িয়ে দোব তোর, আজ…তারপর—তারপর…"

বড় বড় চোখ দুটো আবার জলে ভ'রে উঠে চক্ চক্ করছে, তবে কান্নার ভাব একেবারেই নেই। অমন চেহারা অনিলের কখনও দেখিনি আমি। তার পরেই যেন জোর ক'রে কথাটা বের ক'রে দিল।…অনিলকে হিতেন তার জন্যে মেয়েছেলে এনে দিতে বলেছে। ওদেরই ঝিয়ের মেয়ে, তাই…আরও জানাল, অনিল সস্তা নেশাগুলা একটু একটু ধরেছে। হিতেনেরই সাকরেদী।

অনিল যে ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছিল তা ওর পড়াশোনা থেকে মন সরে যাওয়া আর পরীক্ষার ফলাফল দেখে বুঝতে পারছিলাম, গল্পগুলাও যেন আরও কুরুচিপূর্ণ হ'য়ে আসছিল। তবে, ওর মধ্যে এমনই একটা কি ছিল যার জন্যে ঘৃণা বোধ করা তো দূরে থাক, ওকে না ভালবেসে পারাই যেতনা। সেদিনও অত শুনেও পারিনি। সেদিন আমাদের অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প হোল, সন্ধ্যা পর্যন্ত। মন উজাড় ক'রে ব'লে অনিলের মনটা খুব হাল্কা হ'য়ে গেছে। অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পেয়ে সব কৌতূহল মিটে গিয়ে আমার মনটাতেও যেন আর কোন প্রশ্নের গুরুভার নেই।

কথাবার্তার মোড় ঘুরে গেছে। ও-প্রসঙ্গটাই বহুদূরে সরে গিয়ে আমরা একটা পরিস্কার জমির ওপর উঠে এসেছি। অনিলের সাধু-ফকিরের গল্পও অনেক জানা থাকত ; তারই একটা হ'য়ে গিয়ে মনটা আরও পরিস্কার হ'য়ে গেছে দু'জনের, ও একটু যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে ভেবে নিয়ে হঠাৎ ঘুরে আমার বাঁ হাতটা চেপে ধ'রে বলল—"একটা কথা কিন্তু তোকে মানতেই হবে বিভূতি, আমাদের ধর্মই আমাদের খারাপ করেছে…"

এতই অকস্মাৎ যে আমি হাঁ ক'রে ওর দিকে একটু চেয়ে রইলাম। প্রশ্ন করলাম, "তার মানে ?"

"হ্যাঁ, করেছেন, দুই ঠাকুর, শিব আর কেষ্ট…।"

"শিব আর কেষ্ট ?…কি ক'রে ?"

বলল—"কেষ্টর গোপীলীলা…আর শিবের নেশাভাং…"

যা বয়স তাতে ধর্মের গুরুতত্ত্বের খবর রাখা বা, সমালোচনার মন নিয়ে দেখার কথা নয়। আমি বিমূঢ়ভাবে ওর দিকে চেয়ে রইলাম, কোনও উত্তরই জোগাল না। তারপর আমার বহুদিন পূর্বের একটা কথা মনে

প'ড়ে গেল। পাণ্ডুলের নীলকুঠির অরবিন্দবাবু যে আমাদের বাসায় নবীন সেনের "রৈবতক" পড়তে আসতেন, বাবা, কি ও বাড়ির ছোট জ্যাঠামশাই না আসা পর্যন্ত কাকাজীর সঙ্গে এদিক-ওদিকও কিছু আলোচনা হোত হালকাভাবে, ধর্ম, সমাজের দোষগুণ নিয়েও। কেমন ক'রে কথাটা ওঠে জানিনা, কেন যে কাকাজী আমাদের দু'ভাইকে উঠে যেতেও বলেননি, তাও না। সেদিন অরবিন্দবাবু একটা কথা যে বলেছিলেন সেটা মনে প'ড়ে গেল। অনিলকে বললাম—"অনেকের মতে গীতার কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এক নয়..."—সেদিন যেমন শুনেছিলাম, তেমনি ব'লে দিলাম।

অনিল বলল—"সে আর বুঝছে কে?...হিতেন নিশ্চয় ভাবে, তা'হ'লে দোষটা কি? এ-কেষ্ট-ঠাকুরও তো কম ঠাকুর নয়...ও নিজেও আবার কালো, দেখতে সুন্দর, বাঁশীও বাজাতে জানে..."

বেশ মনে পড়ে একটা যেন গোলকধাঁধাঁর মধ্যে হারিয়ে গেছি। ছেড়ে দিয়ে শিব ঠাকুরকে ধরলাম। এবারটা বেশ নিজের মতেই কুলিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণকে বেশ ভালোভাবে defend করবার মতো না পেয়ে খানিকটা যেন আক্রোশভরেই শিবের দিকে বেশ জোর দিয়েই বললাম, নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে—"আরে শিবের কী অভাব যে সিদ্ধি-গাঁজা খেতে যাবেন? এদিকে কল্পতরু, মানে যে যা চাইছে দিয়ে যাচ্ছেন—নিজের বেলায় গাঁজা?...যাঃ, বিশ্বাস করিনা আমি। ওখানেও নিশ্চয় কি একটা গলদ হ'য়ে গেছে। ...এদিকে বলছে—দেবাদিদেব রূপে কেমন, না রজতগিরিনিভং—গাঁজা খেয়ে প'ড়ে থাকলে হোত? আরও কত কি সব, ভোর বেলায় ঠাকুরমা বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্তোত্র পড়েন, শুনি তো..."

প্রায় আর সব বাল্যবন্ধুদের মতোই অনিলও অদৃশ্য হ'য়ে গেছে আমার জীবনের গতিপথ থেকে, তবে অনিল অন্তত বার তিন উঠে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পথে। অল্পদিনের জন্যেই। তেমন কিছু ঘটনাও ঘটেনি, তবে প্রথমটায়, ওরই মধ্যে, ছায়া রেখে যাওয়ার মতো কিছু থেকে থাকবে।

* * * *

আমি তখন পাসটাস সেরে দ্বারভাঙ্গার রাজস্কুলে শিক্ষক হ'য়ে ঢুকেছি। যখনকার ঘটনা, তখন আমি অস্থায়ী হেড্‌মাষ্টার। আমার ওপরে দু'জনেই একে একে চলে গেছেন, চেয়ারটা আমার দখলে। নূতন লোক রাখা হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের যেন একটা গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে, স্থানীয়

লোক, বাইরের লোক এলে টেঁকছেনা, আমাকেই 'পারমানেন্ট্' ক'রে দেবেন শেষ পর্যন্ত। লক্ষ্য করছেন, পাকা হেডমাষ্টারের রং ধরেছে কিনা আমার গায়ে।

ফুটবল আর হকির দিকে ঝোঁক ছিল। দ্বারভাঙ্গায় থাকলে তখনও খেলেছি, তাছাড়া স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশ হ'লেই কলকাতায় চলে যেতাম। আই-এফ-এ'র লীগ্ আর নক্আউট (Knock Out) কমপিটিসনের খেলাগুলা দেখবার নেশা ছিল। এতে সাথী ছিলেন আমার মেজমামা হরিপদ। বয়স হিসাবে তাঁর নেশা ছিল আরও ছেলেমানুষের মতো।

সেই গেছি সেবার। সালটা মনে পড়ছে না।

অনিলের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। কী ক'রে তাও মনে পড়ছে না। ওরা দ্বারভাঙ্গার পাট তুলে দিয়ে বহু পূর্ব থেকেই কলকাতায় ওদের বাড়িতে রয়েছে। শ্যামবাজারের ওদিকে কোথায়।

দেখা হ'য়ে গেল রাস্তাতেই।

চেহারা সেই রকমই রয়েছে; মাথায়ও যেন বাড়েনি। দেহেও কোন 'গত্তি' লাগেনি। সেইরকম দ্রুত কথাবলার ভঙ্গি। এতদিন পরে দেখে যেন কি করবে কোথায় রাখবে বুঝতে পারছেনা। কথার মোড়ও ক্ষণে ক্ষণে ঘুরে যাচ্ছে—এক ছেড়ে অন্যদিকে। বলল—আয়, দেখিয়ে দিই সবাইকে। বলি তো ওদের তোর কথা।

অল্প একটু দূরে একটা পানের দোকানে নিয়ে গেল, বোধহয় সেইখানেই যাচ্ছিল। পান, বিড়ি, সিগারেট নিয়ে একটা ছোট্ট ঘর, পরিচয় দিতে দোকানী বেশ একটু তটস্থ হ'য়ে পড়ল। আমাদের বয়সেরই একটি যুবক, বাঙ্গালীই মনে হোল। তবে বাঙ্গালী-হয়ে-যাওয়া এ দেশীও হতে পারে। খুবরীর ভেতরে দু'জন দু'লে দুলে বিড়ি পাকাচ্ছিল। হাত থামাল। খাতির-অভ্যর্থনা মালিকের দিক থেকেই—নিজের হাতে ক'রে মিঠা পান সেজে দেওয়া—বিড়ি-সিগারেট চ'লে কিনা প্রশ্ন—কিছু এদিকওদিক আলাপ, সম্ভ্রমের সঙ্গেই—এদিকে এলে যেন পায়ের ধূলা নিশ্চয় দিই···

বেরিয়ে এলাম অনিলের সঙ্গে। আমার কথা কমে গেছে, অশ্রদ্ধায় নয়। অনিলকে কোন অবস্থাতেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখা সম্ভব ছিলনা আমার পক্ষে। পুলকের উদ্দীপনায় যে পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেললে আমায়—বেশ মনে আছে, তাতেও কোনও চিত্তবিকার অনুভব করিনি; ক্ষণিক পরিচয়ের মধ্যে যে আন্তরিকতাটুকু পেলাম, সেইটুকু নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

কোনও প্রশ্ন ক'রে সেটুকু বিঘ্নিত করতে মন সরছে না।

দু'জনে পথ বেয়ে চলেছি। গল্পটা অনিলের দিক থেকেই বেশি। এক

সময় বলল—"মনটা খুব ভালো ভাই।...অবিশ্যি কোকেন-টোকেন রাখে। তা কি করবে বল। শুধু পান-বিড়িতে চলে না তো..."

একসময় ফুটপাথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়ে বলল—"ওরে বিভূতি, মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা হচ্ছে ক'দিন ধরে, যাবি শুনতে? কাছেই।...কী এক একটা গান! শুনলে রক্ত টগ্‌বগিয়ে ওঠে। চল-চল।"

আমার বুকেও হঠাৎ-উত্তেজনার একটা ধাক্কা। সেই স্কুল যুগের কত এ্যাড্‌ভেন্‌চারের একটা দিন এসে গেছে পথ ভুলে। বললাম—"যাব, নিশ্চয় যাব, অনেক দিন থেকে শোনবার ইচ্ছে আছে রে। কখন্ শুরু হবে?"

আরম্ভর সময়টা মনে পড়ছেনা, তবে ভাঙ্গল যখন তখন রাত তিনটে। অনিলকে পেলাম না, তীব্র উন্মাদনার মধ্যে হুঁস করিনি কখন্ কি কাজে উঠে গেছে। যাত্রা ভাঙ্গলে ভীড়ের কোলাহল আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে আর কেউ কাকেও খুঁজে পেলাম না।

রাত্রিটি আর এক দিক দিয়ে মনে গাঁথা রয়েছে আমার।...হেঁটে একলা আসছি শ্যামবাজার থেকে শিবপুর—চিৎপুরের কুখ্যাত পল্লীর মধ্যে দিয়ে—মাঝে মাঝে গলির বাইরেও দু'তিন ক'রে দাঁড়িয়ে—কিছু কিছু স্পষ্ট-অস্পষ্ট কথাও কানে ভেসে আসছে—রাস্তায় আমি শেষ-রাত্রের একা পথিক—গা ছম ছম করছে—হাতে ঘড়ি—পকেটও খালি নয়—সামনে দৃষ্টি রেখে হন্‌হনিয়ে এগিয়ে চলেছি। বড়বাজারে এসে গায়ে বাতাস লাগল।

অনিলকে সেদিন নেশার অবস্থায় দেখিনি। একটু মৌতাতের টানেই কি উঠে গিয়েছিল? আবার ফিরে এসে বসবে ভেবে? না, নিতান্তই ভীড়ভাঙার ছাড়াছাড়ি?

এরপর ওর সঙ্গে একেবারে বছর ছ'-সাত পরে দেখা।

আমার জীবনের পথ অনেকবারই দিক পরিবর্তন করতে করতে এগিয়ে এসেছে। গোটা তিন-চার মোড় ঘুরে আমি তখন দ্বারভাঙ্গা জেলারই এক জমিদারের ছেলের গৃহশিক্ষকের কাজ নিয়ে রয়েছি। জায়গাটার নাম রাঘোপুর। দ্বারভাঙ্গা থেকে বারো-মাইল উত্তর-পূর্বে একটা জনবিরল পল্লী। পাচক আর একটা চাকর নিয়ে সংসার আমার।

একদিন হঠাৎ অনিল গিয়ে উপস্থিত। নিঃসঙ্গ জীবনে একেবারে অনিল,—হাতে প্রায় স্বর্গ পাওয়া!...তবে, সে অনিল নয়। নেশাটা অবশ্য নেই। থাকলে নিশ্চয় আসত না; কিংবা আসবার জন্যে বেঁচে থাকত না। তবে ভেতরটা যে একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে, সেটা

টের পেতে দেরী হ'লনা। অত কথা, একেবারে স্বল্পবাক হয়ে গেছে ; প্রায় মৌনী। তবে, সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি তখনও কোথাও একটু আছেই লুকিয়ে ; মেঘের কোলে বিদ্যুৎ-রেখা। গোটা কতক সমস্যার সমাধান ওই ক'রে দিল, এখন মনে পড়ছেনা, কি নিয়ে।

পাড়াগাঁয়ের দুধ ঘি, মুক্ত হাওয়া, বেশ ভালও হ'য়ে আসছিল। তারপর---আমি তখন সপ্তাহে একবার ক'রে দ্বারভাঙ্গা ঘুরে যেতাম—একবার ফিরে গিয়ে দেখি অনিল নেই। চাকরটা বলল—বাবু কোথায় চ'লে গেছেন—আপনি যাবার পর দিনই, আর আসেননি।

ওর সঙ্গে দেখা আরও বছর আষ্টেক পরে। আমি তখন বোধহয় রাজস্কুলেই দ্বিতীয়বার হেড-মাষ্টারি করছি। একদিন অনিল বাড়িতে এসে উপস্থিত। গেরুয়াপরা হাতে হাত দু'য়েকের লোহার শিক একটা, খানিকটা গোল, নীচের দিকটা সূচাল। মনে হ'ল ত্রিশূলের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কী কথা হ'ল মনে নেই ; কতক্ষণ তাও নয়। যেন বলেছিল তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর একটা এইরকম ধারণা থেকে গেছে মনে যে, কথাগুলা বেশ যেন সুসংলগ্ন ছিলনা, কিংবা মাঝে মাঝে মনটা হঠাৎ অন্যদিকে গিয়ে প্রসঙ্গ থেকে সরে সরে পড়ছিল।

আমাদের একটা বিশ্বাস আছে—আধিভৌতিক আর আধ্যাত্মিক স্তরের মাঝামাঝি সীমান্তরেখায় গিয়ে দাঁড়ালে নাকি এইরকম একটা উদ্‌ভ্রান্ত উদাসী ভাব এসে পড়ে। এ-বিশ্বাসে অন্ততঃ একটা সান্ত্বনা পাই মনে অনিলের কথা ভেবে।

ওর শেষ কথাটা মনে আছে স্পষ্ট—"ভাবলাম বিভূতির সঙ্গে দেখাটা একবার ক'রে আসি।"

এর পর যখন ভাবি, মনে হয়—অনিল যেন চলেইছে ; মৌন, নিঃসঙ্গ, অন্ত নেই চলার ওর।

অনিলের কথাটা একটানাই শেষ ক'রে দিলাম, যতটা রয়েছে ও আমার জীবনে। এবার বাংলা স্কুলের জীবনে ফিরে যাওয়া যাক।

বাংলা স্কুলের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তার তিনজন মাষ্টারের মধ্যে দু'জন স্থায়ীভাবে না থাকা, হেডমাষ্টার আর থার্ড মাষ্টার। কতজন যে এলেন গেলেন আমার সামনেই, তিন চারটি মুখ ছাড়া মনে পড়েনা। এরই মধ্যে সেকেণ্ড মাষ্টার হরিচরণ ঘোষ ছিলেন শাশ্বত মূর্তি। তিনি কবে থেকে ছিলেন, তারপর আমাদের বাংলাস্কুল, রাজস্কুল ছাড়িয়ে কলেজের যুগ পর্যন্ত যে কবে থেকে অবসর নেন কিছুই জানিনা। মাথায়

কোঁকড়া-কোঁকড়া পাকা চুল, একটু খর্বাকৃতি মানুষ ; একটি ঘরে এক চেয়ারে কাটিয়ে গেছেন। এই নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে স্থায়িত্ব ছাড়া তাঁকে আর একটি জিনিস বিশিষ্ট ক'রে রেখেছিল—তাঁর মেজাজ। কড়িতে-কোমলে অমন শিক্ষক কম দেখেছি। অত্যন্ত রগচটা লোক ছিলেন। হোমটাস্ক ক'রে না আনা বা চালচলনে কোন সামান্য ত্রুটি-স্খলনের জন্য এক এক সময় বেত মারতে মারতে বেঞ্চের নীচে পর্যন্ত সাঁদ করিয়ে দিতেন, আবার কখনও কখনও মেজাজ হালকা পর্দায় বাঁধা থাকলে মারের দিকে না গিয়ে সাজার প্রকৃতিই পালটে দিতেন। একটা ছিল বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে কাগজে ছেঁদা ক'রে তাতে সুতো বেঁধে কানে ঝুলিয়ে কোন ছেলেকে পাখা টানতে বলা। আঘাত নয়, কিছু নয়, শুধু টানা পাখার হাওয়ায় কানের কাগজ দুটো ফরফর ক'রে দুলছে। কিন্তু চাপা হাসির মধ্যে সেইভাবে সবার দর্শনীয় হ'য়ে থাকা, যে পেল সাজা তার পক্ষে আরও মর্মান্তিক হ'য়ে উঠত। মেজাজ ভালো থাকলে ছেলেদের বাড়িয়ে চারিয়ে হিউমারও করতে দেখেছি। ক্লাসে রীতিমত হাসির একটা হররা তুলেই। পূর্বে ব'লে থাকব, বাংলা স্কুলে একই ঘরে একই পিরিয়াডে একই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দু'টো ক'রে তো বটেই, কখনও কখনও তিনটে ক'রেও ক্লাস বসত।...বিষ্টু ছিল আমাদের দু'ক্লাস নীচে। বেঁটে-সেঁটে, বড় ঘরের একটু আদুরে ছেলে, এদিকে পড়াশোনাতেও ভালো। লোয়ার ক্লাসের প্রায়-শিশু ছাত্র, স্কুলেও আদর-প্রশ্রয়ই পেত, যার জন্য বেশ প্রফুল্ল আর সপ্রতিভও থাকত বিষ্টু ; স্কুলে ওর নাম ছিল "বেষ্টা-বামন"।

হরিমাষ্টার একটা অংক দিয়েছেন, বোধহয় একটু বড় গোছের একটা গুণ। সাত আটটা ছেলের সবাই কিছু না কিছু ভুল করেছে, শুধু বিষ্টুরটা হয়েছে ঠিক। হরিবাবুর ছিল বড় বড় একটু ফোলা ফোলা গোঁফ। আমরা লক্ষ্য করছি মেলাতে মেলাতেই মাষ্টার মশাইয়ের গোঁফের নীচে যেন একটু হাসি ফুটে আসছে। দুর্লভ সুলক্ষণ একটা, আমরা সবাই ন'ড়ে চ'ড়ে বসলাম।

অত নীচু পর্যন্ত বেত নামত না। মাষ্টারমশাই আর সব স্লেটে ঢেড়া কেটে ঠেলে দিয়ে বিষ্টুরটায় একটা বড় ইংরাজি 'R' অক্ষর লিখে সামনে টেনে নিলেন।—বললেন—"বাঃ, বাহাদুর ছেলে বেষ্টা বামন! আজ বাজি মাৎ করেছে।...উনি ছিলেন নদিয়া-রানাঘাটের মানুষ। সে জন্যই কিনা জানিনা, কথায় একটু টান ছিল, আর ব্যাকরণের প্রথম পুরুষের সঙ্গে কথা কইবার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতেন।..."তা বেষ্টা কি করতে চায়? এই গাধাগুলোর লম্বা লম্বা কানগুলো মুচড়ে ছিঁড়ে দিতে চায়,

কি ও-ঘর থেকে সিংহির ঝুঁটি ধ'রে আনতে চায় ; দেখুক্ ভেবে, যা চায় তারই ব্যবস্থা হবে।"

'সিংগি' ছিল এখানকার বাঙ্গালী জমিদার রাখালচন্দ্র সিংহের বাড়ির ছেলে। তখন উঁচু ক্লাসের ছাত্র। একটু দুষ্টু স্বভাবের। ঠিক ঘোৎনা-যুগলের মতো না হ'লেও, খানিকটা ডানপিটেই, যার জন্যেই বোধহয় ওর আসল নামটা চাপা প'ড়ে গিয়ে 'সিংগি' নামেই পরিচিত ছিল স্কুলে। মাথায় ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল থাকায় নামটা আরও সার্থক হ'য়ে উঠেছিল।

বিষ্টু তখন ফুলে গেছে প্রশংসায়। বড় ঘরের দুলাল, এদিকে একটু হাঁদা-হাঁদা ছিলই, ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে বলল—"ঝুঁটিই ধ'রে আনব ।"

"তা হলে যাক্, সিংহির নামে আজ নালিশও আছে। হেডমাষ্টার মশাই কিছু বললে বলবে আমি ধ'রে আনতে বলেছি।...যাক্, কষে মুঠিয়ে টেনে আনবে যতই গর্জাক। খালি হাতে যেন না আসে ফিরে।"

পাশেই হেডমাষ্টারের ঘরে 'সিংগি'দের ক্লাস চলছে। যারা রহস্যটা জানত তাদের মধ্যে 'খুকখুক' চাপা হাসি শুরু হ'য়ে গেছে। বয়সের জন্যে সেকেণ্ড মাষ্টারের একটা রোয়াব ছিল হেড্‌মাষ্টারের কাছে পর্যন্ত। তাঁর দূত, বিষ্টু বেশ সদর্পে পা ফেলে এগিয়ে গেল। তারপর ও-ঘরের চৌকাঠও ডিঙুতে হ'লনা, তখনই ফিরে এসে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই সবার হাসিটা ফেটে পড়ল।

রাখালবাবুর বাড়িতে কার একটা অশৌচ ছিল কার মৃত্যুতে। তিনদিন আগে 'সিংগি' ঘাটে মাথা মুড়িয়ে আজ প্রথম স্কুলে এসেছে। কড়া শাসনের মধ্যে প্রশ্রয়ের হাসি, চ'লল খানিকটা গড়িয়ে, তারপরে টেবিলে বেতের আছাড়—"হয়েছে, মেলা হাসি নয়! টাস্ক্ আনুক সব!"

খুক-খুকুনির মধ্যে মিলিয়ে গেল হাসি আবার।

বাংলা স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে, তিনি হচ্ছেন হেডমাষ্টার সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেই বলেছি বাংলা স্কুলে হেডমাষ্টার আর থার্ডমাষ্টারের চেয়ার প্রায়ই খালি হ'য়ে নূতন নূতন শিক্ষকের আমদানি হোত। যতদূর মনে পড়ছে, জন চারেক এইরকম যাওয়া-আসার পর আমি যখন সিক্‌স্‌থ অর্থাৎ উর্ধ্বতম ক্লাসের আগেরটিতে উঠেছি, তার কিছু আগে সুধীরবাবু সবে এন্‌ট্রেন্স পাশ ক'রে স্কুলে চাকরি নিয়েছেন। ঠিক মনে পড়ছেনা, একেবারেই হেডমাষ্টার হ'য়ে কিনা। তবে, না হ'লেও বেশিদিন অন্য পদে থাকেননি ; আমি যখন সিক্‌স্‌থ ক্লাসে উঠেছি, উনি তখন পুরোপুরি হেডমাষ্টারই।

তারপরে আমি ও-স্কুল ছেড়ে রাজস্কুলে চ'লে আসবার পরও বেশ কয়েকবছর পর্যন্ত স্কুলেই থেকে যান।

তার একটা কারণ, উনি ছিলেন দ্বারভাঙ্গারই মানুষ। দু-পুরুষের বাসিন্দা, সহরের একটু বাইরের দিকে নিজেদের জোৎ-জমি-পুকুর নিয়ে বেশ ভাল গৃহস্থ। বাইরের দিকে কোনও টানই ছিলনা ওঁর, তার ওপর এসে পড়ল স্কুলের ওপর টান। প্রথমটা হয়ত নিজের সহরের ব'লেই, নিজের সমাজের বলেই; পরে কিন্তু স্কুলটা ওঁর সমস্ত অপত্য-রসটাকেই শোষণ ক'রে নিল। সুধীরবাবু নিজে নিঃসন্তান হ'য়ে থাকেন।

এটা স্বাভাবিক, তবু নিঃসন্তান থাকাটা একটা দৈব বা আকস্মিক ঘটনা ওঁর জীবনে, একান্ত পারিবারিক ব্যাপার। ওঁর এবং ওঁর মতো আরও কয়েকজন শিক্ষকের জীবন পর্যালোচনা ক'রে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, কবির মত teachers are born, not made. সুধীরবাবু ছিলেন সেই জন্মশিক্ষক।

স্কুলের উঁচুদিকের ছাত্র হিসেবে আমার খানিকটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, ঠিক 'বিচার' করবার ক্ষমতা না থাকলেও অনুভব করলাম, উনি আসবার কিছুদিন পর থেকে স্কুলের হাওয়াটা বদলে গেল। এইসব নিম্নশ্রেণী স্কুলে পড়ানো থেকে নিয়ে সব বিষয়ে খানিকটা শৈথিল্য বা গতানুগতিকতার ভাব থাকে। 'ডিসিপ্লিন' অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতা সাধারণত বেতের জোরেই হয় রক্ষিত, চোখের সামনে আদর্শ তুলে ধ'রে নয়। উনি আসার পর থেকেই এই জিনিসটা যেন স্কুলের বাতাসে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হ'য়ে গেল। সবার মধ্যে, অন্তত একটু অগ্রনী ছাত্রদের মধ্যে একটা উৎসাহ—'হ'তে হবে,—ক'রতে হবে' ভাব। প্রথমে অতটা বুঝতে পারিনি। একটা অভিনবত্ব এসে গেছে বাংলা স্কুলে এইটুকু কিশোর মনে অনুভব ক'রে গেছি, তারপর ওপরে উঠে দু'টো বৎসর যে ওঁর নিকট-সংস্পর্শে এলাম, তাইতে ধীরে ধীরে টের পেলাম সমস্তটুকুর উৎসমুখ কোথায়। 'গড়ে তুলতে হবে'—'গোটা মানুষ ক'রে দাঁড় করাতে হবে'—এই ছিল ওঁর জীবনের ব্রত। সেকালের একজন এন্‌ট্রেন্স্ পাসকে সব বিষয়েই চৌকোশ হ'তে হোত, তবে সুধীরবাবু পড়াবার জন্য বেছে নিয়েছিলেন ইংরাজি, (গ্রামার আর অনুবাদ শুদ্ধ) আর ইতিহাস। দু'টোতেই তিনি বেশ পারঙ্গম ছিলেন। একজন এনট্রেন্স্-পাসের স্ট্যান্‌ডার্ডকেও ছাড়িয়ে। একটা কথা ব'লে রাখা দরকার। আজকালকার ছাত্রদের তুলনায় সে সময়ের ছাত্রদের বাইরের বই পড়বার খুব অভ্যাস ছিল একটা। দাদাদের নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সে-সময়ের জনপ্রিয় ইংরাজি

(বা অনুবাদে French, Russian) স্ট্যান্‌ডার্ড লেখকদের বই নিয়ে আদান-প্রদান, আলোচনা করতে দেখেছি। সাধারণত উপন্যাস।

সুধীরবাবুর ঝোঁকটা ছিল ইতিহাস আর জীবনীর দিকে বেশি। ওঁর পড়াবার ধাঁচটাও ছিল একেবারে অন্য রকমের। পাঠ্য পুস্তক পড়াচ্ছেন, কোনও দিন কোনও কারণে প্রসঙ্গ ছেড়ে একটু ছিটকে পড়ার কারণ হয়েছে, সেদিনকার পড়া ওইখানেই শেষ। বিশেষ ক'রে যদি কোনও মহাপুরুষের জীবনী-কথা এসে পড়ল, তার মধ্যেও বশেষ ক'রে যদি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথা। নেপোলিয়ন ছিলেন সুধীরবাবুর একেবারে আদর্শ পুরুষ ; Abbot's Life of Napoleon বইটা সমস্ত যেন ওঁর নখদর্পণে ছিল। মাতৃভক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, অদম্য মনোবল, অটুট তিতিক্ষা, যে কোনও পরিস্থিতির মধ্যেই নিজের কর্তব্যের প্রতি অচল নিষ্ঠা,—নেপোলিয়ন-চরিত্রের যে-কোনও একটি প্রসঙ্গ উঠলেই সুধীরবাবু উদ্দীপিত হ'য়ে উঠতেন। উনি ছিলেন শ্যামবর্ণ ; দেহ ছিল দীর্ঘচ্ছন্দ, পেশীবদ্ধ, একহারা ; চক্ষুদু'টি হয়ত একটু ছোট, তবে দীপ্ত। নেপোলিয়নের কথা আরম্ভ করলে কী যেন একটা ঠিকরে বেরুত ওঁর মধ্যে থেকে। পিরিয়াডের হিসাব থাকত না। শেষের দিকে হ'লে স্কুলের ছুটি হ'য়ে গেলেও ওঁর 'ক্লাস' চলতই। আমাদের 'রীডার'—এ একটা গল্প ছিল 'নেপোলিয়নের আল্‌প্‌স অতিক্রম' (Napoleon Crossing the Alps)। সচিত্র। সেটা পড়াতে ক'দিন যে লেগে গিয়েছিল ওঁর !

এর পাশেই আর একটা ব্যাপার তখন শুরু হ'য়ে গেছে, 'স্বদেশী আন্দোলন'। খুব বেশি না বুঝলেও মোট কথাটা একরকম বুঝতাম—ইংরাজদের সঙ্গে আর কোনও সংস্রব নয়, ওদের দেশ থেকে তাড়াতে হবে। অর্থাৎ স্বাধীনতা। এ জিনিসটার সঙ্গে নেপোলিয়নের চরিত্রের একটা মিল, একটা স্বাজাত্য ছিল ; কিন্তু 'স্বদেশী আন্দোলন' নিয়ে কখন কোন আন্দোলনই করেননি। প্রশ্ন উঠত মনে, কিন্তু তোলবার কখনও সাহস হয়নি। এদিকে আমাদের হুজুগ প্রিয় বাল্য মনে কিছু রং ধরেছে। ফুটবলের ক্লাব করেছি, বড় পিজবোর্ডে নিজের হাতে বড় বড় অক্ষরে লিখে নাম দিয়েছি "বন্দেমাতরম ক্লাব"। আরও বেশি, সূর্যাবাবু নামে একজন বেহারী যুবক লীডার হ'য়ে গান রচনা ক'রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন—দু'টো লাইন মনেও আছে এখনও—"হে দুর্গে, তু হম্ পর্ রহম্ কর, ইন বিদেশীওকো তু খতম্ কর্"—দলের সঙ্গে পতাকা হাতে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমি দাদা আরও কয়েকজন মণ্ডলীর ছেলে গলা ছেড়ে সংগত দিচ্ছি—স্কুলের বাইরে

এসবও হয়ে গেছে। তারপর একদিন উত্তেজনাটা স্কুলেও পড়ল ঢুকে। চাপা উত্তেজনাই, তবে একটা রূপ পরিগ্রহ করল। কয়েকজন মিলে ওপরের তু-'ক্লাসেরই—টিফিন পিরিয়াডে আমাদের জামার বিদেশী বোতামগুলা কেটে ফেললাম। খানিকটা নেপোলিয়নীই বৈকি। মাষ্টারমশাই তো দেখতেই পাবেন, তা দেখুন...।

দেখলেন মাষ্টারমশাই ক্লাস বসলে। তার আগে নিশ্চয় শুনেও থাকবেন। বললেন—'ফেলবি কেন? পয়সা দিয়ে কেনা বোতামগুলো কি দোষ করেছে? আমায় দিয়ে দে।"

সেদিন ঐটুকুই। নিশ্চয় খারাপই লেগেছিল—যখন নাকি আশা করছি, উনি নিজেই কলকাতার রাস্তায় মিছিল ক'রে বেড়াচ্ছেন মাঠে-ময়দানে অগ্নিগর্ভ 'স্পীচ্' উদ্‌গার করছেন।

সেদিন ঐ পর্যন্তই। তারপর কিছুদিন পরে ক্লাসেই একটা প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে যা বললেন তার সারমর্ম—এখন আমাদের যা ভালো তাই দিয়ে নিজের নিজের চরিত্রকে শক্ত ক'রে গড়ে তুলতে হবে। অপরিণত বয়সের বিচারহীন উচ্ছ্বাস ফেনার মতো; আলগাই ক'রে দেবে সমস্তটুকু।

স্কুলের বাইরেও মাষ্টারমশাইয়ের জীবন অনেকখানি ছড়িয়ে পড়েছিল। বপদে-সম্পদে সামাজিক সব রকম কাজেই উনি ছিলেন অগ্রণী। নিজের আদর্শ দিয়ে মনের মতো একটি দল গড়ে গেলেন। বাংলা স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছি, রাজ স্কুল থেকেও, পরে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেও কর্মজীবনে ওঁর অনুপ্রেরণা পেয়েছি। ওঁর জীবনে পরিবর্তন এসেছে; বাংলা স্কুলেই পড়ে থাকবার মানুষ নন। কলমের জোর ছিল, তার ওপর সততা, উত্তর জীবনে দ্বারভাঙ্গা রাজেই ভালো কাজ নিয়ে কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু দ্বারভাঙ্গার বাঙ্গালী সমাজ বরাবরই বিপদে-সম্পদে পেয়ে গেছে তাঁকে।

জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছি ওঁর থেকে বহুবারই, তারপর আবার ওঁর বার্ধক্যে ওঁর চরণতলে বসে উপদেশ আশীর্বাদ নেওয়ার সুযোগ হয়েছে। একটি বিদগ্ধ কর্মবহুল জীবনের সে কী প্রশান্ত মহিমা!

আর একজন আমার জীবনকে প্রভাবিত করেছেন এই সময় থেকে। তবে এরকম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-উপদেশের মধ্য দিয়ে নয়। নিজের জীবনের নীরব আদর্শ দিয়ে—এত নীরব যে নিজেও জানতেন না সেই আদর্শ অনুসরণ ক'রে একজন নিজেকে পরিচালিত ক'রে যাওয়ার প্রয়াসে নিরত। ইনি গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোষ্ঠবিহারী সম্বন্ধে ছিলেন আরও নিকটের, প্রায় এক পরিবারভুক্ত বলাও চলে। পাণ্ডুলের জ্যাঠামশাইয়ের কথা আগে বলেছি, বাবার পিসতুতো ভাই কৈলাশচন্দ্র। ইনি ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। পাণ্ডুলের যেমন আমাদের বাসা একেবারে পাশাপাশি ছিল, কুঠির দেওয়া কোয়ার্টার্স, দৈবযোগে দ্বারভাঙ্গাতেও ঠিক সেই রকমই পাশাপাশি হওয়ায় সেই এক-পরিবারের ভাবটা বজায় থেকে গেল। কথাটা পূর্বেও ব'লে থাকব। বড়দাদা (ওঁর জ্যেষ্ঠ) অল্প বয়সেই মারা যান, যখন এনট্রেন্স পড়ছেন। উত্তর জীবনে এমনও হয়েছে, পাণ্ডুলের বাস উঠে যেতে ও-বাড়ি থেকে জ্যাঠামশাই, এ-বাড়ি থেকে বাবা উভয়ে চাকরি নিয়ে বাইরে, মেজদাদা, কম বয়সেই হু'বাড়ির পুরুষ অভিভাবক হ'য়ে রয়েছেন। হয়তো কলেজও মাড়াননি তখন।

এই আত্মীয়তা, তার ওপর আকস্মিকতা-সূত্রেই আজীবন একত্রে বসবাস, এর দ্বারা ওঁর প্রভাবটা স্বভাবতই আরও নিবিড়ভাবেই পড়েছিল আমার ওপর। প্রতিদিনের জীবন-নির্বাহেই প্রায়। অথচ মুখে কখনও বলেছেন—এটা কর, এইভাবে চলতে হবে—এমন মনে পড়েনা। জীবনে ওঁকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগুতে হয়েছে, তার মধ্যে অর্থকৃচ্ছ্রতাও ছিল। তবে নিজের কর্মদক্ষতার, বিশেষ ক'রে চারিত্রিক গুণে অনেক দূর উঠেও গিয়েছিলেন।

আমারই মতো রাজস্কুলে শিক্ষকতা নিয়ে সুরু। তারপর রাজকুমার-দ্বয়ের গৃহশিক্ষকতা—স্বর্গত মহারাজাধিরাজ কামেশ্বর সিং ও তাঁর ভ্রাতা রাজা বিশ্বেশ্বর সিং—পরে বিশ্বেশ্বর সিংএর একান্ত সচিব (Private Secretary)—তারপরে মূল রাজ এস্টেটেই আফিসের এক দায়িত্বপূর্ণ কাজ। মেজদাদার আর একটা দিক ছিল ওঁর শান্ত, কতকটা আত্ম-সমাহিত ভাব থেকে খানিকটা বিপরীতই বলা যায় ; ওর কৌতুকপ্রিয়তা —বিশেষ ক'রে কারুর স্বভাবে, ভঙ্গিতে বিসদৃশ কিছু থাকলে হুবহু তার নকল ক'রে নেওয়ার ক্ষমতা ; কিছু মুদ্রাদোষ, কিছু আতিশয্য, কিছু abnormality (অস্বাভাবিকতা)। Wit-humour এ-ও দখলটা ছিল প্রবল। স্বল্পভাষী ছিলেন। তার মধ্যেও আলাপে-সংলাপে এক-একটা হাসির কথা ঠিকরে বেরিয়ে হাসির হর্‌রা তুলত। স্নেহ পেয়েছি। ওঁর সমস্ত জীবনের মতোই ওঁর স্নেহে মুখরতা ছিলনা। অন্তরের জিনিস, আমিও অন্তর দিয়েই অনুভব ক'রে গেছি।

সম্প্রতি মারা গেলেন মেজদাদা চুরাশি বৎসর বয়সে। আমায় বিরাশি বৎসরে রেখে।

আমার জীবনে মাস্টারমশাই সুধীরবাবু আর মেজদাদার যা প্রভাব—

বিশেষ ক'রে জীবনের প্রারম্ভে এই সময়টা— তা সব ব'লে শেষ করা যায় না। একটু সকৃতজ্ঞ স্মরণিকা রেখে যাই তবু।

১৯০৮ সাল। রাজস্কুলে গিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। অর্থাৎ রাজস্কুলে প্রবেশলাভের পরীক্ষা। পূর্বেই বলেছি, বাংলা স্কুলের কোন আলাদা সত্তা ছিলনা তখন, এখন যেমন মিড্‌ল্‌ স্কুল রূপে হয়েছে। তখনকার বাংলা স্কুল ছিল দ্বারভাঙ্গার বাঙ্গালীদের—রাজের বাঙ্গালী চাকুরেদের ছেলেদের বাংলা পড়ানোর সুবিধার জন্যে। অবশ্য বাড়ি দেওয়া ছাড়া আর কোন সংস্রব ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি, এ-স্কুলের গোড়াপত্তনে রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) পিতা তৎকালীন রাজের জেনারেল ম্যানেজার চন্দ্রশেখর বাবুর হাত ছিল, এবং বাংলা-স্কুল বাংলা সাহিত্য শিল্পকলার তিনজন মনীষীকে দান করেছে বাঙ্গালীকে—রাজশেখর বসু, যতীন্দ্রনাথ সেন এবং নন্দলাল বসু।

পরীক্ষা দিলাম। এই পরীক্ষায় আমার একটি সামান্য কথা একটু বড় ক'রেই মনে আছে, যাকে বলা যায় হাই-লাইটেড্ (high lighted) হ'য়ে থাকা। লিখে রাখছি, তবে কেউ যেন আত্মপরিচয় না মনে করেন। যদিও সামান্য হ'লেও আত্মপ্রসাদ তো নিশ্চয়, নৈলে এত দিনেও এমন উজ্জ্বল হ'য়ে মনে থাকবে কেন?...পরীক্ষা দিতে বসেছি, আমার পাশেই একটি বাঙ্গালী ছাত্রের সীট পড়েছে, দু' ক্লাস ওপরে রাজস্কুলেই দাদার সহপাঠী। প্রশ্নপত্রে এক জায়গায় ঠেকেছে; হাঁ ক'রে বসে আছি দেখে তিনি আমায় গার্ডের দৃষ্টি-শ্রুতি বাঁচিয়ে এক সময় উত্তরটা ব'লে দিলেন। ক্ষণিক লুব্ধদ্বিধা, তারপর তাঁর ইঙ্গিতটুকু না নিয়েই অন্য প্রশ্নে চ'লে গেলাম।

বাইরে এসে যে একটি তৃপ্ত আত্মপ্রসাদ সেদিন অনুভব করি তার জন্যেই এটুকু লিখে রাখা।...মনে হয়েছিল, ত'াহ'লে বাংলা স্কুল থেকে আমি কিছু পেয়ে এসেছি। সুধীরবাবু আমার জীবনে ব্যর্থ হননি। পরীক্ষায় একটু ত্রুটি রয়ে গেল, কিন্তু পূর্ণসাফল্যের মধ্যে একটা যেন পরাভবই যেত থেকে। সব অনুভূতি আদিতে নিশ্চয় আত্মানুভূতি, কিন্তু এই কথাটাই মনে বড় হ'য়ে উঠল, আমি একজনের মান রক্ষা করেছি।

জীবনে এগিয়ে যাচ্ছি। পাণ্ডুল প্রথম পর্যায়ে। চাতরা, আবার পাণ্ডুল ছুঁয়ে দ্বারভাঙ্গা। বাংলা স্কুল। ছেড়ে দিয়ে এই রাজস্কুল। স্টেজে স্টেজে, নূতন ধাপে পা দিয়ে এক একবার অনুভূতিটা হঠাৎ

প্রবল হ'য়ে উঠেছে। একটা চমক-লাগানো বিস্ময়—নূতন দেখার নূতন পাওয়ার, নূতন কিছু করতে পারার।...সেটা একটা শিশুর চোখে দেখেছি—শৈশব থেকে ধীরে ধীরে জীবনের চক্রবাল বিস্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে। রাজস্কুল এইরকম একটা স্টেজ আমার জীবনে। হঠাৎ দিগন্তটা বেড়ে গিয়ে অনেক কিছু পেয়ে গেলাম ; হ'য়ে গেলাম অনেক কিছু। এটি হোতনা যদি একই হাইস্কুলে বছরে বছরে উঠে এই স্থানটিতে পৌঁছুতাম। অভ্যাসে অভ্যাসে পুলক-রোমাঞ্চটার ধার যেত ম'রে।

প্রথমত একটা বিরাটত্বের অনুভূতি। তিনটি ছোট ছোট ঘর আর তিনজন শিক্ষক নিয়ে বাংলা স্কুল। তার জায়গায় কত ঘর, কত শিক্ষক, কত ছেলের মধ্যে এসে পড়া ! এর যে উল্লাস সেটাকে আর একটা জিনিস দিল বাড়িয়ে। বাংলা স্কুলে দশ বারোটি ছাত্রের মধ্যে পরীক্ষায় আমার যে স্থানটা থেকে আসছিল, রাজস্কুলে এসে জন চল্লিশ ছেলের মধ্যে সেটা বজায় রইল। খুব একটা বড় কৃতিত্ব নয় এমন, এর গোড়ার কথা ছিল বাংলা স্কুলের শিক্ষার উচ্চতর মান। অল্প পরিসর অল্প সংখ্যা ব'লেই শিক্ষকে-ছাত্রে ঘনিষ্ঠতা ; তারপর সৌভাগ্যবশতঃ হেডমাষ্টার সুধীরবাবুর মতো শিক্ষক যদি পাওয়া গেল, তাতে যা হয়।

চলল রাজস্কুলের জীবন, ফোর্থ ক্লাস (তখকার হিসাবে) থেকে ফার্ষ্ট ক্লাস ; চারটে বৎসর। আমি আঠার বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করি। সময়টা চৌদ্দ থেকে আঠারো—জীবনটা গঠন করবার একটা প্ল্যান, একটা খসড়া ক'রে নেওয়ার সময় ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। তার কারণ, বাইরে শিক্ষাক্ষেত্রের পাশে পাশে, দেহমনের নেপথ্যে আর একটি জিনিস তখন ধীর-সঞ্চারে পড়ছে এসে—জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর বিকাশ, যৌবন। প্ল্যান-খসড়া আমি আজও করছি, জীবনের সায়াহ্নে এসেও কিন্তু যেন অর্থহীন। যৌবনারম্ভে সমস্ত জীবনটাই রয়েছে সামনে প'ড়ে, যৌবনের যে শিল্পী সে ছক আঁকবার জন্যে, চিত্রটাকে রঙে রঙে ভরিয়ে দেওয়ার জন্যে, মস্তবড় একটা ক্যানভাস্ (canvas) পায়, তারপর আয়ু-হ্রাসের সঙ্গে যেমন-যেমন ক্যানভাস্ আসে গুটিয়ে জীর্ণ হ'য়ে, তেমনি-তেমনি জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে, কত আশাভঙ্গে, কত আদর্শ-বিচ্যুতিতে যৌবনের সেই আত্মবিশ্বাসটা ক্রমশঃ যেন ক্ষীণ হ'য়ে আসে, লুপ্ত হ'য়ে যায়। রাজস্কুলের ঐ চারটে বৎসর আমার জীবনে একটা বিশেষ জায়গা নিয়ে আছে।

একটা কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে ; আমি প্ল্যান রচনা করার কথাই

বলছি—তার পূর্ণাবয়ব সফলতার কথা বলছিনা; সেখানে এই জীবনব্যাপী সাধনায় দেখলাম,—একটি কথাই সত্য—"মা ফলেষু কদাচন।"

কত জল্পনা-কল্পনা, তার মধ্যে আমি মাত্র একটিকে টায়েটোয়ে বাঁচিয়ে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে আসতে পেরেছি গল্প-উপন্যাস লেখার বাসনা।

জিনিসটা আমি ইচ্ছে ক'রেই "একজন লেখক হওয়ার উচ্চাশা" বললাম না। যতদূর আমার নিজের মনের মধ্যে ডুবে দেখছি, সে ধরণের কোনও আকাঙ্খা যেন ছিলই না আমার মনে, অন্তত একেবারে গোড়ায়। তার একটা কারণ থাকতে পারে। যেমন দেখেছি, শুনেছি, পড়েছি, প্রায় সব সাহিত্যিকেরই সাহিত্যের স্ফুরণ, বিকাশ, গোষ্ঠীগত-ভাবে হ'য়ে এসেছে। কারুর লেখার ক্ষমতা আছে, তাকে ঘিরে, কিংবা ক্ষমতা আছে এই রকম আরও কয়েকজনকে নিয়ে দল গ'ড়ে ওঠে। সৃষ্ট হয় রচনাচক্র, আলোচনা-চক্র, পাঠ-চক্র, বড় বড় লেখকদের বই নিয়ে, জীবনী নিয়ে। তাই থেকে একটা উচ্চাশা এসে পড়ে মনে, আত্মসন্ধানী হ'য়ে পড়ে মন,—দেখিনা, আমিও একজন হ'য়ে উঠতে পারি কিনা। দ্বারভাঙ্গায়, বিশেষ ক'রে সে-সময়ের দ্বারভাঙ্গায় এর কোনও সুযোগই ছিল না। আমি এই বইয়েরই এক জায়গায় বলেছি—পাণ্ডুলে কলকাতার অরবিন্দবাবুর নবীন সেনের "রৈবতক" পড়া থেকে হয়ত অনুপ্রেরণাটা পেয়ে থাকব। কিন্তু মনে হয় সেটা নিতান্তই "হয়ত"। বড় লেখকের স্বরূপ কি সে-সম্বন্ধেই যখন কোনও জ্ঞান নেই, তখন বড় লেখক হ'য়ে ওঠার উচ্চাশা কোথা থেকে আসবে? বরং "অরবিন্দ" হ'য়ে ওঠবার আকাঙ্খা হওয়া সম্ভব ছিল—প্রিয়দর্শন, সুবেশ, কতরকম ভঙ্গির সঙ্গে গম্ভীরকণ্ঠে যাচ্ছেন পড়ে!

আসল কথা তাও নয়। যে-সময়ের কথা, সেই দূর শৈশবে, মনের তন্ত্রীগুলা ছিল আরও সূক্ষ্ম, আরও সজাগ—একটা যে মৃদু রণন উঠেছিল তাকেই এদিকে এসে "প্রেরণা" ব'লে ভুল করছি।

আজ একটা কথা এইখানেই ব'লে রাখতে হয়। আমি বরাবরই ছিলাম প্রকাশ-বিমুখ। পত্র-পত্রিকা-পুস্তকে নয়। লিখছি, সে-সময়ের কাউকে ডেকে শোনাব, অভিমতের জন্য, বা, শোনাবার আনন্দে—এতে মন কখনও সায় দেয়নি, সংকোচই বোধ করেছি এখন পর্যন্ত। এ প্রকৃতির মানুষের গোষ্ঠীগঠন ক'রে সাহিত্য রচনার প্রশ্নই আসে না। ...তাহলে?

"এহ বাহ্য, এই নয়"—ক'রতে ক'রতে নিজেকে বিশ্লেষণ ক'রে একটি তত্ত্বে এসে পৌঁছেছি আমি।

আমার সাহিত্যসাধনার মূল প্রেরণা—নারী-সৌন্দর্য, নারী-মাধুর্য, নারী-বিস্ময়।

কথাটা একটু কেমন লাগে নিশ্চয়, বিশেষ ক'রে আমার সাহিত্য-চেতনা উন্মেষের যে সময়টা ধরেছি। স্কুল জীবনের দ্বিতীয়পর্ব, চৌদ্দ থেকে আঠার বৎসরের মাঝামাঝি। কিন্তু একটু কেমন মনে হোলেও কথাটা সত্য।

নারী-সৌন্দর্য আমায় মুগ্ধ করেছে, এ নিয়ে আমার একা শুধু বড়াই করা (বা লজ্জিত হওয়াই) চলেনা, কেননা এটা মানুষ মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি, একটা বিশেষ সময়ে বিশেষ ভাবে উপলব্ধ হয়। তবে, আমার মধ্যে যেন একটু বেশি মাত্রাতেই ছিল। তা না হ'লে—চৌদ্দ-আঠারোর মধ্যে তবু তো খানিকটা সময় হয়েছে—চাতরায় বয়স যখন এর আধা-আধি—তখন আমি মেয়ে-মজলিসের ফরমাস তামিল করার মধ্যে আমার জ্ঞাতি-বৌদিদির সঙ্গিনী নয়নতারাকে ভালবেসে ফেললাম কী করে?—সেই adolescent love, অপরিণত বয়সের অসম প্রেম; না হয়, ভাললাগাই বলা হোল। এক, তার আকুল-করা সৌন্দর্য ছাড়া সবই তো পরিপন্থীই; আমার চেয়ে কতই না বড়, পূর্ণ যুবতী, বিবাহিতা! দ্বারভাঙ্গায় এসেও যে নিরস্ত হইনি, সে-স্মৃতি তার অসম্ভাব্যতার মধ্যে বিলীন হ'য়ে যায়নি—সে কথাও আমার সাহিত্যে, গল্পের মধ্যে কিছু কিছু রেখে গিয়েছি। যে স্মৃতি হয়ত শুষ্ক হ'য়ে গিয়েছিল, কোনও এক বর্ষা-সন্ধ্যায় আবার সজল হ'য়ে উঠেছে।

কথাটাকে আর একটু এগিয়ে দিই, তাহলেই আমার ভালবাসার পরিপূর্ণ রূপটা পাওয়া যাবে। আমি সৌন্দর্যকে ভালবেসেছি, কিন্তু সৌন্দর্য সম্বন্ধে ভোগলিপ্সা কখনও আমার মনে স্থান পায়নি—গোড়া থেকে একেবারে 'নীলাঙ্গুরীয়'র যুগ পর্যন্ত। এটা ছিল, যে-জিনিসটাকে ইংরাজিতে বলা হয় প্লেটনিক্ লভ (Platonic love), অনেকটা তাই। এর যে পুরস্কার আমি পেয়েছি তা এই যে, এই পরিশুদ্ধ মোহ শেষ পর্যন্ত গেছে থেকে। যাকে চেয়েছি তাকে পাইনি; (সৌভাগ্যবশতঃ); পেলে (দুর্ভাগ্যবশতঃ) আমার এই পরম সম্পদটি হারাতে হোত।

একটা কথা জেনে রাখা দরকার। এ যা বললাম তা আমার সাহিত্যে একেবারেই উৎস-মুখের কথা। এরপর অবশ্য দিন এগুবার সঙ্গে এসেছে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা—কোনটাতে মন বেশি ক'রে সাড়া দিয়েছে, কোনটাতে উদাসীন থেকে গেছে, বিভিন্ন পথে এগিয়ে গেছে মন। আরও আনুষঙ্গিক যা, সব এসে পড়েছে—যশ-অর্থের "উচ্চাশা"—

একজন প্রকৃত লেখক হ'য়ে দাঁড়াতে পারলে ভাল হোত—সবই পড়েছে এসে। স্বাভাবিক ভাবেই। সাধু সাজতে গেলে চলবে কেন?

আমার মূল উৎসের কথায় আসি এবার।

বোধহয় তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ছি। একটি কৈশোর-যৌবনের বয়ঃসন্ধিগতা মেয়েকে নায়িকা ক'রে একটা গল্প খাড়া করবার ইচ্ছা হোল। কোনও চোখে দেখা মেয়েকে নিয়ে, কি, নিতান্তই মগজ থেকে বের ক'রে, সেটা এতদিন পরে মনে থাকবার কথা নয়। গল্পের প্লটটা মোটামুটি কি ছিল তাও মনে নেই; একেবারে গোড়ার একটু যা মনে আছে।···ভোর হ'য়ে ঘুম-ভাঙ্গা কয়েকটি পাখীর কণ্ঠে প্রভাতী রব উঠেছে (কাককে আনিনি রসভঙ্গের ভয়ে, যদিও সবচেয়ে আগে ওঠে) —মেয়েটি শয্যাত্যাগ ক'রে বাইরে এল। সুন্দরী, সদ্য ঘুম-ভাঙ্গার একটা জড়তা লেগে রয়েছে, আলু থালু বেশ, রকে এসে দাঁড়াতে ভোরের আলোয় যেন একটা নূতন রূপ ফুটে ওঠল।

এর পরেই একটা হোঁচট খেলাম।

মেয়েটি গৃহস্থ কন্যা। সে-কালের। এর পরেই তাকে প্রস্তুত হ'য়ে গিয়ে প্রতিদিনের বাঁধা ধরা কাজে নামতে হবে। এইখানেই বাধল গোল। প্রস্তুতির ধারাবাহিক সবটুকু দেখানো দরকার, তারই মধ্যে ওর সৌন্দর্য যতটুকু ফুটিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু তা'হ'লে এর পরেই তো আসে মুখে হাতে জল দিয়ে দাঁত মাজা। এইখানেই রসভঙ্গ হ'য়ে যায়। সেকালে দাঁত মাজার উপকরণ প্রধানতঃ ছিল ঘুঁটের ছাই কিংবা কল্কের পোড়া তামাকের গুল। আজকালকার টুথপেষ্ট বা সুগন্ধী পাউডার আর সুদৃশ্য ব্রাশ থাকলেও খানিকটা মানিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু আমার মানসী আঙ্গুল দিয়ে দাঁতে ছাই বা গুল ঘসছে,—দৃশ্যটা কল্পনায় এত উৎকট হ'য়ে পড়ল যে কোনমতেই হার্ডল (hurdle) টুকু ডিঙিয়ে এগুতে পারলাম না। সে খাতা অনেক সন্তর্পণে, খোলা বইয়ে গার্জেনদের দৃষ্টি বাঁচিয়েও পরে খাতাটা মুড়ে হোমটাস্‌কের খাতার সঙ্গে মিশিয়েও দিলাম। এরপর ভালো ক'রে ভেবে দেখা যাবে। সে দেখা আর হ'য়ে ওঠেনি। আমার প্রথম নায়িকা ভোরের অস্পষ্ট আলোয় রকের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়েই আছে এখনও।

এরপর একটা বিস্মৃতির কাল গেছে বলা যায়। পরে, সম্ভবত স্কুলে থাকতেই, কি ক'রে "কুন্তলীন পুরস্কারের" একটা বই হাতে এসে পড়তে আবার খেয়ালটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যতদূর মনে পড়ছে; একটা গল্প লিখেফেলেও থাকব। প্রেরণা ঐ রকম একটি মেয়েই, জ্ঞাত কি অজ্ঞাত বলতে পারছিনা। প্রথম গল্পটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট ব'লে ঐটুকু মাত্র

স্পষ্ট হ'য়েই মনে আছে। এই দ্বিতীয়টিতে নায়ক-নায়িকা দু'জনকেই এনে ফেলে নিশ্চয় প্রচুর জটিলতা সৃষ্টি ক'রে থাকব, তাই একেবারেই মনে নেই। গল্পটা হয়তো পাঠানো হয়নি। সময় উৎরে গিয়েছিল কি, অন্য কারণে, তাও মনে নেই।

এ-প্রসঙ্গ আপাততঃ এইখানেই শেষ করি। স্কুলের কথা বলতে বলতে সোজাসুজি রোমান্সে নেমে পড়া বোধ হয় অশাস্ত্রীয়ও হ'চ্ছে।

আমাদের স্কুলটি ছিল সহরের একেবারে বাইরে, যদিও সহর থেকে দূরে নয়। পরিবেশটি বড় মনোরম। বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ, তার মাঝখানে বেশ বড় একটি পুষ্করিণী। তার একটা ধারে—পশ্চিমে, কতকগুলি আম-কাঁঠালের গাছ, বোধ হয় গোটা দুই বাদামের গাছও—সবুজের মাঝখানে তাদের রাঙারাঙা পাতা, একধরণের আভিজাত্য নিয়ে আলাদা হ'য়ে আছে। পুকুরের উত্তর দিকে খানিকটা দূরে রাজের কয়েকটা বাড়ি, অফিসার-আমলাদের জন্য। সব মিলিয়ে একটা বেশ বড় চত্বর ; কিছু গ্রাম্য, কিছু সহুরে।

আমরা যেবার এলাম, একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই "শান্তি-নিকেতন" এর বিরাট চত্বরটার সমস্তটুকু স্কুলের এলাকায় এসে গেল। ঘটনাটা খুবই মর্মন্তুদ, তবে আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়নি ব'লে লাগেনি। আগে স্কুলটা ছিল একটিমাত্র বাড়িতে ; পুকুরটার পশ্চিমে আম্রবীথির পরে। লম্বা একটানা বাড়ি, ওপরে মোটা খড়ের ওপরে খাপড়া বসানো। ঘর ঠাণ্ডা রাখবার জন্য রাজের অনেক বাসাবাড়িও এইভাবে তোয়ের হোত। কিন্তু স্কুল আর থাকবার জন্যে বাসাবাড়ি যে এক নয়, এ দূরদৃষ্টিটুকু যে কেন হয়নি কর্তাদের বলা যায়না।

এনট্রেন্স পরীক্ষার টেস্ট্ হয়ে গেছে। ফেল করার জন্যে কয়েকটি ছেলেকে রুখে দেওয়া হোল, যেমন সব বারেই হ'য়ে আসছে। এবার তাদের মধ্যে ক'জনের মনের আগুন বাইরে এসে পড়ল। এক গভীর রাত্রে দেখা গেল রাজস্কুল দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। শুক্‌নো খড়ের গদির ওপর খাপড়া, কিছুই রক্ষা করা গেলনা।

এরপর যে ব্যাপারটা হোল, সেটাকে রোষানলের অন্য একরূপ বলা যেতে পারে। সেকালের রাজা-মহারাজা মহলে সাধারণ বিশ্বাসের মতো দ্বারভাঙ্গা-দরবারেও ভেতরে একটা বিশ্বাস ছিল যে, স্কুল-কলেজে ইংরাজি শিক্ষায় তালিম পেলেই প্রজারা তাঁদের মুখের অন্ন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। এ মহাসত্যে তালিম তাঁরা ইংরাজ সরকারের কাছেই পান। তবে, তাদের যেমন যুগের দাবিতে একটা কাঠামো বজায় রাখতে হয়েছিল, এঁদেরও তেমনি একটা প্রতীক খাড়া ক'রে রাখা

ভিন্ন উপায় ছিলনা।...রোষাগ্নি বলেছি? দুর্যোগটুকুর মধ্যে সুযোগেরই আনুকূল্য আবিষ্কার ক'রে আরও মুখ ফিরিয়ে নিলেন রাজদরবার, বাহ্যত রোষের একটা অভিনয় ক'রেই নিশ্চয়।

পাকা স্কুলভবন আর হোলই না। সমস্ত চত্বরটার মধ্যে আবার কিছু চালাঘর তুলেই, তার সঙ্গে আমলা-অফিসারদের একটা বাসভবন মিলিয়ে স্কুলটাকে খাড়া ক'রে রাখা হোল। তাই থেকেই পাশ করেছি। তাইতেই গ্রাজুয়েট হ'য়ে শিক্ষকতাও করেছি।

পরে অবশ্য পাকা ঘরও হয়েছে। তাতেও শিক্ষকতা হয়েছে আমার, কিন্তু সে প্রায় বিশ বৎসর পরে। আসবে তার কথা যথাস্থানে।

আমাদের স্কুল, ছাত্র হিসাবে যাকে নিয়ে গর্ব করার কথা, সে যেন ছিল রাজার অবহেলিত-পরিত্যক্ত সন্তান। রাজদরবারের অপরদিকের বিরাট সমারোহ দেখে বলা যেতে পারে ও-অংশটা রাজার সুয়োরাণী সুরুচির সন্তান উত্তম, স্কুলটা হতভাগিনী সুনীতির পুত্র ধ্রুব।

তা, আমাদের পক্ষে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-অনাদরের মধ্যেও অতন্দ্র অনলস তপস্যায় নিরত ধ্রুবই বৈকি সেদিনের রাজস্কুল।

বিচ্ছিন্ন হ'লেও পরিবেশটি আশ্রমোচিতই ছিল। চারটি ব্লকে স্কুল-বাড়ি। অফিস, এক অফিসারের বাড়ি খালি করিয়ে পূর্বদিকে, একেবারে বিচ্ছিন্ন। সেখানেই আর একটা ঘরে ফার্স্ট অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস। বাকি সব পশ্চিমে। ছাড়াছাড়া তিনটি ব্লকে। হাঁটাহাঁটি ক'রে যোগাযোগ করতে ক্লাসের একঘেঁয়েমিটা নষ্ট হোত, শেষ ক্লাস থেকে বেরিয়ে সামনের ক্লাসে পৌঁছাতে খানিকটা সময়ও বের ক'রে নেওয়া যেত গল্পে-গুজবে।

চার বৎসরে অনেক শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করেছি। যাওয়া-আসার মধ্যে—এক বেতনের অল্পতার জন্য—সেকালে এ ব্যাপারটা একটু বেশিই ছিল। তার মধ্যে স্থায়ী কয়েকটা মুখ বেশি ক'রে মনে পড়ে। প্রিয়নাথ সেন, অংকের শিক্ষক। সেকালের আই-এ পাশ বা ফেল, তবে একজন ভালো গ্রাজুয়েটের দক্ষতা রাখতেন। প্রৌঢ়, স্থূলাঙ্গ, অত্যন্ত রাসভারি ফরিদপুরের বঙ্গজ সন্তান। ভারি চাল, হাতে একটা মোটা লাঠি। সেইটে টেবিলের ওপর রেখে গণিত শিক্ষা দিতেন। চার বৎসরের মধ্যে লাঠিটা কখনও ব্যবহার করতে দেখিনি বা শুনিনি; তবে শিবের ত্রিশূল যেমন তাঁর ধ্যানাসনের পাশে পোঁতা থাকাটাই যথেষ্ট, থার্ড মাষ্টার প্রিয়বাবুর লাঠি হাতের কাছে থাকার জন্যেই সেই রকম একটা সভয় সম্ভ্রম জাগিয়ে রাখত।

শোনা যেত ভেতরটা খুব নরম এবং শিক্ষকদের মজলিসে হাস্য-

পরিহাসেও নাকি যোগ দিতেন। বাইরেও। কিন্তু আমি অংকে কাঁচা থাকায় একটু কাছাকাছি হ'য়ে যে তার প্রমান সংগ্রহ করব সে সাহস কখনও হয়নি। আপনা হ'তে যেটুকু এসে পড়েছে তার মধ্যে অবশ্য রূঢ়তার সম্ভাবনা ছিলনা। ওঁর হাতে প্রথম বছর দুই থেকে আমরা এই বিভাগে সেকেণ্ড মাষ্টারের অধীনে চলে যাই।

বাঙ্গালী ছাত্রদের ওপর প্রিয়বাবুর বিশেষ নজর থাকত, বিশেষ করে তাদের চাল-চলনের দিকে। একটু প্রচ্ছন্ন, যেন অপাঙ্গদৃষ্টিতে। ওঁর একটু ভ্রমণের অভ্যাস ছিল, দু-একটি হুঁকার আড্ডায় গল্প-গুজব ক'রে। ঐ লাঠি হাতে। যাতে চোখে না প'ড়ে যেতে হয় সেই চেষ্টাই থাকত বাঙ্গালী ছাত্রদের, তবে পড়েও যেতে হ'ত আকস্মিকভাবে। দেখা হ'লেই ওদিককার ভাষায়—"কিরে, কোজ্জাস্?"

এই ছিলেন আমাদের ছাত্র-জীবনের প্রিয়বাবু। উত্তর জীবনে ওঁকে আমি আর একরূপে পেয়েছি—সে-কথা বলবার অবসর হ'তে পারে।

বাঙ্গালী শিক্ষকদের মধ্যে আর ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ড্রিল, ড্রয়িং আর বাংলার শিক্ষক। বেতের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন, বিশেষ ক'রে ড্রিলের সময় একটু এদিক-ওদিক হ'লে সেটা নিদারুণভাবে সক্রিয় হ'য়ে উঠত। শরৎবাবুকে বেশ কিছুদিন—কয়েক বছরই বাড়িতে আমাদের গার্জেন-টিউটার রূপে পেয়েছি। উত্তর জীবনে, সামাজিক জীবনেরও নানা ক্ষেত্রে। অল্প কৃশ, পেশিবদ্ধ শরীর, বয়সে যত এগিয়ে গেছেন, ওঁর কর্মশক্তি ততই যেন গেছে বেড়ে।

বাঙ্গালী শিক্ষক পঞ্চাননবাবু যাওয়া-আসার তালিকায় সেকেণ্ড মাষ্টার হ'য়ে আসেন আমাদের স্কুলে। আমাদের চাতরার লোক, বাবার বাল্যবন্ধু ব'লেই স্কুলের বাইরেও ওঁর সঙ্গে আমাদের একটা নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়ি। উনি নাকি ছিলেন চাতরার প্রথম গ্র্যাজুয়েট। ওঁর সময় সব সাবজেক্টে ওঁর মতো চৌকস শিক্ষক কেউ ছিলেন না।

আর মনে পড়ে সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত যোগধর মিশ্রকে। খুবই বিচক্ষণ। আমাদের সামনেই এলেন। সদ্য টোল থেকে বেরিয়ে। কতকগুলি গ্রাম্যতা দোষ নিয়ে ইংরাজি স্কুলে প্রথমটা বেশ খাপ খায়নি। তারপর সেগুলা কেটে গিয়ে পাণ্ডিত্যের ঔজ্জ্বল্যেই মনে পড়ে তাঁকে। সংস্কৃতের হেড্ পণ্ডিত, তার সঙ্গে মৈথিল বেশভূষা আর আচার আচরণের জন্য খানিকটা বিশিষ্ট হ'য়েই ছিলেন পণ্ডিত যোগধর মিশ্র।

আর একটি মানুষ এইরকম ভাষা, বেশভূষা আর আচার-ব্যবহারের পার্থক্যের জন্য বিশিষ্ট হ'য়ে ছিলেন। পার্শিয়ানের শিক্ষক মৌলবী

সাহেব। নামটা মনে পড়ছে না; হয়তো জানা ছিলনা। দীর্ঘাকৃতি, ওপরের দিকে ঈষৎ নত দেহ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মুখে দাড়ি, মাথায় বাবরি চুল, প্রায় পায়ের গোছ পর্যন্ত আগাগোড়া আলখাল্লা, (নামটা বোধহয় 'চোগা'), পায়ে নাগরা জুতা—সমস্ত স্কুলটাতেই মোলবী সাহেব এদিক দিয়ে ছিলেন অনন্যই। খুব বেশি পান খেতেন, দাঁত খোঁটবার জন্য বুকের মাঝখানে একটি এক ইঞ্চি পরিমাণ রূপার বাঁকা তলোয়ার ঝোলানো থাকত। বয়সে প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তেই উপনীত ব'লে মনে হোত। একটা মুদ্রাদোষ ছিল, যার জন্যে চোখ আর মুখ, দু'টোই বেশি নাড়তে থাকতেন।

ইনিও ছিলেন অত্যন্ত রাসভারি শিক্ষক। আমাদের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ ছিলনা, তবুও এড়িয়েই চলতাম সাক্ষাৎ যমের মতো। মুসলমান ছাড়া সেকালে কায়স্থ ছাত্ররাও প্রায় সবাই উর্দু,—পার্শিয়ান—পড়ত। জেনারেল ক্লাসে আমাদের সহপাঠীরা সবাই। তাদের কাছে শুনতাম মৌলবী সাহেব নাকি—উর্দু-পার্শিয়ান-আরবী ভাষায় এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বিচক্ষণ মৌলবী ছিলেন। বেত রাখতেন, তবে বেশী ব্যবহার করতেন না বোধহয়। ছাত্রদের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে তিরস্কারের ভাষা ছিল —"অরে আদ্‌মিকা বাচ্চা বয়েল!"—মুসলমানী সহবতের মাত্রাজ্ঞান বলা যায়—অর্থাৎ ছেলের দোষে বাপকে পর্যন্ত টানা কেন? —সেটা হয়তো শুধু "বয়েল" (বলদ) বললে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় কিছুটা এসেই পড়ে। "আদ্‌মিকা বাচ্চা" ব'লে দোষটা কাটিয়ে দেওয়া।

গরীব স্কুলের 'ধ্রুবের-তপস্যার' কথা বলেছি। সেখানে যিনি তাঁর তপোমূর্তিতে আমার মনে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠান ক'রে রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন হেডমাষ্টার ছত্রধারীলাল বাবু। বিহারী কায়স্থ। দীর্ঘচ্ছন্দ দেহ, উন্নত ললাট, আয়ত চক্ষু, প্রতিভায় উজ্জ্বল,—ওঁকে দেখে মনে হোত হেডমাষ্টারি করবার জন্যেই উনি যেন বিধাতার হাতে সৃষ্ট। বেশভূষায় একেবারে নিঁখুৎভাবে পরিচ্ছন্ন। সাদা চাপকান—আগাগোড়া বোতাম আঁটা, আর সাদা পাণ্টালুন প'রে স্কুলে আসতেন, রোজই মনে হোত যেন আজই পাট ভেঙ্গে পরা।

প্রায় দেখা যায় প্রতিভাধরদের এক-একটা বাতিক থেকে যায়। ছত্রধারীলাল ইংরাজী ভাষায় ও সাহিত্যে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন এবং এই সূত্র ধ'রে গ্রামার নিয়ে খুঁৎখুঁতুনিটা প্রায় ভাষার শুচিবাইয়ের পর্যায়ে প'ড়ে যেত। বিশেষ করে আর্টিকল্ এ, এ্যান, দি'র (article a, an, the) যথাযথ ব্যবহার নিয়ে। পড়াতেন, শুধু উঁচু দু'টো ক্লাসে ইংরাজী গদ্য, পদ্য আর গ্রামার। ক্লাসে যখন ঢুকতেন, টেক্‌স্‌ট্ বই ছাড়া, চেম্বার্সের

অভিধান, নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার আর "রোজ হিন্টস্‌" (Rowe's Hints) তাঁর নিত্যসঙ্গী হ'য়ে থাকত। একটু সন্দেহেই হয় নেস্‌ফিল্ড, না হয় Rowe's Hints ; না হয় চেম্বার্স খুলে শব্দের নাড়ি-নক্ষত্র বের করা,—কোন সিলেব্লে (Syllable) ঝোঁক পড়ছে, মূল কোথায়—গ্রীক, না, ল্যাটিন, নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত অস্বস্তি। একটা বাতিকই। এরজন্য পড়া এগুত কম, কোর্সের অনেকখানি বাকিই থেকে যেত। তবু এই যে ধারা, এর মধ্যে একটা সম্ভ্রম-জাগানো ভাব কী ক'রে মিশে যেত। ব্যাপারটা নিয়ে, অর্থাৎ ওঁর এই অতিশয্যকে কেন্দ্র ক'রে কিছু কিছু হাস্য-পরিহাসও যে না হোত এমন নয়—শিক্ষকের খুঁৎধরা ছাত্রের একটা অবসর-বিনোদনের খোরাক, কিন্তু আমার মনে হোত, পরিচ্ছদের ঐ অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে ভাষার ব্যাপারের এই অতিরিক্ত বিশুদ্ধতার কোথায় যেন একটা বেশ সামঞ্জস্য আছে। এর সঙ্গে ছিল বাক্‌ সংযম, যা বলছেন, শুদ্ধ উচ্চারণে যেন ওজন ক'রে বলা—হিন্দি, ইংরাজি—যাই হোক ; ক্লাসেই হোক কিম্বা ক্লাসের বাইরেই বা স্কুলেরও বাইরে আলাপ-পরিচয়েই হোক। সব মিলিয়ে ওঁর ব্যক্তি-স্বরূপটি আরও যেন স্পষ্ট ক'রে দিয়েছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে—একই আধারে এই তিনটির এরকম সমন্বয় না ঘটলে উনি এক একটি গুণে বিশিষ্টই হ'য়ে থাকতেন নিশ্চয়, কিন্তু 'হেডমাষ্টার ছত্রধারী-লাল' হ'তে পারতেন না।

এর চেয়ে যা বড় কথা, যার জন্যে আমার হেডমাষ্টার-ভাগ্যে গৌরব-বোধ করি, তা ছাত্রদের কল্যাণের জন্য ছত্রধারীলালের অন্তরের আকুতি, উদ্বেগ। স্কুলে তো বটেই, স্কুলের বাইরে পর্যন্ত। এ-বিষয়ে আমারজীবনে তিনি যেন ছিলেন সুধীরবাবুর সম্প্রসারণ (Continuation)। তবে, দু'জনের পদ্ধতিতে প্রভেদ ছিল খানিকটা। সুধীরবাবুর ছিল উপদেশে, ভর্ৎসনায়, মিলেমিশে, প্রতিনিয়তই নূতন নূতন আদর্শ সামনে ধ'রে চরিত্রগঠনের প্রত্যক্ষ প্রয়াস। ছত্রধারীলালের ধরণটা ছিল একেবারে অন্যরকম। ক্লাসে টেক্‌স্টবুক্‌ ছেড়ে তাঁকে অন্য দিকে, অন্যপ্রসঙ্গে যেতে দেখাই যেতনা। যেমন ভর্ৎসনাও শুনিনি, উপদেশও দিতে শুনিনি তাঁকে। একটা পুরাদস্তুর হাই স্কুলের হেডমাষ্টারের একটা একাকীত্ব, খানিকটা দূরত্ব থাকেই ; রাজস্কুলের আফিস আর ক্লাসের বিচ্ছিন্নতার জন্য দূরত্বটা বেশিই ছিল, তবু, উনি যে আছেন, অপ্রীতিকর কিছু একটা হ'লে উনি ব্যথিত হবেন, এই নীরব জ্ঞানেই কাজ হোত।

আবার ছিলও বৈকি ওঁর অন্তরের আকুতির বাহ্য প্রকাশ। যতটা মনে পড়ছে আমরা যখন সেকেণ্ড ক্লাসে, কয়েক মাস হোল উঠেছি,

কিশোরী ছিল বিরাটকায়। হাড়কাঠ মোটা, মেদহীন দেহ। এই দেহকাণ্ডটিকে ধ'রে রাখবার জন্যে বিধাতা পুরুষ তার পায়ের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। ফরমাস ছাড়া সাধারণ বাজারে ওর জুতা পাওয়া যেতনা। ফর্মার অভাবে নাগরাই ছিল গতি।

খেলত না। তবে বাইরে কম্পিটিশন হলে মারামারি সামলাবার জন্যে দলের সঙ্গে যেত। একবার শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়ায়। ইস্কুলে পর্যন্ত তদন্তকারীর দল পৌঁছায়। ক্লাসের এককোণে সাধ্যমতো বিরাট বাহুটি সংকুচিত ক'রেই বসেছিল। শেষ পর্যন্ত ওর নাগরা জুতার অকাট্য প্রমাণে সনাক্ত করা হয় ওকে। সংঘর্ষে ওর ভূমিকাটিই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তবে, পালাবার সময় নাগরা পা থেকে খুলে যায়। প্রতিপক্ষ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে। পায়ে-জুতায় মিলিয়ে সনাক্ত করল।

রাজস্কুল আপাতত এইখানেই শেষ করি ছাত্র জীবনের কয়েকটি কথা ব'লে। আবার আসবে। দ্বারভাঙ্গায় দু'টি বিদ্যায়তনের (আমার Alma Mater এর) উত্তর জীবনে সেবা করবার সুযোগ পেয়েছি। এ আমার একটি বড় সৌভাগ্য—রাজস্কুলকে দু'টি বিভিন্ন সময়ে। সহকারী শিক্ষক থেকে হেডমাষ্টাররূপে। বাংলা স্কুলকে নূতন ক'রে গঠন করাতেও আমার কিছু হাত আছে, তারপর আজ পর্যন্ত তার সেবায় নিযুক্ত আছি।

ঠিক কোন্ সময়টা অত সাল তারিখ ধ'রে মনে পড়ছেনা। তবে, আমি যখন বাংলা স্কুলের ওপর দিকে কিম্বা রাজস্কুলে কিছুদিন হোল ঢুকেছি, সেইসময় আমাদের পারিবারিক জীবনে মস্তবড় একটা ওলট-পালট হ'য়ে গেল। যেটাকে আমাদের পরিবারিক ইতিহাসে আমাদের পিতামহ মধুসূদনের যুগের অবসান বললেও ভুল বলা হয়না।

পূর্বে কোথাও বলে থাকব, জার্মনীতে Synthetic Indigo অর্থাৎ রাসায়নিক 'নীল' বের হওয়ার পর ভারতের উদ্ভিজ্জ নীলের বাজার নষ্ট হ'য়ে যায়। নীলকরেরা ধীরে ধীরে আখ, গম প্রভৃতি চাষের দিকে চলে যায়। এর সঙ্গে জমিদারী মিলিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সুবিধা করতে পারছিল না। বেচেবুচে দিয়ে একটার পর একটা কোম্পানি পাত্তাড়ি গুটিয়ে দেশে চ'লে যাচ্ছিল।—পাণ্ডুলের সমস্ত সম্পত্তি দ্বারভাঙ্গার মহারাজ কিনে নিলেন।

পরিচালনার ব্যবস্থা, অবশ্য, যা ছিল তাই রইল। সেই বড় সাহেব, ছোট সাহেব, সেই বাঙ্গালী-বিহারী মিলিয়ে আমলা-গোষ্ঠী।

চলছিল একরকম ক'রে, বোধহয় জ্যাঠামশাই-বাবার সময়টা কেটে যেত, কিন্তু একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারে হঠাৎ ছেদ প'ড়ে গেল।

এইসময় Asstt. Manager বা ছোট সাহেবরূপে একটি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ইংরাজ অফিসে এসে কার্যভার নিল। রক্ত গরম, পরিবর্তিত অবস্থার বিশেষ খোঁজ রাখেনা বা আমলই দিতে চায়না তাকে—তার প্রধান উদ্দেশ্য রইল নীলকুঠির পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনা।

খিটিমিটি লাগতে শুরু হোল ওপরের দিকের আমলাদের সঙ্গে; জ্যাঠামশাই, বাবা, ফার্সি সেরেস্তার মুখ্য বাবু কুলদীপ প্রসাদ, যাঁরা নূতন পুরাতনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চালিয়ে আসছেন। ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপার হয়েছে; জ্যাঠামশাইয়ের বড়ছেলে, আমাদের বড়দাদা জগদানন্দ চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। সে-যুগের স্বাস্থ্যচর্চা সবারই অভ্যাস ছিল—ডন্ বৈঠ্কী, মুগুর ভাঁজা; জগদানন্দের এর ওপর ছিল দ্বারভাঙ্গায় স্কুলের ছাত্রাবস্থায় রাজার পালোয়ানদের আখড়ায় কুস্তিতে তালিম নেওয়া শরীর। খিটিমিটি যা চলছিল তাতে তাজা বিলিতি রক্তের সঙ্গে তাজা দেশী রক্তের গরমিলটা থেকে থেকে বেশি স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল।

বড় সাহেব অভিজ্ঞ লোক, নেপথ্যে ছোটকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা রেখে যেতে লাগলেন বটে, তবুও টানটা তো ওদিকেই থাকবে। একদিন ছোটসাহেবেরই চক্রান্তে, তার ওপর উভয় পক্ষেরই কতকটা ভুল বোঝাবুঝিতে ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে এমন চরমে উঠে গেল যে আর সামলানো গেল না। ঘটনাটা ঘটে বড় সাহেবের ঘরে। পাশেই আমলাদের হলে বাবা আর বড়দাদা কাজ করছিলেন, সাহেবের একটা অন্যায় দোষারোপে জ্যাঠামশাই সংযতকণ্ঠেই প্রতিবাদ করতেই সাহেব "হাউ ডেয়ার ইউ!" (How dare you!) ব'লে এমন হুংকার ক'রে উঠলেন যে বাবা আর বড়দাদা হলঘর থেকে এলেন বেরিয়ে। বড়দাদার হাতের আস্তিন অভ্যাসবশেই গোটানো থাকত। বাবা লেজারে রুল টানছিলেন, সেটা হাতেই ছিল, দু'টিই আকস্মিক অনভিলষিত, সাহেব কিন্তু "লে আও হামারা বন্দুক!" বলে আরদালিকে হাঁক দিয়ে উঠল। এর পর আর, জ্ঞান থাকেনা,—"লে আও তোম্‌হারা বন্দুক।" —ব'লে দু'জনেই পা বাড়াতে, সাহেব অফিসের পাশেই বাংলোতে ঢুকে প'ড়ে কপাট বন্ধ ক'রে দিল।

নীলকুঠি তখন দ্বারভাঙ্গার মহারাজের হাতে। জিরাত আর জমিদারি

হিসাবে কিনে নিয়েছেন। এঁরা রাজদরবারে বিচারপ্রার্থী হলেন। কেস্‌টা পরিষ্কারই। শোনা যায় মহারাজা নাকি এঁদের নির্দোষিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহও হয়েছিলেন, কিন্তু লালমুখের বিরুদ্ধে রায় দিতে তখনকার রাজা জমিদারেরা একরকম অক্ষম ছিলেনই বলা যায়।

এদিকে "স্বদেশী যুগ" একেবারে মধ্যাহ্ন গগনে না হ'লেও অনেক খানিই তো ঊর্ধ্বে।

বিকল্প কোনও চাকরিও পেলেন না এঁরা। তিন পুরুষের বাসে অনেকখানি গোড়া নেমে গিয়েছিল পাণ্ডুলে, একপ্রকার ছিন্নমূল হ'য়েই চলে আসতে হোল দুটি পরিবারকে। দুঃখের মধ্যেও বিধাতার আশীর্বাদ থাকে। সুখে-দুঃখে পাশাপাশি থেকে যেমন সবাই এক পরিবারের মতোই কাটিয়ে এসেছিলেন, দ্বারভাঙ্গাতেও তেমনি এক হ'য়ে রইলেন, যেটার প্রয়োজন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আরও বেশিই হ'য়ে পড়েছিল।

পরিস্থিতির গুরুত্বটা উপলব্ধি করবার বয়স নয় আমাদের, আমরা যা পেলাম তা ভালোই তো। আমরা অর্থে, আমরা দুই ভাই যারা দ্বারভাঙ্গায় থেকে পড়াশোনা করছিলাম। প্রথমত ছুটি ছাটা ছাড়া পাণ্ডুলে যাওয়া বন্ধ থাকায় পাণ্ডুলের সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ কমেই এসেছিল, সহুরে হ'য়ে গিয়ে পাণ্ডুলের সবাইকে—বড় থেকে নিয়ে ছোট পর্যন্ত বোধহয়, করুণার দৃষ্টিতেই দেখতে আরম্ভ করেছিলাম, এমন সময় পরিবর্তনটা এসে পড়ল। ভালোর দিকের পাল্লায় আরও একটা খুব বড় লাভ—কাকাজী, কাকীমা ওঁদের শিশুকন্যা দুর্গা আর আমরা দু'ভাই—এই নিয়ে ছিল দ্বারভাঙ্গার সংসার, ক্ষীণস্রোতা নদীটির মতো; হঠাৎ একদিনে যেন কোটালের বাণ ঢুকে কানায় কানায় ভ'রে উঠল।

সে-দিনকার ভেতরের উল্লাসের কথা বেশ মনে আছে ; বিশেষ ক'রে বড়দের সবার শুক্‌ন মুখের সামনে সে-উল্লাসকে চেপে রাখবার অমানুষিক চেষ্টার জন্য। ...দু' একবার বেরিও পড়ল উল্লাস—"উঃ, ইন্দুটা কি সুন্দর হয়েছে মা !! কতদিন থেকে যে ঠাকুরকে বলছি—হে ঠাকুর, সবাইকে আনিয়ে দাও, আনিয়ে দাও,...না দাদা ?" ঠাকুরমা বললেন—"তা, এই ক'রেই কি আনাতে হয় দাদু? তাঁর অন্য উপায় ছিলনা ?"

আঁচল তুলে চোখে চাপলেন।

হ'য়ে যেতে লাগল এই রকম। যেন লুকিয়ে লুকিয়ে, বাঁচিয়ে, বাঁচিয়ে চলা, সবার মুখের দিকে নজর রেখে।

তবে, এ-ভাবটা বেশিদিন রইল না। হয়তো একেবারে বড়দের মধ্যে

—বাবা, কাকাজী, ঠাকুরমা—খানিকটা রইল আটকে, তবে আর সবার মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে সরেই গেল—সব শেষে হলেও, ঠাকুরমারও।

তার একটা কারণ, নিজের যারা তাদের সবাইকে একসঙ্গে পাওয়া, আর দ্বিতীয় কারণ, বিশেষ করে মেয়েদের দিকে—দ্বারভাঙ্গার জীবনের মুক্তি, প্রসার।

একদিন ছোট্ট একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেল এটা, ওঁদের আসার কয়েকদিন পরেই।

কি একটা দরকারে মাকে খুঁজতে খুঁজতে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি মা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। চৌকাটের বাইরে থেকেই ডাকতে বললেন—"দাঁড়া, আসছি।"

কিছু দ্রষ্টব্য আছে মনে ক'রে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটু বিস্মৃত হ'য়েই প্রশ্ন করলাম—"কি দেখছ, কিছুই তো নেই।"

—দুটো এক্কা, একটা খালি, একটাতে সওয়ারি...দু'জন লোক কি কথাবার্তা কইতে কইতে চলেছে। ...উল্টো দিক থেকে দু'জন স্কুলের ছাত্র...একটা ফেরিওয়ালা ছেলেদের চিনির খাবার 'গুলাবছড়ি'-হাঁকতে হাঁকতে চলেছে...

আমার কথায় ঘুরে চেয়ে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে গিয়েই বললেন—"দ্যুৎ, দেখব আর কি?....এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

তারপর যেন নিজের দুর্বলতাটুকু সামলে নেওয়ার জন্যে বললেন, "তা, যে যাই মনে করুক বাপু, গুণ্ডো সাহেবটা এসে একরকম ভালোই হয়েছে। পাণ্ডুলের সেই অষ্টপ্রহর ঘেরাটোপ, বাইরের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই!...হ্যাঁ, বল কি বলছিলি।"

তখন দ্বারভাঙ্গার পর্দাও এতটা মুক্ত হয় নি। আমাদের রাস্তার দিকের ঘরে দু'টো ক'রে জানালা, এক হাত লম্বা, পৌণে এক হাত চওড়া, চারটে ক'রে লোহার শিক, বুক প্রমাণ উঁচুতে বসানো। পাণ্ডুলে ভেতরে ছিল ঐ পরিমাণ বাঁশের বাতার জাফরি, বাইরের দিকে কলসীর গলা বসানো দু'তিনটে ঘুলঘুলি।

আরও এল। এখানকার কাছাকাছি বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে পরিচয়, হৃদ্যতা। মেয়েরা বেড়াতে আসেন। একটি বড় পরিবার, বর্দ্ধিষ্ণুও। মেয়েরা তখনকার হিসাবে একটু বেশিই প্রগতিশীল। প্রায়ই আসেন কেউ-না-কেউ, কখনও সকলেই। বৃহৎ পরিবার, সবাই সবার বয়সমতো সঙ্গিনীও পেয়ে গেছেন। ঠাকুরমা, ওদিককার কর্ত্রীকে; মা ওদিককার কন্যা-বধূকে, পিসিমা, খুড়িমাও। খুড়িমার পরিচয়ই ছিল, কিন্তু একা মানুষ ব'লে অন্তরঙ্গতার সুযোগ হয়নি এতদিন।

অবশ্য বাইরে যেতে এঁদের এখনও পা ওঠেনা—এক ঠাকুরমা ছাড়া ; তবে, ওঁদের কালীপূজা হয়, সেই উপলক্ষে একদিন বাড়িশুদ্ধ সবাই নিমন্ত্রণে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ ক'রে এলেন। এখানকার বারোয়ারি কালীপূজায় থিয়েটার হয়। এবার আর হোলনা, আসছে বারের আশা রইল।

পাণ্ডুলে জীবনভোরই আশা ক'রে থাকবার কিছু ছিল না।

কাকাজী ছিলেন যাকে বলা যায় খানিকটা গৃহাশ্রয়ী। বাবার কিন্তু সামাজিক মন ছিল। তাঁর স্তরেও আলাপ-পরিচয়, মেলামেশা ইত্যাদিতে বেশ খানিকটা ছড়িয়ে পড়লেন তিনি। আমাদের পরিবার দ্বারভাঙ্গার জীবনে বেশ একটা জায়গা ক'রে নিল।

পাণ্ডুল আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু পাণ্ডুল যে পাণ্ডুলই, ঠাকুরদাদা এসে সেখানেই যে লক্ষ্মীর ঝাঁপি বসিয়েছিলেন; এ সত্যটা অন্য পথে এসে পাণ্ডুলের স্মৃতি আবার জাগিয়ে তুলতেও দেরি করল না। বাবার সময়ে তার সে মর্যাদা না থাকলেও কী না করেছে পাণ্ডুল ? ঠাকুরদাদার হঠাৎ মৃত্যুতে বিদেশে একা প'ড়ে গিয়ে দিনকতক দিশেহারা হয়েছিলেন বাবা, তারপর ধীরে ধীরে ক্ষেতখামার বাড়িয়ে, কুঠির জমি ইজারা নিয়ে, কুঠিকে আশ্রয় ক'রে, আরও নানা প্রকারে আয় বাড়িয়ে একজন সম্পন্ন গৃহস্থ হিসাবেই কাটিয়ে এসেছেন পাণ্ডুলে। তিনটি বোনের বিবাহ দিয়েছেন, কাকাজী যখন কর্মহীন—দীর্ঘদিন ধ'রেই, তাঁর পরিবারকে পুষেছেন, আমাদের দেশে রেখে পড়িয়েছেন, দ্বারভাঙ্গা সহরের মাঝখানে বাড়ি করেছেন—সবকিছু তো ঐ পাণ্ডুল হ'তেই।

ফসল তোলবার সময় থেকেই অভাবটা অনুভূত হ'তে লাগল। আগে নিজেদের জমি আর কুঠির কাছ থেকে ইজারা-নেওয়া জমি মিলিয়ে যে ফসলটা হোত, নিজেদের সোঁৎ-বছরের জন্য রেখে, বাকিটা বিক্রয় ক'রে বেশ একটা মোটা আমদানি ছিল।

এবার থেকে মাত্র নিজেদের ক' বিঘা জমি থেকে যা পাওয়া গেল তাতে সহরে একটি বড় পরিবারের পক্ষে বছর চালানই দুষ্কর, নগদ আমদানি তো দূরের কথা। গরু-মোষ যা ছিল পাণ্ডুলেই রেখে আসতে হয়, মাত্র একটি বাদে, শিশুদের দুধের জন্য। নিজেদের কিনে খাওয়া। ঘি সেখানে সস্তা, খানিকটা গরু জোগাত, তাও গেল। কিনে খাও, যতটুকু পার। সহরের সমাজে কিছু লোক-লৌকিকতাও রাখতে হয়।

ঠাকুরমা পাকা গৃহিণী, পোড়-খাওয়া। ঠাকুরদাদা মারা যেতে একটা কঠিন অভিজ্ঞতা গেছে, কষ্টে সৃষ্টে মান বজায় রেখে চালিয়ে যেতে

লাগলেন। কিন্তু আর যেন পারা যায় না। যে ভবিষ্যৎটা এগিয়ে আসছে—অনতিদূরেই—তাতে দারিদ্র্যের করাল মূর্তিটা খুবই স্পষ্ট... এরপর কী হবে !

আমরা অবশ্য অতটা বুঝিনা, বা, বুঝতে না দেওয়ার ফন্দি-ফিকির বাবা, কাকাজী, ঠাকুরমা, সবারই বেশ ভালো রকমই জানা ছিল, তবুও তো কিছুটা টের পাচ্ছি খাওয়া-পরার মধ্যে দিয়ে, সবার মুখের অন্ধকার কিছুটা ছায়াপাত করছেই আমাদের মুখে।

এই সময়ের একটি কথা মনে প'ড়ে যায় মাঝে মাঝে, সে-সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গেলেই। হাসব কি কাঁদব ভেবে পাইনা। কথাটা অন্য কোন বইয়ে বলেও থাকব। তবু, এখানে তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছিনা। আমার খেলাধূলার দিকে মনটা বেশি থাকত ব'লে ওরই মধ্যে বেশ খানিকটা এসব বিষয়ে নির্বিকার থাকতাম। কিন্তু দাদার দৃষ্টিটা খুব তীক্ষ্ণ ছিল ; হয়তো বড় ছেলেররা কম বয়সেই বড় হ'য়ে ওঠার শক্তি নিয়ে জন্মায়। একদিন—সেদিন বোধহয় অনটনের ভাবটা একটু বেশী রকমও ছিল—সন্ধ্যাবেলায় দাদা আমায় নালাটা পেরিয়ে ওদিকে নিয়ে গিয়ে বললেন—"হ্যাঁরে বিভূতি, আজকাল তোর কষ্ট হয় ?

প্রশ্ন করলাম—"কিসের ?"

দাদা যেন একটু থতমত খেয়ে গিয়েই ঘুরিয়ে নিলেন কথাটা। বললেন—"হচ্ছে কষ্ট, আমাদের সব্বারই। দেখনা, পাণ্ডুল থেকে বোরা বোরা বাস্‌মতী চাল আসত, টিন ভরে ঘি আসত, তেল আসত, টিন ভরে ভরে আখের গুড় আসত, আর তো আসছেনা।"...

আমায় বিমূঢ়ভাবে নিরুত্তর চেয়ে থাকতে দেখে আবার ঘুরিয়ে নিলেন কথাটা। আমার বুকে হাত দিয়ে বললেন—"হচ্ছে কষ্ট তাতে। ...আমাদের দু'-জনেরই বোঝবার বয়স হয়েছে যে, তুই আমার চেয়ে আর কত ছোট ?—মাত্র দু'-বছরের। তাই বলছিলাম, তুই খেতে ব'সে মার কাছ থেকে কিছু চাস্‌নি অমন ক'রে।" "চাইনি তো !"—আমি মনে করবার চেষ্টা ক'রে চোখ তুললাম, বললাম "শুধু তেঁতুল গোলাটা চেয়েছিলাম, বেশ হয়েছিল। মা তো দিলেন ও।" "পরে দুধও চেয়েছিলি আর একটু। মা বললেন না—বেড়ালে উল্টে দিয়ে গেছে ? শুধু খোকার জন্যে একটু প'ড়ে আছে। মা ওটা মিথ্যে ক'রে বললেন।"

দিন পাঁচ-ছয় পরে, হঠাৎ একদিন মার মুখেও ঠিক এই ধরণের কথা। বাড়িতে সেদিন কি একটা পূজা ছিল—ছোট-খাট কোন ব্রত নিয়ে, যাতে অল্প ক'রে ভোগেরও ব্যবস্থা হয়।

স্কুলের জন্যে পিঠে-পায়সটা খেয়ে যাওয়ার সময় পাইনি আমরা। দাদার হ'য়ে গেছে, মা আর একটু ক'রে দিতে চাইলেও না নিয়ে উঠে গেলেন, মা বললেন—"তোকে আর একটু দিই ভূতন্—তুই বোস।"

পেটুক ব'লে আমার একটু বদনাম ছিল, হজমও করতে পারতাম।

কোলের শিশু অবনীকে নিয়ে আসনপিঁড়ি হ'য়ে ব'সে খাওয়াচ্ছিলেন, এক সময় বললেন—"তোদের আজকাল বেশ কষ্ট হচ্ছে, নারে ভূতন্?"

একটা ভাপাপুলি দাঁতে কেটে নিয়ে চিবুতে চিবুতে প্রশ্ন করলাম—"কেন?"

"এই খাওয়া পরা তেমন হচ্ছে না—পাণ্ডুলে থাকতে যেমন হোত।"

একটু যাকে বলা যায় 'হাঁদাও' ছিলাম। সেদিনকার দুধ চাওয়ার ভুলের কথাটা প্রায় ভুলতেই যাচ্ছিলাম, ভুলের সান্ত্বনা দেওয়া হিসাবে। হঠাৎ আর একটা কথা—যা আজকাল মাঝে মাঝে মনে হোত, মনে পড়ে গিয়ে চিবুনো থামিয়ে বললাম—"আমার কী মনে হয় তোমায় বলব মা?"

"বল্না।...যদি কিছু খেতে-টেতে ইচ্ছে হয়তো, বলবিও; দেখব।"

"দ্যুৎ করেই না ইচ্ছে।...আমার মনে হয় আসছে জন্মে খুব গরিবের ঘরে জন্মাই, একেবারে গোড়া থেকে—বাবা মা তোমরাই থাকবে। তারপর..."

বলতে বলতে মার গলাটা ধ'রেই আসছিল, চোখ বড় বড় ক'রে শুনতে শুনতে একেবারে খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন, বললেন ...

"কী সাধ রে বাবা! আমরা ভেবে সারা, কিসে ভাল থাকবে, ও এদিকে..."

আজকাল জিনিসটা বুঝি। যাকে বলা যায় দারিদ্র্য-বিলাসিতা যাতে অভাবের মধ্যেও একধরণের সান্ত্বনা পাওয়া যায়, তৃপ্তিও বলা চলে। ঠিক তাই যদি নাও হয় তো অন্তত ভগবানের একটা আশীর্ব্বাদ ছিল আমাদের ওপর—যার একটা মুখ যেমন ছিল আমাদের দিকে, আর একটা মুখ তেমনি ছিল বাবা-মার-দিকেও। বয়স বাড়ছে, অভাবের তাড়নায় বাড়িয়েও দিচ্ছে বয়সটা—বুঝতে পারছি। পাণ্ডুলের একাকীত্ব নয়, এখানে সমাজের মধ্যে থেকে প্রভেদটা আরও স্পষ্ট, আরও রূঢ় হ'য়ে উঠছে—তবে, নিজেদের কথা না ভেবে ওঁদের শুক্নো মুখের দিকেই দৃষ্টিটা বেশি ক'রে গিয়ে পড়ে। খুঁজে খুঁজে। সন্তর্পণেই, খোঁজার চোখ আবার ওঁদের কাছে না ধরা প'ড়ে যায়।

দাদার দৃষ্টিই বেশি সূক্ষ্ম। তাই থেকে, আমার। মাঝে মাঝে বলতেনও দাদা—"আমাদের কষ্টতেই ওঁদের কষ্ট বিভূতি, তবে, টের

পেতেই দোবনা আমরা···চাস্না তো আর কিছু তুই ?”—ওই ধরণের কথা সব।

গয়নায় হাত পড়ল। মার অল্পই ছিল, গয়না করবার অবসর কমই পেয়েছিলেন বাবা, ঠাকুরমা কয়েকটা বের ক'রে দিলেন। একটা বিশেষ চেষ্টা, প্রায় মরিয়া হয়েই। ব্যবসা ক'রে দেখতে হবে। বাঙ্গালীদের মধ্যে শিববাবু ছিলেন ভাল কোল্ মার্চেন্ট (Coal Merchant)। তাঁর পরামর্শে এবং সাহায্যে কয়লার ব্যবসায় নামলেন বাবা। প্রথম দিকটা বেশ চলল একরকম। সংসারে কতকটা স্বচ্ছলতা, শ্রী ফিরে এল। দাদার উপনয়ন দিয়ে দিলেন এই সময়টা। দাদা পরীক্ষার পড়া পড়ছেন, সেও একটা ভরসাই। কতকটা সাধ মিটিয়ে একটু ভালো ক'রেই করা হোল কাজটা। দুই মামা এলেন। তিনজন পিসিমাকেও আনানো হোল। মনে হোল সময়টা যেন ফিরছে।

সাতটি ছেলের পর একটি কন্যা এল। নাকি এও একটা শুভ লক্ষণই।

আর একটা শুভ লক্ষণ, যা অনুমানের অপেক্ষা রাখেনা, পরন্তু প্রত্যক্ষ সত্য—তাও কাছাকাছি এই সময়েই আত্মপ্রকাশ করল; চণ্ডীচরণ বাইরে একটা চাকরি পেয়ে গেলেন। সময় তাহলে ফিরছেই।

ভবিষ্যতের সেই কল্পিত রূপের ভরসায় আর একটা বহুদিনের সাধ মিটিয়ে নিলেন মা। মাস কয়েকের জন্যে একবার বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এলেন। বারো বছর পরে। ওদিকেও অনেক পরিবর্তন হ'য়ে গেছে এর মধ্যে। তিন মামাই চটকলে চাকরি পেয়ে শিবপুরে বাসা করেছেন। বাপেরবাড়ি কিছুদিন কাটিয়ে মা শিবপুরে এসে রইলেন। অভাবের সংসারে অদৃষ্টের আবার একটা অন্যবিধ পরিহাস আছে। যাদের মুখে অন্ন দেওয়ার জন্যই সংসার করা, ক'টি মুখে তারা যে অন্ন গ্রহণ করছে তার হিসাবটাও রাখতে হয় গুণে গুণে। আমাদের প্রথম তিনটি ভাইকে দ্বারভাঙ্গায় ছেড়ে, ভাই-বোনে বাকি ক'টিকে নিয়ে মা বাপেরবাড়ি গেলেন। অবশ্য অন্নের মুখ কমাবার জন্যেই নয়, এখানে সামলাবার লোকেরই অভাব, তবু গুছিয়ে নেওয়ার এই সময়টা ওঁর আর সবাইকে নিয়ে ওদিকে থাকবার খানিকটা সুবিধা হোলই।

ভালোই চলছে সময়টা।

দাদার পাস দেওয়ার বছর। সময়টা কাছাকাছি এগিয়ে আসতে মা চ'লে এলেন।

দাদার পরীক্ষা হ'য়ে গেল। যথা সময়ে, বোধহয় মাস দু'য়েকের মধ্যেই পাসের খবরটা বেরুল।

বেশ মনে আছে সে দিনের কথা। এদিকে বছরখানেক ধ'রে মোটামুটি

একটা যে সুসময় চ'লে আসছিল, এই ঘটনাটি ছিল যেন তার চূড়ান্ত। আজকালকার কোন পরিবারে অনুরূপ ঘটনার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। কেন, তাও ব'লে দিতে হয় একটু।

পাস করা তখন ছিল এক দুর্লভ বস্তু। বি-এ, এম-এর কথা থাক, এটট্রেন্‌স্ কি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করা একটা ছেলে ছিল নিতান্তই দ্রষ্টব্য জীব। হওয়ার কথাই। এত বড় সহরটায়—যেখানে আজ বারো-চোদ্দটা স্কুল, পাঁচ-ছ'টা কলেজ, ছাত্র ছাত্রীতেও গাদাগাদি, সেখানে তখন মাত্র একটি স্কুল,—সবে ধন নীলমনি এই রাজ স্কুল। ছাঁকতে ছাঁকতে ক্লাসে পনের ষোলটিতে দাঁড়াত কি না-দাঁড়াত। টেষ্টে যদি দশটিও গেল তো হেড্-মাষ্টার খুব সদাশয়। সাতটি আটটিও পাস করলে সে-স্কুলের জয়জয়কার।

আজকাল—সহরের রাস্তায় একটা লাঠি ঘোরালে গোটা কয়েক এম-এ মারা পড়ে, সে সময়ের কথা বুঝতে গেলে যথেষ্ট কল্পনা শক্তির প্রয়োজন।

সে সময়ের একটি দৃশ্য মনে প'ড়ে যাচ্ছে, কল্পনায় কিছুটা সুরাহা হ'তে পারে, তাই ধ'রে দিলাম এখানে।

কোল-মার্চেন্ট শিববাবুর কথা বলেছি। বড় মেয়ের বিবাহ দিচ্ছেন, কলকাতার ছেলে, এনট্রেন্‌স্ পাস, প্রথম বিভাগে। বেশ সাড়া প'ড়ে গেছে। অন্তত আমাদের মহলে তো নিশ্চয়ই। বরযাত্রীরা এসে উঠেছে আমাদের বাংলা স্কুলে। দেখতে গেছি আমরা ক'জন মিলে। বয়স কম, বাংলা স্কুলেই আছি, বা সদ্য রাজ স্কুলে গেছি, কয়েকটা কারণেই সেই দেখার কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে, অনেক পরে আরও একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে প'ড়ে যায়, প্রথম যেদিন কলকাতার 'জু' তে গিয়ে সিংহ দেখি।

বেশ সম্ভ্রম, সংকোচ এবং খানিকটা যেন ভয়ের সঙ্গেও গেছি। এন্‌ট্রেন্‌স্ পাস ফার্ষ্ট্ ডিভিশনে! ···শিববাবু ব'লেই পেরেছেন। বর আরও দু'একজন সমবয়সীর সঙ্গে স্কুলের রাস্তার ধারে সেকেণ্ড মাষ্টারের ঘরেই বসেছিল। রাস্তার ধারের জানালার শার্সি। ক'বার এগিয়ে, ক'বার পেছিয়ে, পরস্পরকে ঠেলে সাহস সঞ্চয় ক'রে আমরা শার্সিতে নাক চেপে দাঁড়ালাম।

ওরা গল্প করছিল ব'লে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম ফার্ষ্ট্ ডিভিসনে পাস করা বরকে। বেশ সুপুরুষও। শেষে বরই ঘুরে বলল—"ও, তোমরা বর দেখতে এসেছ বুঝি?···তা, কোন্‌টে বর ব'লে মনে হয় বলতো? কনে কোন্‌টিকে পছন্দ করবে?"

সিংহ গর্জন না ক'রে রসিকতাই করল, আমরা কিন্তু ঠেলাঠেলি ক'রে পৃষ্ঠভঙ্গই দিলাম—অচিরাৎ।

আজ বিশ্বাস করা শক্তই হবে।

দাদার বেলা, সেই প্রথম এনট্রেন্স থেকে সিলেবাস আমূল বদলে ম্যাট্রিকুলেশনের প্রবর্তন। বাঙ্গালীর ছেলের মধ্যে বোধহয় ওঁরা মাত্র দু'জনই পাস করেন। আরও বিশিষ্ট হ'য়ে উঠল ঘটনাটুকু।

এরপর আসে কলেজে পড়াবার কথা। তখন দ্বারভাঙ্গায় কলেজের কথা কেউ চিন্তাও করছে না। পাটনা কিম্বা মঝঃফরপুর।

যে কোন স্থানেই হোক, হোষ্টেলে রেখে পড়াবার ঝুঁকি নেওয়া বিবেচনা-সিদ্ধ মনে হোল না কারুর। দাদা একা নয়, আমরা চারটি ভাই এদিকে স্কুলে পড়ছি, তার মধ্যে একেবারে দাদার পিঠোপিঠি আমি রয়েছি। হয়তো শুরু ক'রে দেওয়া যায় কপাল ঠুকে, কিন্তু এই সময় কয়লার ব্যবসাটা মন্দা হ'য়ে পড়তে সাহস হোলনা।

এই সমস্যার মধ্যে আমরা এমন দু'টি সহায় পেয়ে গেলাম যা দৈবানুগ্রহ ভিন্ন হয়না।

মেজদাদা গোষ্ঠবিহারী দাদার দু'বছর আগেই পাটনায় গিয়ে পাটনার অন্যতম কলেজ বি-এন্ কলেজে পড়া সুরু করেছেন। হোস্টেলে থেকেই। ওঁদের হোস্টেল-সুপার ছিলেন বাবু পরমেশ্বর প্রসাদ বর্মা, হিস্ট্রির প্রফেসর। অতি অমায়িক প্রকৃতির মানুষ। মেজদাদার প্রতি বিশেষ স্নেহশীল এবং ছুটি-ছাটায় কয়েকবার দ্বারভাঙ্গায় ওঁদের বাড়ি আসায় আমাদের সবার ওপরেই স্নেহদৃষ্টি এসে পড়ে।

তাঁরই মধ্যস্থতায় একটা সুরাহা হ'য়ে গেল। পাটনার অন্যতম বিখ্যাত এড্ভোকেট শরদিন্দু গুপ্তর বাড়িতে দু'টি ছেলেমেয়ের গৃহশিক্ষক হিসাবে দাদার থাকবার ব্যবস্থা হোল। শরদিন্দু বাবুর মাতার নাম স্বর্ণময়ী, সেই অনুযায়ী বাড়িটির নাম স্বর্ণাসন। এখনও এইনামে পাটনায় সুপরিচিত। সে কালের সম্পন্ন বাঙ্গালী-পরিবারের মতো বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। স্বর্ণাসনের আর একটা দিক ছিল—একটা পারিবারিক ঐতিহ্যই বলা যায়। এর কয়েক বৎসর আগে বিদ্যাসাগর-জীবনী-প্রণেতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কি কারণে, ঠিক মনে পড়ছে না, বাড়ি থেকে সরে এসে স্বর্ণাসনেই লেখাপড়া করেন এবং শেষে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে বহুদিনই স্বর্ণাসন-পরিবারভুক্ত হ'য়ে থাকেন। ঠিক ঐ ধরণের না হ'লেও অনেকটা অনুরূপ ব্যাপারই আমাদের ক্ষেত্রেও হ'য়ে দাঁড়াল। এইটুকু সম্বন্ধ নিতান্ত আকস্মিকভাবে স্থাপিত হওয়ার পর আমরা একে একে চারভাই ওখানে থেকেই আংশিকভাবে কলেজ জীবন

কাটিয়েছি। পরে যখন অর্থ-সঙ্গতির প্রশ্ন ছিলনা, তখনও আমরা পাস ক'রে 'স্বর্ণাসনেই' গিয়ে উঠেছি। মেয়ে পুরুষ সবার দিক থেকেই এমন একটা মমত্ববোধ, আপন ক'রে নেওয়ার সহজ প্রবণতা ছিল যে—'স্বর্ণাসন' ছেড়ে আমরা অন্যত্র গিয়ে উঠবো, এ প্রশ্নই উঠতনা কারুর মনে। পড়ানর ব্যাপারটাও অনেকটা শিথিলই ছিল। যখন আমাদের সামনে পরীক্ষা বা ফুটবল কম্পিটিসনের অগ্নিপরীক্ষা চলছে, ওঁদের ছেলেরাই সামলে নিত। বড় পড়িবার, সবাই আমরা নিজের নিজের বয়সের বন্ধু একরকম পেয়ে গেছি। আমাদের জীবনে স্বর্ণাসনের ভূমিকা অল্প কথায় ব'লে শেষ করা যায় না।

পাটনায় আমার নিজের তুই বৎসরব্যাপী কলেজ জীবন প্রসঙ্গে আবার কিছু এসে পড়বে স্বর্ণাসনের কথা।

দাদা গিয়ে স্বর্ণাসনে উঠলেন।

সুরাহাটুকু হ'তে বাবা সাহসে ভর ক'রে দাদার পড়বার ছকটাও বদলে ফেললেন। সাধারণ কলেজেই আই-এ পড়বার কথা ছিল, দাদাকে ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি ক'রে দিলেন। মাইনে যন্ত্রপাতিতে খরচ আছে কিছু বেশি। যদি তেমন দেখেন তো সাব্‌ওভারসিয়ারির কোর্স শেষ করিয়ে বের ক'রে আনবেন। সাধারণ লাইনের চেয়ে সে-দিকেও রোজগারের পথ প্রশস্ত।

দাদাকে নিয়ে নূতন আশা, পাশে আমিও এসে দাঁড়িয়েছি, সামনের বছর পাস দোব; কখনও আলো একটু উজ্জ্বল, কখনও অন্ধকারই একটু নিবিড়—এরই মধ্যে দিয়ে প্রায় একটা বছর কেটে গেল। তারপর অন্ধকারটা আবার আরও ঘন হ'য়ে একরকম হঠাৎ পড়ল এসে। এবার যেন আরও চারিদিক থেকে ঘিরে। কয়লার ব্যবসায় মন্দা পড়েই ছিল এদিকে, একেবারে শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছাল। দাদার দিকে বেশ খরচ, ওটা ভুলই হ'ল, পদে পদেই বুঝতে হচ্ছে। পাণ্ডুলের ক্ষেত পূর্বেই কিছু বেচতে হয়েছে, বাকি তু'চার বিঘা যা ছিল তা-ও গেল। কোন-মতেই সামলাতে পারা যাচ্ছেনা। মার তু'চারখানা গহনা ছিল, এদিকে অবস্থার পরিবর্তনে, হালকা খান তুই করানো হয়, আগের থেকেও খান তুই টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ঠিক এইরকম অবস্থাটা পাণ্ডুল ছাড়বার পর আর কখনও হয়নি। বুঝতে শিখেছি, বাড়ির মধ্যে বোঝবার মতো এক আমিই। বাবা ভাগ দেন না। বরাবর একটা স-সম্ভ্রম দূরত্ব রক্ষা ক'রে আসার জন্য অভ্যাসটা এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে, পাশে গিয়ে কোন প্রশ্ন করতে পারিনা। বলার কিছু থাকলে—দরকারে-অদরকারে মার মাধ্যমেই কাজ চালাতে হোত আমাদের। একবার সেই সূত্রই অবলম্বন

করাতে বাবা আমায় ডেকে মৃদু তিরস্কারই করলেন—"তুমি তোমার গর্ভধারিণীকে কি বলেছ? উনি মেয়েছেলে বোঝেনই বা কি?...হ্যাঁ, ভয় আছে বৈকি। নেই, কি ক'রে বলব? ভয়, তুমি আর বছর দুই পরে শশী যদি পাস ক'রে বেরিয়ে আসতে না পার।...সেই চেষ্টা ক'রে যাও দুই ভাইয়ে। ...আর তোমরা বড় হয়েছ, তেমন কিছু বুঝলে তোমাকেই আগে ডেকে বলব।...যাও, তোমাদের এখন যা চিন্তা তাই নিয়ে থাকো।"

কথা লুকানো থাকেনা। এর পরই বাড়ির বাতাসে একটা ফিসফিসানি উঠল—বাবা বাড়িটা বন্ধক দেওয়ার চেষ্টায় আছেন।

বাড়িতে যখন এইরকম জমাট অন্ধকার, বাইরে থেকে অন্ধকার আরও করাল মূর্তিতে এসে যোগ দিল।

প্লেগ দেখা দিল সহরে।

দু-তিন বছর থেকে হচ্ছে। শীতের সময়টা আসে, সহরের এখান-ওখান থেকে কিছু কুড়িয়ে নিয়ে চ'লে যায়। এই সময়টা একটু সাবধানে থেকে, উপায় থাকলে বাড়িবদল ক'রে, নয়তো সংক্রামিত ঘরটা ছেড়ে দিয়েও চ'লে যাচ্ছিল,—এবার শীত গিয়ে ঋতু যতই এগিয়ে যেতে লাগল, প্রকোপটা ততই যেন বেড়ে যেতে লাগল। ফাল্গুন-চৈত্রের ঘূর্ণীতে যেন রোগটা ছড়িয়ে দিচ্ছে সহরের অলি-গলি পর্যন্ত। রাস্তায় লোক নেই, মাঝে মাঝে শুধু শব-বাহকদের "রাম-নাম" শব্দে আকাশটা কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—দূর থেকেও আসছে ভেসে।

অপরিচিতই রোগটা, তার সঙ্গে যুদ্ধের কোন অস্ত্রই আবিষ্কার হয়নি এখনও। একমাত্র উপায় পলায়নবৃত্তি—বাড়ি ঘড় দোর ছেড়ে।

গত বৎসর নিতান্ত সাবধানতা হিসাবে তাই করা হয়েছিল। পেছনের রাস্তার ওদিকে এক ব্রাহ্ম পরিবার—কর্তা বোধহয় ওভারসিয়র, কি, এইরকম কিছু—একটি দোতলা বাড়ি ভাড়া ক'রে ছিলেন। ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, পরিচিত, তাঁর বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য উঠে যাওয়া হয়। থেমেও যায় তারপর। এবার অত শীঘ্র অব্যাহতি দেওয়ার কোন লক্ষণই নেই। ওঁরাও বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন, বাড়ি খুঁজছেন।

নানা মূর্তিতে অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, তার পূর্বে ঠাকুরদাদার সময়েও তাঁর নির্দেশেই সব রকম প্রতিকূল অবস্থাকে অগ্রাহ্য ক'রে বাবার মনোবলটা হ'য়ে পড়েছিল অদম্য। তার ওপর ঠিক এই সময় এই অর্থসংকট। প্লেগ থেকে বাঁচবার তখন পর্যন্ত যা উপায় তা সহরের বাইরে কোন ফাঁকা জায়গায় খড়ের ঘর তুলে থাকা। খড় অগ্নিমূল্য।

সে-খড় কিনে খুব সংক্ষিপ্তভাবেই একটা বাসের উপযোগী কিছু খাড়া ক'রে এত বড় সংসারটা তুলে নিয়ে যাওয়া অসম্ভবই।

সেই সংকটের মধ্যে বাবার চরিত্রের আর একটা দিক নজরে পড়ল।

উপায় ছিল একটা। এখান থেকে পূর্বে, শ' দেড়' শ' মাইল দূরে ভাগলপুরের মহকুমা সহর মাধেপুরায় বড় পিসেমশাই কোর্টে সেরেস্তা-দারের কাজ করেন। ও-জায়গাটা প্লেগ মুক্ত, যাওয়া আসাও ছিল আমাদের, রেলে একরাত্রির পথ। পিসিমা-পিসেমশাই চিঠিও দিতেন; এদিকে ঠাকুরমা-মা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন, এ বেলা বাড়ি ছাড়তে পারলে ও বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না। ঠাকুরমা শেষে কাতর হ'য়েই গিয়ে ধরলেন বাবাকে। আমরা দোরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, বাবা বললেন—"মা, বিরাজের ওখানে যেতে তো অন্য আপত্তি নেই, যাওয়াটা দরকারও—যখন কাছেই একটা উপায় রয়েছে অমন। এটাও বুঝি; কিন্তু মধুসূদন মুখুজ্যের ছেলে আমি, এই রকম দীন হীন অবস্থাতে আমি কুটুমবাড়িতে গিয়ে উঠতে পারব না। তাঁর আশীর্বাদ তো এতটা পথ নিয়ে এসেছে আমাদের; দেখতে দাও আমায়।"

কিন্তু বাবার এরকম মনোবলও একদিন চিড় খেয়ে গেল।

অত নির্মম, কঠোর হ'য়েও প্লেগের একধরণের একটা উদারতা ছিল। সে চিঠি দিয়ে ডাকাতি করত। তার দূত ছিল ইঁদুর। শহীদ-দূত বললেও ভুল হয়না; কেননা চিঠি দিয়ে তাকেও আর ফিরে যেতে হোতনা।

ঠাকুরমার ঘরের সামনে বারান্দায় আমরা পড়ছিলাম, খানিকটা দূরে চাল্ থেকে ধপাস্ ক'রে একটা ইঁদুর পড়ল। আমরা কাপড় গুটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠলাম "ইঁদুর" !!

বাবা পাশের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। এক মুহূর্তে অমন পরিবর্তিত চেহারা বাবার আর কখনও দেখিনি। কর্কশ, আতঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—"মা, খবরদার চৌকি থেকে নেমোনা!"

একটা নেংটি ইঁদুর, ফুলে যেন একটা বড় ছুঁচোর মতন হ'য়ে গেছে। একটা কেন্দ্র ক'রে কয়েকটা পাক দিয়ে একেবারে নিথর, নিষ্পন্দ হ'য়ে গেল!

ওপরে ওপরে যে ভাবটাই বজায় রেখে যান, বাবা একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। মাধেপুরায় যাওয়ার মধ্যে আত্ম-সম্মানের প্রশ্ন ছিল। নিতান্তই সে-রকম অবস্থা হ'লে ঠাঁইনাড়ার একটা ব্যবস্থা ভেতরে ভেতরে ভেবে রেখেছিলেন। ক্রমবর্ধমান অভাবের মধ্যে সংসার তুলে নিয়ে গেলে আরও বিব্রত হ'য়ে পড়তে হবে ব'লে বাড়িতে কখনও স্তোক, কখনও মৃদু ভৎ'সনা দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমাদের জমিদার ছিলেন দ্বারভাঙ্গা রাজের জ্ঞাতিবংশ বড়্গোড়িয়ার জমিদার। এঁদের সাধারণ পদবী ছিল 'বাবুসাহেব'। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে দ্বারভাঙ্গাবাসের জন্য তাঁর একটা বাংলো ছিল। বাবার ভেবে রাখাই ছিল, আমরা তাঁর অনুমতি আনিয়ে বাড়ি বন্ধ ক'রে সেখানে উঠে গেলাম।

সে একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা আমার জীবনে। এতই অপূর্ব, মনে এমনই একটা ছাপ দিয়ে গিয়েছিল যে এখন পর্যন্ত, জীবনের এ প্রান্তে এসেও, খণ্ড খণ্ড অংশে তা মাঝে মাঝে আমার স্বপ্নে এসে উপস্থিত হয়। আমায় সেই বয়সে নিয়ে গিয়ে।

প্রথম অভিজ্ঞতা—যাওয়া মাত্রই যেন নিজেকে নিজের জগতে ফিরে পেলাম আমি। খুব দূরেও নয় জায়গাটা। আমাদের বাড়ির খানিকটা পরেই বিরাট হাড়াহি পুকুর। সহর দ্বারভাঙ্গার মধ্যে সবচেয়ে বড়, এপার-ওপার দেখা যায়না বলাও চলে। বাবুসাহেবের বাড়িটা ছিল তারই ওপারে, মাঝে স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা একটা। আজকাল যেখানে বড় বড় বাড়ি উঠেছে, লোকে জায়গা কিনে পায়না ; কিন্তু সে সময়ে ছিল একেবারে বন্য। দিনের বেলাও ওদিকে যেতে ভয় করত লোকের। এই আরণ্যক ভাবটা আরও একটা জিনিসে বেশি ক'রে ফুটিয়ে তুলেছিল। অতবড় একটা পুকুরের মাটি দিয়ে ওদিকটা পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় সমস্তটাই একটানা একটা উঁচু ঢিবি তৈরি করা ছিল। পুকুরের পাড়ই, নামও তাই ছিল, তবে অতবড় একটা জলাশয়ের মাটি, সে প্রায় ছোটখাট একটা পাহাড়ই। এই সমস্ত অতিবিপুল জলাশয়ের সঙ্গে প্রায়ই এক এক কিম্বদন্তী জড়িয়ে থাকে ; হাড়াহির সৃষ্টি নাকি সেই একেবারে রামায়ণের যুগের। খনিতও নয়, একেবারে আকস্মিক। কোনও তেমনি বিরাট পক্ষী নাকি (তার ক্রিয়াকলাপে জটায়ুর বংশধর ব'লেই মনে হয়) কোনও রাক্ষসের কঙ্কাল পাঞ্জায় ক'রে নিয়ে এই দিক দিয়ে উড়ে আসছিল, ক্লান্তিতে শিথিল তার পাঞ্জা থেকে খসে পড়ে গিয়ে হাড়াহির সৃষ্টি। হাড়ের ভারে ধ্বসে যাওয়া, তাই নাম পড়েছে হ'ড়াহি।

যে-যুগেরই হোক, আগাগোড়া ঘন জঙ্গল পাড়টাতে একটা যে স্থবিরত্বের সম্ভ্রম এনে দিয়েছিল এটা প্রত্যক্ষই। তার সঙ্গে একটা রহস্যও। আমার সেই আদিম ভবঘুরে বৃত্তি, চাতরা ছাড়ার পর যা সুযোগের অভাবে, এবং অনেকটা মার্জিত শিক্ষার প্রতিকূল প্রভাবের বরূপতায় ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসছিল আবার উঠল জেগে।

পরিবেশটা আমার দৃষ্টিতে ছিল আরও অভিনব।

তখন পর্যন্ত আমি কোনও পাহাড় অঞ্চলে কাটাইনি, তবে চাতরায়

যেতে এবং চাতরা থেকে আসতে দু'বার যে পাহাড় দেখেছিলাম, সাঁওতাল পরগণার মধ্যে গাড়িতে বসে, তাতে বিস্ময়ে-কৌতুহলে, সভয় উল্লাসে, মনটা খুবই একচোট নাড়া দেয়। কোনও উপায় ছিলনা ব'লে আকর্ষণটাই আরও প্রবল হ'য়ে সেও এক স্বপ্ন জগতের সৃষ্টি করে।

তারপর, অনেক বছর পরেই পেলাম হাড়াহির এই পাড়।

একটা কথা ব'লে রাখতে হয়। একটা পুকুরের পাড়—তা সে যত উত্তুঙ্গই হোক, যত দীর্ঘই হোক, পাহাড়ের মর্য্যাদা লাভ করতে পারেনা। কিন্তু মর্য্যাদা যে পাবে, সব সময় তারই গুণাগুণের ওপর তো নির্ভর করেনা, যে দেবে তারও মনের গঠনের একটা অংশ থাকে তাতে। আমি যৌবনে পা দিলেও, বাল্যের সেই কল্পনা-বিলাসিতা তখনও হারাইনি যা পাহাড় না হ'লেও পাহাড় ব'লে ধ'রে নিতে পারে। শিশু, সেগুন, পলাশ, অশথ, বট, তেঁতুল থেকে নিয়ে ছোটবড় নানারকম আগাছা আর লতাগুল্মের আবরণে পাড়ের খর্বতা ঢেকে দিয়ে আমার পাহাড়ের কল্পনাটাকে সহায়তা করত। প্লেগের জন্য স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশ-টাকে এগিয়ে আনা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর অভ্যাসমতো দিবানিদ্রা সেরে বাবা সহরের দিকে বেরিয়ে যেতেন, কয়লার ডিপোটা রয়েছে, বাড়িটাও একবার ক'রে দেখে আসতে হয়—আমিও বেরিয়ে পড়তাম আমার পর্বত-অভিযানে। শুধু তো হাড়াহি আর তার এই পাহাড়টুকুই নয়, তার দক্ষিণে একটা রাস্তা বাদ দিয়ে আছে, হড়াহিরই দোসর, দীঘি; তারও ওদিকে, এ-দু'টির সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে 'গঙ্গাসাগর'। এইরকম পাড়, জঙ্গলে ঘেরা। অতদূর অবশ্য যাওয়া যেত না; তখনও অরণ্যসঙ্কুল, বিরল বসতি, সাহস হোতনা। তবে দুরধিগম্য ব'লে অনাবিষ্কৃত থাকার জন্য আমার কল্পনাটাকে আরও উদ্রিক্ত ক'রেই তুলত। বন থেকে কাঠ-কাঠরা আহরণের জন্য সরু সরু রাস্তা আপনিই তোয়ের হ'য়ে গিয়েছিল। আমি ঘুরে বেড়াতাম। ফাল্গুন-চৈত্রমাস, পলাশ গাছ রাঙা রাঙা ফুলে আলো হ'য়ে রয়েছে, শিশু, সেগুন আরও সব নাম-না-জানা গাছের, বর্ণহীন ফুলের একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে ভেসে, আমি লতাপাতা, আগাছার ডাল দু'হাতে ঠেলে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গাও রয়েছে। খেয়াল হ'লে কোনটাতে ব'সে পড়তাম। একটা প্রকাণ্ড ইস্পাতের পাতের মতো হাড়াহিটা প'ড়ে রয়েছে। তার অনেকটা ওদিকে আমাদের পাড়া,—কাঁঠালবাড়ি মহল্লা। আমের একটা হালকা বাগান, আর তখনকার দিনের কয়েকখানা খোলার বাড়ি ঝাপ্সা দেখা যায়। তারই মাঝে আমাদের বাড়িটা লিলি করছে।

বনাঞ্চলের স্তব্ধ মধ্যাহ্ন। একটানা ঝিল্লির ডাকের সঙ্গে মৌমাছির

গুঞ্জন, কাছেপিঠে কোথাও চাক বানিয়েছে। কী সব ভাবতাম, এখন মনে ক'রে বলবার উপায় নেই। শুধু এইটুকুই আছে মনে যে, সেই ডামা-ডোলের মাঝখানে কার যেন আশীর্বাদেই আমি আমার প্রথম পর্যায়ের পাণ্ডুল আর চাতরাকে কয়েকটা দিনের জন্য ফিরে পেয়েছিলাম।

সংসারের অবস্থাও এদিকে সঙ্গীনই হ'য়ে এসেছিল, তার ওপর কয়লার কারবার মহামারীর হিড়িকে খুব একটা আঘাত খেল; তারপরেই এই ঠাঁই-নাড়ার অব্যবস্থা। অবস্থাটা আমাদের যেন চরমে এসে ঠেকল। দু'চারদিন, দু'চার মাসের জন্য নয়। প্রায় বছর খানেক এইভাবে কেটে গেল। অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধে সবাই অবসন্ন। ঋণ হ'য়ে পড়ছে।

দুর্গতির যিনি দেবতা, দুর্গতকে তার দুর্ভোগের জন্য যেন বাঁচিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যেই অন্ধকারে একটা ক'রে আলোর রেখা টেনে যান মাঝে মাঝে। পরিহাসই এক ধরণের। আমি পাস ক'রে শিবপুরে মামার বাড়ি থেকে কলেজে পড়তে চ'লে গেলাম। বাবা আর মার সহনশীলতার আয়ু গেল বেড়ে। কোনরকমে আমাদের দু'জনকে মানুষ ক'রে তুলতে হবে। পুরুষ হিসাবে বাবার হয়তো সে "কোন রকমে"র একটা রূপরেখা সামনে ছিলও, মা আর কিছু দেখতে না পেয়ে মেয়ে-ছেলেদের যা একমাত্র সম্বল—আত্মনির্যাতন—তাই সুরু ক'রে দিলেন। শীতের গোড়াতেই খোকার জন্ম হল, আমাদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই বিনয়। সে-সব দিনের সূতিকাগারের ব্যবস্থা ছিল খুবই খারাপ। প্রায় শুকিয়ে ভালো ক'রে তোলার ব্যবস্থা বলা চলে, তারপর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়ল মার। পেটে একটা যন্ত্রণা ওঠে, গোপন করেন।...দু'টি ছেলেকে মানুষ ক'রে তুলতে হবে। নিজের দিকে চাইলে চলবেনা। গোপনের কথা অবশ্য গুপ্ত থাকে না, কিন্তু প্রতিকারই বা কি?

যেন চরমের পরও একটা চূড়ান্ত অবস্থা। মাকে হারাতে হবে। বাবা ঠাকুরমা একেবারে দিশেহারা হ'য়ে পড়লেন। একমাত্র উপায় রইল বাড়ি বন্ধক। তারপরেই পথে দাঁড়ানো।

চাকা একটু ঘুরল।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে—The darkest hour before the dawn. অর্থাৎ, উষার ঠিক পূর্বের সময়টিতেই রাত্রির অন্ধকার যেন জমে জমে নিরেট হ'য়ে ওঠে। সব প্রবাদের মতোই এটাও কখনও সত্য, কখনও অর্ধসত্য, কখনও বা মিথ্যাই। তবে আমাদের ক্ষেত্রে সেবার সত্য

হ'য়েই দেখা দিয়েছিল। তবু তার মধ্যেই উষার আলোটাকে নিজের গর্ভেতে আটকে রাখবার একটা যেন শেষ চেষ্টা অন্ধকারের। একটা নিদারুণ আশাভঙ্গ দিয়েই সুরু হোল এই নূতন দিন।

ঘটনাটি আমাদের পারিবারিক জীবনে খুব বড় রকমের একটি দিক-পরিবর্তনের সূচনা, তাই আমার অন্যতম গ্রন্থে নেওয়া প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল। এখানে যথাযথ উদ্ধৃত করে দিলাম—

"খুব ঘটা করিয়া পান সাজিয়া, ওষ্ঠাধর ভালো করিয়া রাঙাইয়া গিরিবালা খোকাকে লইয়া বারান্দায় শুইয়া রহিলেন।

স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কেমন একটা ছমছমে ভাব। প্রশ্ন করিলেন—"খেয়েছ তুমি?"

গিরিবালা মুখটা তাঁহার দিকে ঘুরাইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, কেন?"

"না, এমনি।"

তাহার পর বক্তব্যটা বিপিনবিহারী একটু তাড়াতাড়ি বলিয়া গেলেন, যেন এক নিঃশ্বাসে।—"ইয়ে—একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করতে এসেছি—আমাদের দু'জনের মত ঠিক হ'য়ে গেলে মাকে বলব···জিজ্ঞেস করা মানে—ঠিকই ক'রে ফেলেছি, আর কোন উপায় তো নেই। মানে, শশাঙ্ক—শৈলেনদের (দাদা আর আমায়) পড়াতে গেলে—ওদিকে হরেন পূর্ণেন্দুও (হরি, ইন্দু) তো এগিয়ে এসেছে—তাই এই ঠিক ক'রে ফেললাম,—উপায় তো নেই।···বাড়িটা বন্ধক রাখছি।...তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, তুমি কি বল? মানে, লেখাপড়া সব ঠিক হ'য়ে গেছে— এইবার লোকটাকে নিয়ে বেরুব কোর্টে—রেজেষ্টারি করাতে···তুমি অমন ক'রে শুয়ে রয়েছ, শরীরটা খারাপ নাকি?

"কৈ, নাতো।"

যন্ত্রণাটা উঠিয়াছিল, এইমাত্র উপশম হইয়াছে। মুখটা বেশ ভালো-ভাবেই ঘুরাইয়া লইলেন গিরিবালা, একটু হাসিলেনও।...স্বামী দেখুন না, যাহার শক্ত অসুখ, সে কখনও খাইয়া পান চিবায়, কখনও হাসিতে পারে?

বললেন—"বন্ধক রাখছ? কিন্তু বাড়িটাও গেলে···"তাহার পরই যেন অমানুষিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিলেন—"তা রাখ, রাখ, ভালো ক'রে মানুষ হোক ওরা।"

বিপিনবিহারী চলিয়া যাইবার পর প্রায় মিনিট দশ-বারো হইয়াছে, অবু (অবনী) ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—"মা, কে আসছে বলতো?— বড়দা!"

শশাঙ্ক আসিয়া প্রণাম করিয়া একটু ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"বাবা চলে গেছেন, মা ?

গিরিবালার তখন বেদনাটা উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারলেন না, সেটাকে চাপিয়া একটু হ্রস্ব করিয়া বলিলেন—"হঠাৎ এলি যে ?" শশাঙ্ক শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"ও কি !"

"ও কিছু নয়, একটা ব্যথা, খাবার পরেই উঠল, আজ এই প্রথম।...

এখুনি সেরে যাবে।...হঠাৎ এলি যে ?"

শশাঙ্ক যে মাকে এত খারাপ অবস্থায় দেখিবে, ভাবিতে পারে নাই, বলিল—"বাবা চলে গেছেন—রেজেষ্টারি করতে ?" বিস্মিত প্রশ্ন হইল —তুই কী করে টের পেলি ?"

শশাঙ্ক পূর্ণেন্দুর পানে চাহিরা বলিল—"তুই শিগগির যা, গাড়ির এখনও মিনিট কুড়ি দেরী আছে, বলবি—মার শরীর বড় খারাপ,—না, থাক—বলবি—বলবি দাদা পাটনা থেকে এসেছেন—খুবই একটা দরকারী কাজ—তিনি যেন এখুনি ফিরে আসেন—যা, যদি না আসেন, পা জড়িয়ে ধরবি, পারবি ?"

গিরিবালা হতভম্ব হইয়া গেছেন, বলিলেন—"কথার উত্তর দিলিনি— হঠাৎ এলি যে ?"...

"পড়া ছেড়ে দিয়ে এলাম, মা।"

গিরিবালার সমস্ত শরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল—"ছেড়ে দিলি ? —কী সর্বনাশ করলি শশাঙ্ক !—কেন ?"

মনের আবেগ চাপিবার জন্য শশাঙ্ক একটু অন্যদিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরই ভাঙ্গিয়া পড়িল—"আমাদের সর্বনাশ বলে কিছু থাকতে নেই মা ? তোমরা পথে দাঁড়াতে চলেছ—আর দিদিশাশুড়ির ব্রত নিয়ে তিল তিল ক'রে তুমি নিজেকে মেরে ফেলছ—আমাদের সর্বনাশ বলে কিছু থাকতে নেই ?...তুমি আজ খাওনি, তোমার মুখের ও পান মিথ্যে, আমাকেও ঠকাবে ? বল, বল মিথ্যে নয়—বলনা..."

মায়ের বুকে মুখ ঢাকিয়া শশাঙ্ক হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

উপলক্ষটা মনে পড়ছেনা, আমিই কয়েকদিনের জন্য এসে দাদাকে সব কথা লিখি—বাড়ি বন্ধকের কথাটাও কী ক'রে কানে এসে গিয়েছিল।—মনটাতো অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে উঠেছিলই।

"দিদি-শাশুড়ির ব্রত"—সম্বন্ধেও একটু টীকা দিতে হয়। ঠাকুর-দাদাদেরও সংসারে একসময় অভাবের নিষ্পেষণের মধ্যে দিয়ে কাটে। এমন কি এক একদিন এমনও গেছে মাঝে মাঝে, যখন সবাইকে খাইয়ে আর কিছুই উদ্বৃত্ত থাকত না। ঠাকুরদাদার মা পানে ঠোঁট রাঙা ক'রে

পেটের খবর চাপা দিতেন। মার একেবারে অতটা করার প্রয়োজন হয়নি, দিদিশাশুড়ির গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতেন এবং তাঁর এই প্রবঞ্চনার সুলভ সাধনটি সযত্নে আত্মস্থ ক'রে রেখেছিলেন।

The greatest artist ; সব শিল্পীর গুরু। তুর্দিনের সময়, যখন ভাঙার দিকেই মন, বিশৃঙ্খলার, হতাশার সে এক মর্মন্তুদ চিত্র। যখন গড়তে বসেন, রেখায় রেখায় প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়ে, তার আর এক রূপ।

মহাশিল্পী, তুটিই তাঁর পদ্মহস্তের কারু। যেমন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে বিশৃঙ্খলা, তেমনি আবার বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা-সুষমা আসে বেরিয়ে।

সব যেন একটির পর একটি ক'রে কে সাজিয়ে রেখেছে।

বাবার এক পুরণো মনিব, পাণ্ডুলের এসিস্‌টেণ্ট ম্যানেজার ; মজঃফরপুর জেলায় মহম্মদপুর কনসার্ন্‌ ব'লে কুঠীর ম্যানেজারের পদ পেয়ে চলে আসেন। অনেকদিন আগেকার কথা। নীলকুঠির অবস্থা তখনও এতটা খারাপ হয়নি। পাণ্ডুলের চাকরি যেতে বাবা লেখেন, বোধহয় তু'একবার দেখাও ক'রে থাকবেন। ইতিমধ্যে নীলকুঠি উঠে গিয়ে সেখানেও চাষবাস আরম্ভ হ'য়ে যাওয়ায় কিছু ভরসা পাননি। মানুষ অভাবের শূন্যতাটা আশা দিয়ে পূর্ণ ক'রে রাখে।

প্রশ্ন থেকে যাচ্ছিল, যদিই ডেকে বসে কখনও, লাভটা কি ? বাড়িতে থাকবে কে ?

দাদা পড়া ছেড়ে আসবার সপ্তাহখানেকের পরে সাহেবের ডাক পড়ল—কেশিয়ারের পদ খালি হয়েছে, চান তো বাবা চ'লে আসতে পারেন। কয়লার আর কিছুই ছিলনা। বাবা গুটিয়ে নিয়ে, বাজারে কিছু যে পাওনা পড়েছিল, দাদাকে বুঝিয়ে দিয়ে দিন পাঁচ-ছ'য়ের মধ্যে চ'লে গেলেন মহম্মদপুর। দাদা রইলেন অভিভাবক হ'য়ে।

পাটনার পড়া যে ছাড়তেই হবে, এটা দাদা ঠিক ক'রেই ফেলেছিলেন। সেকালে ম্যাট্রিকুলেশনের চাকরির সম্ভাবনা আজকালকার একজন গ্র্যাজুয়েটের চেয়েও বেশি ছিল। দরখাস্ত ছড়িয়ে রেখেছিলেন। একটা পেয়ে গেলেন জেলা কোর্টেই নিম্ন বিভাগে কেরানির পোস্ট। সহর ছেড়ে নড়তে হবেনা। এইখান থেকেই শেষ জীবনে অফিস-সুপারের পদে থেকে অবসর নেন।

দাদার দৃষ্টি আগে গিয়ে পড়ল মার ওপর।

ঠাকুরমারও। ছিলই, পুরোপুরিই, তবে সে নিরুপায়ের সজল চোখের দৃষ্টি। এখন বধূকে টেনে নিয়ে নিজেরও জীবনের সাধ মিটিয়ে নেওয়ার, ভাববার অবসর পান একটু। বাবাকে বলেন—বৌমার যেমন শরীর,

শশীর বিয়েটা দিয়ে দে, একটি কাজের মেয়ে দেখে। পাশে এসে দাঁড়াক।...আর আমারও তো হ'য়ে এল সময়। সাধ-আহ্লাদ গেছে, তবু যদি একটা নাৎবৌয়ের মুখ দেখে যেতে পারি।"

কোর্টে চাকরি হওয়ার পর বছর খানেকের মধ্যেই দাদার বিবাহটা হ'য়ে গেল। তখন তাঁর বয়স আঠার-উনিশের ভেতর। বাইরের মেয়ে বাড়িতে না ঢুকলে সংসারের শ্রী ফোটেনা। নববধূ সে অভাব পূর্ণ করল, সঙ্গে খানিকটা নূতন যুগের আলোও এল নিয়ে।

শিবপুরে আমার অবিছিন্ন, একটানা বাস মাত্র ছ'টি বছর, কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট-ইন-আর্টস্ পড়ার সময়টুকু। তারপরও গেছি, এখনও যাই, কখনও এক হপ্তা, কখনও ছুই, মাস দেড়েকের বেশি কখনও একসঙ্গে থেকেছি ব'লে মনে পড়ে না। আর, কলেজ ছাড়া এই খুচরা যাওয়া-আসা যদি একত্র করা হয় তো একটা বছরও পোরে কিনা সন্দেহ। এই বছর তিন, জোড়া-তালি দিয়ে। কিন্তু এই তিনটি বছর আমার আজ বিরাশি বছরের জীবনের যেন অর্ধেকটা আছে জুড়ে।

একটুও অতিরঞ্জিত নয় ব'লেই আমার বিশ্বাস। কালের মাপকাঠি দিন-মাস-বছর নয়; পরন্তু উপলব্ধির গাঢ়তা, গভীরতা, বৈচিত্র্য।

শিবপুরে আসা আমার একটা নূতন জগতে নবজন্ম। আমার বাঙ্গালীত্ব-বোধ একটা সার্থকতা পেল।

এটাকে যদি বলা যায় প্রাদেশিক সংকীর্ণতা, গণ্ডীবদ্ধ স্বজাতীয়তা তো আমি মেনে নিতে রাজী নয়। আমি পূর্ণ এক ভারতীয়ত্বে বিশ্বাসী। স্বপ্ন দেখি, আচরণে-অনুষ্ঠানে, বিবাহে সামাজিকতার সব প্রভেদ ঘুচে গিয়ে ভারতবর্ষ, প্রদেশ-প্রদেশের সীমারেখা মুছে গিয়ে, শুধু "ভারতবর্ষ" হ'য়ে একটি সত্তায় দাঁড়াবে জগতের সামনে। ছু'-দশ বছরে নয়, ছু'চার শতাব্দী হয়তো যাবে লেগে, যে-শুভ পরিণতির সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধও নেই। তবু দেখি স্বপ্ন। সে-পরিণতির সামান্যও সূচনা দেখলে আনন্দিত হই। তবু বাঙ্গালীত্ব ব'লে একটা আলাদা বস্তু আছেই। একটা পাড়ার মধ্যে একটা বাড়ীর যে নিজস্বতা, অন্তত তাই নিয়ে।

আমি এই বোধটা নিয়ে যে জন্মেছি, এমন নয়। কেউ-ই জন্মায় না। যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হ'য়ে উঠতে থাকে তার দ্বারাই হয় প্রভাবিত, তাকেই আপন ব'লে জানে। তাই বাল্যে আমার চাতরায় প্রথম পদার্পণের অনুভূতিটা ছিল একেবারে বরং উল্টো। মনে হয়েছিল—এ কোন এক বিদেশ ভূমিতে এলাম। সবাই বাংলা বলে, সবার চাল-চলন,

ধরণ-ধারণ অন্য রকম। আমার পাণ্ডুলত্ব ভুলে মিশ খেতে কিছু সময় লেগেছিল।

তারপর সেটা উল্টে গিয়ে, বয়সের জন্যও আবার দ্বারভাঙ্গার বাঙ্গালী পরিবেশের জন্য এ-বোধটা ধীরে ধীরে উন্মেষ হয়েছে, পুষ্টও হয়েছে। বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দেওয়ার একটা আকাঙ্খা জন্মেছে মনে।

নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই। তখন বাঙ্গালীর জীবনে স্বর্ণযুগ চলছে। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র, জ্ঞানের সার্বভৌমত্বে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ, ধর্মাধিকরণে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন, শিল্পে স-শিষ্য অবনীন্দ্র-নন্দলাল, নাট্যমঞ্চে শিশির-অহীন্দ্র, সঙ্গীতে গোপেশ্বর-রাধিকাপ্রসাদ, সাংবাদিকতায় রামানন্দ-সমাজপতি, রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ-বিপিনপাল ; সুভাষ-প্রমুখ শিষ্যদের নিয়ে চিত্তরঞ্জন আসছেন এগিয়ে। শ্রী অরবিন্দ মধ্যগগনে। ধর্মে পরম-হংসদেব এই সেদিন গেলেন। বিবেকানন্দ গুরুর কাজ সমাধা ক'রে এই সেদিন মাত্র তাঁকে অনুসরণ করলেন। তাঁদের বাণী বাংলার আকাশ ছাপিয়ে সারা ভারতকে আচ্ছন্ন করেছে। সারা জগতেই বা কেন না বলি ?

বাংলার এই বিরাট-বিচিত্র নাট্যমঞ্চের আবহসঙ্গীত হোল "বন্দেমাতরম্"। যে-সঙ্গীত কণ্ঠে ক'রে দলে দলে শহীদ চলেছে সুনিশ্চিত ফাঁসিমঞ্চের দিকে এগিয়ে।

এমন একটা যুগ যে, অ-বাঙ্গালীও বাঙ্গালীত্বে গৌরববোধ কররেন। করেছিলেনও। ভগ্নী নিবেদিতা তখনও বেঁচেই।

শিবপুরের জীবন আরম্ভ হোল আমার।

উত্তর জীবনে যখন একটার পর একটা পাস দেওয়ার ঝোঁক চাপে, অভিনবত্বটা যায় একরকম কেটে, তখন পাসের প্রতি মনোভাবটা কি থাকে এতদূর থেকে ঠিক মনে পড়ছেনা। আমি কুল্যে তিনটি পাস দিয়েছি। একটা উল্লাস নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তার জন্যে প্রস্তুতির আর ক্লান্তির কথাই আছে বেশি ক'রে মনে। সাংসারিক কারণে আর এগুবার সুবিধা হয়নি। তবে সেই কারণটুকুর ওপর আমি বিরূপ নই ; কৃতজ্ঞই। কেউ পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, নামের পেছনে অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে—সে নিশ্চয় আনন্দ পায়, কিন্তু আমি দেখে হাঁপিয়ে উঠি। করুণা হয় তার ওপর। পাটনায় থাকতে আমি একজন স্কুলশিক্ষকের কথা জানতাম, যিনি পাস না করা পর্যন্ত বছরের পর বছর একই পরীক্ষা দিয়ে যেতেন। দাঁতে দাঁত চেপে এইভাবে ইউনিভার্সিটির বজ্রমুষ্টি থেকে একটা একটা ক'রে সার্টিফিকেট ছিনিয়ে

নেওয়ার একটা সার্থকতা আছে নিশ্চয়, ক্লাসে "অধ্যবসায়"-প্রবন্ধের জ্বলন্ত উদাহরণ, আমার কিন্তু তাকে অন্যভাবে দেখবার কৌতূহল হোল, Curio, অর্থাৎ আজব বস্তু হিসাবে। এবং কখনও দেখা পাইনি ব'লে মনে হোত, তিনি পৃথিবীর সঙ্গে সব সংস্রব ছিন্ন ক'রে একটি কোল-বালিস পেটে চেপে একটা খোলা বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ-দৃষ্টি হ'য়ে হেঁট মুখে ব'সে আছেন।

অবশ্য আমার মনে যে চিত্রটি জেগে উঠত তার কথাই বললাম, নয়তো, যে ক'জন জ্ঞান-তপস্বীর কথা বললাম তাঁদের সকলেরই জীবনেতিহাস তো এই-ই। আমি নিজে সে-দিক দিয়ে তো রিক্তই।

শিবপুরে আমাদের বাসা তখন ধর্মতলার কাছে, হেমচন্দ্র ব্যানার্জি লেনে। ছোট বাড়ি, রাস্তা থেকে এক ধাপ উঠে একটি ছোট দরজা হ'য়ে ভেতরে যাওয়া। তার ডানদিকে খুবই ছোট একটি ঘর। কয়েক পা এগিয়ে ছোট একফালি উঠান। তার ডান দিকে একটি ঢাকা বারান্দা আর এক-সারিতে তিনটি ঘর। তিন মামা তিন মামীমা আর দাদামশাই নিয়ে সাতজনের সংসার। আমি গিয়ে হ'লাম অষ্টম। বাড়িটি এখনও আছে। এখনও ও-গলি দিয়ে গেলে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে না নিয়ে পারিনা। চকিতে অনেক কথাই মনে প'ড়ে যায়। তার মধ্যে একটি কথা যা শিবপুরকে সব কিছুর ওপরে আমার কাছে অবিস্মরণীয় ক'রে রেখেছে। পরে আসবে সে-কথা। মামাদের তখন নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবার, তিন ভাইয়ে এক অন্নে আছেন ব'লেই সহরে একরকম সচ্ছলভাবে চলছে।

কলেজ থেকে আরম্ভ করি, যার জন্য আসা। অতিরিক্ত কি পেয়েছি না পেয়েছি, একে একে আসবে।

আমি পাস করলাম ১৯১২ সালে। পাস করার পেছনে যে ক্লান্তির কথা বলেছি সেটা নিশ্চয় প্রথম পাস করার বিষয়ে নয়। তাতে জীবনের এমন একটা নূতন দিগন্ত খুলে দেয় যে, সামনের দিকেই নিবদ্ধ থাকে দৃষ্টি। স্কুলের আঠ-দশ বছরের একঘেঁয়েমি ছেড়ে এ-এক সম্পূর্ণ নূতন সম্ভাবনার সামনে এসে পড়া। 'হতে হবে, ক'রতে হবে'—সংকল্পের কথা ব'লে থাকব কোনও এক প্রসঙ্গে। প্রথম পাস দেওয়া হল সেই ব্যাপার।

আমি যে রিপন কলেজে গিয়ে নাম লেখালাম, তার মধ্যে এই রকম একটা সংকল্প ছিল নিশ্চয়, নৈলে হাওড়া-শিবপুরে তখন তো কলেজ না থাকলেও এবং নিকটতম কলেজ প্রেসিডেন্সী নাগালের বাইরে হওয়ায়, সিটি, মেট্রেপলিটান, বঙ্গবাসী তুলনায় খানিকটা কাছেই হোত। 'রিপন'

সুরেন বাঁড়ুজ্যের কলেজ, এই যথেষ্ট, তা ছাড়া সেখানে তখন রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, জানকী ভট্টাচার্য, রবি ঘোষ, ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আরও কয়েকটি বাছা বাছা নাম। সুরেন বাঁড়ুজ্যে নাকি নিজে ক্লাসও নেন।

'কিছু-হ'তে- পারার' মতো একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বৈকি। গিয়ে ভর্তি হ'লাম। বৈঠকখানা রোডের মুখে নূতন বাড়িটা বোধহয় কিছুদিন আগে হয়েছে। বড় মামিমার দেওয়া দইয়ের ফোঁটা কপালে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পা বাড়াবার আগে মেজোমামিমা বাঁ হাতটা টেনে কড়ে আঙ্গুলের ডগাটাও কামড়ে দিলেন—পাছে কারুর কু'নজর এসে পড়ে।

আলগা মুখ; বললাম—"নজর তো আগে তোমাদের. দইয়ের ফোঁটার ওপরই এসে পড়বে মামিমা।"

বড় মামিমা বললেন—"ডেঁপোমি রাখ। একটা পাস দিয়েই ছেলের মধ্যে ঢুকল কেরেস্তানি!"

গলিটা পর্যন্ত ফোঁটার গুরুভার হেঁট মাথায় কোনরকমে বহন ক'রে বেরিয়ে এসে ট্রামের রাস্তা ধরলাম।

সে সব দিনে নাম লেখানোর ব্যাপারটা বেশ সহজ এবং সংক্ষিপ্তই ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই চুকে গেল। সাবজেক্ট নিলাম, হিস্ট্রি, লজিক, সংস্কৃত। ইংরাজি ও বাংলা তো রইলই। কয়েকদিন পরে ক্লাস আরম্ভ হ'য়ে গেল। এইখানে আমার ছাত্রজীবনে একটা পরিবর্তন দেখা দিল, যার জন্যে আমায় অত হাঁকডাকের রিপন কলেজ বিশেষ কিছু দিতে পারল না, বা, আমিই কিছু নিতে পারলাম না। পরে ভেবে দেখেছি কেন এমনটা হোল, এবং আত্মপ্রশ্ন ক'রে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ব্যাপারটা ছিল আমার চরিত্রের সেই দুর্বলতা—সংকোচ, Shyness, যারজন্যে শিবপুরে আমি আমার গোষ্ঠীর মধ্যে আমারই কল্পিত অন্যতম "চরিত্র" বরযাত্রীর "কে-গুপ্ত"-র মতো হ'য়ে ছিলাম। শিবপুরে এটা কেটে যেতে খুব বেশি দেরী হয়নি, আমি গোষ্ঠীর সবাইকে বুঝে নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলাম। রিপনে কিন্তু আমি প্রথম থেকেই তলিয়ে গেলাম। যা সমস্ত উঁচু ধারণা নিয়ে এসেছিলাম তার কোনটাকেই সফল করতে পারলাম না।

অনেকগুলি কারণ হোল—

রাজস্কুলে গুটি চল্লিশটি ছেলের ক্লাসের মধ্যে আমার একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। পুরোভাগেই। এখানে প্রায় শতখানেক ছেলের মধ্যে সুদূর বিহার থেকে আসা একটি ছেলের তলিয়ে যাওয়ার পক্ষে ভিড়টুকুই যথেষ্ট, তার ওপর, আমি মাত্র ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাসটুকু ক'রে দ্বারভাঙ্গায় খানিকটা বাহবা পেয়ে এলাম, এখানে কয়েকজন বৃত্তি পাওয়া স্কলারই

উপস্থিত। কেউ দশটাকা বৃত্তি নিয়ে এসেছে, কেউ পনেরো, কেউ বা সে-সময়ের সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি কুড়ি টাকা। এতে ক'রে প্রথম থেকেই একটা Inferiority Complex বা হীনমন্যতা এসে গেল। সেটাও কেটে যেত, কেননা ক্লাস যত এগুতে লাগল টের পেলাম দশটাকারই হোক, কুড়ি টাকারই হোক কেউ সিংহ-বাঘ নয়। শুরু থেকে মিশে বসতে পারলে আমিও হয়তো যেতাম মানিয়ে একরকম ক'রে। সেইখানে একটা মস্তবড় প্রতিবন্ধক হোল, দূর থেকে আসা। গোড়া থেকে এসে সেই যে দেখলাম সামনের, পাশের সব বেঞ্চ ভরা, মাঝামাঝি একটা জায়গা বেছে নেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই, তার আর, এদিক-ওদিক হোলনা। ঠিক 'ব্যাক বেঞ্চার' না হ'লেও 'মিডল বেঞ্চার' হ'য়েই কাটাতে হোল আমায়।

রাজস্কুলে আমার আর একটা পরিচয় ছিল—ভালো ফুটবলার হিসাবে। সে দিকেও আমার যা পুঁজি-পাঁজা ছিল বের করবারই সুযোগ পেলাম না। তার কারণও ঐ বিচ্ছিন্নতা, দূরত্ব। ফ্রেণ্ড্লি বা কম্পিটিশন ম্যাচ হোত ; কবে, কোনমাঠে খেলা দেখে বাছাই হবে টের পেলেও শিবপুর থেকে এসে হাজিরা দেওয়া সম্ভব ছিল না। আমার এ পরিচয়টাও গেল। ফলে দু'টো বছরের মধ্যে কয়েকটা ছাড়া-ছাড়া স্মৃতি-চিত্র ভিন্ন রিপন কলেজ সম্বন্ধে আমার কিছু দেওয়ার নেই। সে সবও ঘটনা হিসাবে আমার কাছে খানিকটা স্মরণীও হ'লেও অন্যের কাছে অকিঞ্চিৎকর ব'লেই মনে হবে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল, কিন্তু বয়স এবং দীর্ঘকাল অসুস্থতার জন্য কলেজে আসতেন না। একদিন হঠাৎ তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি—তিনি একটি ফরাস-পাতা চৌকিতে, যতদূর মনে পড়ছে, একটা গোল তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ব'সে আছেন—বোধহয় তাঁর অসুস্থতার জন্য ব্যবস্থা—গৌর-কান্তি, একটু স্থূল, দূর থেকেও মনে হ'চ্ছে ঈষৎ কোটরগত চোখদু'টি অসাধারণ-ভাবে উজ্জ্বল। আসনপিঁড়ি হ'য়ে ব'সে কয়েকজন প্রফেসারের সঙ্গে গল্প করছেন, পরিধানে মনে হোল ধুতি পাঞ্জাবিই ; যেতে যেতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে যেটুকু নজরে পড়ল। হয়তো একটা সেকেণ্ড থম্‌কে গিয়ে থাকব, তার বেশি সাহস হোলনা। তখন ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসেই রয়েছি।

জানকী ভট্টাচার্য করিডোর দিয়ে আসছেন। একটু স্থূল শরীরই। দীর্ঘাঙ্গই বলা যায়। চোগা চাপকান প্যাণ্টালুন পরা। হাতে একটি নস্যের ডিবা। একটু চিন্তিতভাবে দৃষ্টি নত ক'রে ক্লাস নিতে করিডোর দিয়ে যাচ্ছেন।...গল্প শোনা,—বিলাত থেকে কবে কোনও সাহেব-পণ্ডিত

এসে ওঁর 'শেক্স্পীয়ার' শুনে মুগ্ধ হ'য়ে যান, যশ শুনে ক্লাসে এসে বসেন।

রবি ঘোষেরও ঐ চাল, ঐ পোষাক ; বয়স বেশ কম ওঁর তুলনায়। পঞ্চাশ-বাহান্ন হবে। বুকের কাছে একসেট বই। অতি স্বল্পবাক। আমাদের ২য় বর্ষে মিলটনের L'allergo Il-penseroso পড়াতেন। উনি নিজেই যেন Il-Penseroso—গম্ভীর, একটু বিষণ্ণ, মস্তক একটু চিন্তা-ভারানত।

তখনকার বিখ্যাত ডন্ (Dawn) পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর একজন। শিবপুরে থাকতেন। স্টিমারে প্রায় একসঙ্গেই আমরা গঙ্গা পেরুতাম। কখনও কারুর সঙ্গে আলাপ করতে দেখিনি। চোগা-চাপকান-পরা, হাতে এক সেট বই। লোভ হ'ত কিন্তু কখনও এগিয়ে আলাপ করার সাহস হয়নি। অথচ নিশ্চয় মুখ চেনা। তাঁর ক্লাসে পড়িও।

বাঘ কি দুঃখে হতে যাবেন, সিংহই। তাই অনুতাপ, জীবনে কতবড় একটা সুযোগ, যা পেয়েও নিতে পারিনি। ...ঐ আমার অভিশপ্ত শাইনেস্ (shyness)।

একদিন আমরা কয়েকটি ছেলে করিডোরের শেষে নীচু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে গল্প করছি ; বাকিটা মুক্তভাবেই, হঠাৎ একটা খসখসে আওয়াজ কানে আসতে চোখ তুলে দেখি সামনের ক্লাসরুমে সুরেন বাঁড়ুজ্জে ডায়াসের ওপর ব'সে পড়াচ্ছেন। খানিকটা দূরেই, তবে একটা দরজার মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। ওদিকে চকিত দৃষ্টি যেতেই মুখ তুলে বললেন—'I say, will you stop talking over there ?"

মৃদু তিরস্কাই, নিয়মভঙ্গের জন্য। তবু, যেটুকু-বা ধার ছিল, কালের জং ধ'রে ম'রে গিয়ে শব্দ কয়টি যেন দুর্লভ সঞ্চয়ই হ'য়ে আছে। উনি তখন ভারতের রাজনীতির মধ্যাকাশে প্রখর সূর্য। অনেকের মতে এদেশে বক্তা অর্থাৎ Speaker অনেক হয়েছে, কিন্তু Orator অর্থাৎ বাগ্মী হিসাবে উনি অনতিক্রান্ত। ওঁকে ভারতের Burke বলা হোত। ওঁর মতো অমন বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণে কথা বলতে খুব কমই শুনেছি।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে (যতদূর মনে পড়ছে) আমাদের ইংরাজী পাঠ্য পুস্তক "Froude"-এর "Seamen in the Sixteenth Century" পড়াতেন।

সাধারণ পড়ানোর মধ্যেও ওঁর বাগ্মিতা এসে এসে পড়ত। পড়ানো শুনব, কি ওঁর মুখের ইংরাজী শুনব, কি ওঁর হঠাৎ এসে-পড়া বাগ্মিতার ঝংকারে কান ভ'রে নোব, যেন ঠিক করা যেতনা।

একদিন, কি উপলক্ষে মনে পড়ছেনা, কলেজের কমান্ রুমে ওঁর

লেক্‌চার হোল। সে দিন ওঁকে খানিকটা পূর্ণতরভাবে পাওয়া গেল। উনিও চোগা-চাপকান পরতেন, চৌরঙ্গীর কার্জন পার্কে ব্রোঞ্জের প্রতিকৃতিতে যেমন আছে। সামান্য একটু খর্বাকৃতি, গৌরবর্ণ, উন্নত, দীপ্ত ললাট, মুখে চাপদাড়ি, মাথার কেশ একটু অবিন্যস্ত, উভয়ই দুগ্ধ-ফেন-শুভ্র। লেক্‌চার দেবার সময় মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত মাঝে মাঝে উচ্ছলিত করবার অভ্যাস ছিল। স্তব্ধ হলের ভিতর লেক্‌চার দিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। তখন উনিই Father of Modern India, বাগ্মিতায় সারা ভারত জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর ক্লাসে ছাত্র হিসাবে কতকটা আপন করেই তাঁকে নিজের মধ্যে পেয়ে তাঁর ভাষণ শোনা! দু'টি বছরের "রিপন" স্মৃতিতে আমার সেই দিনটি উজ্জ্বল হ'য়ে আছে।

রাজনীতি নিয়ে কোনও লেকচার নয়। ও-জিনিসটা ক্লাসেও কখনও তুলতে শুনিনি, কোনও ক্লাসে কখনও তুলেছেন ব'লেও শুনিনি। সেদিন উনি নিজের জীবন সম্বন্ধে কিছু বলেন—বোধহয় ছেলেদের একটা স্বাভাবিক কৌতূহল থাকা সম্ভব ব'লেই। নিজের জীবনের গঠনের দকটাতে জোর দেন। তার মধ্যে একটি কথা বেশী ক'রে মনে আছে। ভাষণের মধ্যে একটি ঘড়ি পকেট থেকে বের ক'রে রাখেন—যেখানেই গেছেন, ঐ ঘড়ি এবং একজোড়া ডাম্বেল (Dumbell) তাঁর নিত্যসঙ্গী হ'য়ে থেকেছে। স্বাস্থ্য ও নিয়মানুবর্তিতার ওপরই জোর দেন বেশি।

তবু সেদিন একটা ব্যাপারে একটু নিরাশ হয়েছিলাম। ওঁর ভাষণ ছিল বাংলায়। সেও দুর্লভই, তবে একটা একটানা ভাষণে ওঁকে ইংরাজীতে পাব এই ছিল আশা। সুরেন বাঁড়ুজ্জের Oratory, তার মূল্যই আলাদা। শুনতাম—Burke এর Impeachment of Warren Hastings-খানা সমস্ত মুখস্ত ছিল।

একদিন কলেজে ছেলেদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি রিপনেই চাকরি নিয়ে আসছেন। ইংরাজীতে ঈশান স্কলার। সদ্য পাশ করেছেন রেকর্ড মার্কস নিয়ে। তাঁর কেরিয়ার নিয়ে কিছুদিন থেকেই ভেতরে বাইরে আলোচনা চলছিল। প্রেসিডেন্সীতেই যাওয়ার কথা, সুরেন বাঁড়ুজ্জের আকর্ষণে রিপনে এসে কাজ নিয়েছেন। আমার তখন দ্বিতীয় বার্ষিক চলছে।

একেবারে কম বয়েস—যেটা ওঁর কৃতিত্বের অঙ্গও। ছাত্রদেরই বয়সী (আমার চেয়ে মাত্র কয়েকমাসের বড় ছিলেন, উত্তর জীবনে এটা জানতে পারি)। রংটা একটু ময়লাই। কিছু কৃশই। যতটা মনে পড়ছে, পাণ্টালুন আর গলাবন্ধ কোটপরা। বড় মহলে এতদিন প্রফেসারিতে চোগা-চাপকানই ছিল। এঁদের সময় থেকে সাজগোজ বদলাল। শুধু,

তখনও নেকটাই পর্যন্ত কেতাদুরস্ত সুটের আমদানি হয়নি। উগ্র স্বদেশী যুগ, যার শখ আছে, সেও সংকোচ কাটিয়ে গায়ে টাঙিয়ে আনতে পারত না, বেশির ভাগ প্লেন ধুতি-চাদরই।

এই বেশে বিশেষ ক'রে মনে পড়ে ইতিহাসের প্রফেসার বিপিনবিহারী গুপ্ত। অত্যন্ত সাদামাটা খাঁটি বাঙ্গালী। নিরীহ গোছের, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। তাঁকে কিন্তু সবাই বাঘের মত ভয় করত। ক্লাসটা ওঁর সময় পাৎলাই হ'য়ে যেত। এসে হেঁট মুখেই রোলকল ক'রে হাজিরা নিতেন। যেন অবান্তরদের সরিয়ে ক্লাস পাৎলা করবার জন্যেই, কে প্রক্সি দিল বা কে রোলকলের জবাব দিয়েই টপ ক'রে বেরিয়ে গেল—লক্ষ্য রাখতেই চাইতেন না। ভাবটা যেন—পাপ সব বিদায় হোক।

খুব বড় স্কলার। তখনকার বড় বড় মাসিকপত্রে প্রায়ই তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ বেরুত। পড়াতেন খুব ভালই। শুধু একটা দোষ—যা সব ছেলেরা পছন্দ করেনা—প্রফেসার হ'য়েও স্কুল শিক্ষকের মতো পড়া জিজ্ঞেস করতেন। তা করুন, কিন্তু কেউ প্রস্তুত হ'য়ে না এলে একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই চেয়ে তর্জনী বেঁকিয়ে "Sit down" কথাটা দাঁতে চেপে এমন ক'রে উচ্চারণ করতেন যে সে-বেচারির যেন আর পদার্থ থাকত না। মাত্র দু'টি কথার মধ্যে এত বিষ ঢেলে দিতেন যে, কল্পনায় আনা যায় না।

আমার বাংলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার হরি ঘোষ মশাইয়ের কথা মনে পড়ে। হয়তো আগেও বলে থাকব, ভাবসাম্যে মনে প'ড়ে গেল। বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দু'টো সুতোয় দু'টুকরো কাগজ বেঁধে কানে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। টানা পাংখার বাতাসে সে দু'টা ফর্ ফর্ করে দুল্‌ছে। আসামীর মুখ তোলার উপায় নেই। এক শ্রেণীর শিক্ষক আছেন যাঁরা সাজা-দেওয়া থেকে দৈহিক পীড়নের ভাগটা সরিয়ে দিয়ে সেটাকে সূক্ষ্ম আর্টে পরিণত করতে পারেন।

আমার নিজের কথা আর একটু ব'লে এবার কলেজ পর্ব শেষ করি।

ক্লাসরুমের মাঝামাঝি ছিল আমাদের ক'জনের বাঁধা জায়গা। সেইখানেই আমাদের যা কিছু ভালোমন্দ আলোচনা। এক প্রফেসার বেরিয়ে গিয়ে আর একজন আসা পর্যন্ত। অনেক সময় তাঁদেরই আলোচনা নিয়ে সময়টুকুর সদ্ব্যয় করা হোত। ক্লাসের মধ্যে একটি ছোট ক্লাস, ক্লাব বললেও ভুল হয় না। বেশ জন পাঁচ-ছয় অন্তরঙ্গ পারিষদ নিয়ে, সবাই হাস্য পরিহাস কুশল। নাম মনে পড়ছেনা, তবে ব্রজেশের নামটা আছে মনে। নানা কারণে।

রিপন কলেজের সঙ্গে জড়িত আর একটি স্মৃতি আমার বড় মধুর।

এখানে থাকতে আমার সেই যাযাবর বৃত্তির আবার একটু সুযোগ পাওয়া গেল।

আমি সাধারণত শিবপুর ফেরিঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে হেঁটেই কলেজে যেতাম। যারা এ পথের দূরত্বটা জানেন—শিবপুর-ধর্মতলা থেকে শেয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি, সস্তা যান-বাহনের যুগে (তখন আরও সস্তাই)—তাঁদের একটু আশ্চর্যই মনে হবে। কিন্তু আমার পক্ষে এমন কিছু ক্লেশকর তো ছিলই না, যেটুকু অনিবার্য, দেখতে দেখতে পথ চলার আনন্দের মধ্যে সেটা কখন্ কি ভাবে লুপ্ত হ'য়ে যেত বোঝাও যেতনা। কলকাতার রাজপথ, পদে পদেই কত দেখার কত শোনার বৈচিত্র্য। একই পথ, একই পার্ক, একই হর্ম্য নিত্যনূতন; তাদের নূতনত্ব বজায় রাখবার জন্যই মাঝে মাঝে বদলেও দিতাম। নাবিকের মতো শুধু দিকটার হিসাবটুকু রেখে যেতাম। আমার ধ্রুবতারা ছিল কলেজ, তার সংস্থানটুকু মনে রেখে আমি অনেক সময় আঁকাবাঁকা গলির মধ্যেও ঢুকে পড়তাম। বিশেষতঃ বাঙ্গালীপাড়ায় এসে। বিশেষ ক'রে যখন নূতন এসেছি। শিবপুর থেকে নিয়ে সর্বত্রই বাঙ্গালী জীবনের টুকরা টাকরা কুড়িয়ে বেড়ানো আমার তখন একটা নেশাই। সাধারণ গতিপথ ছিল চাঁদপাল ঘাটে নেমে স্ট্রাণ্ড রোড, বেন্টিক স্ট্রীট, ডালহৌসী স্কোয়ার, বৌবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা রোড। হাতে সময় থাকলে ঘুর পথে—কার্জন পার্ক, চৌরঙ্গীর উত্তরভাগ, ধর্মতলা, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ফিরিঙ্গি পাড়ার কোন গলি হ'য়ে শেয়ালদা, হ্যারিসন রোড।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময়টা ছিল একরকম বাঁধা, ঘাটের স্টীমারও। কলেজে, স্কুলের মতো একই সময় নয়; যেটুকু সময় পেতাম হাতে এই স্বচ্ছন্দ-বিহারে কাটিয়ে দিতাম।

ট্রামও থাকত মাঝে মাঝে; যেদিন সকাল সকাল ক্লাস, বা, অসুখ-বিসুখের পর শরীর যখন কাহিল।

চলা পথের আকর্ষণই আমার ছিল বেশী। তার চেয়েও যদি বেশি কিছু ছিল তো তা "ইডেনগার্ডেনস্"। খুব বেশিদিন তা থেকে বঞ্চিত থাকা আমার পক্ষে ছিল কষ্টকর। ট্রামে গেলে আসলে ইডেনগার্ডেনস্ একেবারেই বাদ পড়ত। সে যে কতবড় বঞ্চনা আমার পক্ষে, আজকের রেডিওহাউস—আর—ষ্টেডিয়ম-বিড়ম্বিত হতশ্রী ইডেনকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবেনা। শুনি "প্রয়োজন"। "প্রয়োজন"—এর জন্য তো আরও যথেষ্ট স্থান আছে বিরাট কলকাতায়। আর "প্রয়োজন"কে কি এতই আস্কারা দিতে হবে? আমরা বলি বাঙ্গালী আমরা মূলত কবির জাত, শিল্পীর জাত, গৌণত আর কিছু। ...ইডেন গেছে,

ডালহৌসী গেছে, আরও কত গেছে এই রকম। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী উত্তর-কলকাতায় আজ একটা ফুল ফোটাবার জায়গা নেই। ইডেন আমাকে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না, আমি সেদিনের ইডেনে ফিরে যাই। স্মৃতিতেও যেটুকু সান্ত্বনালাভ করতে পারি। বলা বাহুল্য, কলেজ থেকে ফেরবার পথেই ইডেন্ ছিল আমার আস্তানা। যখন সামনে সমস্ত সময়টা রয়েছে পড়ে।

কলেজে শেষের দিকে ক্লাস নেই; বা, কোন প্রফেসারের অনুপস্থিতির জন্য ক্লাস বন্ধ, আমি বেরিয়ে প'ড়ে ইডেনের সংক্ষিপ্ততম পথ ধরলাম, যতখানি পাওয়া যায় তাকে।

বসন্ত শেষ হ'য়ে গ্রীষ্মের আমেজ এসে পড়েছে একটু একটু। উত্তর গেটটা ছিল আমার স্বর্গদ্বার। দীর্ঘপথ চ'লে পরিশ্রান্তই থাকতাম, প্রবেশ করতেই সমস্ত শরীরটা যেত জুড়িয়ে। গতি হ'য়ে পড়ত মন্থর। প্রথমেই রাস্তার ত্ব'ধারে যত্ন ক'রে 'বেড' তোয়ের ক'রে রঙ-বেরঙের বৈজয়ন্তী। সুপুষ্ট, খর্বগাছ, বড় বড় সবুজ পাতার ওপর স্তবকে-স্তবকে ফুল রয়েছে ফুটে। লন-মোয়ার দিয়ে নিখুঁতভাবে ছাঁটা ঢেউ খেলানো লনের এখানে-ওখানে কতরকম মৌসুমী ফুলের কেয়ারী, কোনটা অধিত্যকায়, কোনটা উপত্যকায়; ভিড় নেই, একটি শুকনো পাতা, কি ফুল নীচে প'ড়ে নেই। লাল সুরখির পায়ে হাঁটা পথ সর্পিল গতিতে গেছে এগিয়ে; একটুখানি জমিকে অনেকখানি ক'রে দেওয়ার কৌশল। কোথাও কতকগুলা কালোপাথরের চাঁই এলো-মেলো ভাবে বসিয়ে ইডেন পাহাড়তলির সাধ মিটিয়েছে। ...আরও মন্থর হ'য়ে গেছে গতি। খানিকটা এগিয়ে একটা উটের পিঠের মতো বর্তুল পুল পেরিয়ে ঝিলটার ওপারে গিয়ে পড়লাম। পাশেই একটা ঘাটের মতো, সুপারি, বিলাতি পাম আরও কয়েক রকম গাছের ওপর লতা পাতা তুলে একটি কৃত্রিম জঙ্গলের মধ্যে। মনে ক'রে নিতে হবে আপনি হ'য়ে উঠেছে। আমিও নিজেকে একটু বেশি ক'রেই সুদূরাগত পথশ্রান্ত পথিক মনে ক'রে নিয়েই বইখাতা একটা পাথরের ওপর রেখে এই ঘাটেই হাতমুখ ধুয়ে নিতাম। ইডেনের সুরে সুর মেলানো।

এর পর আবার ঘুরে ঘুরে আমার জায়গাটিতে গিয়ে বসতাম। ত্ব'টি ছিল আমার প্রিয়। ঝিলের ঢালুতে, জলের কাছাকাছি; কি একটা বিলাতী ফুলের গাছের ছায়া এসে পড়েছে, সামনে একরাশ লাল কহলার; ফোটার সঙ্গে আধ-ফোটা কুঁড়ির ভিড় ক'রে রেখেছে। ঝিলে হাঁস ছিল। বসন্তের পাখিগুলা তখনও সব বিদায় নেয়নি।

আর একটা জায়গা ছিল ঝিল থেকে খানিকটা স'রে একটি বেঞ্চ।

পেছনে ঘেঁষাঘেঁষি গুটি দুই কি তিন ঘন দেবদার।...ঋতুতে ঋতুতে ইডেনের রকম-রকম সাজ। বর্ষায়, বৃষ্টি নামলে বার্মিজ প্যাগোডার ভেতর গিয়ে বসতাম। ধারা শীকরের অস্বচ্ছ অন্তরাকে ইডেন রহস্যময়ী হ'য়ে উঠত।

কি ভাবতাম মনে পড়ে না। তবে, সময়ের হিসাব থাকত না। রশিকয়েক দূরেই স্ট্র্যাণ্ড পেরিয়ে চাঁদপালঘাট। স্টীমার এসে জেটিতে ভিড়ে বাঁশি বাজালেও সময় থাকবে।

এদিকে স্বাধীনতার পরও বার দুইতিন যাই। তারপর আর যাইনি। আমার দীর্ঘশ্বাস এত সস্তা নয়।

এই ছিল মোটামুটি আমার ওপারের রোজনামচা। মাঝে মাঝে মিউজি-য়ামটা টানতো; বিশেষ ক'রে যখন "আর্ট-একাডেমির"র প্রদর্শনী চলছে।

এইবার শিবপুরে ফিরে আসি।

পরে ভেবে দেখে এই জ্ঞান হয়েছে, যতই দুঃখ করি, আমি যে স্পোর্টস ইত্যাদি নিয়ে "রিপন"-এর একাডেমিক্ জীবনের সঙ্গে একেবারেই জড়িয়ে পড়িনি এটা ভালোই হয়েছে আমার পক্ষে। পড়লে হয়তো শিবপুরে থেকেও শিবপুরকে হারাতাম। শিবপুরকে যতটা সম্ভব না পেলে আমার জীবনের আধখানা যে বাদ প'ড়ে যেতো সে কথা আগে বলেছি।

শিবপুরকে আমি পেলাম ব্রজেশের মাধ্যমে। ব্রজেশকে পেলাম আমাদের ক্লাশরুমের মাঝামাঝি সেই 'ক্লাব'টিতে। গোড়ার দিকেই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলাম ব্রজেশের বাড়ি শিবপুরেই। প্রশ্ন ক'রে জানা গেল আমাদের গলির কাছেই বটকৃষ্ণ পালের আদি বাড়ির গলিতে। আমি রোজ চৌধুরীপুকুরে স্নান করতে যাই ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে। ব্রজেশ একেবারে 'ক্যালকাটা-বয়', সবদিক দিয়ে। বরং 'শিবপুর-বয়ই' বলি, যেন আরও খানিকটা নিজস্বতা আছে তাতে। অনেক বিষয়েই মিল আমাদের দু'জনের, প্রথম পরিচয়েই ভাব হ'য়ে গিয়েছিল। এত কাছাকাছি থাকি শুনে আমার পিঠে একটা চাপড় বসিয়ে দিয়ে বলল "আলবৎ! এ যে সেই বিয়ের সময়ে মেয়েদের 'মোনামুনি' ফলের কথা হোল মশাই? একটা গামলায় জল ভ'রে উল্টো দিকে 'দু'টো' ফল ভাসিয়ে দিলে, তারা নিজের মনে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে মিলে গেল।...তাহলে? আসুন আমাদের দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই. দেখবেন কি চিজ্ সব!"

সেদিন ওর সঙ্গেই ট্রামে ধ'রে নিয়ে এল। তারপরও ট্রামে এলে

একসঙ্গেই এসেছি। আমাদের "কম্বিনেশনও" ছিল প্রায় এক। মাঝে মাঝে যোগাযোগটা ঘটেই যেত।

পরিচয়ের হাতেখড়ি হোল পায়ের দৌলতে। বাড়ি থেকে অল্প-খানিকটা দূরে চৌধুরীদের পুকুরের ধারে মাঝারি গোছের একটা মাঠ। সেইদিনই কোন্ দু'টো টীমের মধ্যে একটা ম্যাচ ছিল, কম্পিটিশনই হবে বোধ হয়। ব্রজেশ ব'লে রেখে ছিল, জলখাবার খেয়ে ওর বাড়িতে যেতে, ও সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল। খেলা ভাঙ্গলে, দলের যে ক'জন আসবে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। সত্য কথা বলতে কি, একটু ধুকপুকুনি লেগেছিল। কলেজের সেই 'ক্লাবে' আমি এতদিনে খানিকটা ফ্রী (Free) হ'য়ে গেছি, সেখানকার ছেলেদের সঙ্গে স্বাভাবিক একটা যোগসূত্র ও রয়েছে, এখানে বিভিন্ন মেজাজের পাঁচ-মিশালী দলের মধ্যে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে ঠিক আন্দাজ করতে পারছিনা। কলেজে পরস্পরের মধ্যে লঘু-চপলতায় ব্রজেশকে প্রায়ই বলতে শুনতাম—"আমি হচ্ছি, যার নাম, 'শিবপুরের-ছেলে', সেটা মনে রাখতে হ'বে!"

তাঁর নমুনা হিসাবে সবদিকে বেশ চৌকশও। একনম্বরের মুখফোঁড়, আড্ডাবাজ, পড়াশোনাতে ভালোই; তাছাড়া, ফুটবল আর ক্রিকেট। এক্সারসাইজ-করা শরীরটাও ছিল বেশ শক্ত। তেমন কোন উপলক্ষ হ'লে, মুঠোটা কারুর পাঁজরায় চেপে, বা শক্ত পাঞ্জা দিয়ে হাতের, কাঁধের কোনখানটা চেপে ধ'রে বলতো—"এই দেখুন, ফীল ইট্ (Feel it)!"

ব্রজেশের সঙ্গে মাঠের ধারে শিবপুর-জনতার-মধ্যে বেশির ভাগই যুবক। খানিকটা আড়ষ্ট ভাবেই দাঁড়িয়ে খেলা দেখছি, চুপচাপই, কিন্তু জিভ্ কতক্ষণ বশে রাখা যায়? একেবারে শেষের দিকে একপক্ষের সেণ্টার ফরওয়ার্ড বেশ খানিকটা দম-বন্ধ-করা উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও, গোলের মুখে একটা ভুলের জন্যে গোলটা বেঁচে যাওয়ায় যে ধিক্কার উঠল চারিদিকে, তার মাঝে আমার মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেল—"ইস্!" ...আউটার পোস্টেই (outer post) তাগ্ করা উচিত ছিল!"

নীচু গলাতেই, আত্মগত ভাবেই। ব্রজেশ পাশেই ছিল। ধিক্কারে গলাও তুলেছিল, প্রশ্ন করল—"কি বললেন?"

—বললাম—"ওদিক'কার পোস্টটাতেই তাগ্ করা উচিত ছিল। গোলীর (goalie) আন্দাজ ছিলনা।"

"আপনি বোঝেন এ খেলা?"—বিস্মিতভাবে চেয়ে প্রশ্ন করল। বললাম—"অল্পকিছু।"

প্রশ্ন করল—"খেলেন?"

পাশের কয়েকজনের দৃষ্টি এসে পড়ায় আরও একটু আড়ষ্ট হ'য়ে গিয়ে বললাম—"খেলতাম।"

—"কোন পজিশনে।"

—"লেফ্‌ট বা রাইট আউটে।"

শেষ হুইসিল হ'য়ে খেলা ভেঙ্গে গেল। ব্রজেশ গলা উঁচিয়ে একজনকে ডাক দিল—"ওহে বেণী, শোন শোন; এদিকে।"

এগিয়ে এলে বলল—"ইনিও খেলেন। লেফ্‌ট উইঙ্গার (Left winger)। তো সুবিধের পাওয়া যাচ্ছেনা। এঁর দু'পাই চলে বলছেন।"

সাত আট জনের একটি দল আমায় ঘেরে ফেলল। নানা প্রশ্নের উত্তরে ব্রজেশই আমার পরিচয়টা পূর্ণ ক'রে দিল—কোথা থেকে এসেছি, কার বাড়িতে থাকি, সম্বন্ধটা কি, কোথায় বাড়ি, কি নাম ইত্যাদি। দু'দিন পরেই ওদের টীমের একটা ম্যাচ্‌ ছিল। বাজে-শিবপুরের কোন্‌ একটা দলের সঙ্গে। আমায় ট্রায়াল (Trial) দেওয়া ঠিক হ'য়ে গেল। খালি মাঠে ব'সে আমাকে নিয়েই খানিকটা জটলা হোল। বর্ধিত আড়ষ্টতার মধ্যে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আরও দু'তিনজন আমরা ব্রজেশের বাড়ির সামনে শিবমন্দিরের রকে ব'সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গল্প করলাম। আমিও "করলাম" বলাটা অবশ্য ভুলই হয়। কয়েক বার টানায় সতর্ক-ভাবে সংক্ষিপ্ত উত্তর বা অভিমত দিয়ে বেশির ভাগ শ্রোতার ভূমিকা নিয়েই রইলাম বসে। প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই আমাদের দ্বারভাঙ্গার টিম, খেলার মাঠ, এ-মাঠের তুলনায় কত বড়—এ সব তো রইলোই, দ্বারভাঙ্গার রাজ সম্বন্ধেও কিছু কিছু বলতে হোল। সংক্ষিপ্ত এবং সতর্ক-ভাবেই। দেখলাম, কিভাবে বলি, এমন কি, কি রকম ভাষায়—সে সম্বন্ধেও কয়েকজনের কৌতূহল যেন একটু প্রখরই।

ম্যাচ খেলার দিনের দু' একটা কথা বলে এ-প্রসঙ্গ শেষ করি। তাতে দলের মধ্যে আমার ড্যাঙার মাছের মতো অবস্থাটা একটু সহজ হ'য়ে আসার উপলক্ষটুকু রয়েছে—

লেফ্‌ট উইং থেকে খেললাম। খারাপ হোল না। উইঙের ঠিক গোল দেওয়ার দায়িত্ব নয়; তবে অনেকগুলি লাগসই "সুযোগ" রচনা ক'রে দিলাম এবং তারই একটিতে গোলও হোল একটা। তবে, আমার প্রমাণ সাইজের মাঠে খেলার অভ্যাস থাকার জন্যে জোরে মারা শট্‌ কয়েকটা ফীল্ড (Field) টপ্‌কে বাইরে গিয়ে পড়ায় একটু চেপে খেলতে হোল আমায়।

আমরা ২—১ গোলে জিতলাম।

খেলা শেষ হ'লে সবাই ইউনিফর্ম্‌ খুলছি, একটি দল ঘিরে রয়েছে

আমাদের, খেলার আলোচনা হ'চ্ছে, নূতন আমদানি ব'লে আমায় নিয়ে তারই মধ্যে একটু বেশি, এর মধ্যে একটি ছোকরা বেশি ফর্ ফর্ করছিল, বলল—"কিন্তু আপনাকে আমাদের একটু ছেঁটে-ছুঁটে নিতে হবে, বিশেষ ক'রে পায়ের দিকটা।"

অনেকদিন পরে নিজেকে ফিরে পেয়েছি, কিছু "চিয়ারিং" ও (cheering) জুটেছে কপালে, সদ্য খেলার মধ্যে ধমনীর রক্ত দ্রুত চলাচলের জন্যও মনটা তাজা রয়েছে, ইউনিফর্ম নামিয়ে জামার বোতাম আঁটছিলাম, ঘুরে চাইলাম ছোকরার দিকে, একটু দেখে নিয়ে বললাম—"তার চেয়ে একটা আরও ভালো উপায় আছে।"

"আছে নাকি? বলুন তো শুনি!" চারদিকে একবার চেয়ে নিল, একটু ধূর্ত্ত হাসি হেসে টিপ্পনি করল।

বললাম—"আপনি, আর আপনার মত ক'জন চারদিক ধ'রে ফীল্ডটাকেই টেনে বাড়িয়ে দিন না।"

কথাটা তেমন কিছু হাসির নয়। তবে, ঐ সদ্য বেহার থেকে আসা, আমি কি ভাবে কি উত্তর দিই, সবাই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে শুনছিল ব'লেই "হো-হো" ক'রে হেসে উঠল। ছোকরা ছিল ডিগডিগে লম্বা—তাইতে আমার টিপ্পনিটুকু আরও ধারালই হ'য়ে উঠে থাকবে।

এরপর, সঙ্গে সঙ্গেই যে আমার সেই আড়ষ্টতা কেটে গেল এমন নয়। কিছুদিন 'কে-গুপ্ত' হ'য়েই কাটল, তারপর দলের সবাই আমায় চেনার সঙ্গে আমিও সবাইকে নিলাম চিনে। ফলে সহজ অধিকারেই একটা জায়গা ক'রে নিলাম।

একটা কথা এইখানে ব'লে রাখতে হয়। আমায় অনেকে প্রশ্ন করেন—"বরযাত্রী-বাসর"-এর "গনশা-ঘোৎনা-কে.' গুপ্ত,"-এরা বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া কিনা।

আদৌ নয়। আমাদের কেউ ছিলাম সাধারণ কলেজের ছাত্র, বেণী মিত্র আর একজন মেডিকেল কলেজে পড়ছে, কেউ চাকরিতেও ঢুকেছে—এই রকম···একটা মিশ্র দল।

তার মধ্যে "গনশা-ঘোৎনা"র মতো একেবারে দায়িত্বমুক্ত, নিজের নিজের খেয়াল খুশি নিয়ে থাকার মতো কেউই ছিল না। হয়তো দলের কারুর কোন দুর্বলতার আঁচড় একটু আধটু এসে থাকবে লেখার মধ্যে, তাতে ওদের ছ'জনের চরিত্র এবং কীর্তিকলাপ আমার শিবপুর জীবনের মোটামুটি একটা ইম্‌প্রেশন্ (Impression) বা ধারণা থেকেই নেওয়া।

অনেকদিনকার কথা, হয়তো দু' একটা "চরিত্র" রক্ত-মাংসেরই, তবে মোটামুটি লেখকের খেয়ালেরই সৃষ্টি।

আরও দু'টি কথা বললে পরিষ্কার হবে—

তখনকার শিবপুর আর এখনকার শিবপুরে আকাশ-পাতাল তফাৎ; এর মধ্যে আকাশটা হোল তখনকার শিবপুর। আজ থেকে তেষট্টি চৌষট্টি বছর আগেকার কথা হ'চ্ছে —উনিশ শ' বারো তেরোর সময়। কলকাতার এপার ওপার, সুতরাং একটা ব্যস্ততা, কর্মচঞ্চলতা, খানিকটা দৌড় ঝাঁপ, ছুটাছুটি থাকবেই, তবু শিবপুরের জীবনে একটা মস্ত বড় অবকাশ তখনও থেকে গিয়েছিল। চৌধুরী-গাঙ্গুলী-মুখুজ্যে-চাটুজ্যে-বোস-দত্তদের জমিদার বাড়ির অবস্থা পড়তে-পড়তেও রয়েছে টিঁকে। খাওয়া-পরার অভাব নেই, এই রকম গৃহস্থ-ঘরের ছেলে, আরও পাঁচরকমের দলে ভিড়ে পড়বার মতো ছেলে—এদের নির্ভাবনায় নিজেদের নিয়ে কাটাবার একটা সহজ ফাঁক ছিল তখন—গানবাজনা, শরীরচর্চ্চা, ভলান্টিয়ারি, সাধারণ বাউণ্ডুলেপনা, এইসবে।... প্রেমচর্চ্চা, বিবাহ এ জাতীয় ব্যাপারগুলা যৌবন ঘিরে আদাম-ইভের সময় থেকে চ'লে আসছে ; এখনকার মতো তখনও এটা পঁচিশ তিরিশ বছরের কোটায় এসে পড়েনি। দলের মধ্যে একটা কমরেডশিপ (Comradeship) বা অন্তরঙ্গ সখ্যতার অবসর ছিল—বয়স কারুর কুড়ি-বাইশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখলে যাদের হ'য়ে গেছে ও পাট তাদের প্রাণ কেঁদে উঠতো।

এই রকম একটা মুক্তি যে ছিল শিবপুরের কর্মচঞ্চল জীবনে, আমি নিজেও অনেকটা স্বৈরতাবিলাসী ব'লে, সেটা আমার ভালই লাগতো।

কিছু দেখতাম, কিছু শুনতাম, তাই থেকে চরিত্র-পরিস্থিতি-পরিবেশের একটা তালগোল-পাকানো স্মৃতি মনের কোঠায় জ'মে উঠেছিল, তলিয়েও গিয়েছিল, তারপর অনেক পরে কি ক'রে বেরিয়ে আসতে লাগল—প্যাঁজা তুলোর সুতোর স্পষ্ট আকার নিয়ে, তারপর ধুতি-শাড়ির স্পষ্টতর আকারে।

অনেক পরে প্রথম গল্প 'বরযাত্রী' প্রকাশিত হয় প্রবাসীতে আমার বয়স তখন ৩৩-৩৪। ১২টি গল্পের পর শেষ গল্প—"অবশেষে" র মিশ খাওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা ওদের মধ্যে গিয়ে, তাও ঘটাতে সমর্থ হলাম, যেহেতু চেষ্টা করতে দেখলাম, ওদের অবাধ নিষ্কলঙ্ক জীবনের সুরের রেশ তখনও আমার মনের মধ্যে কিছুটা লেগে রয়েছে।

নিষ্কলঙ্কই। কেন, তাও বলি—

শোনা কথা, শিবপুরে একটা সময়ে নেশাভাঙের বাড়াবাড়ি ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ; অনায়াসলব্ধ অর্থসম্পত্তির সহজ পরিণাম। আমি গিয়ে তার জেরটার কিছু কিছু পরিচয়ও পেয়েছি—সে কিন্তু কিছু মাঝা-

মাঝি বয়সীদের মধ্যে। তার ওপরে হয়তো কিছু বেশী থাকা সম্ভব। তারা কিন্তু তখন বয়সে-স্বাস্থ্যে একরকম নেপথ্যেই। আমাদের বয়সী যুবকদের মধ্যে—উর্ধ্ব পর্য্যন্ত মোটামুটি তিরিশ-পঁয়ত্রিশের—নেশার দিকটা একরকম একেবারেই কমে গিয়েছিল। অন্তত. যদি বা কিছু থেকে ছিল তো, তা সদরে আসতে সাহস পেতনা; সদরটা বেশ কিছু পরিচ্ছন্ন ব'লেই।

হয়তো সেই "অনায়াস লব্ধ অর্থ সম্পদেরই" অভাব। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়েও একটা বড় জিনিস ছিল, তখনকার শিবপুরের যুব সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করবার মতো। নেগেটিভ (Negative) কন্তু নয়, পজিটিভই (Positive)। সময়টা ছিল—"স্বদেশী" যুগের একরকম প্রাক্-মধ্যাহ্ন।

তারও কিছু কিছু আঁচ পাওয়া যেত।

প্রশ্ন হবে—এদেরও কিছু আনিনি কেন আমার লেখার মধ্যে।

উত্তরটা সহজ—এমন সৌম্য পবিত্র জিনিসকে কৌতুকের লঘু-চাপল্যে নামিয়ে আনা যায়না।

তবু করেছি চেষ্টা, তার প্রাপ্য মর্যাদাতেই তাকে প্রকাশ করতে, তারই উপযোগী পটভূমির মধ্যে।

'বরযাত্রী-বাসর'-এর যুগেই, একরকম পাশাপাশিও। আমার কয়েকটি বড় লেখাতেই। কিন্তু আমার অক্ষমতার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণে সে-দিকে আমার পাঠক-সম্প্রদায়ের মনটানায় বিশেষ সফল হইনি।

থাক এ কথা এপর্যন্তই।

আমি বাংলাকে প্রথম পরিচয়ের ফ্রেশ্‌নেস্ (Freshness), আর মুগ্ধ বিস্ময়ের আলোয় পেয়েছি দু'বার; প্রথমবার চাতরার প্রথম পর্যায়ে, দ্বিতীয়বার শিবপুরে, সেও প্রথম পর্যায়েই। তবে, এদু'বার উপলব্ধির মধ্যে একটা প্রভেদ ছিল—চাতরায় আমি বাংলাকে "দেখি", শিবপুরে আমি বাংলাকে প্রকৃতই "পেলাম"।

চাতরায় সেটা ছিল একটি অনভিজ্ঞ কিশোরের অবোধ দৃষ্টি, কখনও চোখ বুলিয়ে, কখনও চোখ ভ'রে দেখে যাওয়ার অবোধ আনন্দ। যা দেখছি, অপরিণত মনের প্রবেশ নেই তার মধ্যে।

শিবপুরে ছিল একটি পরিণত মনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি, দেখার সঙ্গে সজ্ঞান উপলব্ধিতে পাওয়া, অঙ্গীভূত ক'রে নেওয়া উপভোগ্যকে। শিবপুরে থাকাকালেও আমার শিক্ষা, আমার বর্দ্ধিত বয়সের সঙ্কোচ আমার সেই

বাউণ্ডুলে-বৃত্তি ঘোচাতে পারেনি। ছুটিছাটা হ'লেই আমি বাড়ি ছেড়ে ঘুরে বেড়াতাম শিবপুর আবিষ্কারে। সেটাই আমার বাংলাকেও সজ্ঞান আবিষ্কার। যেমন কলেজের পথে কলকাতায়, তেমনি ছুটির দিনে শিবপুরেও নিরুদ্দেশভাবে এ-সড়ক, ও-সড়ক, এ-গলি সে-গলি হ'য়ে চলেছি ; কলকাতার মতোই চলমান নিত্য-জীবনের টুকরোটাকরা সংগ্রহ ক'রে। হাতে সময় থাকলে শিবপুর ছাড়িয়েও। একটা কৌতূহল ছিল, খাঁটি বাংলা নামগুলা—রামরাজাতলা, বেতাইচণ্ডীতলা, বাক্‌সাড়া, কৈপুকুর, কাশশ্যাওড়াপুকুর—এই ধরণের সব। দীঘি—সরোবরের শহর দ্বারভাঙ্গার ছেলে এখানের পুকুর দেখে নিরাশই হয়েছি, কিন্তু তাতে ঘুরে ঘুরে দেখার কৌতূহলকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। শিবপুরের সবই ছোট, অল্প পরিসর, একটা লম্বাদৌড়ের বড় রাস্তা নেই, সব আঁকাবাঁকা অপ্রশস্ত গলি ; একটা বড় পুকুর নেই, কৈপুকুরেও বড় রুই-কাৎলার না আটবারই কথা ; চোখ ধাঁধান সেরকম একটা বড় বাড়ি নেই, একটা পার্ক নেই, একটা মাঠের মত মাঠও নেই। সবই স্বল্প, খর্ব, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা লিরিক (Lyric) সৌন্দর্য ছিল। সেই সময়ের শিবপুরের কথা বলছি।

এছাড়া শিবপুরেরও ছিল তার 'ইডেন'।

পূর্বে বলেছি চওড়ায় শহর-শিবপুর গঙ্গা থেকে মাইল দুই-আড়াইয়ের মধ্যে নিঃশেষ।

এর পরেই শহর পাতলা হ'তে হ'তে বাংলার চিরন্তন শ্যামল পল্লী। প্রকৃতির নিজের হাতের গড়া 'ইডেন'। অন্তত আমার দৃষ্টিতে তো বটেই। এর আগে তো একেবারে এতখানি ক'রে দেখার সুযোগ হয়নি আমার, এমন সমগ্রতায়। শহরের সুরকির রাস্তা সরু হ'তে হ'তে সুরকি ফুরিয়ে কালচে-মাটির সঙ্কীর্ণতর পথ। দু'দিকে আম-জাম-নারকেলের বাগানের নীচে শ্যাওড়া-ভাঁট-বৈঁচি, আরও সব আগাছার জঙ্গল দু'পাশে রেখে চলেছি আমি। শহরের গন্ধ তখনও রয়েছে ব'লেই ওরই মাঝখানে দূরে দূরে কয়েকটা রং করা বাগান বাড়ি—শাপলভরা ছোটপুকুর—খানিকটা বাগান—কোনটাতে লোক রয়েছে, কোনটাতে তালা ঝোলানো। খানিকটা গিয়ে গোলপাতার নীচু চালের পল্লী-গৃহস্থের বাড়ি, খড়ের চালে মাথা ঢাকা মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘিরে উঠান। ...কে ডুরে শাড়ি প'রে এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল। চকিত নজরে আরও দেখা গেল, মাটির দাওয়ায় দেয়ালে ঠেকানো থান তিন চার কাঁসা-পেতলের ঝক্‌ঝকে বাসন। এরপরেই আরও একটু ভেতরের দিকে গিয়ে একটা একটু বড়গোছের ডোবা, জলে ভরা, সমস্তটুকু সবুজ পানায় ঢাকা।

মনে হ'তে হবে, কে যেন কি উৎসবের জন্য একটা সবুজ কারপেট্ বিছিয়ে রেখেছে। ওপারে পুকুর ঘেঁষে একটা লাল-রং-করা কোঠা বাড়ি; ঘরের সবুজ জানলার পাল্লা চারটে খোলা। লোক রয়েছে।

শিবপুরের চঞ্চল, স্তিমিত, জাগ্রত, সুপ্ত—সবরকম জীবনের চিত্র সঞ্চয় ক'রে ক'রে বেড়াতাম আমি।···একটা রংচঙে ছবিওলা শিশু-পাঠ্য-বই, শিশুর অশেষ কৌতূহল নিয়ে প'ড়ে যাচ্ছি আমি 'বাংলা'কে।

সেদিনের যা ছিল নিরুদ্দেশ অর্থহীন সঞ্চয়, উত্তর জীবনে সে সবই সার্থক হ'য়ে উঠেছে আমার কাছে। অন্য কারুর দৃষ্টিতে সার্থক ক'রে তুলতে পারলাম কিনা, সে চিন্তা আমার নয়।

মাঝে মাঝে বিরতি আসতো, তাইতে পুরনো হ'তে দিত না শিবপুরকে আমার চোখে। দু'টো বছরে যে চারটে লম্বা ছুটি পেতাম, গ্রীষ্ম আর পূজার অবকাশে, তাতে বাইরে চ'লে যেতাম; দ্বারভাঙ্গা আর মহম্মদপুরে; বাবার চাকরী স্থলে। দ্বারভাঙ্গা বাড়ীই। মহম্মদপুরেও বাবাকে নিয়ে এমন একটা নিজস্বতা ছিল, যার আকর্ষণ বা মোহ কম নয়। এবার সেখানকার জীবনধারার কথাও খানিকটা এনে ফেলা যায়। স্বল্প প্রবাস হ'ত হয়ত, কিন্তু সেও 'স্মৃতি-সমৃদ্ধ।'

দ্বারভাঙ্গা সেই পুরনো দ্বারভাঙ্গাই। এখন যুগধর্মে প্রগতির নানা পথ ধরে নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে; তখনকার দ্বারভাঙ্গায় ঘটনা ঘটতো খুব কম। রাজ নিয়ে যা কিছু একটু বৈচিত্র্য মাঝে মাঝে।

মহম্মদপুর আরও বৈচিত্র্যহীন, তবে তারই মধ্যে একটা অদ্ভুত মায়া বিস্তার ক'রে গেছে এক সময়। পথ চলতে চলতে তার সম্বন্ধে দু'টো কথা বলে নিলে মন্দ হয় না।

শিবপুরের সব ভাল হ'লেও একটানা বেশী দিন থাকলে আমার স্বাস্থ্য খানিকটা ভেঙ্গে পড়তো। বরাবর বিহারে বাস বলে বাংলার জল তেমন সহ্য হোতনা। মহম্মদপুর ছিল আমার রাঁচী-দেওঘর-মধুপুর। বড় ছুটি ক'টা পেলেই আমি সোজা চ'লে যেতাম। সেখানে দিনকতক—ছুটির বেশীরভাগই—কাটিয়ে 'লাল' হ'য়ে গিয়ে ছুটির বাকী ক'টা দিন দ্বারভাঙ্গা। তারপর ছুটি ফুরুলে আবার শিবপুর। ভরা স্বাস্থ্যে নবীভূত দৃষ্টি নিয়েই। মহম্মদপুরকে কি আখ্যা দেব বুঝতে পারছিনা। গণ্ডগ্রাম বলা দূরে থাক, গ্রাম বললেও অতিশয়োক্তির দোষ এসে পড়ে। একটা নাম পেয়ে গেছে কবে কি ক'রে, কিন্তু মাইল দেড় দুইয়ের মধ্যে তার নিজের গ্রামীন মানুষ নেই, একঘর মৎস্যজীবী ছাড়া। বাকী যারা, তারা অফিসের আমলা। বাইরের আমদানি। তাও বেশী নয়; আমি যখন যাওয়া-আসা শুরু করেছি, নীলের 'গৌরবময়' যুগ গিয়ে চাষবাসে,

জমিদারীতে নেমে এসে গোণাগুণতি আটদশজনে এসে ঠেকেছে। বড়বাবু, একাউণ্টটেণ্ট্, হাজিরীনবীশ, সেহানবীশ প্রভৃতি মিলিয়ে। বাবা ছিলেন ক্যাশিয়ার বা খাজাঞ্চি। আফিস থেকে খানিকটা দূরে বিঘে কয়েকের মধ্যে জড়-করা সবার 'কোয়ার্টার্স্'—উপযুক্ত নামের অভাবেই কথাটা ব্যবহার করতে হোল। খান তিনেক ক'রে ঘর, সবগুলো ইটের দেওয়ালও নয়। কারুরই পরিবার সঙ্গে নেই। স্থায়ী-অস্থায়ী মিলে এই বাসিন্দা মহম্মদপুরের। কোয়াটার্সের পাশ দিয়ে একটা বাঁধ, আন্দাজ পাঁচ ছয় ফীট উঁচু, একদিকে অফিস আর সাহেবের বাঙ্‌লো ছাড়িয়ে কিছু এগিয়ে গেছে, অপর দিকে মাইল দুই-আড়াই দূরে একটা গ্রাম পর্যন্ত।

বাঁধের পরে কোথাও তার গা ঘেঁসে, কোথাও খানিকটা স'রে গিয়ে বুড়ী-গণ্ডকী নদী সমান্তরালে ব'য়ে গেছে। ক'খানি কোয়াটার্সের মাঝখান দিয়ে একটা মেটে রাস্তা বাঁধ টপকে গণ্ডকীর খেয়া ঘাটে চলে গেছে। আমাদের বাসা থেকে অল্পদূরে। খেয়াঘাট ছিল আমাদের স্নানেরও ঘাট। সেখানে বহু পুরান অশ্বত্থ গাছের নীচে ফেরিঘাটের ঘাটওয়ালা তার দু'জন মাঝিমাল্লা নিয়ে থাকে।

ফুরিয়ে গেল মহম্মদপুর।

কিন্তু অল্প পরিচয়েও তার নিঃসম্বল রিক্ততা দিয়ে আমার জীবন যে কতখানি পূর্ণ ক'রে রেখেছে তা বলে বোঝাতে পারিনা। স্বাস্থ্যের জন্য যাওয়া, অল্পদিনেই অঞ্জলি ভ'রে এত দিয়ে দিয়েছে, যেন উপছে পড়ছে। তবু বলব এ দান তার স্থূল দানই। তার আসল দান ছিল তার নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে, তার স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে। আর সবচেয়ে বেশী তার শান্তপ্রবাহ গণ্ডকী দিয়ে।

স্বাস্থ্য থেকেই আরম্ভ করি।

মহম্মদপুরের ইঁদারার জল আর হাওয়ার যশ তো মানতেই হয়, তবে মনে হয় বাবার কৃতিত্বই ছিল বেশী; যদিও সে কৃতিত্বের মধ্যে এমন কিছু অভিনবত্ব ছিল না। স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে বাবার নিতান্তই একটা সহজ প্রক্রিয়া জানা ছিল; প্রচুর আর আকণ্ঠ আহার, পূর্বে শরীরটাকে একরকম উপবাসী রেখে তার গ্রহণ করার ক্ষমতাটা বাড়িয়ে দিয়ে। উপচারের একেবারেই বাহুল্য ছিলনা; অর্থাৎ সংখ্যায় বা বৈচিত্র্যে। পাণ্ডুলে জন্ম, পাণ্ডুলে মানুষ, বাবার নিজের অটুট বিশ্বাস ছিল—দুধ, ঘি, অড়রডাল আর রুটির ওপর। তরকারির মধ্যে আলু, আমিষের মধ্যে মাছ। আর সব ডাল—মুগ, মুসুর, কলাই এ সব তাঁর মতে ছিল রুগীর পথ্য, বলতেন ওসব বাংলাদেশের মানুষে খাগ; পেট-রোগার

দল। আলু ছাড়া আর সব আনাজ সম্বন্ধেও প্রায় ওই রকম অভিমত অর্থাৎ পুষ্টাইয়ের অল্পই আছে, শুধু রসনার তৃপ্তি।

যাওয়ার পরদিন থেকেই আমার রুটিন শুরু হ'য়ে যেত।

উনি নিজে উঠতেন খুব ভোরে। বোধহয় সন্তানের প্রতি মমতার জন্য অত ভোরে আমায় তুলতেন না, তবে নিজে প্রস্তুত হ'য়ে স্নান করতে যাওয়ার সময় আমার অনিচ্ছার মধ্যে যথেষ্ট কাতরতা প্রকাশ পেলেও রেহাই ছিলনা। সেও ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বে..."যাও বেড়িয়ে এসো"। মাইল তিনেকের একটা চক্কোর দিয়ে ফিরতাম সাহেবের বাগানের পাশ দিয়ে, খোলা মাঠ—ঋতু-অনুযায়ী ধান-যব-গম-আখের বড় বড় চাকলা হয়ে। তখন খানিকটা বেলা হয়েছে। উনি প্রাতঃকালীন আফিসের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে তামাক খাচ্ছেন। আমি জামা-জুতো ছেড়ে তেল নিয়ে বসলাম। ওঁর দ্বিতীয় বিশ্বাস ছিল তেল মাখায়। তখন আবার বাঙ্গালীই বড় হ'য়ে যেত, বলতেন এ-অভ্যেসটা রেখে গেছো তো? বলে, তেলে-জলে বাঙ্গালীর শরীর। কবিরাজী শাস্ত্রেও রয়েছে—ঘিয়ের চেয়ে তেল সেরা, তবে ঐ 'মর্দনে ন তুভক্ষণে'। উনি বেরিয়ে যেতেন, আমি আরও অনেকক্ষণ ধরে তৈলচর্যায় লেগে যেতাম।

পাণ্ডুলের মত এখানেও দু'বার আফিস, সকাল-বিকাল। সব আমলারা চ'লে গিয়ে নিঝুম পাড়া একেবারে পড়ত ঝিমিয়ে। ঘরে শেকল তুলে দিয়ে গণ্ডকীর দিকে পা বাড়াতাম। প্রথম দু'চার দিন কষ্ট হোত। যতক্ষণ বাবা রইলেন, তারপর শিবপুর এসে শূন্যতার ফাঁকগুলো ভরাট ক'রে দিত—এই সময়টা কি করছি—এই সময়টা কোথায় আছি··· মনটা আইঢাই ক'রে উঠত। স্নান সেরে এসে অল্প কিছু মুখে দিয়ে বইগুলা নিয়ে বসতাম। তাতেও সদ্য ছেড়ে আসা শিবপুর!

"মুখেদেওয়ার" একটু টীকা দরকার। চাকরটা যে হালুয়া ক'রে রাখতো তার একটা খুব অল্প অংশ—গোড়ায় গোড়ায় এক চতুর্থাংশের কম, আমার জন্য আলাদা ক'রে রাখা থাকতো। বাকী তিনচতুর্থ অংশটা, শুনতে গাল ভরা হলেও, আসলে হোত অল্পই। বাবা গুরুভোজনে বিশ্বাসী হ'লেও নিজে ছিলেন খুব মিতাহারী। বরাবরই দেখেছি। শুধু ছেলেদের উৎসাহ বর্ধন করবার জন্য পাণ্ডুলে আমাদের বয়সে কি রকম আহার করতেন তার গল্প করতেন। আমাদের বয়সে ওঁর আহারের পরিমাণ দেখবার সুযোগ না থাকায়, বিশ্বাস ক'রে বিস্মিত হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিলনা।

এদিকে মিতাহারী হওয়া ছাড়া, আহার ছিল অত্যন্ত পরিস্কার। দু'টি

শতান্ন ছাড়া কিছুই প'ড়ে থাকতো না পাতে, যা থেকে মনে হোতে বাধ্য, যার এত ক্ষুধা, না জানি তার আয়োজন কত ছিল। কিন্তু তা আগাগোড়া যে না দেখল তার পক্ষে। সকালে আমার এত সংক্ষিপ্ত বরাদ্দ অবশ্য তাঁরই ব্যবস্থা। ছুটো প্রধান আহারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা ক্ষুধাটাকে শাণিত ক'রে রেখে। তবে, আয়োজন ছিল পরিমাণে যেমন গুরু, পদের বা বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে তেমনি লঘু। প্রথমে ভাতের সঙ্গে প্রচুর ঘি আর আলুভাতে; দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘন ভাজা অড়রডাল, আলুর বড় তরকারি, প্রচুর তৈলসিক্ত; তৃতীয় পর্য্যায়ে একবাটি মহিষের ছুধ। ঘন ক'রে জ্বাল দেওয়া। ঘি আর ছুধ একেবারে খাঁটি। ছুধটা বাবা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতেন এমন মহিষের, যার শেষের দিকে ছুধটা শুকিয়ে ঘন হ'য়ে এসেছে। এদের ভাষায় বলে "বকৈন্ মহিষ।"

এ-আহারটা হোত একটার পরে, বাবা আফিস থেকে ফিরে এলে। ছুপুরে এক চোট নিদ্রা। অত গুরু ভার দেহে বহন ক'রে পড়াশোনা করা সম্ভব ছিল না। মনের জোর ক'রে বসতে গেলেও চোখ আপনি বুজে আসতো। সন্ধ্যার খানিকটা আগে একবার একটা চক্কোর দিয়ে আসা।

এ সময় জলযোগের কোন ব্যবস্থাই থাকত না। রাত্রে আহারের প্রস্তুতিতে কাটাতে হোত। তার ব্যবস্থা হ'তে মহম্মদপুরের হিসাবে রাত্রি গভীরই হ'য়ে যেত। প্রায় দশটা।

ছু'বেলাই দেরিতে ভোজনের কারণ, বাবা স্বপাক-আহারী ছিলেন। তাঁকে ক'রে তুলেছিল বলাই ঠিক হবে। তার একটু ইতিহাস আছে। এদেশী এক পাচক ঠাকুর রাখেন প্রথম-প্রথম; বিলট্ মিশির, কি ঐ-ধরণের একটা নাম। ভালো ছুধ, ঘি খেতে উনি অভ্যস্ত, বাকী যা তাতে উন্নত রন্ধনশিল্প কোন প্রয়োজন হয়না। চ'লে যাচ্ছিল এক রকম ক'রে, তাকে খানিকটা দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে। শুকো মাইনে, ছুবেলা রেঁধে দিয়ে আহার করিয়ে চ'লে যাবে। বাড়ী ক্রোশটাক দূরে একটা গ্রামে।

একদিন সকালে কি একটা দরকার পড়ায় বাবা বাসায় এসে দেখেন ঠাকুর তাঁর থালে দাল ভাত তরকারি নিয়ে আহারে প্রবৃত্ত। দালটা আঁট হ'য়ে যাওয়ায় বাঁ হাতে হাতাটা নিয়ে বোক্‌নয় ডুবিয়েছে; বাবার জুতার শব্দে ঘুরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল। নদীতে মাছ ধরা হচ্ছিল। চাকরটাকে দেখতে পাঠিয়ে দিয়েছে, বড় মাছ উঠলেই বাবুর জন্য নিয়ে আসবে। ওদিক থেকে দামটাও নিয়ে আসবে আফিস থেকে। চাকরটা পুরনো হ'য়ে গেছে। বিশ্বাসীও, ভাঁড়ারটা তার হাতেই খানিকটা রাখা ছিল, ভাল মাছ পেলে বাবুর ভাত দাল তরকারি কিছু

বাড়তি প্রয়োজন হ'তে পারে ব'লে, বাবা বের ক'রে দিয়ে যাওয়ার ওপর কিছু চাপিয়ে নিয়েছিল।

একটু 'ক্যাবলা' দেখেই রেখেছিলেন বাবা বামনটাকে; মাঝে মাঝে তার পরিচয় পেয়ে নিশ্চিন্তও ছিলেন। বুদ্ধির দৌড় দেখে পত্রপাঠ বিদায় ক'রে দিলেন, আর রাখেন নি অন্য কাউকে।

রন্ধনে বাবা বেশ দক্ষই ছিলেন, বিশেষ করে যে ধরণের আহার তাঁর, মাংসটাতো খুবই ভালো রাঁধতেন। বাড়ীতে থাকতেও উনি এক একদিন শখ ক'রে রাঁধবার জন্যই বিশেষ ক'রে মাংস আনিয়ে নিতেন। স্বপাকে রাঁধায় আমার একটা লাভ হোত। এই সময় বাবাকে একটু পেতাম ভালো ক'রে। অন্যত্র দু'এক জায়গায় ব'লে থাকব, বাবা অত্যন্ত রাশ-ভারী মানুষ ছিলেন। যার জন্যে নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে, ওঁকে সাধারণত এড়িয়েই যেতাম। অল্প-স্বল্প দরকারে মা'র দ্বারস্থ হ'তে হোত। অনেক পরে ভাইঝি রাণু একটু বড় হ'য়ে উঠলে সেই মধ্যস্থতা করত।

এখানে দু'জন দু'জনের সম্বল, পিতাপুত্রের সহজ সম্বন্ধটা এসে পড়বার অবসর পেত।

আফিসের সাজগোজ ছেড়ে, সকালের কাচা কাপড়টা প'রে খড়ম পায়ে দিয়ে বাবা এসে বসতেন হেঁসেলে, যেন একটি শুচিতা সঙ্গে ক'রেই। আমি আসতাম। দেরি হ'লে ডেকে নিতেন। চাকর যোগাড় ক'রে দিচ্ছে আলগোছে, চড়িয়ে দিয়ে গল্প ক'রে যাচ্ছেন বাবা। যখন যেদিক্‌টা গেলেন। ঠাকুরদার সময় থেকে আমাদের পরিবারের কথাই বেশী, তাতে আনন্দও বেশী পেতেন। তাছাড়া তাঁর নিজের জীবনদর্শন, ঘটনাবহুল জীবনের বৈচিত্র্য।

প্রথম সপ্তাহ খানেক একটু একঘেঁয়ে লাগতো; দুপুর আর রাত্রি এই দু'টি সময় ছাড়া। খাওয়ার দিকে, গুরুভোজনের দুশ্চিন্তা নিয়ে ও রকম প্রায়োপবেশন নিশ্চয় আনন্দের ছিল না, কিন্তু একটু একটু ক'রে শুধু সয়ে এল এমন নয়, তার বৈচিত্র্যহীন স্তব্ধতার মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগলাম। একটা জিনিষ নিশ্চয় আমার সহায়ক হ'য়ে উঠছে, আমি ইতিমধ্যে অলক্ষে স্বাস্থ্য সঞ্চয় ক'রে যাচ্ছি। কার যাদু-মন্ত্রে যা ছিল tedious, ক্লান্তিকর তা শুধু সহনীয় নয়, হ'য়ে উঠেছে লোভনীয়; যা ছিল বিরস, মনটাকে ঠেলে রাখত, তা যেন অপূর্ব মাধুর্য নিয়ে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।...সকালে আর ডেকে তুলতে হয়না। বাবাকে অবশ্য এড়িয়ে যেতে পারিনা, তবে তাঁর সন্তর্পণ-চলা-ফেরার মধ্যে দূরে কাছে দু'একটা প্রভাতী পাখীর আওয়াজ কানে গেলেই আমি উঠে প'ড়ে বেরিয়ে যেতাম। একটা আগ্রহ নিয়েই; মনে

হোত এরই মধ্যে এই পল্লী প্রভাতের কতখানি হারিয়ে ফেললাম। এর পর ফিরে এসে বাবার সঙ্গে একটু গল্প, ওঁর তামাক খাওয়া আর আমার বিলম্বিত তৈলচর্যার মধ্যে। তারপর উনি চ'লে গেলে গণ্ডকীতে অবগাহন-স্নান। সে যে আবার কি অপরূপ!

নদীর মধ্যে গণ্ডকীর মতো কোন নদীই আমার জীবনের এতখানি অধিকার ক'রে নেই। তার জলটা নীল, তবে একটু বিশেষ ধরণের। অন্য সব নদীর জলের মতো আকাশ-নীল নয়, অল্প একটু সবুজের ছোঁয়ায় আরও যেন নরম, মোলায়েম; যাকে ঠিক বট্‌ল গ্রীন (Bottle green) বলা যায়। এর সঙ্গে তার শান্ত প্রবাহ। নেমে আগে খানিকটা সাঁতার কেটে নিতাম। খুব বেশী চওড়া নয়।

এ-পার ও-পার ক'রে মাঝামাঝি এক জায়গায় গা ডুবিয়ে মাথা জাগিয়ে থাকতাম দাঁড়িয়ে। হাত ছ'টাকে তার প্রবাহে ছেড়ে দিয়েছি—আস্তে আস্তে তুলে, নামিয়ে, ছ'দিকে সঞ্চালিত ক'রে। অবগাহনই নয় শুধু, আমি আমার মনের গভীরে সমস্ত মন দিয়ে গ্রহণ ক'রে যাচ্ছি গণ্ডকীকে। বিশেষ ক'রে তার ঘননীল শান্ত প্রবাহকে।...জীবনটা হয়না এই রকম?...

বিকালের পর্যটনেরও রূপ গেছে বদলে।

গ্রীষ্মাবকাশে প্রবাসে ছুটি শেষ হ'য়ে আসার কাছাকাছি বর্ষা নামত। কুঠীর যে রাস্তাটি আমি বেশী ব্যবহার করতাম—ছ'দিকে ঘন সন্নিবিষ্ট শিশুগাছের মধ্য দিয়ে, তার ছু'ধার, কয়েকশ' একর (Acre) মাঠের চাকলা ছ'টো যেত জলে ডুবে। তখন আর এক রূপ। অপরূপই। মুক্ত হাওয়ায় ছু'ধারের জলে বড় বড় ঢেউ, একদিকে হাওয়ার তোড়ে সেগুলা লাফিয়ে লাফিয়ে এসে ভেঙে পড়ছে রাস্তার গায়ে। অপরদিকে ভাঙা ভাঙা মেঘের গায়ে কত রঙের তুলি বুলিয়ে অস্তাচল-লগ্ন সূর্য।

উঠে আসতে মন সরত না। একটা ছোট ইটের পুলের ওপর বসে শান্ত আর রুদ্রের যৌথ লীলা দেখতাম। এক একদিন চটক ভাঙতে দেরি হ'য়ে যেত। গা ছম ছম করত ঐ রাস্তাটুকু পেরিয়ে সদর রাস্তায় না ওঠা পর্যন্ত। আখের খেতে বুনো শূকরের ভয়। আজ স্মৃতি মাত্র হ'য়ে গিয়ে সে-অনুভূতিটাও পুলক জাগায় মনে। এর পর আর একটা অবদান মহম্মদপুরের, ফিরে এসে মুখহাত ধুয়ে কুঠীর সান্ধ্য মজলিসটিতে এসে শরিক হ'তাম। মহম্মদপুরের আর সবকিছুর মতো সেও একটা মহম্মদপুরেরই নিজস্ব জিনিস। আফিস থেকে এসে থিতিয়ে জিরিয়ে প্রায় সবক'টি আমলা নিশ্চিন্ত মনে বাঁধের চৌমাথাটিতে বসেছেন, যেখানে খেয়া ঘাটের রাস্তাটা বাঁধটাকে ডিঙিয়ে গেছে। বাবার হাতে

হুঁকো; আরও কার একটা হুঁকো হাত বদল ক'রে ফিরছে—দিনগত আফিস সংক্রান্ত গল্প থেকে নিয়ে রাজা-উজির মারা পর্যন্ত শ্রুতিরোচক সব রকম খোস গল্প। মাঝে মাঝে প্রসঙ্গ ভেঙ্গে তুলসীদাসের দোঁহা, কবীর, দাদু, যার যে রকম জানা আছে। বাবারও স্টক কম নয়। একটার গায়ে একটা এসে প'ড়ে একটা বেশ বৈচিত্র্য ছিল তার মধ্যে। হাসির দিক্‌টা পুরো করতেন হেডক্লার্ক লালবাবু। আমুদে লোক, বলবার ভঙ্গিটী যেমন ছিল, তেমনি গল্পের ভাণ্ডার। বিশেষ ক'রে ওঁদের দিকের গল্প করতেন। লালবাবু ছিলেন মোতিহারী জেলার লোক। মোতিহারীর একটি ছোট পরগণার বাসিন্দার জন্য জায়গাটা নাকি প্রবাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। "বাগড়্" ব'লে তারা একটা আলাদা নামেই চিহ্নিত। তাদের গল্প এসে পড়লে আসর একেবারে জমে উঠত।

আর একভাবে জমে উঠত রামাশ্রের গানে। লালবাবুর দু'টি বছর দশবারো বয়সের ভাইপো তাঁর কাছে থেকে পড়াশুনা করত। রামাশ্রে (রামাশ্রয়) ছোট। অদ্ভুত মিষ্ট গলা। পড়বার সময় ব'লে তাকে নিয়মিত পাওয়া যেতনা। তবে এক একদিন তুলসী-কবীর-দাদুর ভাগ বেশী হ'য়ে ঐ-রসেই সবার মন সিক্ত হ'য়ে উঠলে, অনুরোধ পড়েই বা নিজে হ'তেই লালবাবু তাকে ডেকে নিতেন। যাকে কোকিল-কণ্ঠ বলে রামাশ্রের ছিল তাই। তার বেশীর ভাগ গানই ছিল রামায়ণ-মহাভারত থেকে। দু'একটা ছাড়া-ছাড়া কথা নিয়ে এখনও সে সুর কানে ভেসে আসে। একটার গুটি তিনেক ছাড়া-ছাড়া পংক্তিও—

বিনা রঘুনাথ কো দেখে
দশরথ কো……নাহি দিলকী কড়াড়ি হ্যায়।
কাঁহা রাম, কাঁহা লছুমন, কাঁহা—সীতা বেচারী হ্যায়।
ধরণীপর ভরত লুটে, নয়ন সে নীর জারি হ্যায়…

রামায়ণের মূল সুরটি বেদনায় ভরা, লঙ্কাকাণ্ডের অতবড় শৌর্য-কাহিনীও তাকে চাপা দিতে পারেনি। মুক্ত, উদাত্ত কণ্ঠের সুরে সমস্ত আকাশটাকে দিত ভরাট ক'রে রামাশ্রে। অনেককেই কাপড়ের খুঁট তুলে চোখে চেপে ধরতে হোত।

দিনের সময়টা আমাদের কুঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বিশেষ ক'রে, দু'বেলা আফিস হওয়ার জন্যে; সন্ধ্যার পর থেকে সম্পূর্ণ আমাদের নিজের। সেই জন্যই রাত্রের আহারটা খুব একটা বাঁধা ধরা সময়ে হ'তে পেত না সব-দিন। মজলিস যদি জমে উঠল, লালবাবুর গল্পে বা রামাশ্রের গানে, তাহ'লে তো কথাই ছিল না।

রাত্রে রুটির ব্যবস্থার জন্যে সময়ের একটু সুসরও হোত। চাকরটা রুটি সেঁকে, দুধ জ্বাল দিয়ে রাখত। দালের বাঁটলোয় দাল ছেড়ে দিয়ে নরম আঁচে বসিয়ে রাখতো, মজলিস ভাঙলে বাবা গিয়ে সাঁৎলে নামিয়ে নিতেন; তারপর তরকারি চড়িয়ে দিতেন। শেষ হ'য়ে গেলে আমরা খেতে বসে যেতাম।

আমার রুটি স্বাস্থ্যের অবস্থা বুঝে ছ'টা কি সাতটা থেকে শুরু হোত, আধাআধি দাল তরকারি, আর ভাল ক'রে জ্বাল দেওয়া বকৈন্ (অর্থাৎ পুরনো-প্রসূতি) মহিষের দুধের, তারপর প্রতি সপ্তাহে গড়-পড়তায় একখানা ক'রে বাড়ত। সংখ্যার দিকে। পুষ্টিত্বের দিকেও একটা পরিবর্তন হোত। রুটিগুলা ঘিয়ে জবজবে ক'রে মাখানো থাকতোই, পরে তার একটা জায়গায় একটু ছিঁড়ে তার মধ্যে খানিকটা ঘি ঢেলে চালিয়ে দেওয়া হোত।

আহারের মধ্যে স্বাস্থ্যের দিকটা প্রধান হ'লেও আর একটা দিক বিচার ক'রে দেখবার আছে; রুচি, স্বাদ, আনন্দ। আজকের এই ঘৃতহীন যুগে 'ভেতরে-বাইরে ঘৃত'—কথাটা শুনলেও রসনায় জল আসে বটে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেদিন তা মোটেই হোতনা। কাঁচা ঘিয়ে মুখ মেরেই দিত। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। মহম্মদপুরের জল, হাওয়া, আর বসে বসে শুধু হজম ক'রে যাওয়ার নিরুপদ্রব, নিশ্চিন্ত জীবন—সব ছিল বাবার স্বপক্ষে।

যাই হোক, আহারে আনন্দ না থাক, স্বাস্থ্যের মধ্যে একটা বড় রকমের আছেই। আহারের বৈচিত্র্যহীনতায় যেমন দুঃখ পেতাম, তেমনি আবার দেহমন পুষ্ট হ'য়ে আসার সঙ্গে মহম্মদপুরের বৈচিত্র্য-হীনতাতেই, রিক্ততাতেই আনন্দ যেন ধীরে ধীরে যেত বেড়েই। বাসা থেকে দূরে, কুঠী থেকেও আরও অনেকটা সরে নদীর মধ্যে ছোট্ট দ্বীপের মতো ছিল, নূতন একটা শিশু-চর, হাত দশেক চওড়া হাত পনের লম্বা, কচি ঘাসে ঢাকা। বেশী ভেতরের দিকে নয়; হাঁটুর অর্দ্ধেকও ডোবে না এই রকম একটা স্রোতের ফালি জুতো-হাতে পেরিয়ে কত সন্ধ্যা যে কাটিয়েছি সেখানে! জনমানবশূন্য, গো-মহিষেরও রব নেই কোথাও, শুধু একটা বোধহয় জলচর পাখী—"টিট্টিই···টিট্টিই···" ডাকে মাঝে মাঝে একটানা যাচ্ছে ডেকে। বসে থাকতাম। কেউ নেই, কিছু নেই; শুধু যেন নিঃস্তব্ধতাকেই সঙ্গী ক'রে। কত স্তব্ধ গ্রীষ্মের দুপুর ফেরী ঘাটের অশ্বত্থের নীচে বসে কাটিয়েছি। উগ্র তাপে সমস্ত জীবন স্তব্ধ, নিশ্চল। ঘাটোয়াল, তার মাঝিমাল্লা, সব নিদ্রাগত। ক্বচিৎ একটা গরুর গাড়ী এসে পড়ল, কি, দু'চার জন মানুষ এসে জমলো ঘাটে,

একটা তন্দ্রালস জাগরণে একটু সাড়া পড়লো। আবার যেন দ্বিগুণ স্তব্ধতা। শুধু মাথার ওপর মন্থর বাতাসে অশ্বত্থ পাতার পৎ-পৎ শব্দ আর নদীর জলের কুল কুল কলতান, যেখানে স্রোতটা গাড়ী পার করাবার বড় ফ্ল্যাটে (Flat) ধাক্কা খেয়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

নিশ্চুপ হ'য়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকতাম। বসে বসে স্তব্ধতার অতলে যেতাম তলিয়ে।

আর একটি এইরকম স্তব্ধতার জন্য মন থাকতো উন্মুখ হ'য়ে। তবে সে স্তব্ধতায় একটু বীচি-ভঙ্গ ছিল।

—রাত্রে আহার সারা হ'য়ে গেলে আমরা দু'জনে বাইরে এসে উঠানে বসতাম; বাবা কুঠীর ছুতারমিস্ত্রির তৈরী একটা শিশুকাঠের চেয়ারে, আমি সামনে একটা টুলে। বাবা গল্প করতেন, আমি শুনতাম। আমাদের বংশ আর পরিবার নিয়ে বেশীর ভাগ গল্প। চাতরা, তার সঙ্গে কলমীলতার ডাঁটার মতো আরও সব জায়গার কাহিনী টেনে—ওঁর মামার-বাড়ী ন'গাঁ, জ্যাঠামশাইদের বাড়ী চানক—ব্যারাকপুর। দশঘরা-মহম্মদপুর গ্রাম একেবারে সুপ্তিমগ্ন—উঠানের মাঝখানে বাবার একটানা গল্প হুঁকার আওয়াজের মধ্যে এসে বেধে বেধে যাচ্ছে। এইসময় সমস্তিপুর-মজঃফরপুর-লাইনে একটা গাড়ী যেত। এক এক দিন তাঁর বাঁশীর একটা খুব মিহি আওয়াজ প্রায় পাঁচ ছ' মাইলের স্তব্ধতা ভেদ ক'রে কানে পৌঁছাতো। বাবা হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়তেন। বলতেন—"রাত হ'য়ে গেছে; যাও, শুয়ে পড়োগে।"

একবারের কথা, সেও এই রকম হঠাৎ বিরতি—কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। নিথর শান্তি কিন্তু সে শান্তির প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেবারও গ্রীষ্মের ছুটিতে মহম্মদপুরে গেছি। সকালে বেড়িয়ে ফিরেছি, বাবা আফিস যাওয়ার প্রস্তুতিতে তামাক খাচ্ছিলেন, যেন অপেক্ষাই করছিলেন আমার জন্যে, দাঁড়িয়ে উঠে হুঁকোটা পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে বললেন—"তুমি তৈরী হ'য়ে নাও, আজই চ'লে যাও দ্বারভাঙ্গায় দুপুরের গাড়ীতে।"

একটু যেন চিন্তিত ভাব, মুখটাও যেন একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন যাতে মুখের ভাবটা দেখতে না পাই।

এত হঠাৎ যে, কথা ধক্ ক'রে লাগলো বুকে। শুষ্ক মুখেই প্রশ্ন করলাম—"বাড়ীর কোন চিঠি পেয়েছেন নাকি?" বললেন—"না", দিনচারেক আগে সেই যেটা পেয়েছি...খবর ভালই।..."তুমি তৈরী হ'য়ে নাও। আমি সকাল সকালই আসছি।"

একটা কথা আরও মনে প'ড়ে যেতে আমি আরও শুষ্ক মুখে প্রশ্ন করলাম—"আপনি একা থাকবেন ?"

বাবা আমার মুখের উপর একটু দৃষ্টি ফেলে রেখে বললেন—"ক্ষতি কি ? প্রায় সবাই চ'লে গিয়ে আফিসে কাজের একটু চাপও পড়েছে এখন।...তুমি তৈরী থেকো।" চাকরটাকে হু'টো উনুন জ্বেলে হু'টো পাত্রে চাল আর ডাল ছেড়ে দিতে ব'লে বেরিয়ে পড়লেন।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে এসে বললেন—"তাহ'লে চলো আমিও যাই তোমার সঙ্গে। ছুটি নিয়ে এলাম দিন সাতেকের।"

পেছনে একটু কাহিনী রয়েছে। তাতে মহম্মদপুরের আর একটা দিকের সঙ্গে বাবার চরিত্রেরও আর একটা দিক স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। সেকালে মহামারীটা হোত বেশী। প্লেগটা গাঁয়ের দিকে বেশী ঘেঁষত না, তবে কলেরা আর বসন্তটা প্রতিবৎসর একরকম নিয়মিতই ঝাঁটা বুলিয়ে যেত। যেবারের কথা বলছি, সেবারে মহম্মদপুরে কলেরাটা চারিদিকে উগ্রভাবেই দেখা দিল। যেন এগিয়েও আসতে লাগল কুঠীর-মহম্মদপুরের দিকে।

নিকটতম গ্রামে হু'একটা কেস হ'য়ে গেল। মাইল পাঁচেকের মধ্যে হু'একজন বৈদ্য ছাড়া হেঁতুড়ে ডাক্তারও নেই। সমস্ত তল্লাটটা ভয়ার্ত্ত হ'য়ে উঠল। আমলারা প্রায় সবাই ছুটি নিয়ে গেছে, রইলাম শুধু আমরা, লালবাবু, হাজরীনবীশ, আর বোধ হয় অন্য একজন। লালবাবু ভাইপো হু'টিকে দিলেন বাড়ী পাঠিয়ে।

বাবা সম্পূর্ণ অবিচলিত, অন্তত বাইরে বাইরে তাই দেখতাম। আমিও ছিলাম তাই। প্রথমত, দুশ্চিন্তা আর ভয়ের মতো সাহস আর নিশ্চিন্ততার একটা সংক্রামকতা আছে, তার ওপর জায়গাটার নির্জনতার জন্যে প্রত্যক্ষ কিছু চোখে পড়তো না, খবরাখবরও ততকিছু কানে আসত না, প্রত্যক্ষ করবার একটা পথ ছিল—যম-রাজার নিজের বাঁধানো পথ। মাইলখানেকের ভেতরেই নদীর তীরে চারিদিকের গ্রামের শ্মশান। আমি বেড়াতেও যেতাম কখনও কখনও। এদিকে বন্ধই হ'য়ে যায়!

জানবার আর একমাত্র সূত্র বাবা। কিন্তু বাবা একেবারেই তুলতেন না ব'লে, আমিও কোন প্রশ্ন করতাম না। শুধু আহারের পরিমাণটা এই 'সুযোগে' কমিয়ে আনবার লোভে একদিন বলি—"শুনছি হাওয়াটা নাকি চারিদিকে বড় বিগড়েছে, একটু কমিয়ে দিতে হোতনা খাওয়াটা ?"

বললেন—"মোটেই নয়। এসব রোগে পেটটা পরিস্কার থাকলেই আর ভয়ের কিছু থাকেনা।" এর দিনতিনেক পরেই বাবা বললেন—

"চলে যাও দ্বারভাঙ্গায়।" ঘণ্টাখানেক পরেই আফিস থেকে এসে বললেন—"তাহলে চলো আমিও না হয় যাই।"

—এটা নিশ্চয়ই তখন আমার মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখে।

ব্যাপারটা ভেবে দেখবার চেষ্টা করেছি। বাবার সাহস ছিল অদ্ভুত; সেই সাহস আর ধৈর্য নিয়ে তিনি একা জীবন সংগ্রামে এগিয়ে গেছেন, জয়ীও হয়েছেন। কিন্তু 'উপযুক্ত' ছেলের সঙ্গে, একটু কিছু হ'লেই নিরুপায়ভাবেই তাকে মৃত্যুদূতের হাতে সঁপে দেওয়া ভিন্ন আর কিছু করার নেই—এ অবস্থার মধ্যে যত দুর্দমনীয় সাহসই হোক্ তাকে মাথা হেঁট করতেই হয়। তাই করতেও হোল বাবাকে।

তবু প্রশ্নটা থেকেই যায়। একেবারে চরম অবস্থায় না পৌঁছান পর্যন্ত নিজের সংকল্পে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাটা আসে কোথা থেকে? এবারে আমার ক্ষেত্রে নত করলেন মাথা, সেবার প্লেগের সময় পিসিমার বাড়ী মাধেপুরায় গেলেনই না। সমস্ত পরিবারের জীবন বিপন্ন জেনেও। কারণটা কি?

এরপর তাঁর সমস্ত জীবন পর্যালোচনা ক'রে উত্তরও পেয়েছি—

বাবার মধ্যে ধর্ম-বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিশেষ কোন বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। তাঁকে একবার মাত্র গায়ে নামাবলী জড়াতে দেখেছি, বোধহয় আমার ছোট বোন লীলার বিবাহে; সম্প্রদানের পিঁড়িতে। তবে আপাত-ঔদাসীন্যের গভীরে কোথাও বা কিছুতে একটা অটল-অনড় নির্ভরতা ছিলই—তা নিজের অর্জিত নিয়তিই হোক বা একজন পরমনিয়ন্তার করুণাই হোক। কখনও প্রকাশ ক'রে বলেন নি তিনি।

পূর্বে পূর্বে ক্ষুব্ধ হওয়ারই কারণ হয়েছে, যেমন সেবার প্লেগের সময়। উত্তর জীবনে এসে বিস্মিতই হয়েছি।

দ্বারভাঙ্গায় আসতে ঠাকুরমা মৃদু তিরস্কারই করলেন, মাও অনুযোগের কণ্ঠে বললেন—"জানি, তুমি তোমার এই জিদের জন্যে কোন্‌দিন একটা সর্বনাশ ঘটাবে; আছে তা অদৃষ্টে আমার।"

বাবা বললেন—"দেখেছি, সত্যিই ভয়ের কিছু না থাকলে হাজার বিপদের মধ্যেও মনটা নিশ্চিন্দিই থাকে। সেইভাবেই কাটছিলো। তারপর উপরো উপরি দু'টো ব্যাপার হোলো। আগের দিন নাইতে যাওয়ার সময় দেখি, পথের পাশে মড়ার হাত প'ড়ে রয়েছে, সবাই পয়সার অভাবে পোড়াতেও তো পারেনা; শেয়ালে শ্মশান থেকে টেনে এনেছে আর কি। নেয়ে ফেরার সময় দেখি সেটা নেই। মনটা খারাপই

হ'য়ে গেল। মাত্র দিন কুড়ি এসেছে বিভূতি, গায়ে একটুও মাংস লাগেনি— দোমনা হ'য়েই কাটল সমস্ত দিন। তারপর—মনের এইরকম অবস্থায় যা হয়। রাত্তিরে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম—ঘুমুচ্ছিলাম, কে যেন আমার খাটের শিয়রে দু'দিকে দু'টো হাত দিয়ে মুখের উপর ঝুঁকে বলছে— "তুই দিবিনি বাড়ী পাঠিয়ে বিভূতিকে—দিবিনি? দিবিনি?'.... স্বপ্ন স্বপ্নই, তবু ভাবলাম এরকম একটা অশান্তি মনে পুষে রাখার কোন মানে হয় না। নিয়েই এলাম।"

শিবপুরে থাকতে বার চারেক যাই মহম্মদপুরে, এরপর পাটনায় থাকতেও ক'বার, বোধহয় কাছে হওয়ার জন্য বেশীই; তারমধ্যে এরকম ভয়াবহ রূপ মহম্মদপুরের সেই একবারই দেখেছিলাম। তাতে তার সজীব স্তব্ধতার চিরন্তন রূপটিকে কখনও মলিন ক'রে দিতে পারেনি।

দ্বারভাঙ্গায় শেষের দিনকতক কাটিয়ে শিবপুরে চ'লে আসতাম। শিবপুর ছাড়বার পর যেমন ক'টাদিন শিবপুরই মনটা জুড়ে থাকতো, ফিরে আসার পর মহম্মদপুরও তেমনি ক'রেই তার শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতা দিয়ে মনটা ভরিয়ে রাখতো। তবে, জীবনই আনন্দ, চারিদিকে বেগচঞ্চল জীবনের ভারে মহম্মদপুর মন থেকে সরে যেতে দেরি হোত না।

আমাদের ক্লাব আর আমার নিরুদ্দেশ, নিঃসঙ্গ পর্যটন ছাড়া শিবপুরকে পেতে আমায় আর একটি জিনিস যা বেশী সাহায্য করতো, এক হিসাবে ও দু'টোর চেয়ে বেশী ক'রেই, তা তার নিমন্ত্রণগুলা— বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন উপলক্ষে—কখনো কখনো, বেশী অন্তরঙ্গতা থাকলে, ব্রত-অন্নপ্রাশনেও। ভোজ জিনিসটাই বোধ হয় সামাজিক আদান প্রদানের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান; নিশ্চয়ই সবচেয়ে আনন্দেরও। এর বড় কারণ—সবটুকু পরস্মৈপদী, রসনা-তৃপ্তির সঙ্গে, সে-তৃপ্তির আহরণের যে-উদ্বেগ আর ব্যয়ভার তার কোন সম্বন্ধ থাকেনা; একদিকে যত বেশী রসনা তৃপ্তির আয়োজন, অপর দিকে ততই বেশী উদ্বেগ আর ব্যয়-বাহুল্য তো।

একদিকে বহু-বৈচিত্র্যে উদরপূর্তি ছাড়া ভোজের আর একটা গুণ আছে, যাতে নিমন্ত্রণ-বাড়িকে আরও আকর্ষণীয় ক'রে তোলে; মেলা-মেশা, আলাপ-আলোচনার সুযোগ। যেমন পঙ্‌ক্তিতে হাত চালাবার সঙ্গে সঙ্গে, তেমনি বাইরে বসে পঙ্‌ক্তিতে বসবার প্রতীক্ষায়। পাওয়ার মধ্যে মনটা তো সরস থাকেই, প্রত্যাশার মধ্যেও মনের সরসতা কম থাকেনা। কত রকমের গল্প, কত রকমের সমালোচনা, কত মুখরোচক

পরচর্চা, নিন্দাসুখ্যাতিতে—দরকার হ'লে অতীতের ঘটনাবলী টেনেও—আমি তো নিমন্ত্রণ-বাড়ির বৈঠকখানার মতো জমাট মজলিস আর কোনখানে খুঁজে পাইনি। কি একটা প্রসার এসে যায় মনে, বয়সের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকেনা। রসের মাত্রাই বেশী, এক এক সময় হাসির হর্‌রা উঠে বৈঠকখানার ছাদ ভেঙে পড়ার মত হ'য়ে ওঠে।

শিবপুর সম্বন্ধে আমার বেশীরভাগ অভিজ্ঞতা এইসব মজলিস থেকে। যার মানে হয়, আমার লেখার কিছু নয়তো অর্দ্ধেকখানির উৎস শিবপুর; 'চরিত্রে', তাদের নিয়ে জায়গা বেছে বেছে গল্প-বিন্যাসে। হাসিরই হোক বা অন্য ধরণেরই হোক। তবে খোস গল্পের আসর, সেখানে রসের ভিয়ানটা বেশীর ভাগ থাকতো কৌতুকের।

শিবপুর বনেদী জায়গা। যুগটা তখনও প্রাচুর্যের যুগ চলছে বলা যায়। এটা সাহায্য করতো নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও যা বড় কথা, তখনও খাওয়ানো-বিষয়ে বাংলার সেই চিরন্তন আমীরী—"দীয়তাং-ভূজ্যতাম্" ভাবটা এতটা নষ্ট হ'য়ে যায়নি।

বলা হবে, অভাব। অনেকটা নিশ্চয়ই তাই। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তখনকার তারা পাঁচজনকে নিয়ে থাকতে ভালবাসতো ব'লে অন্যদিকে অভাব কমিয়ে এদিকটা ঠিক রাখবার চেষ্টা করতো। এখন অভাব বেশী কি, আত্মকেন্দ্রিক সমাজে অভাব-সৃষ্টি বেশী সেটা হিসাব ক'রে বলা শক্ত। আসলে বাঙ্গালী জাতটা নিজের সে মেজাজ হারিয়েছে। তার জন্য তার অবস্থা নিশ্চয়ই দায়ী, কিন্তু আমার মনে হয় নিজেও কম দায়ী নয়।

আমার আর একটা সুবিধা ছিল, এ-সুযোগগুলা জুটে যেত খুব বেশী। দুই মামা, মেজো আর ছোট। মেজো ছিলেন মিশুকে আর সামাজিক। ছোটমামা ছিলেন যাকে বলা যায় 'করিতকর্মা' মানুষ। বিশেষ ক'রে একটা বড় কাজ চালাতে তিনি নিজেদের তল্লাটে—এমনকি, পরিচয় ঘনিষ্ঠ থাকলে পাড়ার বাইরেও যজ্ঞজাতীয় এসব কাজে অপরিহার্য ছিলেন। কাজেই নিমন্ত্রণটা আমার বাদ যাওয়ার উপায় ছিল না। সেসব দিনে নিমন্ত্রণ ছিল—লঘু-চাপল্যের ভাষায় "বাড়ি শুদ্ধ ঝেঁটিয়ে" অর্থাৎ বাদ-সাদ না দিয়ে, সবার।

সে এক এলাহী কাণ্ডের যুগ গেছে। কত যে খেয়েছি শিবপুরে, কত যে পেয়েছি তা ব'লে শেষ করা যায় না।

মেজমামা ছিলেন ঢিলেঢালা প্রকৃতির মানুষ; কাজের দিকটা ফাঁকিতে সেরে আসরে এসে জমে বসতেন। সেখানে তাঁর জুড়ি ছিলনা। আমি পাশটিতে জায়গা ক'রে নিতাম, পঙ্‌ক্তিতেও।

আর শিবপুরকে পেয়েছি তার সখের থিয়েটার, অপেরা, আর গানের মজলিসের মধ্যে দিয়ে। চাটুজ্যে-মুখুজ্যে-চৌধুরী-গাঙ্গুলীদের বড় বড় চক্ মেলানো বাড়ির উঠানে ষ্টেজ বেঁধে বা আসর বিছিয়ে ব্যবস্থা হোত। বিখ্যাত গায়ক নিকুন্ মারা গেছেন কিন্তু তাঁর সাকরেদদের অনেকেই তখন বেঁচে। কারণে-অকারণে আসর বসে যেত, বিশেষ ক'রে এই সব বড় বড় বাড়ীর প্রাঙ্গনে।

আর একটা জিনিষ ছিল; পাড়ায় পাড়ায় ভলেন্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবকদের দল। কাজ বেশ ভালই হোত—গঙ্গাস্নানে, রামরাজাতলা, হাজারহাত-কালী আর এই ধরণের জায়গার মেলায়। তবে সে সময় দলের সংখ্যা বেশী হওয়ায় রেষারেষির জন্যে, আর সেবাকার্যের উৎসাহের মাত্রা কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে মাঝে মাঝে জটিল আর হাস্যকর পরিস্থিতিও সৃষ্টি হ'য়ে যেত কম নয়।

সে কিন্তু আলাদা কথা। মোটের ওপর 'গাইয়ে বাজিয়ে শূর তিনে শিবপুর'—শিবপুরের দাবিটা তখনও অনেকখানি বজায় রয়েছে।

শিবপুরে থাকতেই আর একটা জিনিসের গোড়াপত্তন হোল, গোষ্ঠী বেঁধে সাহিত্যচর্চা, যার সুযোগ দ্বারভাঙ্গায় থাকতে আদৌ হয়নি, এবং—একটু কিরকম মনে হোলেও, যার সুযোগ উত্তরকালে আমি আমার সাহিত্যজীবনে ইচ্ছা ক'রেই ঘটাইনি।

এই সময় শিবপুরে থাকতে আমি এইরকম একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়লাম। ঠিক শিবপুরে নয়; পাশেই বাজে-শিবপুরে। আমাদের ফুটবল ক্লাবটাই যেন ছিল সর্বেসর্বা। সাহিত্যগোষ্ঠী নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু আমি অন্তত কোন সন্ধান পাইনি; কিংবা পাওয়ার চেষ্টাও করিনি। বাজে-শিবপুরের মজলিসে কি ক'রে ভিড়ে গেলাম তাও আমার মনে পড়ছেনা। শুধু আবছা-আবছা এইটুকু মনে আছে যে, কোন আকস্মিক পরিচয়ে আমি এর প্রধান উদ্যোক্তার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ি, এবং তাই থেকেই ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে প'ড়ে সভ্য হয়ে যাই তাঁর ক্লাবের। আকৃষ্ট হ'য়ে পড়বার প্রধান কারণ তাঁর পারিবারিক পরিচয়। তিনি ছিলেন নাট্যকার ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের পুত্র। সে সময় বিদ্যাবিনোদের নাট্যকার হিসাবে খুব নাম ডাক; তাঁর 'আলিবাবা' রোমান্টিক নাটক বহুদিন থেকেই অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রে আসছে। তাঁর ছেলের সঙ্গে পরিচয়, একটা দেবানুগ্রহই মনে হয়েছিল আমার। তারপর যখন ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে জানতে পারলাম তাঁর নিজেরও সাহিত্যের দিকে ঝোঁক, ক্লাব আছে তাঁদের, তখন ভিড়েই পড়লাম।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে শিবপুরে আজ একটা বিপুল পরিবর্তন এসে

গেছে। বিশেষ ক'রে যে সব জায়গা খালি ছিল, ছোটখাটো মাঠই হোক বা বাড়ি-সংলগ্নই হোক, সে সব আর চিনে বের করার উপায় নেই। আমাদের ফুটবলের সে-মাঠ আজ বাড়িতে ভর্ত্তি। ব্রজেঁশদের বাড়ীর সামনের মন্দিরকে পেছনে ফেলে দোকানের সারি উঠেছে। শহরের মাঝখানে 'সাঁঝের-আটচালা'র সে মুক্ত প্রসার নেই, অশত্থ গাছের চারিদিকে বাঁধানো বেদীসুদ্ধ। অনেক কিছু একেবারে অবলুপ্ত হ'য়ে গেছে। শিবপুরের জীবন অবসরহীন হ'য়ে, তার পল্লীগুলা অবকাশহীন হ'য়ে, আজ শ্রীহীন।

আমাদের ক্লাব ঘরটি ছিল বেশ সুন্দর পরিবেশের মধ্যে বাজেশিব-পুরের একটা লেনের মাঝামাঝি এক জায়গায়। নামটা মনে পড়ছে না। গলির ওপরই একটা গেটের মধ্যে দিয়ে ভেতরে গিয়ে ডান দিকে খানিকটা খালি জায়গা ; তু'একটা আম-কাঁঠাল-জামরুলের গাছও ছিল। বাঁদিকে, যতটা মনে পড়ছে, একটা চতুষ্কোণ ছোট ডোবা, পাশে কিছু সুপারি গাছ, এর পেছনে একতলা একটা বাড়ি। উঠেই নীচু বারান্দা, ওপরে কাঠের জাফ্‌রি দেওয়া, তারই ডানদিকে ভেতরের দরজা। বাঁ দিকটায় একটা ছোট বৈঠকখানা। ডোবা বা পুকুরটার পরেই, হাতখানেক জায়গা ছেড়ে। ছবির মতো বাড়িটি ; নীচু, ছোট, ছিমছাম। আমার যতদিন সংস্রব ছিল, বাড়িতে কিন্তু লোক দেখিনি। হয়তো যাঁদের বাড়ি তাঁরা বাইরে কোথাও থাকতেন। ক্লাবের জন্যে ঘরটুকু ভাড়া দিয়েছিলেন। কিম্বা—যেটা বেশী সম্ভব—নিঃশুল্ক ছেড়েই রেখেছিলেন পাড়ার ছেলেদের ক্লাবের জন্যে। তখন দেখেছি একটু জানাশোনা থাকলে এসব ক্ষেত্রে টপ ক'রে টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব নিয়ে বসত না লোকে।

বাড়িটা নেই, বা, ব্রজেশদের সামনের মন্দিরের মতো দোকান-পাট হ'য়ে অবলুপ্ত। এত পরিবর্তন যে কোনখানটায় ছিল তারও আন্দাজ পাইনা। সপ্তাহে একটা দিন ক'রে আমাদের বৈঠক বসত। লেখা এনে পড়া—গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ; তারপর তার আলোচনা ; নিজের মন মাফিক পরিবেশ ; প্রায় ঘণ্টা দুই-আড়াই বেশ সুন্দর ভাবে কাটত। প্রবন্ধের দিকটাই বেশী থাকত ব'লে যেন আমার মনে হচ্ছে। অন্তত আমি কখনও কোন গল্প পড়িনি। এটা আশ্চর্য মনে হবে, কেননা স্কুলের কাঁচা বয়স থেকেই আমার যেমন নায়িকা হাতড়ে বেড়াবার অভ্যাস ছিল—সুযোগ না থাকলেও—তাতে এত বড় সুযোগেও আমি শুষ্ক প্রবন্ধ নিয়ে রইলাম, এটা আমার কাছেও আজ অস্বাভাবিকই মনে হয়। হয়ত আমার সেই Shyness, স্বল্প পরিচয়ের সংকোচ,

শিবপুরের ছেলে ব'লেই তাদের সামনে নিজের ভেতরটা একেবারেই উদ্ঘাটন করার মতো যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় ক'রে উঠতে না পারা।

এই সময় আমার কৈশোরের সেই সাহিত্য-প্রবণতাটুকু আবার এক ঝোঁক নূতন ক'রে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই। দ্বারভাঙ্গা থেকে বেরিয়ে আমি একটা কল্পনাতীত পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছি—কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে একটা বিরাট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। যদি একথা মেনে নিতে হয় তো, আমার মতো যাঁরা সাহিত্য-সৃষ্টির লাইনে এসেছেন, গোড়া থেকেই তাঁদের অন্তরে এর একটা অঙ্কুর থেকে যায়ই। তাহ'লে সে-অঙ্কুর যে এই পরিবেশের আলো-বাতাসের মধ্যে আপন মুক্তি খুঁজবে এটাও খুব স্বাভাবিকই।

বাজে-শিবপুরে আমি একটা নূতন জিনিসের স্বাদ পেলাম, একটি বিশুদ্ধ আবহের মধ্যে পরস্পরের অন্তরের পরিচয় পাওয়া। ঈর্ষা-বিদ্বেষ-হীন আলোচনায়, যার মধ্যে শ্রদ্ধা-প্রশংসার ভাবটাই বেশী থাকে, তাই দিয়ে যার যেদিকে মনের প্রবণতা সেইদিকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। একটা কথা ব'লে রাখা দরকার এখানে, যুগে যুগে রুচির প্রভেদ হিসাবে। লেখা যা সব পড়া হোত—বিশেষ ক'রে গল্প, কবিতা, তার মধ্যে সব কিছুই থাকতো প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, শুধু সবকিছুতেই যৌন-বিকৃতির জয়গানের চেষ্টাটুকু থাকতো না। ফলে, এইসব সভা-সমিতির বাতাবরণটা বেশ পরিচ্ছন্ন থাকতো। বেশ নিষ্কলুষ আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে খানিকটা যেন নূতন হ'য়ে বেরিয়ে আসতাম।

মনে একটা আকুতি জাগতে লাগলো, এই স্তরে আরও মেলামেশার জন্য। কিছুদিন পরে আর একটি সাহিত্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়লাম। এটি কলকাতায় এবং ছাত্রদের নিয়ে হলেও Standard বা মানটা আরও একটু উঁচু। আমাদের সঙ্গে মলিন আর হেমন্ত নামে দু'টি ছেলে পড়ত। তখন প্রসিদ্ধ ইঙ্গ-সংস্কৃতি স্কলার নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় বেঁচে। মলিন আর হেমন্ত তাঁরই পুত্র। বৈমাত্র ভাই, নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়ের দুই বিবাহ ছিল। কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবার তার মধ্যে মলিন আবার দশটাকা বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র—নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় ছিলেন দ্বারভাঙ্গার একটি বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গে কুটুম্বিতা সম্বন্ধে আবদ্ধ;—আমার দাদার বন্ধু রটন্তী কুমারের মামা।

ছেলে দু'টি ছিল সব রকমের লঘুতা-বর্জিত একটু সিরিয়াস টাইপের। ক্লাশে আমাদের সেই লঘুচপল 'ক্লাব'-এর থেকে আলাদা ধরণের, তবে, দ্বারভাঙ্গার সূত্র ধ'রে আমার সঙ্গে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা হ'য়ে পড়ে।

একদিন গল্প প্রসঙ্গে জানতে পারলাম ওদেরও একটি সাহিত্য-সমিতি আছে। নিয়মিত বৈঠক হয়। মলিন আমায় টেনেও নিল।

খুব কমদিনই কিন্তু ওদের বৈঠকে যোগদান করতে পারি। মলিনদের বাড়ি ছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (বর্তমান রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের) পূর্ব দিকে ফিরিঙ্গী পাড়ায়। কলেজ সেরে যাওয়া, সন্ধ্যার পর বৈঠক, বোধহয় মাত্র তিন চারটিতে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম। তাহ'লেও কিন্তু দু'একটির কথা, শিবপুরের ক্লাবের তুলনায় একটু বেশী ক'রেই মনে আছে।

মলিন-হেমন্তদের সমিতি ছিল বেশ একটু বাছাই-করা সভ্যদের নিয়ে। প্রায় সবাই কলেজ-ছাত্র। তাঁর মধ্যে যে প্রেসিডেণ্ট সে বোধহয় প্রেসিডেন্সীতে এম. এ. ষষ্ঠ-বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ছে।

একদিন গিয়ে দেখে এলাম ওদের বৈঠক। মলিন পরিচয় করিয়ে দিলো সবার সঙ্গে, জন-দশবারো উপস্থিত ছিল। আমার পরিচয়টা বিহার-আগত ব'লে, বেশ একটু কৌতূহলের উদ্রেক করে। গুটি পাঁচ ছয় লেখা পড়া হ'ল, বাজে-শিবপুরের চেয়ে মান খানিকটা উঁচুই। দু'টি কবিতা, একটি ছোট গল্প, দু'টি প্রবন্ধ; তার মধ্যে একটি মলিনের। মলিন ছিল ইতিহাসের ছাত্র, একটি নাতিদীর্ঘ গবেষণা-সূচক প্রবন্ধই লিখে আনে সে। যতদূর মনে পড়ছে একটি কবিতা প্রণয়-সম্বন্ধীয় ছিল। আবেগময়, কিন্তু আবিলতা-বর্জিত। ভালই লেগেছিল।

প্রেসিডেণ্ট একটি কাগজে নোট রেখে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে, শেষ হ'য়ে গেলে সমালোচনা আহ্বান করল। কিছু হ'ল। তারপর নিজে ক্রমানুসারে এক একটি ধ'রে সমালোচনা করল। বেশ পড়াশুনা আছে ব'লেই মনে হোল। বৈঠক শেষ হ'লে আমায় সাদর নিমন্ত্রণ জানায়। এবার কিছু লিখে আনতেই হবে। বেশ সুপরিচালিত একটি সংস্থা। বাইরেরও কয়েকজন সভ্য থাকায় এদের বৈঠক হোত শনিবার-শনিবার। শিবপুরে বসত রবিবারে। এই সময় যে রূপ একচোট ঝোঁক এসে পড়ে মৌলিক রচনার দিকে। আমি খুব সতর্ক প্রস্তুতির পরে একটা প্রবন্ধ নিয়ে যাই লিখে। বোধহয় সৌজন্যবশতই সভ্যদের কাছ থেকে কোন মন্তব্য হোলনা। সেটা স্বস্তিকরই হয়েছিল আমার পক্ষে, কেননা, সৌজন্য একদিকে প্রাপ্য নিন্দাকে প্রছন্ন রাখে। বেশ একটু অস্বস্তি হয়েছিল প্রেসিডেণ্টের সুখ্যাতিতে। সে বিশেষ সূক্ষ্মতার সঙ্গে প্রবন্ধটার বিচার করে। যে অভিমত ছিল তাতে সত্যের পরিমাণ যতটুকুই থাক; শ্রুতি সুখকর যে হয়েছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সাহিত্যে প্রবেশের পথে সেই বোধহয় আমার প্রথম স্বীকৃতি। পরে

কাজ দিয়েও থাকবে। এর পরের বৈঠকে কিছু নিয়ে যাইনি। সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করি একটু। তারপর যে কটা বৈঠকে যোগদান করি, সবেতেই কিছু লিখে নিয়ে যাই, তবে প্রবন্ধ জাতীয়ই। একে কলকাতায়, তায় সুরটা একটু গম্ভীর, একটু বেশ আড়ষ্টই ক'রে রেখেছিল প্রথমটা, তারপর কিন্তু শিবপুরের আদি পর্বের মতোই সে ভাবটা কেটে যেতেও দেরি হোলনা। তার কারণ, গম্ভীর হ'লেও পরিবেশটা বেশ সরস ছিল, আমার মন-মেজাজের সঙ্গে কোথাও বাধলনা। দিব্যি মিশে গেলাম।

তারপর আর একটা দিনের কথা, যা বেশী ক'রে মনে আছে—সে দিন একটি দীর্ঘ কবিতা আর একটি গল্প ছিল। এর আগের বৈঠকে লেখক বিষয় এবং টেক্‌নিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে একটু Modernism এর ধারে ঘেঁষে যায়। সে দিনেরটিতে লেখক একটি সংযত মনোভাব নিয়ে রূপের পূজারী হিসাবেই নিজেকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করে। ভঙ্গীটি রবীন্দ্রানুসারী। ভালো লাগে সবার; একটু নীরব ক'রেই রাখলো। আমার প্রবন্ধটা ছিল সবশেষে। কিছু আলোচনাও হোল সে দিন। দু'একটা প্রশ্নও; তার উত্তরও দিলাম। প্রেসিডেণ্ট একে একে শেষ ক'রে আমারটা সম্বন্ধেও তার অভিমত দেওয়ার পর একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সভাভঙ্গের কথা ঘোষণা না ক'রে। মুখে ধীরে ধীরে একটু হাসি ফুটে উঠল। তারপর সাধারণ ভাবে সভার দিকে চেয়ে বলল "একটা কথা—জানিনা বিভূতিবাবু কি ভাবে নেবেন...তাঁর প্রবন্ধগুলিও সুচিন্তিত, সুলিখিত, কিন্তু তাঁর চেহারায় এমন একটি কবি-কবি ভাব রয়েছে যে, আমরা প্রবন্ধের অতিরিক্ত আরও কিছু প্রত্যাশা রাখি তাঁর কাছে। এ বিষয়ে চিন্তা ক'রে দেখবেন তিনি?" আমার মুখের দিকে চেয়েই শেষ করল বক্তব্য।

আমার মুখে নূতন দাড়ি-গোঁফের যে সূচনা দেখা দিয়েছে, তাদের তখনও পথ ছেড়ে দিয়ে রেখেছি। অবশ্য কবি হ'তে সাহায্য করবে এ আশা বা বিশ্বাস নিয়ে নয়। প্রেসিডেণ্টের প্রত্যাশা পূরণ করা হয়নি, সঙ্কোচ বা যে কারণেই হোক। অথচ প্রকাশের ঐশ্বর্য দিয়ে না হোক, অ-প্রকাশের বেদনা-মাধুর্য দিয়ে তখন একটি নীরব-কবির যুগই চলেছে আমার অন্তর্লোকে।

সে কথা পরে বলছি। তার আগে ঠিক শিবপুর-জীবনে না হোক, শিবপুর থাকতে থাকতে পাশ কাটিয়ে একটা যে ঘটনা হ'য়ে গেল মাঝখান থেকে, তার কথা বলে নিই।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বোধহয় ঘটনাটুকুর মূলে দু'টি

জিনিস কার্যকর হ'য়ে উঠেছিল ; এক, আমার সেই বহির্মুখিনতা, ঘরের কোণ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার তাগিদ, দ্বিতীয়, যেটা আরও স্পষ্ট শিবপুরের জল-হাওয়া তেমন বরদাস্ত না হওয়া। শিবপুর যখন আজও আমার কাছে নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি, তখন কলেজ-জীবনের দু'টো বৎসরে যাবে—যখন আবার গতিবিধি বেশী ক'রে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হোত—সেটা সম্ভব নয়। তবু মাঝে মাঝে পট পরিবর্তনের প্রয়োজন হোত। আমার আকর্ষণ ছিল চাতরা, শ্রীরামপুর আর উত্তরপাড়া। চাতরায় তখন আমাদের বাড়িটা এক রকম পরিত্যক্ত। নিজেদের কেউ নেই, খেতন দাদা কোথায় চ'লে গেছেন, বোধহয় মনমোহিনী পিসিমার বাপের বাড়ি যেখানে ছিল।

তবে আমাদের আর এক খুব নিকট আত্মীয় রয়েছেন, অধর ভট্টাচার্য, সম্বন্ধে জ্যাঠামশাই। তিনি আমাদের কুল-বৃত্তি, পুরোহিত-গিরিটা ধ'রে রয়েছেন ; ডেলি-প্যাসেঞ্জারির সঙ্গে নয়, নির্ভেজাল পৌরোহিত্য। এক ছেলে সুরেশ্বর আমার বয়সের, বোধহয় শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্র। প্রথমদিনের অভিজ্ঞতাটা একেবারে নূতন ধরণের। ছেলেবেলার পুরনো সেই চাতরার স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, নামার পর থেকে যত এগুই সে চাতরা শ্রীরামপুরকে যেন খুঁজেই পাইনা। রাস্তাগুলো সরু, দূরত্বও কত কম; বড় বড় গাছগুলা খর্ব হ'য়ে গেছে। দোতলা বাড়িটা একতলার সমান উঁচু। শ্রীরামপুরের গির্জা যা স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ব'লে সে-সময় মনে হোত, যেন একখানা বাঁশের সিঁড়ির আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে। গঙ্গারও আর এপার-ওপার সেই দিগন্ত-প্রসার নেই। ব্যাপারটা যে দৃষ্টি-বিভ্রম এটুকু বোঝবার বয়স হয়েছে, তবু প্রথম বিস্ময়ের দিক থেকে সেদিন আর এ দিনের মধ্যে প্রভেদ ছিলনা।

মাত্র বার দুই তিন যাই। তখন শ্রীরামপুর যাওয়া বর্তমানে যাওয়ার সমান ছিলনা ; সময় সুবিধার কথা ভাবতে গেলে। উত্তরপাড়ায় আকর্ষণ ছিল তার অভিজাত স্বরূপটি।

স্কুল, রাজবাড়ি ছাড়া রাজপরিবারের শাখাপ্রশাখাদের কতগুলি সুদৃশ্য হর্ম্য যা স্থাপত্যকলায় রাজপ্রাসাদেরই মর্যাদা লাভ করতে পারে। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা প্রাঙ্গনে বটল-পামের সারি দেওয়া উদ্যান। ফাটকের পাশে প্রহরীর গুম্‌টি ঘর। পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাজপথ। সুরকি-বেছানো। আমি যখনই গেছি, বিকালেই গেছি, বলদেটানা মন্থর জলের-গাড়ি জল ছিটিয়ে রাস্তায় সুরকিগুলা আরও রাঙা ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। সে-সময় নানা প্রকারের যানবাহনের ভিড় ছিল না, নগরীর কেন্দ্র-অঞ্চলে

মানুষের ভিড়ও কম। একটি সম্ভ্রম-জাগানো শান্তভাব সমস্ত জায়গাটাকে ছেয়ে থাকতো। হয়তো জুড়িঘোড়ার একটা ফিটন্, বা ঢাকা গাড়ী বেরিয়ে গেল ; তাতে বাড়িয়েই দিত এই মৌন সম্ভ্রমের ভাবটুকু। কেন্দ্রের বাইরেও গৃহস্থদের বাড়ীতেও এইরকম একটি সৌন্দর্য-শুচিতার ভাব রক্ষা করার চেষ্টা। গঙ্গার ধারের গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের দোকানপাটেও এই সুর।

তারপর রাজা প্যারীমোহনের বিদ্যোৎসাহ ও বদান্যতার প্রতীক উত্তরপাড়ার বিখ্যাত লাইব্রেরী, গঙ্গার ধারে প্রশস্ত মুক্তপ্রাঙ্গনের মাঝখানে। তার ঘাটের শান বাঁধানো বেঞ্চে ব'সে ব'সে মনে হোত, উত্তরপাড়া যেন কলকাতার বণিক সভ্যতার ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে এই গঙ্গার ধারটিতে। আমার এই বাইরে থেকে ঘুরে আসবার ঝোঁক বেশী ক'রে হোত ছুটিছাটায়, দ্বারভাঙ্গা থেকে ফিরে যাওয়ার পর। বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে শিবপুরে মন না বসবার জন্যই।

তারপর একবার ঝোঁকটা, দু'তিনটা কারণে একত্র হ'য়ে বেশ প্রবলতর হ'য়েই এসে রীতিমতো একটা অস্বস্তি লাগিয়ে দিল। এবার দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শেষের দিকে। পরীক্ষার বছর, পূজার ছুটিতে দ্বারভাঙ্গা যাওয়া হোল না। বর্ষাতেই 'নোনা' লেগে স্বাস্থ্যটা বেশী নষ্ট হ'য়ে যেত, এই সময়, আর গ্রীষ্মকালে মহম্মদপুরে বাবার কাছে গিয়ে মেরামত ক'রে নিয়ে আসার কথা, সেটা আর হোলনা। মন্দ স্বাস্থ্যের ওপর পড়ার চাপ, খেলাধূলা ঘুরে বেড়ানো—এসব সংযত করতে হয়েছে ; চাতরা-উত্তরপাড়াও হ'য়ে উঠছে না, দেহমনের এই অবস্থায় একদিন হঠাৎ (তখন যেমন মনে হয়েছিল)—সর্বব্যাধিহর হাজারীবাগের কথা কানে গেল। গোড়াতেই বলেছি স্মৃতিচারণে, স্মৃতিবিস্মৃতির অদ্ভুত নিয়মে কেন যে এক একটা মনে থাকবার-কথা এমনভাবে মুছে যায়, অথচ এক একটা মনে-না-থাকবার মতো তুচ্ছ কথা এমন জ্বলজ্বল ক'রে মনে থাকে, তার কোন হদিস্ পাওয়া যায়না। হাজারীবাগের কথাটা কার কাছে, কি পরিস্থিতিতে শুনি মনে নেই, তবে নিকটতম স্টেশন হাজারীবাগ রোড থেকে তার দূরত্ব, পর্বতের মধ্য দিয়ে তার পথের বর্ণনা; নিজ্ হাজারীবাগ শহরের বর্ণনা, তার স্বাস্থ্যকর জলহাওয়া, স্থায়ী এবং স্বাস্থ্যান্বেষী প্রচুর বাঙ্গালীর বাস, সর্বোপরি টুইশন বা গৃহ-শিক্ষকতার সুযোগ—সব মিলিয়ে যে চিত্রটি দাঁড় করিয়ে দিল তা আমার কল্পনাকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলল। শিবপুরে মামাবাড়িতে থেকেই আমার পাঠ্যজীবন শেষ করার কথা, আমি প্রায় সেই দিনই ঠিক ক'রে ফেললাম, আই. এ. টা শেষ ক'রে হাজারীবাগে গিয়ে উঠব। সেণ্ট্ কলম্বাস কলেজের তখন প্রচুর যশ। কোন অসুবিধা হবেনা।

মনটা আবেগে যখন পূর্ণ হ'য়ে যায়, হিসাবের ছোট বড় অনেক কিছু টপকে টপকে এগুতে থাকে। মনে রইল শুধু এবার গিয়ে একটা গৃহ-শিক্ষকের জায়গা ঠিক ক'রে এসে কলেজের সেসন্স (Sessions) আরম্ভ হওয়ার আগে গিয়ে উঠতে হবে।

স্বাস্থ্যের কথা বেশী ভাবলাম, কি, পাহাড়ে-ঘেরা অমন পরিবেশের কথা শুনে, পা বেশী চুলকে উঠল, বলতে পারিনা। সামনে বড়দিনের ছুটিটা রয়েছে।

অত অধীরতা অবশ্য রইল না। পরীক্ষার চিন্তাটা বড় হ'য়ে ঝোঁকটা একটু কেটে গিয়ে হয়তো একটা দোমনা ভাবও এসে গিয়ে থাকবে, তারপর ফাইনাল্ পরীক্ষা দেওয়ার পর মনের হঠাৎ যে একটা মুক্তির প্রসার এসে যায়, হাজারীবাগ তার সমস্তটুকুই ভরাট ক'রে নিল। পরীক্ষার ফলাফল না বেরুনো পর্যন্ত মহম্মদপুর-দ্বারভাঙ্গাতেই কাটানোর কথা, ঠিক করলাম আগে হাজারীবাগে গিয়ে টুইশনের ব্যবস্থাটা পাকা ক'রে নিয়ে সেখান থেকেই চ'লে যাব ওদিকে। নিজের মনের চাঞ্চল্যের জন্যই মনে হ'তে লাগল পরীক্ষার ফল বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে হাজারীবাগের লোভনীয় টুইশনগুলার জন্য চারিদিকে চাঞ্চল্য প'ড়ে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

একদিন সকালে বম্বে মেল থেকে নামলাম হাজারীবাগ রোডে। নামার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা দমে গেল। অতি সাধারণ একটি ওয়েসাইড (Wayside) স্টেশন, চারিদিক—ফাঁকা, বাবুদের কোয়ার্টার্সের ওদিকে আর বাড়ি নেই বললেই চলে। দূরে-কাছের পাহাড়গুলা একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা নিয়ে আছে দাঁড়িয়ে। পুসপুসের কথা জানা ছিল, সে সময়ের একমাত্র সওয়ারী; মানুষে-টানা-আর-ঠেলা। আমি বিমূঢ়-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে গুটিতিনেক বাদে সবগুলি ভর্তি হ'য়ে গেল, কয়েকটা বেরিয়েও গেল। যতদূর মনে পড়ছে শেয়ারে ছ'টাকা ক'রে মাথা পিছু রেট্। তিনটা যে খালি রয়েছে তার মধ্যে একটা ভাড়াটে ঠিক হ'য়ে গেছে, তিনটি ছেলে মেয়ে নিয়ে একটি বাঙ্গালী পরিবার। একটি কোলে। একটা স্টোভ জ্বেলে চা প্রস্তুত ক'রে, দুধ গরম ক'রে প্রাতরাশ সেরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো, বাকি দু'টিকে প্রশ্ন করাতে বলল ডাউন ট্রেন যেটা আসবার কথা আছে তার জন্য অপেক্ষা করছে; একলা গেলে আমায় পুরো ভাড়া দিয়ে যেতে হবে। বোধহয় ছত্রিশ টাকা বলেছিল।

একেবারে অকুল-পাথার। আমি পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। সে-সময় রেলভাড়া খুব কম ছিল, বোধহয় পাঁচটা টাকা খরচ হ'য়ে

বাকাটা কাছে ছিল, একবার মনে হোল বেরিয়ে পড়ি, কিন্তু হাজারী-বাগ রোডের চেহারা দেখে খোদ হাজারীবাগের সে রঙিন স্বপ্ন মলিন হ'য়ে এসেছে, অতটা নিঃসম্বল হ'য়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হোলনা। ডাউনট্রেন এলে পুস্‌পুস্‌ ছাড়বে। জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম দু'ঘণ্টা পরে আসবে। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। স্টেশনের বাইরে গোটা দুই তিন দোকান ছিল—তার মধ্যে একটা ছোট-খাট সরাইখানা গোছের। কিছু মুড়ি, চিঁড়ে, দেশি মোওয়া, কিছু বাংলা খাবারও। একটা পুস্‌পুস্‌কে একটা জায়গা রাখবার কথা ব'লে মুখহাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নেওয়ার জন্য এগিয়েছি, কানে গেল—"বলি—শোন এসে।" ঘুরে দেখি বাঙ্গালী পরিবারের কর্তা স্টেশনের পেছনে টিকিট কাটার বারান্দার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন, গৃহিনী চায়ের ব্যবস্থা করতে করতে ঘুরে চেয়ে রয়েছেন। আমি যেতে কর্তা প্রশ্ন করলেন, "পুস্‌পুসে হোলনা জায়গা?" বললাম—"পুরো চার্জ নিতে চায়। ভাবছি পরের ট্রেনে যাব, ডাউন গাড়ীটা এলে।" বললেন "প্যাসেঞ্জার, প্রায়ই লেট থাকে, তখন যাওয়া নিরাপদ নয়। রাত হ'য়ে যায়। এমনি ঝাড়া হাত পা একলাটি, না, বেশী মোটঘাট আছে?"

বললাম—"না, এই একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ মাত্র।"

"চলো আমাদের সঙ্গে। গোটা পুস্‌পুস্‌টা নেওয়া আছে।"

"অসুবিধে হবে না আপনাদের?" সাধারণ ভদ্রতার প্রশ্নটুকু বেশ একটু চেষ্টা ক'রেই বের করতে হোল।

বললেন—"নাঃ। হয়তো ও বেটাদেরই হবে—যেমন ডেঁড়েমুশে চার্জ ক'রে নিলে। ...বউক্ কত বইবে।"

বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে, বেশ সুস্থ শরীর। বোধহয় কিছু বখশিস্ আদায় ক'রে রাজি হ'য়ে থাকবে চালকেরা। ওঁর মন্তব্যে, আমার উপকার করার চেয়ে ওদের প্রতি আক্রোশের ভাবটা এমন বেশী ক'রে ফুটে উঠল, অত দুঃখের মধ্যেও প্রায় আমার হাসি বেরিয়ে পড়েছিল, সামলে নিয়ে বললাম—"হয় একটু জায়গা তো বাঁচা যায়। বেশ একটু মুশকিলে পড়ে গিয়েছি।"

"উঠে এসো। ...অসুবিধে আর কি? লম্বা দৌড়, বরং বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।"

উঠে গিয়ে ব্যাগ থেকে মাজন বের ক'রে নিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। গৃহিনী সবার সঙ্গে আমাকেও চা আর বাড়ী থেকে আনা লুচি, আলুভাজা, মিষ্টি দিলেন। ওর মধ্যেই একটু পরিচয়ও নিলেন কর্তা; কোথা থেকে আসছি, কি করি, হাজারীবাগে কোথায় যাব। শিবপুরের

দিকটা যথাযথ দিয়ে, হাজারীবাগের বটমবাজারের নাম করলাম। এই একটা নামই সেদিন শুনি ; মনে ছিল। একটা ভয় ছিল, কার বাড়ী যাব যদি জিজ্ঞেস ক'রে বসেন। কিন্তু উনিও জিজ্ঞেস করলেন না, আমারও একটা মিথ্যার ওপর আর-একটা চাপাতে হোলনা। একটা কারণ ছিল, না জিজ্ঞেস করার; সেটা অনেক পরে টের পেলাম। প্রাতরাশ সেরে আমরা প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। কর্তা বললেন বটে আমায় সঙ্গী পেয়ে বেশ গল্প করতে করতে যাবেন, গেলেনও খানিকটা, একটু বকার অভ্যাস আছে, তারপর কিন্তু তারই মাঝে ঢুলুনি এসে চমকে চমকে উঠে গল্পের খেই শেষ পর্যন্ত আর ধ'রে রাখতে পারলেন না, ব'সে ব'সেই ঘাড় গুঁজে ঘুমিয়ে প'ড়ে নাক ডাকাতে শুরু ক'রে দিলেন।

তবে, আমার গল্প করার লোকের অভাব হোলনা। সেদিনকার সে-স্মৃতিটিও বড় মিষ্ট। এটা হয়তো অনেকে লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, কোন সম্পর্কের কোন রকম সম্ভাবনা নেই, অথচ দু'টি মানুষের চেহারা, হাবভাব, এমন কি কণ্ঠস্বর পর্যন্ত যেন একরকম ; হাতপা' নাড়ায় একজনের যদি কোন মুদ্রাভঙ্গি থাকে, সেটি পর্যন্ত অপরের মধ্যে পরিস্ফুট। আরও অনেক কিছু খুঁটিনাটি, যেন দু'টিতে এক মায়ের যমজ সন্তান। বড় বিস্ময় লাগে।

সেই বিস্ময় নিয়েই প্রথমবার চোখ পড়তেই আমি গৃহিনীর মুখের দিকে মুহূর্তখানেক দৃষ্টি ফেলে রাখি। তখনই আবার সম্বিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নিই। কি ভাবলেন উনি জানিনা। একেবারে আমার মেজো মামিমার মতো ; শুধু বয়সটুকু ছাড়া। মেজোমামিমা আমার প্রায় সমবয়সী, বড় হ'নতো, মাত্র এক-আধ বছরের বড়। ভদ্রমহিলা মনে হোল উনত্রিশ-ত্রিশের মধ্যে। সুতরাং কর্তার বয়স ধ'রে মনে হয় দ্বিতীয় পক্ষেরই। কিন্তু এছাড়া মামিমার সঙ্গে যেন সব বিষয়ে এক।

একশ্রেণীর স্ত্রীলোক আছেন যাঁরা, বিনা আয়াসেই, নিজের সহজ অধিকারটুকু সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে যান। কথাবার্তার মধ্যে, বিশেষ ক'রে কারও সঙ্গে মতভেদের কারণ হলে, মামিমার "বাবা বিভূতি, তুমিই বলতো"...এমন একটি ভঙ্গি ছিল, যাতে মনে হোত স্নেহ-স্পর্শ দিয়ে উনি নিজেকে অনেক বড় ক'রে নিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমায় আরও ছোট ক'রে নিলেন। গৃহিণীর বয়স অবশ্য আমার চেয়ে বেশ খানিকটা বেশী, তবে নিঃসম্পর্কতার একটা দূরত্ব আর সঙ্কোচ থাকবার কথা, উনি যেন ওর গৃহিণীত্বের অধিকারে সেটা এক সাপটে সরিয়ে দিলেন।

শিশুটিকে কোলে নিয়ে কতকটা আসন পিঁড়ি হ'য়ে বসেছিলেন, কর্তার মাথা গুজড়ে নাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলেন—"নাও, এই মানুষ আবার গল্প করবে! এ'কে একনম্বর ঘুম-কাতুরে, তার ওপর আবার গাড়িতে ছিল ভিড়"...

—আমার দিকেই চেয়ে। একটু হেসেও। তারপরেই—"তা, তুমি যে বললে বাবা তোমার ঠাকুরদাদা ষোল-সতেরো বছর বয়সে মা-জানকীর দেশে গিয়ে ওঠেন—সে কেমন দেশ?"

বেশ জায়গাটিতে এনে ধরিয়েও দিলেন আমায়, শুরু হ'য়ে গেল আমাদের গল্প।

সংযত কৌতূহলে আমিও বের ক'রে নিলাম ওদিক'কার পরিচয় কিছু কিছু।...ছোট সংসার, তবে কর্তার একটু বায়নাক্কা আছে।..."মেয়েটি—তা তের পেরিয়ে চোদ্দয় পা দেবেন...মায়ের দিকটা একটু সামলে দে...একা পারি বাবা? তুমি বলো?...কুটাটি নেড়ে উবগার করবে? কিছু বলবার জো নেই, তা হ'লেই হৈ হৈ—আছুরি যে বাপের!...আর বোলনা বাবা। ...মেয়েটির পরেই বছর নয় দশের একটি ছেলে, তারপর এই কোলের মেয়ে!"

কর্তাকে নিয়ে চারজনেই ঘুমুচ্ছে। আমাদের পুস্‌পুস্‌ মন্থর গতিতে চলেছে। কখনও চড়াই ঠেলে ওঠার টানা নিঃশ্বাসের শব্দ, কখনও সংযত ভাবে পা চেপে চেপে ওৎরাই হ'য়ে নামা। দূরে কাছে, ছ'ধারে পাহাড়, নিঃশব্দ বনভূমি, আমাদের ছ'জনের গল্প চলেছে। এক একটা ভঙ্গিতে, কথার সঙ্গে মাঝে মাঝে একটা বিশেষ মুদ্রা রচনায় মামিমাকে মনে প'ড়ে দৃষ্টি যাচ্ছে আটকে মুখের ওপর। খেয়াল নেই, বিন্দুমাত্র। গল্প ক'রে যাচ্ছেন। গল্পিয়ে স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিতে হয় ব'লে বোধ হয় অভ্যাসটা একটু বেশী। কর্তা একবার হঠাৎ জেগে উঠে মাথাটা ঘুরিয়ে বললেন "ও!...তা কতদূর এগুলুম।"

"অনেকদূর এখনও, তুমি নিশ্চিন্দি হ'য়ে ঘুমোও।"

কর্তা ব'লেই সঙ্গে সঙ্গে মাথা গুঁজে নিয়েছেন, গৃহিণী বললেন—"সমস্ত রাত ঘুমিয়েই এসেছেন, আমি এইরকম ক'রে মেয়ে কোলে ক'রে বসে। এতগুলি মাল-পত্র, লক্ষ্য রাখতে হবে তো বাবা—বলো?"

বললাম—"আপনিও না হয় একটু ঘুমিয়ে নিন্‌না আমি তো রয়েছি। আমি একটু সুবিধে পেয়ে বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম।"—বানিয়েই বললাম শেষটুকু।

"রক্ষে করো বাবা! সবাইকে ঠাকুর এইরকম অসাড় হ'য়ে ঘুমুবার ক্ষমতা দেবেন তবে তো? মানুষে পারে এ ধকলের মধ্যে?" হাসি হাসি

ভাব নিয়ে একটু শিউরে উঠেই বললেন তারপর, "না, সে-কথা নয়—সব রকম সওয়া আছে, ঐ মানুষের সঙ্গেই এত দিন..."

হঠাৎ একটু অপ্রতিভভাবে চুপ ক'রে গিয়ে অকারণেই শিশুটির মাথায় একটু চাপ দিয়ে বললেন "ঘুমো, ঘুমো।"

প্রায় দেড়টার সময় আমরা একটা চটিতে এসে খাওয়া দাওয়া সারলাম। পুস্‌পুসের সফর বেশ আরামের নয়, একটু হাত পা মেলে জিরিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা করলাম। কর্তা গৃহিণীকে বললেন—"এবার তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি বসে বসে এঁর সঙ্গে গল্প করি।"

"সেই ভালো।"—ব'লে গৃহিণী আমার দিকে আড়ে চেয়ে একটু হাসলেন। কি যেন একটা ইঙ্গিত রইল তাতে। সেটা স্পষ্ট হ'তেও দেরী হোলনা। ঘুম-কাতুরে, রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত গেছে, খোরাকটিও নিন্দের নয়, এবার মাথা ঢুলে পড়ে নাক ডাকা শুরু হ'তে আরও কম সময় নিল। গৃহিণী তাঁর ইঙ্গিতেরই টীকা স্বরূপ বললেন—"দেখলে তো ?...সাধা ঘুম !"

কোলের শিশুটি বায়না ধ'রেছে, তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে উনিও এবার পড়লেন পুস্‌পুসের পিঠে এলিয়ে। আমার মনটা এতক্ষণে চারিদিকের দৃশ্যে জেগে উঠল। পাহাড় ভ্রমণ আমার জীবনে এই প্রথম। এতক্ষণ এদিকে মনরেখে যতটা পারছিলাম চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলাম, এবার সমস্ত মনটাই আনলাম এদিকে টেনে। শুধু একটু বললেই যেন সব বলা হোলনা। একটা দুর্ভাবনা কেটে যাওয়ার পর এরকম সঙ্গ, এরকম স্নেহ-প্রীতি—অপ্রত্যাশিতভাবেই, সমস্ত মনটা যেন সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পাহাড়ে-অরণ্যে এর পরেও অনেক ঘুরেছি, ভেতরে গিয়ে,শিখরে উঠে, ভালোই লাগে, থ্রীলিং। কিন্তু সেদিনকার প্রথম বিস্ময়ের সঙ্গে হঠাৎ মনের প্রসার—সেদিন যেমন লেগেছিল আর কখনও লাগেনি। শুধু এইটুকুই নয় ; সৌভাগ্য আমার চোখের সামনে তার একটি দ্বার দিল খুলে। এই তো, যা খুঁজতে বেরিয়েছি তা নিজে হ'তেই হাতের কাছে মজুত। তখন খাওয়ার সময় গৃহিণী যে কথা প্রসঙ্গে বললেন—ছেলের পড়ার ক্ষতি হচ্ছে, ভাল লোক পাচ্ছেন না—আজকাল মেয়েদেরও একটু লেখাপড়ার দরকার হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু মেয়ে বড় হ'য়ে আসছে, যার তার হাতে দিতেও পারেননা—সেই থেকেই আমার মনে একটা চিন্তার স্রোত নেমেছে। গৃহিণী পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়তে ঐটে নিয়েই লেগে পড়লাম।...আজ দিনটির ওপরও কেমন একটা বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা এসে গেছে, মন বলছে হ'য়ে যাবে। হবে ব'লেই এই যোগাযোগ ; পুস্‌পুসে জায়গা হোলনা, যেটাতে হোল, অসম্ভব হেঁকে

বসল।...যাবেই হ'য়ে। যখন কথাটা বলবো, কর্তা-গৃহিণীও যোগাযোগের অভিনবত্ব দেখে আমার মতোই বিস্মিত-পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌বেন—যা খুঁজছিলেন তাই একবারে হাতের কাছে! কি ক'রে পাড়ব কথাটা তার ভাষা মনে মনে ঠিক করতে লাগলাম।

সূর্যাস্তের একটু আগে আমরা শেষ চটিতে নেমে একটু চা-টোষ্ট খেয়ে নিলাম। তখন শিশুটি পর্যন্ত নিয়ে সমস্ত পরিবারটি বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে দীর্ঘ নিদ্রার পর। আমি বরং একটু নার্ভাস হ'য়ে পড়েছি ভেতরে ভেতরে, কথার মধ্যে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছি। গৃহিণী একবার বললেনও—"তুমি বাবা এবার যেন হাক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ, একবারটিও চোখের পাতা এক ক'রলে না তো।" বললাম—"না, তেমন কিছু নয়।"...

"কিন্তু, কিছু যেন ভাবছই ; বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে না তো?"

প্রায় বেরিয়েই পড়েছিল, ওদেরই সমস্যার কথা ভাবছি। তখনই মনে প'ড়ে গেল, বাড়াবাড়ি হ'য়ে পড়বে। বললাম—"না...এই তো বেশ দেখতে দেখতে গল্প করতে করতে এলাম।"

"ব্যাটা ছেলের আবার মন কেমন কি?"—সমর্থন করলেন কর্তা। খাবে দাবে ঘুরে বেড়াবে।" "আর নাক ডাকিয়ে ঘুমুবে।...তুমি থাম বাপু।"—গৃহিনী থাবা দিলেন।

ঘণ্টা দুই পরে আমরা গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছলাম। একটু রাতই হ'য়ে গেছে।

এখানে আমার স্মৃতিটা বড় আবছা হ'য়ে গেছে। যেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম সেটা যেন একটা আফিস-ঘর। বাইরে একটা খোলা জায়গায় অনেকগুলি পুস্‌পুস্‌ রয়েছে। আরও ভেতরে গিয়ে বোধহয় নামধাম পরিচয় গোছের কিছু লেখালাম।...ওঁদের বাড়ির গাড়ি আসবার কথা, তখনও পৌঁছায়নি।...আমি অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছি।...সব যেন গুলিয়ে গুলিয়ে যাচ্ছে, সকালে নেমেই যেমন হয়েছিল।...কোনও হোটেলে গিয়ে উঠব এই ঠিক ছিল, কিন্তু এঁদের সামনে তো সে কথা তুলতে পারছিনা। এদিকে আসল কথাটার সময়ও যাচ্ছে বেরিয়ে, ওঁদের গাড়ি এসে পড়লেই হোলো। শেষে মরিয়া হ'য়েই, অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও আরম্ভ করেছি—"হ্যাঁ—তখন যে এদের টিউটারের কথা বলছিলেন...।"

ছেলেটি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, ব'লে উঠলো—"ঐ আমাদের গাড়ি এসে গেছে!"

গৃহিণী বললেন—"আছে তেমন জানা শোনা? তাহলে আমরা কোলকাতায় ফিরে গেলে দেখা ক'রে বোল।...শিগ্গিরই ফিরছি।

আমাদের আবার চেঞ্জে আসা ! গড়িমসি ক'রে যা দেরী ক'রে দিলেন !" চেঞ্জার !! হাওয়া বদলাতে এসেছেন !! হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা যেন ধোঁয়াটে হ'য়ে গেল চোখের সামনে।...এত আশার মুখে এরকম ধাক্কা আর কবে খেয়েছি মনে পড়েনা। এরপর থেকেই দুর্ভোগের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হ'য়ে গেল আমার।

অমন চোট খেয়েও কি ক'রে যে সামলে নিলাম আর কেন যে মনে হোল একটু গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বিদায় দিয়ে আসি, এখনও বেশ বুঝতে পারিনা।

আফিস ঘরে একটা নড়বড়ে টেবিল, ওদিকে একটা কাঠের চেয়ার। যে ভদ্রলোক লিখছিলেন, আমরা থাকতে থাকতেই উঠে গেছেন। আমি আমার ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি ব্যাগ নেই ! তারপর আবার সে-রাত্রির অনেক কিছু স্মৃতি থেকে অবলুপ্ত; হয়তো অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগ আর চঞ্চলতার জন্য কিছু দাঁড়াতে পারেনি মনে—কাকে কি বলেছিলাম, কে কি বলেছিল—কিছুই নয়। সমস্ত রাত সেই ঘরে সেই টেবিলের ওপর কোনরকমে গুটিয়ে শুয়ে অসম্ভব রকম মশার কামড়ে ছটফট করেছি। শুধু এইটুকুই আছে মনে, পরের জীবনে আর কোনখানের মশার কামড় সে-স্মৃতিকে চাপা দিতে পারেনি ব'লেই নিশ্চয়।

একেবারে শেষের দিকে একটু ঘুম এসে গিয়েছিল, দু'একটা কি শব্দে জেগে উঠতে রাত্রির ওদিকের সমস্তটুকু একসঙ্গে মনে প'ড়ে গিয়ে বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো।...আমার ব্যাগ ! তার মধ্যেই জামা কাপড়, টুকিটাকি—সবকিছু। হাতটা আপনা হ'তে পকেটের ওপর গিয়ে পড়ল। না, গাড়িতে ভিড়, গাঁটকাটার ভয়ে মনিব্যাগটাও সেই ব্যাগেই রেখে দিই।...আফিস বন্ধ ছিল, কে খুলে কখন চ'লে গেছে...কয়েকজন পুস্‌পুস্‌-ওয়ালা উঠোনটায় জড়ো হ'য়েছে, গল্প করছে।

...এরপর অনেকখানি পর্যন্ত একটা ধূসর শূন্যতা। নিজেকে এত একা, এত অসহায়, এত নিরুপায়, জীবনে আর কখনও অনুভব করিনি। টুকরো-টুকরো হ'য়ে মনে প'ড়ছে দিনটা, এক একটা চেতনা অতিরিক্ত উগ্র হ'য়ে উঠে।...ক্ষিদে ! সেরকম ক্ষিদেও পায়নি কখনও জীবনে।...কড়া রোদ্দুর। একটা গাছের ছায়ায় বসেছিলাম। একটা মাঠের চারিদিকের রাস্তা ধ'রে চলেছি, কি উদ্দেশ্যে, কোথায় কিছু হুঁস নেই।...পথটা বেড়ে বেড়ে গিয়ে যেন আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে গেছে। অসহ্য ক্ষিদে। ...ভয় হ'চ্ছে, আতঙ্কের ওপর একটা আতঙ্ক—শেষ কালে কি আমায় পেটের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন

করতে হবে ! ···দুর্বল মনের সঙ্গে অতি বলবৎ ক্ষুধার একটা যেন লড়াই চলেছে। সহায় হ'য়ে দাঁড়াল লজ্জা। সেদিন শিবপুরে বসে পরিকল্পনা থেকে নিয়ে যত মূঢ়তা, যত হঠকারিতা, যত আকাশকুসুম রচনা—সব একজোট হ'য়ে একটা উৎকট লজ্জার রূপ নিয়ে দাঁড়াল আমার সামনে। গিয়ে-দাঁড়াব যে, ব'লব কি ? কত লুকুব ? তার শূন্যতা কত মিথ্যা দিয়ে ভরব ?

একটা ইঁদারা। পাশে একটা বাঁধানো চবুতরা, কয়েকটা সিঁদুর মাখানো নুড়ি পাথর। ···কি একটা ঝাঁকড়া-ঝোকড়া গাছের ছায়ায় গিয়ে বসেছিলাম। কেউ এলে একটু জল চেয়ে নিয়ে খেতে হবে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমটা একসময় ছাঁৎ ক'রে ভেঙ্গে গিয়ে একটা কথা মনে প'ড়ে যেতে আবার শরীর অবশ হ'য়ে পড়ল। আবার সেই ক্ষিদে ; ঘুমের পরে কি আরও সতেজ হয়ে উঠল ? ...তবে, মাথাটা যেন পরিস্কার আগের চেয়ে। তাইতেই যেন একটু আলো। ...ভিক্ষা যখন অনিবার্যই, সেণ্ট-কলম্বাস কলেজে চ'লে যাচ্ছিনা কেন ? ছাত্রদের হোস্টেলে। ছাত্রের গতি ছাত্র। তাদেরই একজন দৈবক্রমে দুরবস্থায় পড়েছে, কোন উপায় করতে হবে।...বুকটা হালকা হ'য়ে মাথাটা আরও পরিস্কার হ'য়ে এসেছে। ক্ষিদের কথাই বা বলতে হবে কেন ? রাত্রি সামনে, একটু আশ্রয় চাই। তারপর, আর তো ভিক্ষাও নয় ; ফিরে যেতে হবে, চাঁদা ক'রে কিছু তুলে দিক, গিয়ে পাঠিয়ে দোব। পকেটমারদের কৃপায় এরকম তো কত হ'চ্ছে নিত্য। উঠে আবার পথ ধরলাম। অনেকখানি বিকাল হ'য়ে এসেছে। একজনকে—বাঙ্গালীই —জিজ্ঞেস করতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। কাছেই এসেও পড়েছি।

হোস্টেলের বারান্দা হ'য়ে এগিয়ে চলেছি। বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। আদিবাসী ক্রীশ্চানই বেশী। একটা ঘরে ইংরাজীতে বাঙ্গালীদের আলাদা ঘর আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে ওপরতলায় একটা ঘরের নম্বর বললে একজন।

ওপরে উঠতে হাঁটুদুটো যেন মুড়ে মুড়ে যাচ্ছে।...

কি বলব ? কি ভাববে ?···নেবেই বা কি ভাবে ? মাথাটা কিন্তু বেশ পরিস্কার হ'য়ে আসছে ; পরে একদিন যে মাথাটা গল্পে-উপন্যাসে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা রচনায় সাহায্য ক'রেছে। বলব—"এখানে কি বিকাশ হালদার থাকে ?" থাকেনা জেনেই প্রশ্ন। শুনে মুখটা শুকিয়ে যাবে। বলব—"তবে আমায় যে লিখলে—হাজারীবাগ কলেজেই হোস্টেলে পড়ছে !" আন্দাজ করবে সবাই। কেউ বলবে রাঁচী কলেজ বলেনি তো ?—বা, ঐ রকম কিছু। এরপরেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

যখন বাঁচান তিনি, মিথ্যা ভাষণের কলুষটুকু থেকেও দেন বাঁচিয়ে।

এগিয়ে যাচ্ছি নম্বরের ওপর দৃষ্টি রাখতে রাখতে, গিয়েও পড়েছি কাছাকাছি, পেছন থেকে কানে গেল—"একটু দাঁড়ান তো!"

ঘুরে দাঁড়াতেই একটু চেয়ে থেকে—"বিভূতি! তুই এখানে! of all places!

আমারও ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে; "ভোম্বোল!···তুই···তুই!···"

গলা ধ'রে এসেছে। জড়িয়ে ধরলাম বুকে।

ভোম্বলের কথা একটু বলেছি, আমার বাংলা স্কুলের জীবনের কথা বলতে। খুব অন্তরঙ্গই ছিল, তবে বাংলা স্কুল পর্যন্তই। ওর বাবা কালী লাহিড়ী রাজ্যের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। পরে গভর্ণমেণ্টে চ'লে যান সিভিল সার্জন হ'য়ে। তারপর থেকে একেবারে যোগাযোগ ছিন্ন হ'য়ে যায়। দু'টো দিন জোর ক'রে ধ'রে রাখল হোস্টেলে। তেমন আনন্দেও অনেকদিন কাটাইনি। তখন গানটান গাইছি, খেলার মাঠেও নামলাম একদিন। বন্ধু-গৌরবের একটু কারণ হয়েছিল নিশ্চয় ভোম্বলের। একদিন বলল—"তা, হ্যাঁরে, পাশ ক'রে এখানেই চ'লে আয়না।··· বলিস তো একটা ভালো টুইশনও জোগাড় হ'য়ে যেতে পারে। বাড়ির আরামেই থাকবি, এই রকম দেখে।"

ওকে, অবশ্য, টুইশান শিকারের কথাটা বলিনি। মনগড়া কি বলেছিলাম আজ মনে নেই। শুনে বললাম—"এখানে? এই পাহাড়ে-ঘেরা তেপান্তরে?···কেউ মেয়ে দিয়ে আধখানা সম্পত্তি লিখে দিলেও শর্মা রাজি নয়। তুই কি দেখে মরতে এখানে এসে উঠেছিস?"

•

আমার জীবনে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে গেল। একদিনের হঠাৎ খেয়ালে শুরু হ'য়ে দু'দিনেই শেষ। আগের জীবনের সঙ্গে কোন যোগ নেই, পরের জীবনটাকেও কোনরকমে প্রভাবিত করেনি।

তবু, মনে হয়েছে, একেবারেই বিচ্ছিন্ন কি?

আমি হাজারীবাগ থেকে সোজা দ্বারভাঙ্গায় গিয়ে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মহম্মদপুরে বাবার কাছে চ'লে গেলাম। এবার পুজার ছুটিতে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আসতে পারিনি, "বর্ষার নোনা জলে"র অতিরিক্ততারও একটা চাপ গেছে। সেখানে একদিন এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় প্রশ্নটা উঠল মনে। কি ক'রে ভাবতে পেরেছিলাম হাজারীবাগে চ'লে আসব? আমি যে শিবপুরে শৃঙ্খলিত। আমার সমস্ত সত্তা যে আজ শিবপুরে কেন্দ্রীভূত। ধ'রে নেওয়া যাক, এই রকম বিরূপ না হ'য়ে হাজারীবাগ যদি আমায় হাত বাড়িয়ে ডেকেই নিত, লোভনীয় ক'রে

তুলত নিজেকে, যদি অসম্ভবই হোত সেই লোভ কাটিয়ে ওঠা, তাহ'লে কত গভীর বঞ্চনা নিয়েই কাটাতে হোত আমার জীবন!

শিবপুরে তখন আমার দ্বিতীয় বৎসর চলছে; কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর মাঝামাঝি একদিনের কথা। স্টীমার ঘাটে নেমে সোজা পথে এসে আমাদের গলিটা পড়ত, আজ মনে পড়ছে না কেন, আমি একটু ঘুর-পথে আসি সেদিন। শুধু এইটুকু দেখেছি, কিছু ঘটার থাকলে কে যেন অলক্ষে থেকে নিত্যদিনের পথ ছাড়িয়ে এইরকম ঘুর-পথ দেয় ধরিয়ে। ঘটাটুকু ভালোর দিকেই হোক বা মন্দের দিকেই হোক। আমার সেদিনের এ-সংঘটন?—এমন বেদনায়-আনন্দে ওতপ্রোত হ'য়ে রয়েছে যে, এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি সেটা ভালো ছিল কি মন্দ। শুধু, এইটুকু ভাবি, সেটা না ঘটলে যে শূন্যতা থেকে যেত আমার সত্তার একটা অংশে, সেটা আর-কী দিয়ে পূর্ণ করা সম্ভব ছিল?

একলাই আসছিলাম আমি সেদিন। ফলে, যে-জিনিসটা আমার নিতান্তই একলার; আর সব-কিছুর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, সেদিন আমার নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হ'য়েই উপস্থিত হয়েছিল। সেদিন যে ঘুর-পথটা ধরেছিলাম আমি, একটা চওড়া গলিই, সেটা খানিকটা সোজা গিয়ে একটা তেমাথার সৃষ্টি করেছে। সামনে একটি বাড়ি। সুদৃশ্য, তবে ছোট, একহারা। আমাদের বাসা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। পূর্বেও অনেকবার এই রাস্তা হ'য়ে এই বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করেছি। তখন বাঙ্গালীদের বাড়ি করায় নিজস্ব একটা স্টাইল্ রয়েছে, এখনকার মতো সব একাকার হ'য়ে যায়নি। দেশে নূতন গিয়ে চারিদিক দিয়ে বাঙ্গলার বাঙ্গালীত্ব খুঁজছি, তখন যেতে-আসতে এই বাড়িটি নজরে পড়ত বেশী ক'রে।

সে দিন যখন সোজা রাস্তাটার আধাআধি এসে প'ড়ে বাড়িটার কাছাকাছি হয়েছি, একটি মেয়ে বাড়ি থেকে থেকে বেরিয়ে এল। কেন এর আগে চোখে পড়েনি কি ক'রে বলব, হয়তো যে জীবনের এতখানি পূর্ণ ক'রে থাকবে তাকে দেখার, তার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হওয়ার জন্য এই লগ্নটি প্রতীক্ষা ক'রে ছিল। সেই প্রথম দেখলাম আমি শীলাকে।

শীলা কিন্তু তার নাম নয়। যাকে আমি জীবনভোর আমার অন্তরে গোপন ক'রে এলাম, সে-অন্তঃপুর ছাড়িয়ে সে যখন আমার জীবনে প্রত্যক্ষ হোলই না, তখন পরিচয়ের দিকেও থাক্ সে এই ছদ্মনামের অন্তরালেই।

"দৃষ্টি-বিনিময়" কথাটা আমি যে ব্যবহার করলাম—কাব্যে-উপন্যাসে

রোমান্সেরই কথা একটা—আমি কিন্তু এখানে সে-অর্থে ব্যবহার করিনি। তার একমাত্র কারণ এই যে, আমার দৃষ্টিতে সেই লগ্নে যে ভাবই ফুটে থাকুক, তার দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই সে-ধরণের কিছু ছিল না ব'লেই আমার বিশ্বাস।

বিশ্বাসের কারণ, সে-যুগটাই সে-ধরণের ছিলনা। আজকাল রোমান্সের এত প্রাচুর্য এই জন্য যে, আজকাল যে-মেয়েরা নানা কাজে বাড়ির দরজা পেরিয়ে বাইরে পা দিচ্ছে—শিক্ষা থেকে নিয়ে উপজীবিকা পর্যন্ত নানা রকম প্রয়োজনে—তারা অন্তত বয়সের দিক থেকে রোমান্স জিনিসটা বোঝে। হাওয়াটাও রোমান্সেরই অনুকূল আজকাল।

তখনকার, সেই অ-রোমান্টিক যুগের একটি কিশোরী, বয়েসটা অনেক বাড়িয়েও চৌদ্দর খুব বেশী ও-দিকে নিয়ে যাওয়া যায়না—সুন্দর ব'লে তার মুখের ওপর অনেকের দৃষ্টি একটু আটকে যায়, সে এইটুকুই বুঝতে পারে; এর বেশী আর কি?

সুতরাং শীলার দিকের কথাটা বাদ দেওয়া যাক্। সেই প্রথম "দৃষ্টি বিনিময়"—এর পর তার সেই অপূর্ব চোখদু'টি, আমার পথ চেয়ে কখনও অপেক্ষা ক'রে ছিল কিনা, কী ক'রে বলব আমি?

আমি সেদিন কলেজ থেকে দেরি ক'রেও ফিরি, হয়তো ইডেন-গার্ডেনস ধ'রে রেখেছিল। বিকালের রোদটার একটা লাল আভা এসে পড়েছে। "কনে-দেখার-আলোয়" আমি প্রথম দেখলাম শীলাকে।

গতি নিশ্চয় শ্লথ হ'য়ে গিয়ে থাকবে আমার। সেটাও এখন আন্দাজে বলছি এইজন্য যে, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত এমন একটা ঘটনা গতি একটু শ্লথ না ক'রেই পারেনা—কিছু স্পষ্ট যা মনে আছে, তা এই যে, আমি বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারিনি সে-মুখের দিকে।

হঠাৎ কি যেন ঘটে গিয়ে মুহূর্তটিকে স্তব্ধ, নিশ্চল ক'রে রাখল আমার মধ্যে। দেখেছি, সৌন্দর্য আমার মনে যে প্রথম প্রতিক্রিয়াটি জাগিয়ে এসেছে তা সম্ভ্রমের, আকাঙ্খার একেবারেই নয়।...সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই শাইনেস (Shyness) এসে পড়ে, যা, একটা যেন গণ্ডী রেখার ওদিকে মনটাকে আর এগুতে দেয়না। আমি কোথাও অস্বীকার করিনি যে সৌন্দর্য আমায় চিরকালই মুগ্ধ করেছে! মনে হয়েছে, তাহ'লে এই বুঝি ভালবাসা। শীলাকে দেখার পর সেদিন প্রথম আবিষ্কার করলাম—আর সবার বেলায় সে ছিল একটা মোহ মাত্র, নিবিড়ভাবে "ভালোলাগা" একটা।...চাতরায় পূর্ণযুবতী নয়নতারাকে আট-নয় বছরের ছেলে আমি ভালবেসে ফেলব, এমন উদ্ভট ঘটনা একটা কবে কোথায় হয়েছে?

বাড়ির সামনের তেমাথাটি খুব ছোট, যেন বাড়ির বাইরের উঠানটিই;

গাড়ি-ঘোড়ার বালাই নেই, লোক চলাচলও কমই। বেরিয়েই একদিকে অন্য এক বাড়ির খোলা জায়গা এক ফালি। একটি বড় বাতাবিলেবুর তলায় একটা শানবাঁধানো চাতাল; কাছে পিঠের ছেলেমেয়েদের বিকালের এই সময়টিতে একত্র হওয়ার জায়গা। ছোট ছেলেমেয়েরা খেলবে, একটু বড় মেয়েরা গল্প করবে। আমি চোখ নামিয়েই এসেছি একরকম। তেমাথায় এসে ডাইনে মোড় নেওয়ার আগে চোখ একটু অবাধ্যভাবে ঘুরে যেতে দেখি শীলা তিনচারটি সমবয়সীর সঙ্গে চাতালে ব'সে পা ছুলিয়ে ছুলিয়ে গল্প করছে। তার দৃষ্টিও যে সে সময় এদিকে এসে পড়েছে, সেটা আকস্মিকই মনে হোল।

সেইদিন থেকে এক স্বপ্নরচনার যুগ শুরু হ'য়ে গেল, যেমনটি আর পূর্বে কখনও আসেনি, পরেও না। মনে হোল এর আগে যারা এসেছিল আমার জীবনে সৌন্দর্য নিয়ে, মোহ নিয়ে, তারা যেন ছিল আমার আজকের দিনটির জন্যে সাধনা। তারা জাগিয়ে গেছে আমার চৈতন্যকে, তারপর শেষ পর্যন্ত আমায় পৌঁছে দিয়ে একে একে বিস্মৃতির কুহেলীতে মিলিয়ে গেল। একটু কাব্যময় হয়ে পড়ছে? কিন্তু ছিলই যত কাব্যময় তার শতাংশও কি প্রকাশ করতে পারছি?

সেইদিন থেকে সেই ঘুর পথ হ'য়ে পড়ল আমার যাওয়া-আসার পথ। শুধু কলেজ নিয়েই নয়, কারণে—অকারণে। সেই বাড়ি, সেই সুরখির রাঙা তেমাথাটুকু, পাশে বাতাবিলেবুর ছায়া বেছানো জায়গাটুকু—আমার কাছে অপরূপ এক জগৎ হ'য়ে উঠল। এত অপরূপ যে, সমস্ত শিবপুরটাকেই আমার কাছে আরও মোহময় ক'রে তুলল। প্রতিদিনই যে শীলাকে দেখেছি এই পরিবেশে তাও নয়। তবু দেখতাম বৈ কি। এখানে যেমন বঞ্চিত হতাম, তেমনি আবার অন্যত্রও পেয়ে যেতাম দেখা।...আমাদের বাসার যেদিকে শীলাদের বাড়ি তার উল্টোদিকে সেই গলি হ'য়েই ছিল শীলাদের স্কুল। প্রায়ই চোখে পড়ত শীলা স্কুল থেকে ফিরে আসছে। বাঁ হাতে একখানা স্লেট, তার নীল রঙের ওপর দিয়ে শীলার নিটোল, সুগৌর হাতখানি নেমে এসেছে। কি জানি কেন স্লেট? কোন ক্লাসের ছাত্রী তাও জানিনা। তবে আমাদের তখন সবই ছিল এখন থেকে অনেক আলাদা। নোলক্ পরত ঐ বয়সের মেয়েরা। একটি বেশ পুষ্ট নোলক থাকত শীলার মুখে, টানা নাকটির নীচে ছুল ছুল করত। আরও আলাদা ছিল যুগটা। মেয়েদের পায়ে এত জুতা ওঠেনি। ভালো কি মন্দ জানিনা, তবে, একজোড়া চপ্পলের চেয়ে নিশ্চয় ভালোই; তা সে যতই জরি-বসানো হোক। শীলার নগ্ন পা ঘেরে রাঙা আলতাটুকু ভালোই লাগত।...

শীলা আসছে, আমি যাচ্ছি হয়তো কিছু কিনতে, বাজার ওদিকেই। নির্জন গলি। কাছাকাছি গিয়ে দু'জনের দৃষ্টি নত হ'য়ে গেল। একজন যে দেখে তাকে একটু বেশি, যেন একটু খোঁজার ভাব নিয়ে, এটা বুঝে গিয়েছিল যেন শীলা। কী ভাবত সেটা তো জানা হয়নি। কোন কথাই তো কখনও হোলনা তার সঙ্গে।

একবার মাত্র একটি সুযোগ এসেছিল একেবারে সোনারপাতে মোড়া। কিন্তু হাতে পেয়েও পাওয়া যায়নি।

একদিন—সম্ভবত কোন রবিবার বা অন্য কোনও ছুটির দিন ছিল সেটা—সকালবেলায় দোকানে নিজের দরকারি কিছু কিনে ফিরছি, গলিটার একটা মোড় ঘুরে দেখি, সামনে গলিটার একেবারে শেষের দিকে শীলা আস্তে আস্তে চ'লে যাচ্ছে। শীলাই। বেশ খানিকটা দূরে তখন। প্রায় শ' গজ; কিন্তু আমার দৃষ্টি ভুল করবেনা। সেই একটি বিশেষ ভঙ্গিতে মন্থর গতি, পিঠজোড়া ঘন কেশের ঢাল।...আমার মতো এই পথ দিয়েই গেছে, আর একটু আগে হ'লে আরও কিছুক্ষণ দেখা যেত, সেটা আর হোলনা।

বাড়ি যেতে বড়মামিমা বললেন—"বিভূতি, তোমায় শীলা ডাকতে এসেছিল।"

ধক্ করে উঠল বুকটা। অজ্ঞতার অভিনয় ক'রে প্রশ্ন করলাম—"কে শীলা?"

"ওই যে...বাবুর মেয়ে।"—ওর বাবার নাম বললেন।

তিনজনেই ছিলেন, মেজোমামিমা বললেন—"এই মাত্র তো গেল, এখনও বোধহয় গলি থেকে বেরিয়ে যায়নি।"

"কেন ডাকতে এসেছিল—বললে কিছু?"—একটু স্খলিতকণ্ঠেই প্রশ্ন করলাম।

"ওর কে একজন চাতরার ভগ্নিপতি পাঠিয়েছিল ওকে। তোমার ঠাকুরমা এসেছেন দ্বারভাঙ্গা থেকে, খবর দিতে বলেছেন। হ'য়ে এসোনা।"

দাদাই যে আবার শীলার ভগ্নিপতি এটা জানা ছিলনা। তবে...একেবারে নিজের নয়; নিকট জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক পাশের বাড়ির জামাই। বয়স তখন তাঁর ত্রিশ-বত্রিশ হবে। যেতে ঐ কথাই বললেন—ঠাকুরমা এসেছেন, একবার দেখা করতে বলেছেন শিগ্গির।

কোনও বড় স্নানের যোগ থাকলে ঠাকুরমা কখনও কখনও এসে কাটিয়ে যেতেন চাতরায়।

আমি যে এখানে রয়েছি...দাদাও এটা জানতেন না। ঠাকুরমার কাছেই শুনেছেন। উনি অধর জ্যাঠামশাইয়ের চেয়ে আর একটু দূর

সম্পর্কের। বেশ একটু আমুদে গোছের মানুষ, বড় বড় ভাসা ভাসা চোখে একটু হাসি মাখিয়ে কথা কওয়া অভ্যাস। অনেকক্ষণধরে বসিয়ে গল্প করলেন।

একটু যেন বেশি পরিচয় নিলেন—কোথায়, কেমন পড়ছি, পড়া শেষ ক'রে কি করবার ইচ্ছা, আরও সব ব্যক্তিগত কথা। তার মধ্যেই একটা বিরতি দিয়ে, একটু যেন প্রসঙ্গ ছেড়েই প্রশ্ন করলেন—"শীলাকে দেখেছিস্?"

বেশ একটু থতমত খেয়ে গিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করলাম—"কে শীলা?··· যে ডাকতে গিয়েছিল?···না, চ'লেই এসেছিল মামিমাদের ব'লে।"

"এর আগে কখনও দেখিসনি? এখানকারই মেয়ে।"—হাসি হাসি দৃষ্টি স্থির ক'রে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রাণপণে নিজেকে সহজ ক'রে রাখবার চেষ্টা করছি। বললাম—"কলেজ থেকে আসতে কখনও কখনও দেখি বাচ্চারা খেলা করছে, কয়েকজন মেয়ে বসে গল্প করছে; তার মধ্যে..."

"কে শীলা কি করে জানবি?...ঠিকই তো।" —হাসি-হাসি চোখে একটু কৌতুকের ভাব যেন। কথাটা হঠাৎ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—যাক্, এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম। তুই আসছিস—খবরটুকু দিয়েই কোথায় যে চ'লে গেল। থাকলে ভালো হোত। পরিচয় করিয়ে দিতাম। আমার শালী হয়। বড় ভালো মেয়ে, আজকালকার মতন নয়।"

সেইদিন সবচেয়ে কাছাকাছি হই দু'জনে। কত সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল! কিছু না হ'য়ে কত কি যে হ'তে পারত তারই স্বপ্ন নিয়ে কাটাতে হোল জীবন। ধরা যাক্, ওটুকু বিলম্ব হয়নি, দু'জনে চলেছি পাশাপাশি। প্রথম একত্র হওয়ার মধ্যে কথা আর কি থাকবে?..."দাদা ডেকে পাঠিয়েছেন?...কে হ'ন তিনি তোমার?...ও, ভগ্নিপতি!...কবে এসেছেন?···থাকবেন এখন?···"

—শুধু কথা শোনবার জন্য। যত সংক্ষিপ্তই হোক।...

তারপর...তারপর...সেই প্রথম পরিচয়ের সূত্র ধ'রে সে আবার এক কী সম্ভাবনা! দু'জনে নিবিড় থেকে নিবিড়তম হ'য়ে পড়া!

হ্যাঁ, স্বীকার করি দু'জনকে নিবিড়তম ক'রে দেওয়ার আরও উপায় ছিল বৈকি, নিত্যই যে ভাবে হ'চ্ছে। নিবিড়তম ক'রে তোলবার জন্য সে-যুগে বিধিবদ্ধ যা যা সব কঠোরভাবে পালন করা হোত, সে দিক থেকেও কোন বাধা ছিলনা, তবু হোলনা। কেন হোলনা সে কথা বলতে বসিনি আমি। জীবন এমন একটা প্রহেলিকা, কত আশা ছিল—হবে, এমন কত ঘটনা যে শেষ পর্যন্ত হ'য়ে ওঠেনা, তার হিসাব আছে?

আমার নিজের বিশ্বাস, সেদিন আমরা ছু'টিতে 'সাত পা' পাশাপাশি যেতে পারলে, ছু'টো কথা হ'লে যেন সব কিছুই হ'তে পারত। তা না হ'য়ে, ছু'টি মিনিটের ব্যবধান আমাদের মধ্যে চির ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু আজ তারজন্যে আমার দুঃখ নেই আদৌ।

আমি পূর্বে বলেছি, এত যে ভালো লেগেছে আমার, কোন খানেই গিয়ে আমার কামনা স্পর্শ করেনি। যশ নিচ্ছিনা, এটা যেন আমার স্রষ্টার আশীর্বাদ আমার ওপর। শীলা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আমি তাকে যেন এই আশীর্বাদের মধ্যে দিয়ে পেয়ে গেলাম। ভালোবাসার শুদ্ধতম রূপে। নারীকে ভালবাসা—সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে—সারা জীবনের বিরহের বেদনা বুকে ক'রে—সে যে কী অমৃত, তা আমি বুঝেছি। নারীর ভালোবাসা যে পাইনি, অর্থাৎ শীলা যে প্রতিদান দেওয়ার সুযোগ পেলনা, তাতে কি? সে ও বরং ভালোই হয়েছে। তাকেও যে এই বেদনা বুকে ক'রে দন কাটাতে হোত—এ চিন্তায় সুখ কোথায়।

শীলার যতটুকু দেওয়ার অঞ্জলিভরে দিয়েছে আমায়। এর পরের শীলাকে জানিনা আমি, জানতে চাইনি, ইচ্ছে ক'রেই। আমার শীলা তার চতুর্দশ বসন্তের স্থির-কৈশোর নিয়ে আমার জীবনের একস্থানে আমার সেই সেদিনের প্রথম যৌবনকেও শাশ্বত ক'রে রেখেছে।

শিবপুরে আমার জীবনের মধুরতম, অন্তরতম সঞ্চয়ের কথা ব'লে এবার এ পর্ব শেষ করি। আমার জীবনের এই ঐকান্তিকতা এতদিন যবনিকার অন্তরালেই রেখে এসেছি, এ আমার জীবনালেখ্য ব'লেই তার একটা কোন একটু তুলে ধরলাম।

তা'হ'লে, জীবনকাহিনী ব'লেই আর একটু ব'লে দিতে হয় 'নীলাঙ্গুরীয়র' মীরাকে নিয়ে একটা অনুরূপ ধারণা গ'ড়ে ওঠবার কথা। উঠেছেও অনেক ক্ষেত্রে। প্রশ্ন পেয়েছি; সাক্ষাতে, চিঠিপত্রেও। এমনও হয়েছে, উত্তর দিয়ে বিশ্বাস করাতে পারিনি যে বস্তুত মীরা নামে কোন মেয়েই আসেনি আমার জীবনে। আমি একদিন নারীকে ভালবাসার যে অমৃত-স্বাদ পেয়েছিলাম, মীরাকে ভালোবাসার মধ্যে সেইটিই রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছি। শীলাকে না দেখলে, না জানলে আমি মীরাকে আনতে পারতাম না। আমার দিক দিয়ে শ্যামাঙ্গী মীরা গৌরাঙ্গী শীলারই প্রতিরূপ। এদিক দিয়ে মীরা সত্য বৈ কি। মীরাকে ভালবাসিয়েও আমি শীলাকেই পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছি আমার জীবনে।

শিবপুর স্থায়ী হ'য়ে থাকতে পেল না। হাজারীবাগ আতঙ্কই হ'য়ে রইল, আই.এ. পাশ করার পর আমায় বি.এ. শুরু করতে হোল পাটনায় বি-এন কলেজে। আই.এ. পাশ করলাম সেকেণ্ড ডিভিসনে। বিশেষ যে দুঃখিত হয়েছিলাম একথা বলতে পারিনা। পূর্বেই বলেছি, রিপন কলেজে থাকতে আমি স্কুলযুগের সমস্ত বিশিষ্টতা থেকে খানিকটা নেমে এসে-ছিলাম, খেলা-পড়া—সবদিক দিয়েই। পাটনায় এসে আমি আবার খানিকটা নিজের জগতে ফিরে এলাম। সে হিসেবে দেখতে গেলে আমার দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করাটাও আমার অনুকূলেই এসে গেল। আমি পাটনা (গঃ) কলেজে জায়গা পেলাম না। চেষ্টাই করলাম না অবশ্য; অধমতারণ বি-এন কলেজে নাম লেখালাম। ক্লাশ শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই সুনজরে প'ড়ে গেলাম। তাও যার-তার নয়, স্বয়ং কলেজের প্রিন্সিপালের। আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। ডি. এন. সেন নামেই পরিচিত। দীর্ঘচ্ছন্দ শরীর একটু স্থুলত্বের ওপরই; ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, শ্যামবর্ণ, বয়স...বোধহয় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে; প্রশান্ত, গম্ভীর ভাব। সুট প'রেই থাকতেন; ঈষৎ স্থূলত্বের জন্য সেটাও বেশ নিভাঁজ হ'য়ে মিশে থাকত অঙ্গের সঙ্গে। কলেজ স্টাফের মধ্যে এদিক দিয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য বেশ সুপরিস্ফুটই ছিল। ফিলজফিতে 'এম.এ' ছিলেন। তৃতীয় বার্ষিক বি.এ. ক্লাসে সাইকোলজি অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব পড়াতেন। প্রথম দিনের কথা, এক হিসাবে সামান্য হ'লেও আমার স্মৃতিতে একটু বিশেষভাবে চিহ্নিত হ'য়ে থাকবার একটু কারণ আছে। বি. এন কলেজের তখন দীন অবস্থা যাচ্ছে বললে ভুল হয়না। যিনি স্থাপন করেন, বোধহয় তাঁরই বাংলো-ধরণের বাড়ির বড় হলঘর বিভক্ত ক'রে, চারিদিকের বারান্দা ঘিরে নিয়ে ক্লাশ হোত। সে সব দিনে ছাত্র সংখ্যা খুবই কম থাকতো; একরকম করে কুলিয়ে যেত।

এই রকম একটি ঘেরা বারান্দায় আমরা জন দশবারো ছাত্র বসেছি, ডি. এন. সেন এলেন। ওঁর সব কাজেই বেশ একটি পারিপাট্য ছিল। প্রথমে একটি ছোট্ট ভূমিকায় আমাদের স্বাগত জানিয়ে, মনস্তত্ত্ব জিনিষটা কি, স্থূল দেহের সঙ্গে সূক্ষ্ম মনের কি সম্পর্ক, কি ভাবে একে অন্যকে প্রভাবিত করে তার একটু পরিচয় দিলেন। পরে একটি কাল্পনিক বিশেষ পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের সবাইকে মনের প্রতিক্রিয়াটা কি হ'তে পারে সে-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কয়েক লাইন লিখতে বললেন। ইংরাজীতেই।

যার যেমন শেষ হ'য়ে আসছে, একে একে প'ড়ে যেতে বলে, কোনটাতে চুপ ক'রে শুধু শুনেই গেলেন, কোনটাতে অল্প অল্প মাথা

নাড়লেন। আমি আমারটা শোনাতে, একটু বিশেষ ভাবে অনুমোদনের ভঙ্গিতে মন্তব্য করলেন—"just so."

সে দিন ওইটুকুই ; ক্লাশের মধ্যে তখন বোধহয় এর বেশী বলা চলত না ; তবে, সেই থেকে আমি ওঁর নজরে প'ড়ে গেলাম। ছোট স্কুল বা ছোট কলেজের এই একটা সুবিধা। শিক্ষক-ছাত্রের দূরত্বটা যেন স্থানের অভাবেই বাড়তে পায়না ; তারপর দৈবাৎ যদি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবার সুযোগ পাওয়া গেল তো, স্নেহে-শ্রদ্ধায় পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলতে বিলম্ব হয়না। আমার ক্ষেত্রে আবার অদৃষ্ট একটু বেশী প্রসন্ন ছিল। প্রিন্সিপাল সেনের আমি শুধু ছাত্রজীবনেই অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠিনি, পরেও আমার এই সৌভাগ্য বহুদিন পর্যন্ত অটুট ছিল—আমি যখন প্রৌঢ়ত্বে পদার্পন করেছি আর উনি বার্ধক্যের প্রায় শেষ সীমায়। সে কথায় আসবার পূর্বে ওঁর আর একটু পরিচয় দিয়ে দিই। আমার ভুল হ'তে পারে, তবে আমার মনে হয় আজকালকার হেডমাষ্টার, প্রিন্সিপাল প্রভৃতি স্কুল কলেজে রাজনীতি নিয়ে কাটান বেশী, বা হয়ই কাটাতে। বাইরের রাজনীতিও, কেননা রাজনীতি আজকাল সর্বগ্রাসী হ'য়েও উঠেছে। তখনকার দিনে ঠিক এমন ছিলনা।

ফলে, একজন হেডমাষ্টার, প্রিন্সিপাল বা সাধারণ শিক্ষকই নিজেকে শিক্ষা-দীক্ষার নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত ক'রে দিয়ে জ্ঞানে-চরিত্রে তাঁর ছাত্রদের মানুষ হিসাবে গঠন ক'রে তোলবার অবসর পেতেন। সক্রিয়-ভাবে সর্বক্ষেত্রে সম্ভব না হ'লেও, তাঁদের আদর্শই ছাত্রদের উন্নীত ক'রে তুলত মনুষ্যত্বে। এই টাইপ ছিলেন বাংলা স্কুলের সুধীরবাবু, রাজস্কুলের ছত্রধারীলাল। ডি· এন· সেন ছিলেন সেকালের ব্রাহ্ম। তিনি পাটনার ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পরেশবাবুর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পরে বিপত্নীক হ'য়ে আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেননি।

এক যদি বলা যায়, বি· এন· কলেজই তাঁর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ।

ডি. এন. সেন কলেজের সঙ্গে একেবারে একাত্ম হ'য়ে গিয়েছিলেন। কি ক'রে কলেজটিকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবেন, এই ছিল তাঁর দিবা-রাত্রির স্বপ্ন ; অর্থাভাব, স্থানাভাব, উপযুক্ত গৃহের অভাব—সব রকম অভাবের মধ্যে দিয়ে। তখন গভর্ণর থেকে নিয়ে, কমিশনার, ডি· পি· আই· প্রভৃতি যত বড় বড় অফিসার, সবাই সায়েব। প্রায়ই কাউকে না কাউকে দিয়ে কলেজ পরিদর্শন করিয়ে নিতেন : বিজ্ঞান বিভাগের একটা আলাদা বাড়ি করিয়ে নিলেন, কি হোস্টেলের দু'টো ঘর, কি বিজ্ঞান বিভাগের যন্ত্রপাতির জন্য মোটা কিছু গ্র্যাণ্ট বা অনুদান। বেশ খানিকটা বিব্রতই থাকতে হোত এইসবের জন্য ; কিন্তু

বাইরে থেকে বোঝবার জো ছিলনা। বাইরে বাইরে ওঁর কতকগুলা শখ বা হবি (hobby) ছিল, তাই নিয়ে থাকতেন। একটা ছিল বাগান। সমস্ত কলেজটাই ছিল একটা বাগান। সুচারুভাবে ছাঁটা কাশনির বেড়া দিয়ে আলাদা করা সুরখির রাস্তা, ভেতরের দিকে যতটুকু বা যতখানি জমি, সব ফুলের বেড্; বিশেষ ক'রে শীতকালে নানাজাতের মরসুমি ফুলে সমস্ত কলেজটা বর্ণে-গন্ধে অপরূপ হ'য়ে থাকত। আর একটা হবি ছিল প্ল্যাণ্ট-অটোগ্রাফ্ (Plant autograph)। আচার্য জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারটা তখন বিজ্ঞান জগতে খুব একটা বড় সাড়া জাগিয়েছে। কলেজে নিজের ছুতোর-মিস্ত্রি দিয়ে এবং নিজের নির্দেশে যন্ত্রপাতি তৈরি করিয়ে রিডিং (Reading) নিতেন। গবেষণায় লেগে থাকতেন। ওঁর বাসা ছিল অনেকদূরে, পাটনার বিরাট লন (Lawn), বর্তমান 'গান্ধী-ময়দানের' ওপারে। উনি কিন্তু থাকতেন খুব কমই সেখানে। কলেজের পর একবার বাড়ি চ'লে গিয়ে আবার ফিরে এসে—কখনও বা একটানা থেকে গিয়ে বাগান আর প্ল্যাণ্ট-অটোগ্রাফ নিয়ে কাটাতেন। বেশ কিছুটা রাত পর্যন্তই অনেক সময়। পড়াশোনার কাজও এই সময়টায় করতেন। কিংবা কিছু লেখার কাজ থাকলেও। একবার আমরা দু'জন বাঙ্গালী ছাত্র—তখন বোধহয় চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে রয়েছি—সন্ধ্যার একটু আগে কলেজ হোস্টেলে যাব, দেখি ভেতরের দিকে ওঁর অফিসের বারান্দায় ব'সে কি একটা লেখা নিয়ে একটা নীচু টেবিলের সামনে হেঁট হয়ে বসে আছেন। কাশনির বেড়া, তার ওদিকে দু'একটা ফুলের গাছের হালকা আড়াল রয়েছে, আমরা একটু সন্তর্পণেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম, উনি দেখতে পেয়ে আমাদের ডেকে নিলেন—"ওহে শোন, শোন!"—ব'লে, যেন একটু ব্যগ্রভাবেই। আমরা উঠে গিয়ে নমস্কার ক'রে দাঁড়াতে বললেন—"আমি এই অনুবাদটা করছি, কি রকম হচ্ছে শোন তো।"

নামটা মনে পড়ছেনা, তবে রবীন্দ্রনাথের বোধহয় 'বলাকা' (?) থেকে একটা দীর্ঘ কবিতা। বেশ একটু ফাঁপড়ে পড়তে হোল। কলেজের অধ্যক্ষ। যে-রকম ভাষাতেই বলি, চাটুবাদ ব'লেই মনে হবে। এদিকে হ'চ্ছে প্রকৃতই অপূর্ব; উনি কাব্যের নিজের-ভাষায় যে এধরণের অনুবাদ করতে সমর্থ, এ জ্ঞান না থাকায় যে চমৎকৃতই হয়েছি, এই সত্যটাও প্রকাশ ক'রে ব'লতে পারছিনা; যতটা পারলাম উচ্ছ্বাসের দিকটা সংযত ক'রে সংকুচিতভাবে একটা অভিমত দিলাম।

উনি তখন এমন ভাবের-ঘোরের মধ্যে রয়েছেন যাতে মনে হোল গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটা মুছেই গেছে। প্রশ্ন করলেন—"হ'চ্ছে ঠিক মনে হয় তোমাদের?"

এই রকম আর একদিনের কথা বলি, তাতে ওঁর চরিত্রের আর একটা দিক প্রকাশ পাবে।

সেদিন আমরা জনা তিন-চার ছেলে প্রায় ঐ সময় হোস্টেলের দিকে যাচ্ছি, উনি দেখতে পেয়ে ডেকে নিলেন। গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর গোটা তিনেক লজ্জাবতী লতা আর ওঁর অটোগ্রাফ নেওয়ার যন্ত্র। রিডিং নিচ্ছিলেন, একটা ছাপা চার্টে, ছোট বড় কতকগুলি সরলরেখা তির্যক আকারে আঁকা রয়েছে।

"Watch" (লক্ষ্য রাখ)'—ব'লে শুরু ক'রে দিলেন পরীক্ষা। যন্ত্রের সঙ্গে একটি বিজলীর তার দিয়ে সংযুক্ত একটি ছোট সূচের আকারের কলম, তারটার অন্য প্রান্ত একটি লজ্জাবতী লতার সঙ্গে অল্প জড়ানো। লতার পাতায় স্পর্শ দিতে যেই সেটা নুয়ে পড়ল, এদিকে কলমটা সচল হ'য়ে চার্টের গায়ে কয়েকটা রেখা টেনে দিল।

"Now watch" (লক্ষ্য করো)—ব'লে উনি লতাটির গায়ে একটা আল্‌পিন ফুটিয়ে দিতেই কলমটা আরও ত্বরিতগতিতে চার্টের গায়ে কয়েকটা দ্রুততর বড় বড় আঁচড় টেনে দিল। ডি. এন. সেন পুলকিত-ভাবে আমাদের দিকে মুখ তুলে বললেন—"হাউ ফানি, শি ফীলস্ হার্ট!" How funny, She feels hurt!)—অর্থাৎ লতাটার যে আঘাত লেগেছে, সেটা জানিয়ে দিল ছটফটিয়ে।

—হেসেও উঠলেন, এই রকম কৌতুককর কিছু ঘটলে প্রায় "হাঃ, হাঃ, হাঃ" ক'রে হেসে ওঠবার একটা লঘু-চপলতার অভ্যাস ছিল ওঁর। শব্দ হোতনা, শুধু স্থূল শরীর দুলে দুলে উঠত। ছাত্রমহলে নাম পড়েছিল, ডি. এন. সেনের রবার টায়ার (Rubber tyre) হাসি।

সেদিন খুব অন্তরঙ্গতার মুডে ছিলেন। বাঙ্গালী ছাত্র থাকলে বাংলা-ইংরাজি মিশিয়ে কথা বলতেন। সে দিন বিহারী ছাত্র থাকার জন্য ইংরাজীতে বলছিলেন। ও পরীক্ষাটা শেষ হ'য়ে গেলে গম্ভীরভাবে যন্ত্রটা ঠিক ক'রে নিয়ে বললেন—"Now I will try on one of you··· you come forward." (এবার তোমাদের একজনের ওপর দিয়ে পরীক্ষা চালাব। তুমি এগিয়ে এস)—আমায় লক্ষ্য ক'রে।

নিশ্চয় ভোল্টেজ কম, তবু আমি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যেতে তারটা হাতে জড়িয়ে দিলেন। তার পরে যা করলেন তার মধ্যে যেন ছেলেমানুষী দুষ্টুমিরও খানিকটা এসে পড়েছিল। আমার ডান পায়ের হাঁটুর নীচুটা তর্জনী আর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে টিপে, চাপটা বাড়াতে বাড়াতে যন্ত্রণায় যখন আমার মুখটা বিকৃত হ'য়ে উঠেছে, ওদের জিজ্ঞেস করলেন—"Does he wince ?" (মুখ সিঁটকচ্ছে নাকি ?)

ছেড়ে দিয়ে চার্টের চঞ্চল আঁচড়গুলো দেখিয়ে "Here you are", (এই গ্যাখো)—ব'লে আবার সেইরকম হাসি।

এই জিনিসটা মোটা মানুষদের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখেছি আমি; তাদের স্থূল দেহের মধ্যে যেন একটা নধর কৌতুক-চপল-শিশু থাকে ব'সে। অমন একজন প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন মানুষ, সাধারণত গম্ভীরই। তাঁর এই হালকা দিকটা তাঁকে আরও মাধুর্য-মণ্ডিত ক'রে রেখেছিল। দরকার হ'লে নিজেকেও ছেড়ে কথা বলতেন না।

একদিন ক্লাসে সাইকোলজির 'স্মৃতি'র অধ্যায়টা পড়াতে পড়াতে 'sudden lapse of memory'র (স্মৃতিশক্তির হঠাৎ ক্ষণিক বিলোপ) কথায় এসে নিজের ব্যক্তিগত এক অভিজ্ঞতার কথায় এনে ফেললেন। এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে একদিন দেখা করতে গিয়ে, তার দরজা বন্ধ দেখে ডাকতে যাবেন, হঠাৎ নামটাই গেলেন ভুলে একেবারে। রাস্তার ধারে বাড়ি, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, নামটা কোনমতেই মনে করতে পারছেন না এবং যতই চেষ্টা করছেন নিজের অবস্থার দিকে মনটা সূক্ষ্মভাবে পিছলে গিয়ে ততই যেন নার্ভাস হ'য়ে আরও গুলিয়ে ফেলছেন। বর্ণনাটুকু করে—"I looked so foolish standing speechless on the road!" (রাস্তায় বোকার মত দাঁড়িয়ে সে যা আমার অবস্থা!) —ব'লে ঘাড় উলটে হেসে উঠলেন, 'হাঃ, হাঃ,'—করে।

গাম্ভীর্যে-লঘুত্বে এক অপরূপ মানুষ ছিলেন প্রিন্সিপাল ডি. এন. সেন।

ওঁর ব্যক্তিত্বের আরও একটা দিক ছিল, এবং সেইটিই ছিল তাঁর সত্তার মূলাধার।

তাঁর আধ্যাত্ম জীবন।

কোনওরকম আড়ম্বর ছিলনা এতে। শুধু মাঝে মাঝে আত্মসমাহিত হ'য়ে যেন একটি তন্ময়তার রসে ডুবে যেতেন। শুধু একটু নির্জনতা একটু নিঃসঙ্গতা হোলেই হোল। কোন প্রয়োজনে তাঁর আফিসের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে কয়েকবারই দেখেছি, চোখ বুজে আছেন ব'সে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসেছি। কখনও কখনও শব্দের ইঙ্গিতেই মোহ ভেঙ্গে গিয়ে ডেকেও নিয়েছেন। ধর্ম সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোন আলোচনা করতেন না।

তবে একটা জিনিস যা নিয়ে মাঝে মাঝে করতেন আলোচনা সেটাকে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার অনুষঙ্গ ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। উনি মৃত ব্যক্তিদের আত্মাকে নামিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেন। Automatic writing (স্বয়ংস্ফূর্ত লিপি) ছিল তাঁর

সাধারণ পদ্ধতি। বিশেষ কারুর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে; এবং সেরকম মেজাজে থাকলে দেখাতেন আমাদের। শোনা যায় এইভাবে ওঁর পত্নীর সঙ্গেও একটা যোগাযোগ ছিল। তবে সে-বিষয়ে অবশ্য কখনও কিছু বলেন নি।

সাইকোলজির শিক্ষক হিসাবে সমস্ত জিনিসটা নাস্তিক্য মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বোঝবার যে একটা চেষ্টা আছে, সে কথাও বলতেন—যেন, "যে যে-ভাবে নাও, নিতে পার"—তবে ওঁর মনটা যে বিশ্বাসের দিকেই ছিল, এটা লুকানো থাকত না।

এতখানি এইজন্য বললাম যে অতবড় কলেজ হওয়া সত্ত্বেও রিপন কলেজ থেকে যেমন প্রায় কিছুই পাওয়ার সুযোগ হয়নি, 'বি-এন'-এ এসে তেমনি যেটুকু পাওয়ার তার সমস্তটুকুই পেয়েছিলাম। তার মধ্যে নিশ্চয় প্রিন্সিপাল সেনকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়াটা "যতটুকু"র মধ্যে পড়েনা।

ফুটবলেও আমি অচিরেই একটা কায়েমী স্থান পেয়ে গিয়ে "কলেজ একাদশের" একজন হ'য়ে রইলাম, যেমন রাজস্কুলে থাকতে "স্কুল একাদশের" অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলাম। মোট কথা, এখানে এসে আমার কিছুই ফেলা গেলনা।

অধিকন্তু আর একটা জিনিসের সূত্রপাত হোল যেটা আমাকে আমার নিজের পথে দিল তুলে। যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ছি, ১৯১৫ সাল, আমার প্রথম লেখা ছাপার অক্ষরে বেরুল; তাও আবার 'প্রবাসী'র মতো পত্রিকায়, যা তখন বাংলাদেশে তো বটেই, সারা ভারতেই অগ্রণী পত্রিকা। এতে সাক্ষাৎ কলেজের অনুপ্রেরণা হয়তো ছিলনা, কিন্তু কলেজ আমায় সব দিক দিয়েই একটা যে মুক্ত, সফল জীবন এনে দিয়েছিল, একটা সেই "করার, হ'য়ে ওঠার"—আবেগে, তার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা কে বলবে?

খুবই কাঁচা একটা লেখা। কিন্তু একটা জিনিস তো দিয়েছিলই; একটা আত্মবিশ্বাস। কলেজেও যে বাড়তি পরিচয়টুকু হোল, সেটাও নিশ্চয় বৃথা যায়নি।

শেষ করছি এবার কলেজ জীবনের কথা। তার আগে প্রিন্সিপাল ডি. এন. সেনকে আর একবার নিয়ে আসি। পূর্বে বলেছি, ওঁকে আমি আমার প্রৌঢ়ত্ব এবং ওঁর বার্ধক্য পর্যন্ত পেয়ে গেছি। একটা সুদীর্ঘ বিরতির পর অবশ্য—যার সমস্তটাই পাটনার বাইরে কেটেছে।

বোধহয় ১৯৩৯ সালের কোনও সময়। আমি তখন নানাঘাটের জল খেয়ে দ্বারভাঙ্গারাজের কাগজ 'ইণ্ডিয়ান নেশন্' এবং "আর্যাবর্ত" (হিন্দী)-

দু'টি দৈনিক কাগজের ম্যানেজার হ'য়ে পাটনায় রয়েছি। পাটনা সায়েন্স কলেজ কিম্বা আর্টস্ কলেজ আমার ঠিক মনে পড়ছেনা—সেখানে বাংলা সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে আমায় পৌরোহিত্য করতে ডাকা হয়। আমি ওঁদের ডি. এন্. সেনকে প্রধান অতিথিরূপে নিমন্ত্রণ করতে বলি। কাজে যোগ দেওয়ার পর ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে কয়েকবার দেখা হ'য়ে গেছে। কলেজ থেকে বহুপুর্বেই অবসর নিয়ে উনি সেই বাড়িতেই আছেন। বেশ বয়স হ'য়ে গেছে কিন্তু মাথা তখনও বেশ পরিষ্কার।

আমার ভাষণ হ'য়ে গেলে, কিছু প্রশ্ন করা হয় আমায় আমার সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে। উত্তরে আমি আমার কলেজে সেই প্রথম দিনটির উল্লেখ করি—মনস্তত্ত্ব বিচারে আমার ক্ষুদ্র লেখাটি যে তাঁর নীরব সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করে—তার কথা।

এটুকু ছিল আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার বাণী-অর্ঘ্য।

এরপর একটু সেবা করবারও সুযোগ হয়। ওঁর অনেকগুলা লেখা অপ্রকাশিত প'ড়ে ছিল। আমি বিশেষ যত্ন নিয়ে তার কতকগুলি 'ইণ্ডিয়ান নেশনে' ছাপাই। খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। প্ল্যান ছিল ছাপা শেষ হ'লে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা। দুঃখের বিষয় সেটা আর হ'য়ে ওঠেনি। ১৯৪২ সালে 'Quit India' (ভারত ছাড়) —আন্দোলনের হাঙ্গামায় কাগজ বন্ধ ক'রে দেওয়া হোল, আমার চাকুরী জীবনেরও ঐখানেই পূর্ণচ্ছেদ। জীবনের অনেক কিছুর সঙ্গে গুরুকৃত্যের শেষাংশ থেকে বঞ্চিতই র'য়ে গেলাম আমি।

কলেজ জীবন মানে আমার পাটনার দু'টো বছর। কলেজ ছাড়া তার আর একটা যে দিক আছে তার স্মৃতিও এমনি মধুর। হাজারীবাগে একদিন গৃহশিক্ষকতা জোগাড় করবার জন্য গিয়ে নাকালের হিসাব ছিলনা, পাটনা নিজেই আমার জন্য একটি জায়গা করে রেখেছিল, ডেকে নিল।

আমার জ্ঞাতি মেজদাদা গোষ্ঠবিহারীর প্রসঙ্গে তাঁর প্রফেসার পরমেশ্বর প্রসাদ বর্মার কথা বলেছি, অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং দ্বারভাঙ্গায় কয়েকবারই ওঁদের বাড়ি এসেছিলেন। উনি দাদাকে বলেন—বিভূতি শশীর জায়গায় 'স্বর্ণাসনে' থাকতে রাজি আছে? আমায় শরদিন্দুবাবু ওঁর ছেলের জন্য একটি গৃহশিক্ষকের কথা বলেছেন; ছাত্র হ'লেই ভালো। তোমার মুখে শুনেছি, বেঙ্গলে বিভূতির স্বাস্থ্য ভাল থাকছে না।"

সেই আমার স্বর্ণাসনের সঙ্গে সম্পর্কের গোড়াপত্তন। প্রকাণ্ড চত্বর-ওলা দোতলা বাড়ি। নেমে সামনেই একটু বাগান। তার সামনে একটা বেশ বড় চৌকিতে বড়দের তাসের আড্ডা বসেছে সন্ধ্যার পর, পরমেশ্বরবাবু আমায় নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

আমায় শুধু প্রশ্ন হোল—"তুমি শশীর ভাই?"

আমি উত্তর দিতে, সামনে একটা ছোকরা চাকরকে বললেন—"কাঞ্চনবাবুকো বোলা দেও।"

কাঞ্চনেন্দু ওঁর বড় ছেলে। সে এলে বললেন—"শশীর ভাই। ঘর দেখিয়ে দাও গে।"

নীচে অনেকগুলি বড় বড় ঘর, তার মধ্যে পেছন দিকে পাশের একটি ঘরে আমার জায়গা হোল। বাঁদিকে একটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটি প্রায় বিঘাখানেকের খোলা মাঠ। বাড়ি, ঘর, পরিবেশ—সবই বেশ বড় স্কেলে, মনটা প্রথম থেকেই সাড়া দিয়ে উঠল। তার ওপর গৃহ-প্রবেশ সেও যেন রীতিমতো একটি অনুষ্ঠানই। শশীভূষণের ভাই শুনে ছেলেমেয়েদের সবাই জড়ো হয়েছে; সবার মুখে হাসি, আগ্রহপূর্ণ প্রশ্ন, মন্তব্য—দাদা এখন কী করছেন, কেমন আছেন?...আমাদের হু'জনের চেহারা নাকি একরকম...।

কাঞ্চনবাবু, ওঁর জ্যেঠতুতো ভাই বিশদেন্দু, খবর পেয়ে দাদার অন্তরঙ্গ বন্ধু গণেশবাবুও এসে উপস্থিত হয়েছেন; উৎসুক প্রশ্ন তাঁদেরই। এর পরে যারা বাড়ির ছোটদের মধ্যে, তারা আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছে, হোল্ড-অল খুলে চৌকিতে বিছানা পেতে দিচ্ছে। একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে এসে দাঁড়াল। ঠিক প্রফুল্ল নয়। সবার মধ্যে একটু জায়গা ক'রে একটু আড়াল হ'য়ে দাঁড়িয়েই দেখছে আমাকে, বিশদবাবু বললেন—"তোমার নূতন মাষ্টারমশাই কড়ি। শশীবাবুর মতো চেহারা ব'লে অত ভালোমানুষ মনে কোরনা। ভয়ংকর কড়া, সাবধানে থাকবে।"

একটা হাসি উঠল।

চমৎকার একটি প্রসন্নতার মধ্যে আমার অভিষেক হোল। আমার ছাত্র 'কড়ির' ভালো নাম কনকেন্দু। তিনজন 'ইন্দু' হোল।

বাড়িটার নামকরণ শরদিন্দুবাবুর মা স্বর্ণময়ী দেবীর নামে। পাটনার একটি খুব পুরনো বাড়ি, সেই সিপাহী বিদ্রোহের আমল থেকে রয়েছে। পুণ্যবতী নারী ছিলেন স্বর্ণময়ী। পাটনায় এত পরিবর্তন হ'য়ে গেল, "স্বর্ণাসন" এখনও তেমনি রয়েছে, ঐ নামেরই পরিচয় নিয়ে। আমি যখন গেলাম তখন বেশ বোলবোলাও। বাড়ির কর্তা শরদিন্দুবাবু

জেলা কোর্টের একজন নামজাদা উকিল। ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরেন্দু ওঁর জুনিয়ার হিসাবে উঠছেন। তাঁর ছোট প্রদোষেন্দু নূতন এম· বি· পাস করে বাইরে কোথাও চাকরী করছেন। এর পরেই সব ছাত্রাবস্থায় —শরদিন্দুবাবুর বড় ছেলে কাঞ্চনেন্দু আর ভাইপো বিশদেন্দু ম্যাট্রিক পাস করে আই·এস্·সি-র ছাত্র, আমার প্রায় সমবয়সী। তারপর স্কুলের স্তরে—অমলেন্দু, অতুলেন্দু, কনকেন্দু, সুবর্ণেন্দু—আরও কয়েকটি। গুটি তিন চার মেয়েও আরও নীচের দিকে।

আশ্চর্য হই, এমন বিরাট একটি পরিবার, আজ বহুশাখা-পল্লবিত, কিন্তু এখনও পুরুষদের নামের শেষে 'ইন্দু'র অভাব হয়নি ওঁদের। যতদূর জানা আছে আমার। এইতো ক'দিন আগে পর্যন্ত শিশিরেন্দু বাবুর পুত্রের চিঠি পেলাম, বরৌনীর কাছে বেগুসরাই থেকে নিজের পরিচয় দিয়ে চিঠি লিখেছেন। উপস্থিত সেখানে ডাক্তার, আমায় শরৎশতবার্ষিকীতে ওঁদের একটা সম্মেলনে পৌরোহিত্য করতে হবে। নাম স্বাক্ষর করেছেন—'সিতেন্দু'।

আমার সবচেয়ে হৃদ্যতা জন্মেছিল কাঞ্চনবাবুর সঙ্গে। বুদ্ধিমান—ম্যাট্রিকে একটা বৃত্তি পান—তার ওপর বেশ রহস্যপ্রিয়, আমার সঙ্গে বেশ জমত। কি জানি কেন, ওঁদের এই "ইন্দুত্ব" ওঁদের নিজেদের ব্যাপার হলেও, আমার কেমন একটা অস্বস্তি লেগে থাকত, শুধু এইজন্যে যে, বেশ মিষ্টিই, তবে কতদূর পর্যন্ত এটা ধ'রে রাখা চলবে?

একদিন রহস্যচ্ছলে বললাম—"আমরা আটভাই, তাইতেই কোন রকমে নামের মাঝখানে 'ভূষণ' টুকু, বজায় রেখে বাবা-মা পরের ব্যাচে 'কুমার-চন্দ্রে' নেমে এসেছেন, আপনাদের 'ইন্দু' এভাবে কতদূর চলবে?"

অল্প কথাতেও খুব হাসতেন কাঞ্চনবাবু। হেসেই বললেন—"আমরা তিন ভাইয়ে 'সোনার চাঁদ' হ'য়ে তো থাকি, এরপর যাঁদের ভাবনা তাঁরা ভাববেন।"

ওঁদের তিন সহোদরের নাম ছিল—কাঞ্চনেন্দু, কনকেন্দু, সুবর্ণেন্দু।

একেবারে মিশে গেলাম পরিবারটির সঙ্গে। আমি একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের মানুষ, এখানে এসে সবার মধ্যে একজনের মতো হ'য়ে যেতে বেশি সময় লাগল না। পড়ানও, সে যেমন নিজের ছোট ভাইদের দেখতে হোত, প্রচুর মুক্তি এবং অবসরের মধ্যে, সেইরকমই। সমস্ত পরিবারটাই ধী-সম্পন্ন। কাজটা যে একটা টাস্ক (task), এটা কখনও অনুভব করতে হয়নি।

একটু শুধু অস্বস্তি লেগে থাকত শরদিন্দুবাবুকে নিয়ে। অত্যন্ত

রাশভারী লোক ছিলেন। অত্যন্ত স্বল্পবাক। আমি ছু'বছর ছিলাম, তার মধ্যে নিতান্তই অল্প কয়েকবার তাঁর মুখের কথা শুনেছি। তার একটা কারণ অবশ্য, ওঁর অফিসঘর, যেখানে সকালে মক্কেলদের নিয়ে বসতেন, আর আমার থাকার ঘর, নীচের বাড়ির একেবারে উল্টো ছুই প্রান্তে—ওঁরটা সামনে ডানদিকে, আমারটা পেছনে বাঁ দিকে। মাঝখানে একটা বেশ বড় হলঘর আর বারান্দা।

আমার সম্বন্ধে অনেকের মত আমি নাকি গম্ভীর প্রকৃতির। এটা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়। আমি নিজের কাছে জানি আমি গম্ভীর স্বল্পবাক মানুষের পাশ কাটিয়ে চলি। তা'হ'লে একই মেজাজের মানুষ পরস্পরকে এড়িয়ে চলবে, এটাই বা কী ক'রে হয়?

আমার সঙ্গে ছু'বছরে হয়তো ছু'টো কথাও হয়েছিল কিনা সন্দেহ। একটা অস্বস্তি লেগে থাকবারই কথা; গৃহশিক্ষক মাত্র, হয়তো অবহেলার ভাব একটা, যেটা গায়ে মেখে টিঁকে থাকা যায়না। কিন্তু, ছেলে, মেয়ে, ভাইপো, নাতি, নাতনী—সবার বিষয়েই মোটামুটি এই এক আপনকরা-ভাব লক্ষ্য ক'রে আর ও-অস্বস্তিটা দাঁড়াতে পারত না মনে।

একদিন কাঞ্চনবাবু আমার ঘরে সন্ধ্যার পর ঢুকে বললেন—"জানেন, আজ বাবার হঠাৎ মুখ খুলে গেছে—এক রাশ কথা! বোধহয় মক্কেলরা খুব পকেট ভ'রে দিয়েছে—" বলেই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে, চাপা গলায়, ছুলে ছুলে হাসি।

শুধু একবার একটা ব্যাপারে—সে এক বিশ্রীরকম অস্বস্তিতে কাটে দিন কতক।

সন্ধ্যা উৎরে গিয়ে রাত্রি একটু গাঢ়ই হ'য়ে উঠেছে, নিজের ঘরে ব'সে পড়া করছিলাম, একাই, হঠাৎ মাঠটার ও'দিকে যে একটা বস্তির মতো ছিল, সেখানে একটা কোলাহল উঠল। এদিক থেকে আশপাশের অনেকে ছুটে গেল, আমিও বেরিয়ে মাঠের প্রায় শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতেই গোলমালটা থেমে গিয়েছিল। ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই দেখি শরদিন্দুবাবু। বেশ গম্ভীর, একটু বিরক্তির স্বরেই প্রশ্ন করলেন—"কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"

বেশ একটু থতমতই খেয়ে গেছি, তবে, যা ভেবে গিয়েছিলাম, সেটা বেশ সহজভাবেই বলতে পারলাম—"গোলমাল শুনে মনে হোল বুঝি চোর, তাই..."

মুহূর্তখানেক দৃষ্টি ফেলে রাখলেন মুখের ওপর, তারপর একটু নরম হ'য়ে গিয়েই বললেন—"কি করতে তুমি?...যা করছ তাই নিয়ে থাকো।"

চ'লে গেলেন।

বলা বাহুল্য, ভালো উপদেশ দিয়ে শেষ করলেও বেশ ভালো লাগেনি, যখন একটা সাধারণ কৌতূহলেই গেছি আমি। এই খেদটুকু পরের দিন একটা গভীর লজ্জায় পরিণত হ'য়ে অস্বস্তিটুকু চতুর্গুণ গেল বেড়ে। যখন শুনলাম—ওটা বস্তির একটা স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার ছিল।

দিনকয়েক বেশ অস্বস্তিতে কাটার পর পরমেশ্বরবাবুর কথা মনে প'ড়ে গেল। উনি এদিকে বি.এল. পাস ক'রে ওকালতি করার কথা ভাবছেন; মাঝে মাঝে কোর্টে যেতেন, বার লাইব্রেরীতে বসতেন; সেই সূত্রেই শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে পরিচয়। একথা-সেকথার মধ্যে কি ক'রে প্রসঙ্গটা তুলব তাই ভাবছি—নোংরা কথাই তো—উনি ইংরাজিতেই কথা কইতেন আমাদের সঙ্গে, নিজেই প্রশ্ন করলেন—"How do you find Mr. Gupta and his family ?" (মিঃ গুপ্ত এবং ওঁর পরিবারবর্গকে কেমন দেখছ ?)

বললাম—"Quite good, Sir." (খুব ভালো)

সঙ্গে সঙ্গেই নিজের উদ্বেগটাকে প্রশ্নে আকার দিয়ে বললাম—"But how does he find me ? Has he ever said ?" (কিন্তু উনি আমায় কেমন দেখছেন ? বলেছেন কখনও ?)

বললেন—"Yes, quite good too. He told me only yesterday. Naturally I had some curiosity and asked him." (হ্যাঁ, কালই বলেছেন। স্বভাবতই আমার কতকটা কৌতূহল থাকায় ওঁকে প্রশ্ন করি।)

—"But how did he form his opinion, Sir ? Besides, I have not been long there." (কিন্তু কেমন করে ওঁর অভিমত গ'ড়ে তুললেন ? আমার তো বেশিদিন হয়নি ওখানে এখনও)

পরমেশ্বরবাবু একটু হাসলেন—বললেন—"He told me, you seem to have a truthful face...Surely, not a bad compliment ? He has a name for very sharp eye in the bar." (বললেন, তোমার মুখে একটা সত্যের আভাস আছে।...নিশ্চয়, কম প্রশংসা নয় ? উকীল মহলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব'লে ওঁর একটা সুনাম আছে)

আমি লজ্জিতভাবে বললাম—"If I could only deserve it !" (এর উপযোগী হ'তে পারলে ভালো হোত)

লনে ফুটবল প্র্যাক্‌টিসের পর সন্ধ্যার সময় দেখা করতে যাই ওঁর সঙ্গে। বেশ খানিকটা প্রসন্নমনেই বাসায় ফিরলাম। সেদিন কথা বলতে শরদিন্দুবাবু মুহূর্তের জন্য আমার মুখে একটা যে সন্ধানী-দৃষ্টি ফেলে রাখেন তারও রহস্যটা বোঝা গেল।

কিন্তু স্বভাব-চরিত্র নিয়ে মনে এধরণের একটা খুঁৎখুঁতানি তো টপ্ ক'রে যেতে চায়না।...অনেকখানি ক্ষীণ হ'য়ে এলেও কোথায় যেন একটু থেকেই রইল।

বাড়ির পেছনে, একান্তে আর নিরিবিলি ব'লে আমার ঘরে সন্ধ্যার পর প্রায়ই কিছুক্ষণ আড্ডা বসত। দু'টো কলেজের দৈনিক মুখরোচক আলোচনা, যদি কোনও ফুটবল ম্যাচ রইল, সে সম্বন্ধেও, অন্যান্য আরও সব আলোচনা। পড়ায় বসার সময় পর্যন্ত। কাঞ্চনবাবু, বিশদবাবু, থাকতেনই, তাছাড়া দাদার বন্ধু গণেশবাবু, তাঁর ভাই কার্তিকবাবু—এই বয়সের আরও কেউ কেউ উপস্থিত হতেন; বিশেষ ক'রে রবিবার হ'লে। সেদিন বোধহয় রবিবার ছিল।

গণেশবাবু এসেই বললেন—"শশীর খবর ভালো তো? সেদিন কলেজে আপনাকে যেন একটু Subdued (মনমরা) দেখলাম। ক্লাসে চ'লে গেলেন, আর জিজ্ঞেস করা হলনা।"

কাঞ্চনবাবু বললেন—"উনি বাবার কাছে দাবড়ানি খেয়েছেন।"—ব'লে হেসে উঠলেন। ওঁর ঐ স্বভাবই, ছোট কথা বড় ক'রে ব'লে খানিকটা রগড় করা, আড্ডার মুডে।

বিশদবাবু ছিলেন একেবারে উল্‌টো। আস্তে আস্তে গম্ভীরভাবে নিজের অভিমত দিতেন। কৌতুকের দিকটায় কমই যেতেন। বললেন—"দাবড়ানি তো কখনও কাকাকে কাউকে দিতে দেখলাম না এ পর্যন্ত। হয়তো বস্তি সম্বন্ধে Warn (সাবধান) ক'রে দিয়ে থাকবেন। নতুন এসেছেন।"

আমি, কাঞ্চনবাবু যেভাবে রহস্যের আকারে বলেছেন, ওঁকে জানি ব'লেই সেইভাবে নিয়েছিলাম। সেই রহস্যের আকারেই বললাম—"আর আমায় যে একটা বিরাট কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়েছেন উনি, পরমেশ্বর বাবুর কাছে শুনলাম।"

"তাই নাকি!...বাবা?...প্রশংসা!...বিশ্বাস হয়না...ওঁর দাবড়ানি যেমন নীরব, প্রশংসা আবার তার চেয়েও নীরব। He rules by silence, almost.' (প্রায় নীরব থেকে বাড়ীর শাসন চালিয়ে যান)...অত খেটেখুটে স্কলারশিপটা পেলাম, গিয়ে খবরটা দিতে শুধু দু'টি কথা—'আরও ভালো হ'তে পারত।' যা কচুপোড়া! আমি রাত জেগে, প্রাণান্ত ক'রে...।"

—আড্ডা জমে উঠেছে, সবাই বেশ জোরেই উঠলাম হেসে।

প্রিন্‌সিপাল ডি· এন· সেনের মতো শরদিন্দুবাবুর সঙ্গেও আমি

শেষের দিকে আর একবার ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠি। তখন তাঁর আর এক রূপ।

সেও ১৯৩৯ সালের কয়েকমাস এদিক ওদিক, আমি 'ইণ্ডিয়ান নেশনের' ম্যানেজারি নিয়ে এসেছি। কাগজটা দ্বারভাঙ্গার মহারাজের। গঙ্গার ধারে তাঁর একটা খুব বড় বাড়ি ছিল, প্রায় প্রাসাদই। তার একটা বড় হলঘরে আমাদের কাগজের স্টক্ থাকত। বড় রাস্তা থেকে একটা গলির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। একদিন সন্ধ্যার আগে গুদামটা দেখে ফিরছি, দেখি শরদিন্দুবাবুও ঐ গলি দিয়ে আসছেন। কাজের চাপে স্বর্ণাসনে তখনও বোধহয় আমার যাওয়া হয়নি নতুন চাকরি নিয়ে, কিংবা গিয়ে থাকলেও ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। সেদিন খানিকটা দূর থেকে সামনাসামনি দেখলেও ওঁকে প্রায় চিনতে পারলাম না বললেও ভুল হয়না। চেহারায় যে এমন কিছু পরিবর্তন হয়েছে, তা নয়। খুব ছোট ক'রে সমানভাবে চুল কাটতেন, এখনও তাই, সুতরাং পক্ককেশের সাক্ষাৎটা বেশ স্পষ্ট নয়। বার্ধক্যের অন্য সব লক্ষণও তেমন প্রকট নয়। কতকটা হয়তো গলির মধ্যে আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়ার জন্যও, তাই মনে হোল। চিনতে ধোঁকা হোল একেবারে অন্য কারণে। সম্পূর্ণ আতুর গা, গলায় একটি বেলফুলের মালা, উনি মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছেন, একা। কাছাকাছি হ'য়ে নমস্কার ক'রে একটু পরিচয় বোধহয় দিতে হয়েছিল, কিন্তু না দিলেও যেন ক্ষতি হোত না। দাঁড় করিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলেন—শুনেছেন, আমি কাগজটার ম্যানেজার হ'য়ে এসেছি...একটু ফুরসৎ হ'লেই মাঝে মাঝে যেন যাই স্বর্ণাসনে।... আমার পর স্বর্ণাসন থেকেই আমার দুই ভাই, তৃতীয় হরি এবং ষষ্ঠ মণি অনেক পূর্বে পাস ক'রে বেরিয়ে গেছে। তাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন, কি করছে, কেমন আছে।... নিজের দিকের কথাও, যেন নিতান্ত অন্তরঙ্গ কাউকে বলবার আনন্দেই—ছেলেরা সব পাসটাস ক'রে ভালো কাজেই রয়েছে—কাঞ্চন, বিশদ, অমলেন্দু, কনকেন্দু, সুবর্ণেন্দু কেউ ডাক্তার, কেউ ইনজিনিয়ার—বিশদেন্দু একাউন্টেসি পাস ক'রে নিজের ফার্ম খোলবার চেষ্টায় আছেন। বড় ভাইপো শিশিরেন্দু ওকালতিতে ভালই করছেন। একটি বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের মনোজ্ঞ চিত্র।

উনি নিজে অবসর নিয়েছেন; অনেকদিন আগেই। বললেন—"আর কেন বলো? ক'রে দিলাম, এখন তোরা দেখে শুনে, বুঝে সুঝে চালা।...আমার একজন বন্ধু এইখানে থাকেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে দেবীদর্শন ক'রে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসি।...তুমি আসবে বিভূতি। এদিকে এসেছিলে কোথায়?"

বললাম।

বললেন—"বেশ, বেশ, তুমি 'ইণ্ডিয়ান, নেশনে' এসেছ, একথা ওদের মুখে শুনেছি। খুব আনন্দ হোল। সব একসঙ্গে মানুষ হয়েছ—ভালো লাগে তোমাদের ভাইয়েদের উন্নতির কথা শুনলে।…এসো এখন।…আসবে স্বর্ণাসনে।"

অবাক কাণ্ড! সেই শরদিন্দুবাবু! স্বল্পবাক, গম্ভীর!

আমার প্রথম উপন্যাস "নীলাঙ্গুরীয়" বেরুলে ওঁকে এক কপি দিয়ে আসি। বেশ একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই। কতকটা যেন না দিলেই নয়, অথচ মনের এতটা পরিবর্তনের মধ্যে একটা রোম্যান্স্ কিভাবে নেবেন তার একটা দ্বিধা। শুধু যে অকুণ্ঠ প্রশংসা পাই তাই নয়, তার মধ্যে আর একটা বস্তু ছিল সেটা স্বর্ণাসনে আমরা যেভাবে পেয়েছি অন্যত্র কোথাও পেয়েছি বলে মনে হয়না। আমাদের চার ভাইয়ের যেখানে যা একটু কৃতিত্ব তাতে স্বর্ণাসনের সবারই একটা সহজ আপন-বোধ ছিল। খেলাতেই হোক বা অন্য ক্ষেত্রেই হোক।...হরি, পরে মণি পাটনা কলেজেই পড়ে। খেলার দিকে হরির তখন পাটনার শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরওয়ার্ড বলে গণনা। মণি কলেজটীমের ক্যাপটেনই হয়েছিল। ওদের নিয়ে স্বর্ণাসনের ছেলেদের 'বড়াই'য়ের অন্ত ছিলনা। আমরা যেন আমাদের ভালোমন্দ সব কিছু নিয়ে স্বর্ণাসনের পরিবারভুক্ত হ'য়ে গিয়েছিলাম। 'নীলাঙ্গুরীয়' শরদিন্দুবাবুর ভালো লেগেছিল। তাঁর অভিমতের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল 'স্বর্ণাসন' এর সেই আপন ক'রে নেওয়া সুরটি।…'স্বর্ণাসন' থেকেই বেরিয়েছে লেখাটা! 'স্বর্ণাসনে'রই একজনের হাত থেকে!

আরও একটি চিত্র মনে গভীর দাগ কেটে ব'সে আছে। অনেক পরে। একটি বিষাদময় চিত্রই; শেষের দিকে অসুস্থ হ'য়ে উনি বেশ কিছুদিন শয্যাগত হ'য়ে পড়েছিলেন। দেখতে যেতাম মাঝে মাঝে। খুশী হতেন। অনেক গল্প-সল্প হোত নূতন পুরাতন প্রসঙ্গ টেনে।

বিষাদময় স্মৃতি, তবে বড় পবিত্র। তাই যদি কখনও মনে প'ড়ে যায় তো মনটাকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করিনা।

যবেই গেছি, যে সময়েই, দেখেছি কাঞ্চনবাবুর মা ওঁর পায়ের কাছটিতে বসে ধীরে ধীরে সেবা করছেন। গৃহিনী, বড় সংসার ও নিত্য নানারকমের দাবী, কিন্তু এ-চিত্র কখনও অন্যথা হতে দেখিনি।

প্রিন্সিপাল ডি. এন. সেন এবং শরদিন্দুবাবুর কথা শেষ পর্যন্ত টেনে

দিয়ে এবার আর একবার কলেজ জীবনে ফিরে আসি। পাটনায় কলেজ তখন মাত্র দু'টি, পাটনা-কলেজ এবং আমাদের কলেজ। সারা বিহারেই তখন মাত্র পাঁচটি কি ছয়টি কলেজ; আজ যেখানে ইউনিভার্সিটির সংখ্যাই সাত, তার মধ্যে দ্বারভাঙ্গাতেই সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি ধ'রে দু'টি। শিক্ষার সংখ্যাগত প্রচারের মান এতটা বেড়েছে, কিন্তু ঠিক সে-অনুপাতে গুণগত উৎকর্ষ বেড়েছে ব'লে মনে হয়না। আমি হয়তো একথা বলবার অধিকারী নই, কেননা এখন প্রত্যক্ষ যোগ নেই আমার শিক্ষার সঙ্গে, তবে, দূর থেকে যতটুকু দেখছি তাতে এটুকু তো স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, শিক্ষার সমস্ত কাঠামোটা আজকাল রাজনীতি কর্তৃক প্রভাবিত; ছাত্র থেকে নিয়ে শিক্ষক পর্যন্ত সর্বস্তরেই—স্কুল, কলেজ, স্নাতকোত্তর বা পোষ্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগ—কোনখানেই বাদ নেই। বিদ্যার জন্যই বিদ্যার্জন মনোভাবে যে ধরণের শিক্ষক সৃষ্টি করে, তাদের প্রভাবে যে ধরণের ছাত্র গোষ্ঠী সৃষ্ট হয়, তার অভাব খুবই সুস্পষ্ট। ফলে সংখ্যাস্ফীতি, যা স্বাধীনতার এই ক'টা বৎসরে দেশের চেহারা বদলে দিতে পারত, তা উলটে একটা যেন সমস্যা, একটা গুরুভারে পরিণত হয়েছে মাত্র।

রাজনীতির কথা বললাম। তা নিয়ে যে তর্কটা হবে, তার উত্তরটাও তা'হ'লে আমি এখানে দিয়ে রাখি। তর্ক হবে রাজনীতি তো আমাদের সে-সব দিনেও কম ছিলনা।

আমি বলব বেশিই ছিল বরং। বলব, কিন্তু সে ছিল এক উন্নত ধরণের রাজনীতি। নিঃস্বার্থ আত্মোৎকর্ষে, আত্মবলিদানে দেশকে উদ্বুদ্ধ করার রাজনীতি। আজকের রাজনীতির সমস্তটাই স্বার্থ। আকাশ-পাতাল প্রভেদ হ'য়ে যায়। সে রাজনীতি স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, এ রাজনীতি সে-স্বাধীনতাকে পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত করেছে।

আমি একথা বলছিনা, তখনকার সব শিক্ষকই সেই রাজনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। আমার অভিজ্ঞতায় সে-সময়ে দুই শ্রেণীর শিক্ষক দেখেছি, এক যাঁরা রাজনীতি, অর্থাৎ বিপ্লবে বিশ্বাসী আর এক শ্রেণী যাঁরা সব কিছু থেকেই মুক্ত থাকাটাই বিদ্যার শুচিতা রক্ষা করা মনে করতেন। সরস্বতী-মহাশ্বেতারূপের পূজারী, কোন বর্ণমাত্রেরই মালিন্য নেই যে-রূপে। এ টাইপ পেয়েছিলাম আমাদের হেডমাষ্টার ছত্রধারী-লালের মধ্যে, রিপন কলেজে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জানকী ভট্টাচার্য প্রভৃতি প্রবীণ আচার্যদের মধ্যে, নবাগত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। রাজনীতির, (বিপ্লব বলাই বোধহয় ঠিক) প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন রবি ঘোষ। সুরেন বাঁড়ুজ্যের কলেজ, সুতরাং আরও হয়তো

ছিলেন, রবি ঘোষের চেয়েও স্বল্পবাক, অনুচ্ছ্বসিত ব'লে তাঁদের চিনতে পারিনি। এর সঙ্গে একটা কথা আছে। আমি মাত্র দু'টি বছর ছিলাম রিপনে, তাও আই.এ. অর্থাৎ কলেজের নিম্নশ্রেণীতে। অধ্যাপকদের পূর্ণরূপ, যা ওপরের ছাত্রদেরই সামনে স্ব-প্রকাশ হয় তার পরিচয় পাওয়ার সুযোগও তো পাইনি।

বি.এন. কলেজে পেয়েছিলাম দু'জনকে। সেখানে বি.এ.র ছাত্র সুতরাং ভালোভাবেই পেয়েছিলাম। কামাখ্যাবাবু (পদবীটা ভুলে যাচ্ছি) আর হারানচন্দ্র চাকলাদার। দু'জনেই ইংরাজির প্রফেসার।

কামাখ্যাবাবু ছিলেন যাকে বলা যায় Fire brand—আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জ্বলন্ত কাঠ। খুবই ভালো বক্তা একজন, সুরেন বাঁড়ুজ্যের বি.এন. কলেজ-সংস্করণ বললে ভুল হয়না। ঠিক রবি ঘোষ টাইপের নয়। ওঁর Motto বা মন্ত্র ছিল—Liberty, Equality, Fraternity. সহরে এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে তাঁর ভাষণ হোত—Oratory, বাগ্মিতা, জ্বালাময়ী ভাষণ। কলেজের ক্লাসেও তেমন কিছু এসে পড়লে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতেন। এদিকে জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিদে। জামা পরতেন না। গায়ে বিদ্যাসাগরের মতো একটা মোটা বোম্বাই চাদর জড়ানো, চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা, অল্প মোটা কাঁচের ওধারে চোখ দু'টা জ্বলজ্বল করছে, অথচ স্বপ্নময়; মাথায় কাঁচাপাকা চুল।

একদিন পরিচিত ছাত্রমহলে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল, হারাণচন্দ্র চাকলাদার আমাদের কলেজে প্রফেসার হ'য়ে আসছেন। যেন মনে হচ্ছে, রিপনে ওঁর কাছে কিছুদিন ইংরাজি সাহিত্য প'ড়ে থাকব। তবে, যদি থাকিও প'ড়ে তো বোধহয় শেষের দিকে অল্প দিনের জন্য, তাই সেখানে তাঁর সম্বন্ধে স্মৃতিটা বেশ স্পষ্ট নয়। তবে, এবার তাঁকে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই পাই। ইংরাজির অধ্যাপক হিসাবে তিনি কলকাতাতেও তখন প্রথম শ্রেণীয়দের মধ্যে গণ্য হতেন। তাঁর অন্যতম পরিচয়, তিনিও রবি ঘোষের মতো বিখ্যাত Dawn Societyর সভ্য এবং Dawn পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন। অধ্যাপক হিসাবে তাঁর রবি ঘোষের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য ছিল। স্বল্পবাক, গম্ভীর। ডন-গোষ্ঠীর এটা বোধহয় একটা বিশেষত্বই ছিল। আমি গোষ্ঠীগুরু সতীশ মুখোপাধ্যায়কে দেখেছি। কিছুদিন তৎকালীন রাজগ্রন্থাগারিক সতীশচন্দ্র গুহের অতিথি হ'য়ে ছিলেন দ্বারভাঙ্গায়। অনেকের মতে তিনি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন। কিছু যে জানবার সুযোগ হয়েছিল তাতে তাঁর বিরাটত্বের কোন আভাসই বাইরে থেকে পাওয়া যেতনা। আত্মপ্রচার বিমুখ, শিশুর মতো সরল প্রকৃতির

মানুষ। সাধারণ মানুষ এঁদের চেনেনা, খবর রাখেনা। খোঁজ রাখবার আগ্রহ নেই। পরিচয় দেওয়ারও কোন আগ্রহ থাকেনা এই কর্ম-যোগীদের। বিন্দুমাত্রও নয়। এঁরা কর্মের মধ্যে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে নিঃশেষ হ'য়ে যান। গীতা এঁদের মধ্যেই সার্থক।

শিক্ষকদের মধ্যে ফিরে এসে অন্তত আর দু'একজনের নাম না করলে সে-সময়ের পাটনার বিদ্বৎ-পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। আমি যে-সময়ের কথা বলছি সে সময় বিহার-উড়িষ্যা-আসাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় রয়েছে। এর বিরাট চক্রের মধ্যে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের পরই পাটনা কলেজের নাম করা হোত। অনেক বিশিষ্ট স্কলার রয়েছেন তখন এখানে, তার মধ্যে একজন অন্তত এমন যাঁর নাম দেশ-কালের গণ্ডী গেছে ছাড়িয়ে। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার। মোগল পিরিয়ডের অথরিটি হিসাবে আজও অনতিক্রান্ত।

পাটনার খোদাবক্স লাইব্রেরী পার্শিয়ান-আরেবিক গ্রন্থ-পুঁথিপত্রের এক বিশিষ্ট সংগ্রহালয়। অসীম অধ্যবসায়, সময়ানুবর্তিতা এবং কঠিন নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁর বিস্ময়কর অবদানের জন্য সে-সময় তাঁর সম্বন্ধে অনেক কল্পিত-অকল্পিত কাহিনী প্রচলিত ছিল। উনিই বোধহয় পাটনার শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে গরিষ্ঠ পুরুষ তখন—এমন একজন, যাঁকে কেন্দ্র ক'রে এ ধরণের নানা কাহিনী গ'ড়ে উঠতে পারে। সময়নিষ্ঠা আর নিয়মানুবর্তিতার কথায় তখনকার একটি দৈনন্দিন ঘটনার কথা মনে প'ড়ে যায়। স্যার যদুনাথ সহরের মাঝখানে নিজের মখনিয়াটুলির (?) বাড়ি থেকে এসে বিরাট লন-এর চারিদিকে চক্কর দিচ্ছেন। বৈকালে, রোজই সেই একই সময়; ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া যায়। আমাদের ফুটবল খেলার সময়। কোনদিন বাদ যেতে দেখেছি ব'লে মনে পড়ছেনা। একটা কথা তখন খুব চালু ছিল—সময়ের অভাবেই স্যার যদুনাথ কখনও অসুখে পড়তেন না।

আর একজনের কথা বলতে হয়, যিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে পাটনার গৌরব ব'লে স্বীকৃত। যদিও আমার সময়ে তিনি নবাগত, সদ্য পাস করে বেরিয়ে এসে প্রফেসারি নিয়ে ঢুকেছেন—অবশ্য পাটনা কলেজেই। স্যুট পরা, মাথায় হ্যাট, ছোটখাট মানুষটি কলেজের দিকে চলেছেন একটু দ্রুত পদক্ষেপেই। ছাত্র নয়, বেশ বোঝা যায়; এদিকে বয়স এত কম যে প্রফেসার ব'লে মনে করতে বাধে। হাতে বই, যাতে উভয়বিধ সম্ভাবনার কথাই মনে উদয় হয়। একদিন প্রশ্ন ক'রে জানলাম—ইনিই

যোগেন ঘোষ, পাটনা কলেজে নূতন প্রফেসার হ'য়ে এসেছেন...নাম প'ড়ে গেল—বয় প্রফেসার (Boy Professor).

ছাত্রাবস্থায় পাটনায় যে দু'বছর ছিলাম তার মধ্যে যোগেন ঘোষের সঙ্গে পরিচয়ের কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা ছিলনা। উনি এক কলেজের প্রফেসার আমি অন্য এক কলেজের ছাত্র—সম্পর্কের কোনরকম সেতু নেই। বহু পরে আমি যখন 'ইণ্ডিয়ান নেশনের' ম্যানেজার, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর যশ পরিব্যাপ্ত। ওঁকে তখন বলা হচ্ছে Moving Encyclopaedea (চলমান বিশ্বকোষ)। সাহিত্য থেকে নিয়ে ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ—সর্বক্ষেত্রেই তাঁর মনীষা স্বীকৃত। সর্ববিষয়েই তিনি একজন অথরিটি ব'লে গণ্য। আমি ওঁর সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে কিছুটা ঘনিষ্ঠও হয়ে পড়ি। পাটনায় তখন ভিন্ন ভিন্ন স্তরের, বিশেষ ক'রে শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে চমৎকার একটি Cultural association বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তৈরী হয়েছে—কতকটা যেন আপনা-আপনিই, পরস্পরের আকর্ষণে। বেশি ক'রে মনে পড়ছে, শচীন বোস্ (বোধহয় সবচেয়ে সিনিয়র এবং পাটনার সর্বজনমান্য), বিমান মজুমদার, রঙিন হালদার, শম্ভুবাবু, যোগেন ঘোষ (সকলেই প্রফেসার)। বয়সে একটু নীচের দিকে মণ্টু, মনি সমাদ্দার প্রভৃতি। আমিও পাটনায় এসে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ি এবং যোগেন ঘোষ প্রমুখ কয়েক জনের সঙ্গে একটু বেশি অন্তরঙ্গও হয়ে পড়ি! একদিন, আমি যখন বি-এ'-র ছাত্র, উনি তখন প্রফেসার, উদীয়মান একজন শিক্ষাবিদ্—তাও অন্য এক কলেজের। এ-সময়ে এসে সে-দূরত্বটা স্বভাবতই গেছে মিটে, তার ওপর, প্রফেসার-ছাত্র যাই হই একসময়, আমাদের বয়সের বিশেষ প্রভেদ ছিলনা। একজন স্বীয় প্রতিভাবলে নিজের পথ ধ'রে সহজ স্বচ্ছন্দগতিতে চ'লে এসে কৃতী শিক্ষক, একজন পাণ্ডুল-চাতরা-শিবপুরের নানা জটিলত্বের মধ্যে দিয়ে তখনও একজন সাধারণ ছাত্র। প্রভেদটা ছিল সুযোগ আর প্রতিভার। কিন্তু সুযোগ আর প্রতিভাই তো জীবনে শেষ কথা নয়। মন-মেজাজ ব'লেও একটা বস্তু আছে। সেইখানে আমাদের দু'জনের খুব বড় একটা মিল ছিল। বয়সের প্রভেদ একরকম নেই-ই। ফলে, আর কোন প্রশ্নই আমাদের পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পড়ায় অন্তরায় হ'তে পারেনি উত্তর কালে।

জীবনে এই পাওয়া-না-পাওয়ার ব্যাপারটা বেশ একটু অদ্ভুত লাগে। একদিন যাঁকে অন্তর থেকে চেয়েও পাওয়ার উপায় ছিলনা, তাঁকে একেবারে নিবিড়ভাবে পেয়ে যাওয়া; অন্য দিকে যাঁকে একেবারে একান্ত-

ভাবে পাওয়া গিয়েছিল, তাঁকে আর খুঁজে না পাওয়া। এটা হয়েছিলি আমারই এক সতীর্থ ললিতের ব্যাপারে।

ক্লাসে আমরা মাত্র জন ছয়েক বাঙ্গালী ছাত্র ছিলাম যার জন্য পারস্পরিক সম্বন্ধটা এমনিই নিবিড় ছিল; তার মধ্যে ঐ মন-মেজাজের, আর খানিকটা অবস্থারও সমতার জন্য ললিত আর আমাতে ছিলাম একেবারে যাকে বলা যায় এক-মন এক-প্রাণ। অনেকটা রিপন কলেজে থাকতে ব্রজেশের মতো, শুধু আরও ঘনিষ্ঠ। ব্রজেশের মতো ললিতের Sense of humour বা কৌতুক চেতনাটা ছিল প্রবল। এর ওপর মনটা রোমান্টিক হওয়ায় ঐ দিক দিয়ে আমাদের বয়সোচিত আলাপটা জমত ভালো। গম্ভীরভাবেও আবার লঘুভাবেও; তবে, রুচিসঙ্গত ভাবেই। আমার মনে হয়, একটা বয়সে এ জিনিসটার মতো এক ক'রে দিতে আর কিছু পারে না। সেই সংস্কৃত শ্লোকের 'ষট্‌বিধ প্রীতিলক্ষণম্' এর অন্যতম কারণ—"গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি", অর্থাৎ মনের গোপন কথা বলা আর শোনা। ওর জীবনে ছিলও কিছু রোমান্স। আমার মতো ললিতেরও ছিল ট্যুইসন ক'রে পড়া। তবে, ওর নিজস্ব একটা আস্তানা ছিল। কলেজের কাছেই। কলেজের অবসর পিরিয়ডগুলা আমাদের প্রায় সেখানে গিয়েই কাটত। দু'টো বছরে আমরা চলাফেরা, পোশাক-আশাক্, আলাপ-আলোচনায় এত এক হ'য়ে পড়ি যে আমাদের নাম প'ড়ে গিয়েছিল ইনসেপারেবল্‌স (inseparables) অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য।

পাস করলাম একসঙ্গে। তারপর আজ পর্যন্ত একেবারেই খোঁজ খবর নেই। ললিত ছিল সাহসী আর enterprising, উদ্যমশীল; সেই সূত্র ধরে জানি পাস করার পরেই একটা সাবডেপুটির চাকরী যোগাড় ক'রে নেয়। এগিয়ে যাওয়ারই পাত্র, এ বিশ্বাস আর সান্ত্বনাটা আছে। শুধু, এত ভুলে যাওয়ার পাত্রও এটা বিশ্বাস করা শক্ত হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু আমিও যে খুব একটা বিরাট আগ্রহ নিয়ে খোঁজাখুঁজি করেছি, এ কথাও তো বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি এমন নয়।

এখন ভাবতে অবাক লাগে। কেন এমন হয়? অত কাছে, অথচ দূর হ'তে হ'তে দু'জনে দু'জনের দৃষ্টি থেকে যেন মিলিয়ে গেলাম। আমাদের জীবনের ইতিহাসে সমস্ত জিনিসটারই যেন দুদিকে ব্র্যাকেট দেওয়া একটা পঙ্‌ক্তির বেশি কোন তাৎপর্যই রইল না।

পাটনায় আমার কলেজযুগের কথা প্রায় এইখানেই শেষ হ'য়ে যায়। তখনকার পাটনা আর এখনকার পাটনায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। রাজধানী হ'লেও সবে গোড়াপত্তন হয়েছে; একটা সন্তোষেরই ভাব, বাংলার বিপ্লবের ঢেউ প্রতিহত হ'য়ে ফিরে ফিরেই যাচ্ছে। অসহযোগ

আন্দোলনও শুরু হয়নি, কোন কিছু বিশেষ ঘটত না পাটনার নিথর-নিষ্পন্দ জীবনে। বিহারের নেতারা তখন আলাদা হওয়ার অধিকার পেয়ে ঘর গোছাতে ব্যস্ত। সে গোছানোর মধ্যেও তখন ইংরাজই সর্বেসর্বা। প্রথম সারির নেতা যাঁরা—তার মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামটা বেশি ক'রে কানে আসছে—তাঁদের কর্মপদ্ধতি তখনও স্থির হয়নি, রাজেন্দ্র-বাবুর ক্ষেত্রে যেটা পরে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্ট হ'য়ে পড়ে। তখনকার বিহারের, বিশেষ ক'রে রাজধানী পাটনার যে আবহাওয়ার মধ্যে আমরা বাস করছি সে সম্বন্ধে স্থূল দু'একটা কথা বললাম মাত্র। স্কুলের যুগে একবার আমাদের দ্বারভাঙ্গার লীডার সুরযা-বাবুর নেতৃত্বে পতাকা হাতে স্বাধীনতা সঙ্গীত গেয়ে বেড়ালেও উত্তরকালে আমি এদিক দিয়ে বরাবর দ্রষ্টাই থেকে গেছি। তাতে একটা প্রশ্ন আসেই—আমার জীবনটা যেভাবে কাটল, যে আবহাওয়ার মধ্যে, তাতে ঐদিকেই তো আকৃষ্ট হ'য়ে পড়বার কথা। কেন যে হলাম না তার উত্তর আমার কাছেই বেশ স্পষ্ট নয়। আমাদের পারিবারিক জীবনের কথা ভাবি—যে ভাবে বাবা বড় সংসার নিয়ে একা প'ড়ে যাওয়ায় আমাদের ওপরের দিকে কয়েক ভাইকে নানা বিরূপতার মধ্যে দিয়ে সংসারটাকে দাঁড় করাতে হয়। কিন্তু একটু গভীরতর ভাবে ভেবে দেখলে ফাঁকিটা ধরা প'ড়ে যায়। অর্থাৎ, এটা মনকে চোখ ঠারা মাত্র। রাজনীতি, বিশেষ ক'রে স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক রাজনীতি হচ্ছে সংসারকে পেছনে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়বার ব্যাপার। অত চুলচেরা বিচারের স্থান নেই।

আসল কথা, এতদিন সব দেখেশুনে যে-সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি তা এই যে, রঙ্গমঞ্চ আর প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে সংসারের যে বিরাট নাট্যশালা তা সেটা এই নিয়মে চলে যে, সক্রিয় অনলস একটা দল অভিনয় ক'রে যাবে, আর নিষ্কর্মা অলস একটা দল তাই দেখে বাহবা দেবে, হাততালি দেবে, মিষ্ট-কটু সমালোচনা করতে থাকবে।

প্রেক্ষাগৃহের টিকিট নিয়ে আসা আমার, মঞ্চে স্থান পাব কেন?

তা সত্ত্বেও, সে অনেক পরে একটা সময় এসেছিল, যখন মনে হোল বুঝি নিলেই টেনে পলিটিক্স্ আমায়। লক্ষণ দেখে, ভবিষ্যৎ বিচার করা মানুষের মজ্জাগত প্রবৃত্তি। মহাত্মা গান্ধী দ্বারভাঙ্গায় আসছেন, বোধহয় চম্পারণ অভিযানের পরে। সমস্ত সহর গমগম করছে। গাড়ি থেকে নেমে মহারাজার অতিথি হবেন। আমরা স্টেশনে গেছি। প্রচণ্ড ভিড়—আর হুড়াহুড়ি। গাড়ি স্টেশনে ঢুকে গতিবেগ কমিয়ে দিলে আমি সেই ভিড় ঠেলে গিয়ে পাদানিতে উঠে পড়লাম। একেবারে তাঁর মুখোমুখি,

মাঝখানে জানলাটুকুর যা প্রভেদ। আমার সে চাপা উল্লাসের কথা এখনও মনে আছে। ভাবলাম অত ভিড়ে অমন নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে যেন একটা ইংগিত আছে, যেন আমার এটা নীরব দীক্ষা। খদ্দর কিনলাম, চরখা কিনলাম, তুলো কিনলাম—সুতো কাটা সুরু ক'রে দিলাম।

কিন্তু কিছুই ধ'রে রাখতে পারিনি। তার কারণ প্রথম উদ্দীপনার ঝোঁকটা কেটে গেলে হাজার চেষ্টা ক'রেও এযুগে ওঁর পদ্ধতিটার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে পারিনি। অহিংস অসহযোগ সম্বন্ধেও একরকম তাই। মহাত্মাজী বললেন—এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন—সর্ত, দেশব্যাপী পূর্ণ অসহযোগ। সর্তটা গাণিতিক সত্য তাতে সন্দেহ নেই, একধার থেকে সবাই হাত গুটিয়ে নিলে শাসন-যন্ত্র অচল না হ'য়েই পারেনা। কিন্তু, ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশে চল্লিশ কোটি লোক একযোগে হাত গুটিয়ে নেবে, এ যোগফলের মধ্যেও তো একটা গাণিতিক ভুল রয়েছে।

আমার বিশ্বাস ছিল বাংলার বিপ্লবে। মহাত্মাজীর স্বভাবতই তার প্রতি অবজ্ঞার ভাব ছিল। তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত 'কুইট ইণ্ডিয়া' (ভারত ছাড়) আন্দোলনের ছাড়পত্র দিতে তাঁকে হয়েছিলই। সেটা যে নিতান্ত অহিংস অসহযোগ ছিলনা, তা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেন তাঁরা জানেন। আমিও করি। সে-কথা যথাস্থানে আসবে।

আমার নিজের কথা হচ্ছিল। বিশ্বাসের অভাবে আমি চরখা নিতে পারিনি, অহিংস অসহযোগী হ'তে পারিনি।

বিপ্লবী হ'তে পারিনি আরও অনেক কিছুর অভাবে, তার মধ্যে প্রাণ দেওয়ার মহাপ্রাণতাও আসে বৈকি, অস্বীকার করি কি ক'রে?

শেষ কথা ঐ—যে দর্শকের টিকিট নিয়ে জন্মাল সে মঞ্চে স্থান পাবে কি ক'রে?

বিহারের, বিশেষ ক'রে রাজধানী পাটনার কথা বলতে বলতে এদিকে এসে পড়েছি।

একদিকে পূর্ব, পূর্ব-পশ্চিম দুই বাংলা এক হ'য়ে গিয়ে, একদিকে খণ্ডিত, বিহার-উড়িষ্যা-আসাম বিযুক্ত হ'য়ে গিয়ে, ইংরাজের দ্যূত-চালে যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বাঙ্গালী জাতটা, যেন হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারছে না। নিজ্ বাংলায় যাই হোক, এখানে বিহারে আমাদের অবস্থাটা সঙ্গীনই হ'য়ে উঠেছে। ইংরাজ কূটনীতির বৈশিষ্ট্যই এই যে তার মধ্যে বিভেদের একটা কীলক বা গোঁজ ঢোকানো থাকবেই। বাংলার মুক্তি সংগ্রামের যে উদ্দীপনা বিহারের জনমানসের

মধ্যে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করছিল, সেটা খানিকটা নিরুদ্ধ হ'য়ে বিহার-ফর-বিহারীজ (Bihar for Biharies) শব্দটা পর্দায় পর্দায় ব্যাপক আর উচ্চতর হ'য়ে উঠতে লাগল। ইংরাজ ডোমিসাইল (Domicile) আইন জারি ক'রে বাঙ্গালীকে আরও বিভ্রান্ত ক'রে তুলল। ইংরাজের সবচেয়ে বড় শত্রু হিন্দু বাঙ্গালী। তুই বাংলা এক ক'রে দেওয়ার মধ্যেও কি এই মারণ-মন্ত্র ছিলনা? সংযুক্ত বাংলার পশ্চিমে কতকগুলি বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল এমনভাবে বাইরে সরিয়ে রাখল, যাতে তু'টি বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা যে সংখ্যাগত প্যারিটি (Parity) বা সাম্য আছে সেটা নষ্ট হ'য়ে গেল। ফলে, ইংরাজ আমলে—বিশেষ ক'রে তাদের ওসকানির জন্যে প্রশাসন ব্যবস্থা যে কী বিষময় হ'য়ে ওঠে তা এত শীঘ্র ভুলে যাওয়ার কথা নয়।

আবার আমার সেই আর্মচেয়ার পলিটিক্স (Armchair Politics) এসে পড়ছেই ঘুরে ফিরে। এই রকম দূষিত বায়ুমণ্ডলের মধ্যেও মাঝে মাঝে কিছু ঘটে যাচ্ছে যাতে এখানে বাঙ্গালীর মরেল (Morale) অর্থাৎ মনোবলটা একেবারে নষ্ট হ'তে দিচ্ছেনা। তার মধ্যে একটার কথা বেশি ক'রে মনে পড়ে। একটা বড় গোছের সাহিত্য-সম্মেলন হ'য়ে গেল পাটনায়। মনে হচ্ছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনই। তু'জন বড় বড় দিক্পালকে সভামঞ্চে দেখলাম —স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর চিত্তরঞ্জন দাস; তু'জনই যশ-প্রতিষ্ঠার শিখরে তখন। আরও এমন অনেকে এসেছিলেন সাহিত্যের নানাক্ষেত্রে যাঁরা সুপরিচিত। তার মধ্যে বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার (তখন অন্ধ হ'য়ে গেছেন)। আর "নায়ক"-এর সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। "নায়ক"-এর তখন খুব নাম ডাক, সম্পাদকীয় স্তম্ভটি হোত একাধারে তীক্ষ্ণ এবং সরস। লক্ষ্য বেশির ভাগ থাকত তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একচ্ছত্র অধীশ্বর স্যার আশুতোষের দিকে। তাই নিয়ে অনেকগুলি গল্প তখন প্রচলিত ছিল। সত্য-কল্পিত, যাই হোক। স্যার আশুতোষের অনুগত-বাৎসল্য একটু প্রবলই ছিল; এছাড়া এই বিরাট পুরুষের বহুমুখী কর্মজীবনের নানা ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে সমালোচনার খোরাকে অভাব ঘটত না। এই সব নিয়ে "নায়ক"-এ প্রায়ই অম্লকটু মন্তব্য বেরুতেই থাকত। আশুতোষ ছিলেন সার্থকনামা। তাঁর শিবের মতো দপ্ ক'রে জ্বলে উঠতে যেমন বিলম্ব হোতনা, তেমনি অল্পেই আবার প্রসন্ন ক্ষমাশীল হ'য়ে উঠতেন। পাঁচকড়ি বাবু কাগজে তাঁকে চটিয়ে দিয়ে সাক্ষাতে ঠাণ্ডা ক'রে সন্দেশ আনিয়ে খেয়েছেন, এমন ঘটনাও নাকি

ঘটেছিল একবার। জবাবদিহি হোল—"আপনাকে ছু'কথা না ব'লে রামা-শ্যামাকে বললে কি কাগজ চলবে আমার? ওসবে কান দেবেন না। নিন্, সন্দেশ আনতে বলুন।"

স্যার আশুতোষের সন্দেশ প্রীতিও সেকালে একটা প্রবাদের আকার ধারণ করেছিল।

সেবার স্যার আশুতোষ তাঁর একটা নূতন সংকল্পের কথা ব'লে সম্মেলনের এই পাটনা অধিবেশনটিকে বিশেষভাবে একটি ঐতিহাসিক মর্যাদা দিলেন। বাংলায় এম.এ. পরীক্ষার প্রবর্তন করবেন, সিনেট্ এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

বিরাট বপু, গায়ে সাদা চিনে লম্বা কোট, সম্পূর্ণ বাঙ্গালী প্রথায় থান কাপড়ের কোঁচা ঢুলছে, "বেঙ্গল টাইগারের" মতোই বর্তুল গোঁফজোড়া, চোখ ছু'টোয় অসাধারণ প্রতিভা...আত্মবিশ্বাস যেন ঠিকরে পড়ছে, মেঘমন্দ্র স্বরে সংকল্পের ঘোষণাটা করতেই সমস্ত হলঘরটা করতালি ধ্বনিতে যেন ভেঙে পড়ল।

অধিবেশনটা হচ্ছিল 'স্বর্ণাসনে'র একেবারে পাশে এলফিনস্টোন পার্শি থিয়েটারের প্রশস্ত রঙ্গমঞ্চটা ভাড়া ক'রে।

একটা কাজ হোল। যত সাময়িক আর অস্থায়ীভাবেই হোক। একটা যে Depression—মনমরা ভাব এসেই পড়েছিল রাজধানীর বাঙ্গালীদের মধ্যে সেটা অনেকটা কেটে গেল। আত্মপ্রতিষ্ঠিত পুরুষদের দেখে আবার যেন আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাবটা ফিরে আসতে লাগল।

এ-প্রসঙ্গ শেষ করার আগে—অনেকটা পুনরাবৃত্তি ছুষ্ট হ'লেও একটা কথা বলে নিই। বিদেশী শাসকবর্গের কূটচালে তখনকার আমলে দেশের বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ থাকলেও, শিক্ষাক্ষেত্রটি শিক্ষকমণ্ডলীর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, চরিত্রাদর্শ প্রভৃতির জন্যে বহুলাংশে পরিচ্ছন্ন ছিল। ঠিক উল্টোটা হয়েছে আজ। স্বাধীনতার পর, অন্তত সংবিধানে এক-ভারতীয়ত্বের নীতি স্বীকৃত হ'য়ে সেদিক দিয়ে বায়ুমণ্ডল অনেকটা পরিচ্ছন্ন হ'লেও (Implementation বা যথাযথ কার্যে পরিণত হবার অভাবে পূর্ণরূপে না হোক) আভ্যন্তরীণ নানাবিধ কূটচালে কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থিতচিত্ততা, শিক্ষক মহলেও সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সংঘাত—এইসব কারণে আজ জাতিগঠনের মূল বস্তু যে শিক্ষা, সেটিই বিপর্যস্ত, আদর্শভ্রষ্ট।

একদা পরাধীনতার ছুঃখ, অভাব, বঞ্চনা যে-জিনিসটা গঠন করেছিল, আজ স্বাধীনতা, নিশ্চিন্ততা, প্রাচুর্য সেটাকে যেন রক্ষা করতে পারছেনা। ছুঃখটা এইখানে।

১৯১৬ সালে আমি বি-এ পাস ক'রে বেরিয়ে এলাম। সাধারণভাবে পাস, তবু তার একটা আনন্দ ছিলই; কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবন থেকে বিদায় নেবার বিষাদে মলিন হ'য়ে গিয়েছিল সেদিন। মানুষের জীবনে দু'টি দিক আছে, একটা গতির দিক, শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব, তারপর বার্ধক্য। এগুলা এমন নিঃসাড়ে আসে-যায় যে, সুখের হ'লেও একটা দাগ কেটে বিদায়ের ব্যথাটা রেখে যায় না। যৌবন যতই মধুর হোক, আজ যৌবনের কাছে বিদায় নিলাম ব'লে কাউকে আফসোস করতে হয় না। তারপরেও তাই; পরিবর্তনগুলা নিঃসাড়ে আসে ব'লেই। ছাত্রজীবনের বেলায় অন্য সুর।

সেই কবে সুদূর অতীতে চাতরায় মহাদেব গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় আরম্ভ হ'য়ে কত বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে যে-ছাত্রজীবন আজ সমাপ্ত, তাকে বিদায় দিতে বাল্য-কৈশোর-যৌবনের সব তন্ত্রীগুলিতেই ব্যথার মীড় জেগে উঠবে বৈকি।

শুরু হোল আমার গার্হস্থ্য অথবা গৃহীর জীবন। যদিও, যদি, "গৃহিণীগৃহমুচ্যতে"—কথাটা মেনে নিতে হয় তো, আমার এটাকে সার্থক বা পরিপূর্ণ ব'লে ধ'রে নেওয়া যায় না। কিন্তু সে পরের কথা, কিছুটা অবান্তরই। আমার পাওনাই যখন বানপ্রস্থ বা যতি, তখন এদিক মাড়াতে যাওয়াই কি ভুল হয়নি আমার?

ভুলের মাসুল দিতেও হল বিস্তর। সে-কথা মনে হ'লে ভাবি, গোড়াতে যেমন কৌপীন-একতারা-তুম্বা নিয়ে শুরু করেছিলাম, পিসিমা বিশালাক্ষী দেবীর কবচ এঁটে সে ধারাটা বন্ধ ক'রে না দিলে মন্দটা কি হোত এমন? নিশ্চিন্ত দেবতাত্মা হিমালয়। পূর্বজন্মের অতটা অর্জন না থাকলেও—যা আরও নিশ্চিন্ত—একটি আশ্রম খুলে, কানে মন্ত্র দিয়ে ব'সে ব'সে মাখন-নবনীতে দেহ পুষ্ট করা।

তার জায়গায় পাস ক'রে বেরিয়েই সেই যে চাকরির জীবন শুরু হয়েছে, অর্ধেকটা জীবন তাইতেই গেল কেটে, তারমধ্যে যদিও মাত্র একটি ক্ষেত্রেই ডোমিসাইলড সার্টিফিকেট জোগাড় ক'রে। সেও এক দুর্ঘট ব্যাপার। বাড়িঘর সবই রয়েছে, দু'পুরুষ কেটে গিয়ে তৃতীয় পুরুষ চলছে, তবু এটুকু প্রমাণ ক'রে ম্যাজিস্ট্রেটের আফিস থেকে একটা চিরকুট জোগাড় করা, সে যেন এক অসাধ্যসাধন! তাও করতে হয়েছে। তারপর, সে-চিরকুট যে কোন রদ্দি কাগজের ঝুড়িতে অবলুপ্ত হয়েছে তার খোঁজ আর কে রেখেছে?

ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে এর। বাবার আমার সম্বন্ধে মস্ত এক

উচ্চাশা ছিল। আমায় ডেপুটি করবেন। উচ্ছ্বসিতভাবে কিছু প্রকাশ ক'রে বলা বাবার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তবে, বংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট আমি, বাবার ইচ্ছা ছিল যতটা সম্ভব আমায় আরও বিশিষ্ট ক'রে তোলা। এতে পিতৃসুলভ একটা দুর্বলতা ছিলই, তবে, সে যুগে গ্র্যাজুয়েট এত সস্তা হয়নি, বিশেষ ক'রে মাত্র পাঁচটি কলেজের বিহারে তখনও কিছুটা মর্যাদা ছিলই, বাবার উচ্চাশায় দোষ দেওয়া যায়না।

দোষ দেওয়া যায়না আরও এইজন্য যে এতে তাঁর কিছুটা উৎসাহ পাওয়ার কারণও হয়েছিল। বাবা তাঁর সায়েবকে ব'লে রেখেছিলেন এবং তিনি চেষ্টা করবেন ব'লে কথা দেন।

এই 'কথা দেওয়া'র একটু টীকা দরকার।

মজঃফরপুরে কুঠিয়ালদের একটা খুব বড় ক্লাব ছিল, নামটা 'প্ল্যান্‌টার্স্‌ ক্লাব' (Planters' club)। কাছাকাছি কুঠিয়ালরা ছাড়া দূরের যারা তারা সপ্তাহের শেষে তাদের গাড়িতে এসে একত্রিত হোত। তখন জেলায় বড় বড় অফিসার, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট থেকে আরম্ভ ক'রে, প্রায় সবই 'লালমুখ'। তারাও মাঝে মাঝে এসে জুটত ক্লাবে। তাদের সিভিলিয়ান ক্লাব (Civilian Club) আলাদা থাকলেও। পলিটিক্যাল্‌ আবহাওয়া খারাপ, মজঃফরপুর আবার ক্ষুদিরাম-মার্কা জায়গা। পলিসি ঠিক হতো খানাপিনা-নাচ-গানের সঙ্গে। পলিসির মধ্যে মাঝে মাঝে নেটিভদের তোষণ-নীতির ছিটে-ফোঁটাও এসে পড়ত।

সায়েব আমার দরখাস্তটা দেখে খুসী হন। বাবাকে বলেন, এদেশের ছেলেরা যে এমন ইংরাজী লিখতে পারে এটা তাঁর জানা ছিলনা। তিনি ওপরওলাদের ব'লে চেষ্টা করবেন। হ'য়েও যাবে আশা করেন।

ভেতরের কথা তা নয়, আমি যেমন আন্দাজ করি। একটা চাকরির দরখাস্তের মধ্যে শেক্সপিয়ার-স্কট-বায়রণকে ঢোকাবার রাস্তাও নেই। আসল কথা, ইংরাজিতে চাকরির দরখাস্তে শেষ কথা—'ইয়োর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট্‌ সার্ভেণ্ট্‌—অর্থাৎ আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য।' আমি সাধ্যমতো দরখাস্তের আগাগোড়াই ঐ সুরটাকে জোরালো করবার চেষ্টা করি। তাঁর বিশ্বাস ছিল শিক্ষিত বাঙ্গালীর ছেলে বোমা করতেই জানে।...তাই আরও মিষ্ট লেগে থাকবে দরখাস্তটা।

চাকরি, অবশ্য, আমার হয়নি। দিন কতক পরেই গান্ধীজীর চম্পারণ-অভিযান সুরু হ'য়ে গেল।

আমি নিরাশ হইনি। চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে চাঁদ না পেলে শিশু যতটুকু হয়, ততটুকুও নয়। তার কারণ, আমি চাকরির বাজার, তার সঙ্গে বি-এ পাসের ক্ষীয়মান মূল্যের সম্বন্ধে অনেকখানিই ওয়াকিবহাল

থাকায় আমার উচ্চাশা কখনই বাবার উচ্চাশার স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। হয়তো নীচে থেকেই কিছু সংক্রমিত হ'য়ে থাকাতে মন থেকে মিলিয়ে যেতে দেরি হোলনা।

যেমন উচ্চপদ সেই অনুপাতে উচ্চ আশা থাকলে, যেদিন পেলাম চাকরি সেইদিনই আমার হার্টফেল ক'রে ম'রে যাওয়ার কথা। বিস্তর ঘুরে ফিরে এসে, নানাঘাটের জল খেয়ে...পরে আমি দ্বারভাঙ্গার মাড়োয়ারী স্কুলে চাকরি পেলাম। 'সরস্বতী একাডেমি' ব'লে একটি স্কুল বহুদিন থেকে নাভিশ্বাস টানতে টানতে মারা যায়। তারই পরিত্যক্ত গৃহে মাড়োয়ারী স্কুল স্থাপিত হয়। তখনও নন্-এফিলিয়েটেড (non-affiliated) অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির স্বীকৃতি পায়নি। এদিকে আমার মনের অবস্থা তখন—Any port in a storm. পাসটা করবার পর থেকেই চাকরির জন্য বাড়ি ছেড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ইণ্টারভিউ দিয়ে, দরখাস্ত ছেড়ে। গান্ধীজীর চম্পারণ-অভিযানে কুঠিয়ালদের গদি টলটলায়মান, ডেপুটি গিরির স্বপ্ন কেটে গেছে—যে-কোনও কাজ, যে-কোনও জায়গায় —দরখাস্ত ছেড়ে আর ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, অবসন্ন হ'য়ে বাড়ি এসে দম নেওয়ার জন্য বসব, একরকম বিনা আয়াসেই কাজটা পেয়ে গেলাম। সহকারী শিক্ষকের পোষ্ট, মাইনে চল্লিশ টাকা, স্কুল স্বীকৃতি পাওয়ার সঙ্গে মাইনে সম্বন্ধে বিবেচনা করা হবে।

সমস্ত ব্যাপারটুকুর পেছনে মাড়োয়ারী ভাইদের সূক্ষ্ম ব্যবসাবুদ্ধি যে কাজ করছে, সেটা এমন কিছু মাথা ঘামিয়ে বুঝতে হয়না। প্রায় বছর খানেক ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি, গ্র্যাজুয়েটই তো, সস্তায় পাওয়া যাবে। তারপর...

তারপর যা সেটা পরে বলছি।

পাস করার সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়া আমার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ প্রেরণা ছিল ও প্রয়োজন ছিল—বাবাকে কাজ ছাড়িয়ে আনা। যতই দিন যাচ্ছে, সম্ভাবনা যেন ক্রমেই সুদূর হ'য়ে যাচ্ছে। দাদা বোঝেন, বাড়ি এসে বসে চারিদিকে দরখাস্ত ছাড়তে বলেন, কিন্তু নূতন বয়স, নূতন উৎসাহের মুখে এই ব্যর্থতা, বাড়ির ভাত যেন বিষ হ'য়ে উঠেছে, টিঁকতে পারিনা, বেরিয়ে পড়ি। পাস ক'রেই বাবাকে যে মহম্মদপুরে একবার প্রণাম করতে যাই, আর ও-মুখো হইনি। বাড়ির সবাই ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন থাকেন।

সে উদ্বেগের আবার একটা ফিকরি বেরুল, অন্য এক রূপ ধ'রে। যেটা, অন্তত বাবা-মা-দাদা যতদিন বেঁচেছিলেন আমার পিছু ছাড়েনি। বাইরে ঘুরেফিরে যখনই বাড়ি আসি, একটা যেন চাপা ষড়যন্ত্রের গন্ধ

পাই—সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎবাণীর লক্ষণগুলো প্রকট হ'য়ে উঠছে—আমায় না বেঁধে ফেললেই নয়। পাত্রীর খোঁজে চিঠি পাঠানো হচ্ছে চারিদিকে। সামনের ঐ হতাশা, পেছনের এই বিভীষিকা। চাকরি করবার পূর্ব পর্যন্ত এই যে একটা বছর—এটা বোধহয় অন্তত উপজীবিকা অর্জনের দিক দিয়ে সব চেয়ে দুর্বৎসর গেছে আমার জীবনে। এরপর থেকেই দৈব বা অদৃষ্টের বঞ্চনা আর প্রসাদ যেন পাশাপাশি গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চনাটাই প্রসাদ বা আশীর্বাদে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে। বড় বিস্ময় লাগে। আর একটু বিশদ ক'রে বলি কথাটা—

উনিশশ'বিয়াল্লিশ পর্যন্ত আমার চাকরির যুগ গেছে। একটা কাজ একটানা ক'রে গিয়ে আবার গ্রহণ করার, গভর্ণমেণ্ট বা সওদাগরী চাকরি নয়। স্কুল—বিভিন্ন স্থানে, আর দ্বারভাঙ্গারাজ, বিভিন্ন বিভাগ বা দপ্তরে। কম ক'রে ধরলেও বোধ হয় আট ন'বার ছেড়েছি, আর ধরেছি। ছাড়ার পর কয়েকবার ব'সেও থাকতে হয়েছে, তবে কোনবারেই দীর্ঘ সময়ের বিরতি না থাকায় উদ্বেগও দীর্ঘ এবং অসহনীয় হ'য়ে উঠতে পারেনি। সেটাকে আমি কি বলি? ভগবানের আশীর্বাদ? মতভেদ হবে, তবে আমার তো তাই বিশ্বাস। নৈলে এই যার বিক্ষুব্ধ, অব্যবস্থিত জীবন, ছাড়া-ধরার মধ্যে দিয়ে বরাবরই ঘুর পথে চলতে হয়েছে—তাতে, আর-একটি জীবের, তার শুভাগমনে ক্রমে আরও কয়েকটির দায়িত্ব স্কন্ধে থাকলে সারা জীবনটাই যে দুর্বহ হ'য়ে উঠত। হয়না ইচ্ছে বলতে —"বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে"? বয়োধর্মে আমিও যে চাইনি—বলতে পারি তা শপথ ক'রে? তাঁর দয়া জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে আমি আর একভাবে উপলব্ধি করেছি। সে বড় অদ্ভুত; সেখানে তিনি যেন সখারূপে আমার সঙ্গে লুকোচুরিই খেলেছেন; একহাতে লুকিয়ে বঞ্চনা করেছেন, আর এক হাতে বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রসাদ। সমস্ত জীবনটা পেরিয়ে এসে আজ বড় কৌতুক লাগে। ব্যাপারটা হচ্ছে, ডেপুটিগিরির সেই প্রথম দরখাস্ত নিষ্ফল হওয়ার পর থেকে যেমন কোন দরখাস্তই আমার ডাকের খরচটুকুও ফিরিয়ে দেয়নি, তেমনি আবার যখন চাকরি পেয়েছি, তখন আপনি-আপনিই পেয়েছি। এটা বললেও সব বলা হোলনা। যাঁদের প্রয়োজন আমায়, তাঁরাই ডেকে নিয়েছেন আমাকে। দরখাস্তের প্রশ্নই ওঠেনি। তাঁর এ-দয়ায় আমার একটা বিশ্বাসই জন্মে গিয়েছিল মনে যে, আমায় তিনি ভুলে থাকবেন না। তাই থেকে একটা দম্ভও। যার জন্যে আমি অন্যায় কখনও সহ্য করিনি। চাকরি য'বার ছেড়েছি; অন্যায়ের প্রতিবাদেই ছেড়েছি। এর মধ্যে অন্তত একবার

বেশ উচ্চাসন থেকে অনেকটা নীচে নেমে আসতে হয়েছে। কিন্তু একটি দিনের জন্যে সে কারণে অনুতাপ করতে হয়নি আমায়।

অনুতাপ দূরে থাক। এই পতনের বা স্খলনের সময়টাই আমার জীবনে বোধহয় সবচেয়ে সুখের গেছে; শান্ত, নিশ্চিন্ত, আত্মস্থ জীবন। সে যেন ছিল আমায় তাঁর যা দান তার কিছু কিছু ক'রে একসঙ্গে আমার অঞ্জলিতে তুলে দেওয়া। সুবন্ধু, সু-সম্পর্ক, সু-পরিচয়। তখনও খেলছি আমি। ফুটবল, টেনিস; সে-খেলা স্বীকৃতি পেল। সবচেয়ে বড় প্রসাদ তাঁর, সাহিত্য। সম্পূর্ণ আত্ম-বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে তার প্রথম সূত্রপাত হোল এই সময়েই।

আরও অনেক কিছু। এত মিষ্ট যে এখনও মনটা কোন কারণে ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলে তাকে সেই দিনগুলি থেকে ঘুরিয়ে আনি। তৃপ্তি পাই।

এই ছন্দেই যেন র'চে দিয়েছেন আমার জীবন।

ডেপুটিগিরির উত্তুঙ্গ আশা থেকে স্খলিত হ'য়ে আমায় অ-স্বীকৃতি-প্রাপ্ত মাড়োয়ারী স্কুলে নেমে আসতে হয়। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই যে আমায় অনুতাপ করতে হয়েছে কখনও, এমন নয়।

বরং ভালোই লেগেছিল আমার সেই ওপরের চারটি মাত্র ক্লাস নিয়ে সেই জরাজীর্ণ বিদ্যানিকেতন। তার একটা কারণ হয়তো—যেমন পূর্বে বলেছি—Any port in a storm; তবে সেটাই সমস্ত নয়। প্রধানও নয়। প্রধান কারণ, যা আবিষ্কার করতে বেশি দিন লাগল না, দেখলাম, শিক্ষকতাই আমার জীবনের মূল সুর। আমার দৈবনির্দিষ্ট বৃত্তি। যা কিছু সঞ্চয় আমার জীবনে—অধ্যয়নে ও অভিজ্ঞতায়, ছাত্রদের মধ্যে সে সব বিলিয়ে দেওয়ায় যে আনন্দটা পেয়েছি তা আর কিছুতে পেয়েছি ব'লে মনে করতে পারিনা। দেওয়ার আনন্দ, সৃষ্টি করার আনন্দ, নিজের জীবনের আদর্শগুলোকে মূর্ত ক'রে তোলার প্রয়াসের যে আনন্দ। আমার চব্বিশ-পঁচিশ বছর চাকরি জীবনের মধ্যে অর্ধেকটা কেটেছে স্কুলে। ভালো সঙ্গ পেয়েছি সহ-শিক্ষকদের মধ্যে; যখন সমস্তরে, আবার যখন হেড-মাষ্টার, তখনও। ভালো ছাত্র পেয়েছি, যাদের পেয়ে আশান্বিত হয়েছি তারা সন্তানের মতোই উত্তরাধিকারসূত্রে আমার জীবনটাকে ভাবী কালের দিকে এগিয়ে দিতে পারবে। উত্তর জীবনেও এমনই অনেকের সাক্ষাৎ পেয়ে সাফল্যে আনন্দে আমার চক্ষু অশ্রু সিক্ত হ'য়ে উঠেছে।

কয়েকটা ক্ষেত্র তো ঘুরে এলাম। কোন বৃত্তিই ঠিক এ জিনিসটি দিতে পারেনা।

শুধু শেষের দিকে আমি বেশ কিছু নিরাশ হ'য়ে পড়েছিলাম।

কারণটা সম্বন্ধে আমি কিছু পূর্বে আলোচনা করেছি, একাল আর আমাদের সে-কালের শিক্ষার আদর্শ প্রসঙ্গে। দীর্ঘ কয়েক বৎসর অন্য বৃত্তি নিয়ে থাকার পর যখন আমি আবার স্কুলে ফিরে এলাম, হেড-মাষ্টার হ'য়েই, দেখলাম, সব বদলে গেছে। দেখলাম, শিক্ষানিকেতনের সে নির্মল আবহাওয়া আর নেই। যার জন্যে, একদিন বিনা আয়াসে স্কুল শিক্ষকতার নিম্ন স্তরেই একটু স্থান পেয়ে যে-আনন্দ পেয়েছিলাম, সাদরে আহূত হ'য়েও তার উচ্চতম পদ থেকে স্বেচ্ছায় সচেষ্ট হ'য়েই বিদায় নিতে হয়েছিল। প্রসঙ্গটা যথাস্থানে আসবে, এখানে একটু উল্লেখ ক'রে রাখলাম মাত্র।

একটা অশান্ত ঘূর্ণীর মধ্যে দীর্ঘদিন আবর্তিত হওয়ার পর একটি নির্মল শান্ত পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা বিতরণে তৃপ্তি ছাড়া আমি মাড়োয়ারী স্কুলে আর একটি জিনিস পাই যা অন্য স্কুল হ'লে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা। সেটি হচ্ছে, রাজস্কুলের বহুপূর্বে অবসর-প্রাপ্ত প্রবীণ হেডমাষ্টার কৃপানাথ মজুমদারের সাহচর্য, মাড়োয়ারী স্কুলের হেডমাষ্টার হিসাবেই। আমি তাঁর সহকারী, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ হেডমাষ্টার। চারিদিক দিয়েই। আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ পরিচালক (Administrator), আদর্শ অনুশাসক (Disciplinarian)। এছাড়া তাঁর চেহারাটাও একজন আদর্শ হেডমাষ্টারের উপযোগী হওয়ায় (যদি তাই বলতে হয়) তিনি নিজের ক্ষেত্রে এ-অঞ্চলে অদ্বিতীয়ই ছিলেন সে সময়।

অবসর নেন বহুপূর্বে। আমি বাংলা স্কুল থেকে রাজস্কুলে গিয়ে ভর্তি হই উনিশ শ' আটের মাঝে। উনি তার কয়েকবছর আগেই অবসর গ্রহণ ক'রে বোধহয় ওঁর বাড়ি ফরিদপুরের কোনও গ্রামে গিয়ে বসেছিলেন, আবার মাড়োয়ারী স্কুলের চাকরি নিয়ে আমার নিয়োগের দু'-তিন বৎসর পূর্বে দ্বারভাঙ্গায় আসেন।

তখন অবশ্য তাঁর পূর্বের সে শক্তি নেই। থাকা সম্ভবও নয়। রাজস্কুল থেকে যদি ষাট-বাষট্টি বৎসর বয়সেও অবসর নিয়ে থাকেন তো—১৯০৩/৪ সালের এদিক-ওদিক, তা হ'লে এ সময় তাঁর বয়স চুয়াত্তর-পঁচাত্তর। স্কুলের মাড়োয়ারী কমিটি, যাঁরা ওঁকে ডেকে নিয়েছেন, তাঁরা যে ওঁর নামটাকেই পুঁজি ক'রে ডেকেছেন এটা স্পষ্ট। শরীর মন দুই-ই অনেকটা অপটু হ'য়ে গেছে তখন। গাড়ির ব্যবস্থা ছিল, ঘণ্টা দুই থেকে চ'লে যেতেন। এতে স্কুলের মুনাফার খাতায় কিছু জমত কি জমত না জানিনা, তবে, যাঁর যশ-খ্যাতি-সৌরভ এখন পর্যন্ত সময়ের অলিন্দ বেয়ে আসছে, শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের সঙ্গে আজও যাঁর নাম উচ্চারিত,

তাঁকে দেখা, তাঁকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া আমার একটা পরম সৌভাগ্য ব'লেই মনে করি।

শালপ্রাংশু দেহ তখন সামনে ঈষৎ নুয়ে পড়েছে, আবক্ষলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রু, উন্নত ললাট, চক্ষুদু'টি তখনও দীপ্ত, কণ্ঠস্বর স্তিমিত হ'য়ে এলেও সতেজ, স্পষ্ট—স্কুলে আসতেন সাধারণত চোগা-চাপকান প'রেই। সব মিলিয়ে উনি তখনও যেন শিক্ষাক্ষেত্রে বিগত যুগটাকে ধ'রে রেখেছিলেন নিজের মধ্যে।

আদর্শ হেডমাষ্টারের একটা দিক সম্পর্কেই কৃপানাথের নামটা বেশি উচ্চারিত হয় এখনও, অনুশাসন, Discipline রক্ষা; বোধহয় নানা কারণে আজকাল এর মানটা নেমে যাওয়ার জন্যই। তবে তাঁর আমলে, বিশেষ ক'রে তাঁর স্কুলে এর মান উঁচুতে ধ'রে রাখা সহজ ছিলনা।

এমনি, বয়সের ধর্মেই সর্বকালেই স্কুলের ছাত্রদের একটু দুরন্তপনা থাকেই লেগে। একক, আবার অনেকগুলি একত্র হওয়ায় দলবদ্ধ হ'য়ে। এর ওপর ছাত্রসংখ্যার একটা মোটা অংশ ছিল রাজের বড় বড় আমলার বাড়ির ছেলে, বাঙ্গালী, বিহারী, বিহারীদের মধ্যেও মৈথিল। এদের মেজাজটা—সবারই না হোক, অনেকেরই একটু উঁচুপর্দায় বাঁধা থাকত। তাদের দলপতিত্বে, তাদের বেপরোয়া ভাবটা অন্য ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। সংঘর্ষ বাধবার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। স্টেশন, রাজের গার্ডেন ডিপার্টমেণ্টের ফলফুলের বাগান রক্ষক, হয়তো কোন কারণে রাজের সেপাইদের সঙ্গেও।...অনেক গল্প আমাদের সময় পর্যন্ত চ'লে আসে।

—বিনা টিকিটে আসার জন্য স্কুলের অমুক ক্লাসের অমুক ছাত্র ধরা পড়েছে। খবর পেয়ে একদল ছাত্র স্টেশনে ঢুকে পড়ল তার নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে—"তোকে আমরা সারা দ্বারভাঙ্গা খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুই এখানে দাঁড়িয়ে করছিস কি?"

হাতটা ধ'রে, নির্বাক, হতবুদ্ধি স্টেশন-স্টাফের মধ্যে থেকে বের ক'রে নিয়ে এল।

সুবিধে হ'লে জিজ্ঞেস করতাম এসব ছেলেকে কি ক'রে, কি মন্ত্র বলে বশে রাখতেন। উনি হাসতেন! একদিন বললেন মন্ত্রের তো দরকার হয়না—দরকার ট্যাক্ট (Tact) তার সঙ্গে একটা আন্তরিক সহানুভূতি—আমি যা করছি তা ওদের ভালোর জন্যই করি। সাজা পেলেও যাতে এই বিশ্বাসটা থেকে যায় ওদের। আর, স্কুলের মর্যাদাটা বরাবর রক্ষা ক'রে গেছি। কিছু হ'লে বাইরে থেকে সাজা দিতে দিতাম না। এ নিয়ে আমার রাজের কয়েকজন আমলার সঙ্গে কড়া চিঠিপত্রও হ'য়ে যায়।

ইলড্ (yield) করিনি। চাকরি পণ ক'রেও। ছেলেরা এটার মূল্য বুঝত। ক্রমে এই ভাবটা বেশ কাজ করে—'স্কুলের সুনাম'।...

তা ব'লে কি একেবারে মুনিঋষির আশ্রম করা যায়?"—হেসে বলেন উনি—"খানিকটা দুরন্তপনা যে থাকবেই যেখানে এক বয়সের অতগুলি পড়ে—এটা মেনে নিতে হয়। Exuberance of animal spirit (প্রাণচাঞ্চল্যের আধিক্য)।...

"তবে দুর্নীতি কখনও আসকারা পায়নি আমার কাছে।" হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে উঠে বলেন—"এর জন্যে দু'টি ছেলেকে রাসটিকেট করতে হয়। রাজের বড় অফিসারের ছেলে। সহজে হয়নি।"

একটু থেমে যেন একটু স্মৃতিচারণ ক'রে বললেন—"নৈলে, চড়াও হ'য়ে হয়তো একটা আমবাগান লুট করলে—সাজা অবশ্য পেতই, তবে..."

আমি হেসে বললাম—"সেটাকেই বা আপনি কি পর্যায়ে ফেলতেন?"

আমার উদ্দেশ্যটা বুঝে উনিও হেসে বললেন—"চুরিই বরং ডাকাতিরই ছোট সংস্করণ বলতে পার। তবে কি জান?—ওসব আমের লোভে নয়—ঐ যা বললাম—animal spirit. সাজা দেওয়ার সময় এ কথাটাও মনে রাখতে হোত।"

মাড়োয়ারী স্কুলের প্রায় একটা বছর (ঠিক তারিখ দিয়ে মনে পড়ছেনা)—বেশ শান্তিতে কাটে। তবে এখন মনে হয় সেটা ছিল কবরের শান্তি—Peace of the grave. ওখানেই বরাবর প'ড়ে থাকলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম বলতে পারিনা। মাড়োয়ারী কমিটির বরাবর কৃপাদৃষ্টি থেকে গেলে, সুবিচার থাকলে, স্কুলের প্রথম গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক ব'লে হয়তো এ্যাফিলিয়েসন যখন পেল, হেডমাষ্টার হ'য়ে যেতে পারতাম, কিন্তু, আমার সৌভাগ্য বলতে হবে, ওঁদের কৃপাদৃষ্টি স্থায়ী হোলনা।

সৌভাগ্যই বৈকি না-হওয়াটা। কারণটা বলি—

জীবনের এ-প্রান্তে এসে মিলিয়ে দেখছি, আমার জন্মদিনে সন্ন্যাসীর সেই ভবিষ্যতবাণীর মধ্যে কিছু একটা ছিলই যেন। একটা ছোট স্কুলের বীচি-তরঙ্গহীন জীবন, বাড়ির ভাত, বড় পরিবারের মধ্যে সবরকম অভাব-অভিযোগ থেকে আগলানো জীবনে—এর মধ্যেই যে অশান্তির বীজ রয়েছে—সেটা আমার কোষ্ঠীর গুণেই মাঝে মাঝে অনুভব করতাম। একটা যেন স্থাণুত্ব এসে পড়ছে। কোষ্ঠীই হোক বা ধমনীতে ঠাকুরদাদার রক্তই হোক, একটা অস্বস্তি এসে পড়ত মনে। এটা হয়তো অবচেতন মনের ক্রিয়া; কিন্তু স্পষ্টতর ভাবে, আমাকে অভাব-অনটন থেকে আরও ভালোভাবে আগলে রাখবার যে একটা চক্রান্ত চলছিল,

অনেকটা প্রচ্ছন্ন হ'লেও, মাঝে মাঝে তার সংকেত পেয়ে আমি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠছিলাম। আমায় উদ্বাহ-বন্ধনে আটকে ফেলার।

আমার উদ্বেগটা ছিল দু'দিক দিয়ে। একটা ছিল, নিজেরই দুর্বলতা। ও-বয়সে, ও-প্রসঙ্গের একটা মাদকতা থাকেই, তলিয়ে যেতে কতক্ষণ লাগে? দ্বিতীয় এবং প্রবলতর উদ্বেগ ছিল, মেজোমামাকে নিয়ে। সে প্রায় একটা আতঙ্কই।

অমন একজন এ্যামেচার ম্যাচমেকার (Amateur match maker)—অঘটন ঘটাবার দুর্ধর্ষ ঘটক আমি জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করবার পরই দাদার বিবাহের উনিই সব জোগাড়-যন্ত্র করেন। যখন মামার বাড়িতে থেকে আই-এ. পড়ছি তখন, নিজে পাত্রী দেখে, এদিকে বাবার সঙ্গে পত্রাচারে সব প্রায় ঠিকঠাক ক'রে আমাকেও একদিন তারকেশ্বর লাইনের একটা জায়গা থেকে ঘুরিয়ে আনলেন। ব্রজেশের সঙ্গে গিয়ে মোটামুটি একটি পছন্দসই পাত্রী অপছন্দ ব'লে সে-ফাঁড়া একরকম ক'রে কাটাই; কিন্তু একবার চিনে নিয়েছেন, দ্বিতীয়বারও যে মামা ভাগনের কাছে হারবেন—যখন মুক্ত, রোজগারী, বিবাহের বয়সও সে কালের হিসাবে অতিক্রান্ত হ'য়ে যাচ্ছে—হারবেন যে মামাই, এমন ভরসা ছিলনা। মামা দাদার বিবাহ ঘটান বয়স যখন আঠারো, আজকাল যে-বয়সে মেয়েরাও বিয়ের পিঁড়িতে পা দিতে পারছেনা। আমার তখন চলছে একুশ-বাইশের মধ্যে।

এই সময় একটা দিকের মোহ ঘুচিয়ে স্কুলের কমিটি আমায় সাহায্য করেন। হঠাৎ একদিন টের পেলাম, একজন বিহারী গ্র্যাজুয়েটকে আমার চেয়ে বেশি মাইনে দিয়ে আমার ওপরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভদ্রলোক বি-এল., অর্থাৎ স্পষ্টতই ওকালতির জন্যই প্রস্তুত করছেন নিজেকে, জমি তোয়ের করার সময়টা যে দিক থেকে যা পান হাতিয়ে নিচ্ছেন। ওকালতির উপযোগীই মানসিক গঠন। কিন্তু সেজন্য অভিনন্দিত করি, আমার মানসিক অবস্থা তখন তেমন নয়। প্রথম চোটটা বেশি লাগেই, তায় একেবারে অকস্মাৎ। একটা কড়া চিঠি দিই কমিটিকে। কোনও ফলের আশা না ক'রেই।

ওদিকের মোহ গেল। বাকি রইল বাড়ির দিকের আতঙ্ক। এবার এদিকের চেষ্টাটা বাড়বেই। আমি স্কুলে ইস্তফা পাঠিয়ে দিয়ে একদিন বাড়ি থেকে অন্তর্ধান হলাম।

আমার সেদিনকার মানসিক অবস্থাটা গুছিয়ে বোঝবার চেষ্টা ক'রে কোন হদিস পাইনা, পরবর্তী ঘটনাগুলোও তালগোল পাকিয়ে গেছে। শুধু মনে আছে, আবার একটা অশান্ত ঘূর্ণির মধ্যে বেশ কিছুদিন

কাটল। চাকরির চেষ্টাতেই। স্কুলে-স্কুলেই, বিশেষ ক'রে যেখানে যেখানে বাঙ্গালী হেডমাষ্টার বা সেক্রেটারি। সে সময় ছিলও বেশ কিছু। ছাপরা, মোতিহারী, পাটনা (স্বর্ণাসন বাদ দিয়ে)। ছুটাছুটি, অনাহার, অনিয়ম। ···বাড়ির কথা। ব'লে আসিনি। চিঠি দিচ্ছিনা। ···কেন যে দিচ্ছিনা তাও স্পষ্ট নয়। এ-কাজটা পেলে দোব। ও-কাজটা পেলে দোব। ···মার চোখের জল জমে উঠছে। দাদার উদ্বেগ। বাবাও জেনেছেন। মহম্মদপুরের নিঃসঙ্গ জীবনে তাঁর মনের অবস্থা। ···চাকরি ক'রে বাবাকে বাড়িতে এনে বসানো ছিল প্রথম কাজ। মাড়োয়ারী স্কুলে কাজের সময়টা বাবা নিশ্চয়ই প্রস্তুত হচ্ছিলেন।··· খবর গেল, বিভুতি কাজ ছেড়ে বাড়ি থেকেই বেরিয়ে কোথায় চ'লে গেছে !!

হতাশার সঙ্গে ওঁদের কাছে এই অপরাধের গ্লানিতে মনের অবস্থাটা এমনই চরমে পৌঁছে যায় যে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে ফেলবার খুব কাছাকাছি গিয়ে পড়ি এক সময়। মা-ই বাঁচান। না, তাঁর চোখের জল আর বাড়ালে চলবে না। সে অপরাধের স্খলন এই গঙ্গার জলেও সম্ভব হবে না।

না হয় ফিরেই যাই বাড়ি ? ওঁদের জন্যে সব মান-অভিমান অন্যায় অবিচার গঙ্গার জলেই ভাসিয়ে দিয়ে ফিরে গিয়ে আবার স্কুল কমিটির কাছে দরখাস্ত ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করি ?

ঠিক এইভাবে এই সংকল্প নিয়ে ফিরছিলাম কিনা মনে নেই, যেমন সে সময়ের অনেক কথাই ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে গেছে। বাড়িই ফিরছিলাম পাটনা থেকে। গাড়ি মজঃফরপুরে এসে কিছুক্ষণ হোল দাঁড়িয়েছে; জানালায় কনুই চেপে, গালে হাত দিয়ে অন্যমনস্কভাবে ব'সে আছি, হঠাৎ কানে গেল—"বিভূতি না ?" ঘুরে দেখি, রটাই !

চোখাচোখি হ'তে প্রশ্ন করল—"তুই কোথা থেকে আসছিস ?"

গলায় হঠাৎ কি একটা ঠেলে উঠেছে, চোখের দিকে অশ্রুও।

অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বললাম—"রটাই না ?···তুমি এখানে যে ?"

"আমি তো এখানেই আছি, আজ ক'বছর থেকে, ম্যুনিসিপল আফিসে কাজ করি।···দ্বারভাঙ্গায় তো আর যাওয়া নেই। শুনেছি তুই পাস ক'রে সেখানেই একটা চাকরি পেয়েছিস স্কুলে না, কোথায়···তা, এখন···?"

আর সামলাতে পারছিনা, চোখের জল শুধু ঝ'রে পড়তে বাকি আছে,

কোঁচার খুটটা তুলে মুখ নীচু ক'রে চাপতে হোল, গাড়ির চঞ্চল ভিড়ের মধ্যে লজ্জায় প'ড়ে গেছি।

রটাই একেবারে ঘেঁসে এল, গলা নামিয়ে বলল—"ও কি! কিছু হয়েছে নাকি? বাড়ির খবর—"

"ভালোই।" কোনরকমে কথাটাকে ঠেলে গলা দিয়ে বের ক'রে দিতে পারলাম।

"তবে?"

ও-ও কিছু বুঝে উঠতে পারছেনা। একটু মুখ ঘুরিয়ে ভেবে নিয়ে বলল—"এক কাজ করতে পারবি?...গাড়িটা এবার ছেড়ে যাবে, লাইন ক্লিয়ার নিয়ে যাচ্ছে...না হয় নেমে পড়বি? পরের গাড়িটায় যাবি'খন। হ্যাঁ, তাই কর্—ভাবনা লেগে থাকবে। কি আছে সঙ্গে, দে জানালা গলিয়ে।"

দড়ি দিয়ে বাঁধা কালো কম্বলে জড়ানো একটা সুজনী, বালিস আর ছোট একটা মশারি। আর একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। বের ক'রে দিতে রটাই বলল—"কালো কম্বল তো তার সঙ্গে লোটা কই? তোকে নিয়ে তো আবার সে ভয় আছে। শশীর কাছে শুনেছিলাম।"—আমায় হাসিয়ে মনটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যেই। আমি ওঠা-নামার ভিড় ঠেলে প্লাটফরমে নেমে দাঁড়ালাম। একটা দুঃস্বপ্ন যেন হঠাৎ কেটে গেছে। মুখে একটা হাসিও ফুটে থাকবে ওর লোটা-কম্বলের কথাটুকুতে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা টাঙ্গা ক'রে নিয়ে দু'জনে উঠে পড়লাম।

রটাইয়ের পরিচয়টা একটু দিয়ে নিই।

ওর বাবা হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সময়ে দ্বারভাঙ্গা বাঙ্গালী সমাজের একজন বড় মাতব্বর; সে সময় রাজস্টেটের জেনারেল ম্যানেজার, বাংলা সাহিত্যের "পরশুরাম" রাজশেখরের পিতা চন্দ্রশেখর বাবু, স্কুলে হেডমাষ্টার কৃপানাথ মজুমদার, স্টেটের অন্য সব ক্ষেত্রেও কর্ণধার প্রায় সকলেই বাঙ্গালী, জমিদার রাখাল সিংহের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ; মোটকথা সহরে বাঙ্গালী সমাজ একটা বিশিষ্ট জায়গা নিয়ে রয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও একটা বড় পরিচয় রয়েছে। ঘি'টা বাঙ্গালীর একচেটিয়া, বড়বাজারের সারদা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেতাবই প'ড়ে গেছে "ঘি-প্রিন্স।" (Ghee Prince)।

হরিমোহনের কৃতিত্ব ছিল সর্বতোমুখী। স্টেটের বাইরে কোথায় একটা বড় চাকরি ধ'রে রেখেছিলেন, এদিকে ফলাও ব্যবসা, ওঁদের "ইউনিয়ন প্রেস" তখন দ্বারভাঙ্গার একমাত্র ছাপাখানা। ব্যক্তিগত জীবনে উনি ছিলেন একজন বড় তান্ত্রিক সাধক। বাড়ি সংলগ্ন মন্দিরে মানুষ

পরিমাণ তৈলচিত্রের শ্যামামূর্ত্তি ছিলেন তাঁর আরাধ্যা, মন্দিরটি ছিল দ্বারভাঙ্গার একটা প্রধান আকর্ষণ।

হরিমোহনের পরিবারের আর একটা দিক ছিল; কৃষ্টির দিক। বৃহৎ পরিবার। তার মধ্যে গান বাজনা-সাহিত্য এ সবের অনুশীলনও একটা বড় জায়গা নিয়ে ছিল। মোটের ওপর সে-সময় এই পরিবারটি সবচেয়ে প্রগতি-সম্পন্ন।

আমরা যখন এলাম, তার কিছুদিন পূর্ব্বে হরিমোহন বোধহয় গত হ'য়ে থাকবেন। স্বভাবতই পরিবারের সে জৌলুস খানিকটা ইতিহাসের বিষয় হ'য়ে এসেছে। তবু যা আছে তাতে তখনও দ্বারভাঙ্গায় ওঁরাই সবচেয়ে বিশিষ্ট। রটাই ছিল হরিমোহনের তৃতীয় পুত্র; চারটির মধ্যে। রটাইয়ের পুরো নাম ছিল রটন্তীকুমার। হরিমোহন বোধহয় এইরূপেই দেবীর উপাসক ছিলেন।

স্কুলে রটাই ছিল দাদার সতীর্থ, এক ক্লাসের সাথী। কিন্তু বয়সে ছিল আমার প্রায় সমবয়সী। এদিকে বয়সের এই সমতা, ওদিকে মানে দাদার বন্ধু, এক ক্লাস ওপরেই আমার চেয়ে; ফলে আমাদের সম্বন্ধটা মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছিল। এই দ্বিবিধ সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথনে কি ক'রে আপনিই যেন একটা রফা দাঁড়িয়ে যায়, আমার সম্বন্ধে ও ব্যবহার করত "তুই" ওর সম্বন্ধে আমি ব্যবহার করতাম "তুমি"।

রটাইয়ের আর একটা পরিচয়—আমার সাহিত্য জীবনে ওর বেশ খানিকটা জায়গা আছে। অবশ্য কিছুটা পরোক্ষভাবেই। ও নিজে লিখত না, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ই ছিল কম, তবে স্কুলে থাকতেই ও সে-কালের পরিচিত অনেক বিশিষ্ট বিদেশী লেখকের নাম-করা বই প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলেছে—স্কট, ডিকেন্‌স, রাইডার হ্যাগার্ড, ম্যারি করেলী, হাচিনসন্‌স, জেরোম-কে-জেরোম, ডব্লিউ ডব্লিউ জেকভ, মার্ক টোয়েন—অনুবাদে, টলস্‌টয়, ভিক্‌টর হিউগো, ব্যালজাক্, সারভেনটিস্, এনটোল ফ্রান্স্, আলেকজাণ্ডার ডুমা প্রভৃতি।

সে-সময় একশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে ইংরাজি নভেল পড়ার ঝোঁকটা ছিল খুব বেশি। দাদাও এর মধ্যে ছিলেন। বইয়ের লেনদেন, গল্প নিয়ে আলোচনা, এসব প্রায় লেগেই থাকত। তবে, নভেল আর গল্পের বই পড়া ছাড়া, রটাইয়ের আর যেন অন্য কাজই ছিলনা। আমার আন্দাজ, ও স্কুলের উঁচু তিনটে ক্লাসে থাকতেই সে সময়ে নাম করা সব নভেলগুলাই পড়া শেষ করেছিল। এনট্রেন্‌সের তুলনায় উনিশ শ' দশ সাল থেকে ম্যাট্রিকুলেসন অনেক সহজ হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও

রটাই কোনরকমে থার্ড ডিভিসনে পাসটা ক'রে যায়। কলকাতায় গিয়ে কলেজে ঢুকেছিল, কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারেনি। তবে নভেল-প্রীতি ওর একান্ত বৃথা যায়নি। মাত্র একজন স্কুলের ছাত্র হিসাবে ওর ইংরাজি ভাষায় দখল ছিল অদ্ভুত। ছোট ছোট কথার স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ইংরাজি লিখতে সমস্ত স্কুলটায় ওর জুড়ি ছিলনা। এইখানেই শেষও হয়নি। এদিকে থার্ড ডিভিসন হ'লেও ইংরাজিতে ওর ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় খুব উঁচু স্থান ছিল। শুনেছিলাম ওপরের ছু'তিন জনের মধ্যেই। এতে আশ্চর্যেরও কিছু ছিলনা, কেননা, পাঠ্যপুস্তক-মুক্ত যে অংশে নিজের স্টাইলের সুযোগটা থাকে—অনুবাদ, প্রেসি (সংক্ষিপ্তকরণ), প্রবন্ধ—তাতে ওকে ছাড়িয়ে যাওয়া সহজ ছিলনা।

আমার সঙ্গে সম্বন্ধ, রটাই-ই প্রথম আমায় সে-কালের বড় বড় লেখকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। স্কট, ডিকেন্স, টলষ্টয়, ভিক্টর হিউগো এবং কয়েকজন নিছক কৌতুকরসের কারবারী। নানা কারণেই রটাইয়ের মতো আমার একটা বিরাট-বিচিত্র ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করবার সুযোগ ছিলনা,—মনের গঠন অনুযায়ী অভিরুচিও নয়। আমি ডিকেন্স্, হিউগো শ্রেণীর কয়েকজন লেখক এবং বিশেষ ক'রে নিছক হাস্যকৌতুক-রসিক ক'জনের—জেরোম-কে-জেরোম, মার্ক টোয়েন, ডব্লিউ-ডব্লিউ জেকভের অনুরাগী হ'য়ে পড়ি। আমার ক্ষেত্রে এটা শুরু হয় যখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর (অর্থাৎ) ম্যাট্রিকুলেশন-পূর্ব শ্রেণীর ছাত্র। রটাই আমায় সর্বপ্রথম ডিকেন্সের 'ডেভিড্ কপারফিল্ড', 'পিকউইক পেপার্স' আর হিউগোর 'লা মিসারেবল্' আর ডন কুইকসোটের কথা বলে। আমি এই বিরাটকায় পুস্তকগুলো অন্তত বার তিনেক ক'রে এমুড়ো-ওমুড়ো পড়ে গিয়ে থাকব অত্যন্ত মন্থরগতি পাঠক হওয়া সত্ত্বেও।

আর 'পিকউইক পেপার্স' এখনও আমার একরকম নিত্যসঙ্গীই।

রটাইয়ের শক্তির আর একটা দিক ছিল, গান বাজনায় দখল। গানটা মিষ্ট হ'লেও গলা ছিল চাপা, বেশি তুলতে পারত না; তবে যন্ত্রসঙ্গীতে ছিল ওস্তাদের হাত, বাঁয়া-তবলা থেকে নিয়ে সেতার, এসরাজ, বেহালা, সরোদ সবকিছুতেই অন্তত বয়স হিসাবে আশ্চর্যই দখল ছিল বলতে হবে। অবশ্য, সখ হিসাবে একজন ছাত্রের যতখানি হ'তে পারে। দ্বারভাঙ্গা রাজে যন্ত্রে, কণ্ঠসঙ্গীতে তখনও কয়েকজন সর্ব-ভারতীয় খ্যাতির ওস্তাদ রয়েছেন। যাওয়া আসা করত রটাই, তবে একজনকে ধ'রে থেকে একটা যন্ত্রের সাধনা নিয়ে থাকা—এটা ওর স্বভাবে ছিলনা। হয়তো পারিবারিক পরিবেশও সে সুযোগ দেয়নি

ওকে। ফলে, গ্রহণ করবার শক্তি থাকলেও শিক্ষার মধ্যে একটা পল্লব-গ্রাহিতার ভাব থেকে যায়।

রটাইদের অমন সুসংবদ্ধ বিরাট পরিবার শেষের দিকে নানা কারণে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে। আমারও এদিকে বছর চারেক বাইরে বাইরেই কাটল, রটাই যে কবে এর মধ্যে দ্বারভাঙ্গা ছেড়ে এখানে এসে পড়ে তা জানা ছিলনা। আমার মানসিক ঐ অবস্থার মধ্যে আর সবকে ছেড়ে তাকে এভাবে পাওয়া—একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়লাম আমি। মাইল খানেকের মধ্যেই কল্যাণীতে ওর বাসায় পৌঁছে গেলাম।

রাস্তাটা একরকম চুপচাপই গেল। ব্যাপারটার আকস্মিকতায় আমি সহজেই স্বল্পবাক হ'য়ে প'ড়েছি, রটাইয়ের শিল্পীর মন, বোধহয় ভাবছে কিভাবে প্রসঙ্গটা তুললে আমার আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা; আমার এভাবে আবির্ভাব, তার ওপর ওর বাড়িমুখো হ'লেও এক কথাতেই এভাবে নেমে যাওয়া, এর মধ্যে একটা কিছু রহস্য যে আছেই এটা অনুমান ক'রে নিতে ওর নিশ্চয় বেশি সময় লাগেনি। এ অনুমানের একটু কারণও ছিল, যা পরস্পরের এদিকের কাহিনীর মধ্যে টের পাওয়া গেল। রটাইও অনেকটা আমারই মত অবস্থায় প'ড়ে নিরুদ্দেশভাবেই মজঃফরপুরে এসে পড়েছিল।

বাসাটা ছোট। একটা অল্প পরিসর উঠানের তিনদিকে সংকীর্ণ বারান্দা, তার শেষের দিকে একটি মাত্র ঘর, তাও বাইরে থেকে মনে হোল একজনেরই যোগ্য। রাস্তা থেকে উঠে ওর পেছনে পেছনে ভিতরে পা দিতেই রটাই ঘুরে একটু হেসে বলল—"ওয়েলকাম্ টু বাকিংহাম প্যালেস!" (Welcome to Buckingham palace)।

একটু ধাক্কা খেয়েছিলামই, যেন হঠাৎ কোনও উত্তর না পেয়েই আমি শুষ্ক মুখেই প্রশ্ন করলাম—"তুমি একলা রয়েছ?"

"তুবার চেষ্টা ক'রে দেখলাম।...সে সব পরে শুনবি, তুই আগে একটু মুখ হাত ধুয়েনে। আমি এখুনি আসছি।"

বারান্দায় বালতিতে তোলা জলে মুখ হাত ধুয়ে তোয়ের হ'তে যতটুকু সময় লাগল, তার মধ্যেই রটাই ঠোঙায় ক'রে পাশের দোকান থেকে খাবার নিয়ে এল; লুচি, আলুর তরকারি, জিলিপি—সবই গরম গরম।

বারান্দায় পায়চারি করতে করতে স্টোভ পাম্প করার সঙ্গে সোঁ সোঁ শব্দ উঠল।

একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে—দ্বারভাঙ্গার হরিমোহনবাবুর সেই পরিবারের এই অবস্থা!...

বারান্দায় একটা নড়বড়ে টেবিল আর একটা চেয়ার পাতা ছিল;

রটাই ছ'টো প্লেটে খাবার এনে রেখে আর একটা চেয়ার বের ক'রে ডাকল—"আয় বিভূতি, বসে যা।...কি ব্যাপার বলতো ?"

আমার সেই "একলা রয়েছ ?"—প্রশ্নটা আরও ব্যাপক হ'য়ে উঠে আমার নিজের চিন্তাকে একরকম চেপেই দিয়েছিল, প্রায় বেরিয়েই গিয়েছিল মুখ দিয়ে—"চাকর দেখছিনে কোন ?"—এমন সময় একটা বুড়ি ভেজানো দরজা ঠেলে এসে কোণ্ থেকে একটা ঝাঁটা তুলে নিয়ে ঝাঁট-পাট শুরু ক'রে দিল।

খাওয়ার মধ্যে, তার সঙ্গে ওর চা তৈরী করার মধ্যে আমার কাহিনীটা মোটামুটি ব'লে গেলাম। রটাই কোনরকম মন্তব্য না ক'রে শুনে গেল। চা হ'য়ে গেলে একটা কাপ আমার সামনে রেখে দিল, নিজেরটা একটা কাঁচের গ্লাসে ঢেলে, চেয়ারে ব'সে চুমুক দিয়ে বলল—"চাকরি যদি করতে চাস তো হ'য়ে যেতে পারে, স্কুল মাষ্টারিই অবশ্য।"

"কোথায় ?"—একটু আগ্রহের সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম।

"এইখানেই। 'মুখার্জি সেমিনারি'র নাম শুনেছিস তো ?...তবে..."

"মুখার্জি সেমিনারি !"—বেশ উৎসাহের সঙ্গেই ব'লে, তখনই একটু স্খলিত কণ্ঠে বললাম—"কিন্তু, 'তবে' ব'লে থেমে গেলে কেন ?"

রটাই একটু চোখ তুলে ভেবে নিয়ে বলল—"সে কথা থাক্, তোর এখন একটা ফুট্‌হোল্ড (Foot hold) পাওয়া দরকার, তারপর দেখা যাবে।"

চিন্তিতভাবে চায়ে চুমুক দিতে দেখে বলল—"অত ভাবছিস কি ? চল্, তোকে নিয়ে যাই। কালই জয়েন ক'রে নে। তারপর ধীরে সুস্থে ভাবিস।"

সন্ধ্যার পর আমায় হেডমাষ্টারের বাড়ি নিয়ে গেল। মনে হোল, জন তিনেক শিক্ষকের সঙ্গে স্কুল সম্বন্ধেই আলোচনা করছিলেন, আলগা ভাবেই, রটাই গেলে—"আসুন, আসুন" ব'লে যেমন একটু আগ্রহের সঙ্গে ডেকে নিলেন, বোঝা গেল, ভালো রকমই পরিচয় আছে। ছ'খানা খালি চেয়ার দেখিয়ে ছ'জনকে বসতে বললেন।

রটাই দাঁড়িয়ে থেকেই বলল—"আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।"

একটা লম্বা আরাম কেদারায় আধ-শোওয়া অবস্থায় গল্পস্বল্প করছিলেন, একটু গা তোলবার চেষ্টা ক'রে রহস্যচ্ছলেই হাসতে হাসতে বললেন—"আবার তুলবেন কুড়ে মানুষকে ?"

কথার ভাবে মনে হোল যেন সাক্ষাৎকারের অত্যাচারটা কিছু বেশি হ'য়ে পড়েছে। ভদ্রলোকদের একজন বললেন—"না হয় আমরাই একটু বাইরে যাই ?"

রটাই ব'সে পড়ল; আমাকেও বসতে ব'লে বলল—"আপনি থাকুনই ব'সে। সে-ধরণের কিছু কথা নয়।···শুনলাম, একজন গ্র্যাজুয়েট টীচারের জায়গা খালি আছে।...আমার বন্ধু···কিছু একস্-পিরিয়েন্সও আছে এ লাইনে।"

"মহীতোষ বাবু?"··· প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাইলেন ছ'জনের মধ্যে যিনি একটু বয়সে বড় তাঁর দিকে।

উনি বললেন—"আর একটা সেকশন যেন খুলতেই হবে টেন্থ ক্লাসে।...আপনার সাবজেক্ট?"—প্রশ্নটা আমায়।

বললাম। উনি হেডমাষ্টারের দিকে চেয়ে বললেন—"চলবে।"

হেডমাষ্টার রটাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন—"তা'হ'লে আসুন উনি কাল থেকে।···দিতে, কিন্তু আমরা উপস্থিত বেশি পারছিনা।"

"তার জন্যে আট্‌কাবেনা। থ্যাংক্‌স্।"—রটাই বলল।

নমস্কার করে আমরা দুজনে চলে এলাম।

আমার মজঃফরপুরবাসের ছ'টি পর্বের মধ্যে প্রথমটি শুরু হোল। ছ'টিই স্মৃতি-সমৃদ্ধ, তবে এটিতে ঝঞ্ঝা-বৃষ্টির শেষে মুক্ত-আকাশের যে একটা প্রসন্নতা ছিল, একটা ফ্রেশনেস্ (Freshness), তাতে স্মৃতিটুকু আরও উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে।

একটা নূতন জীবনের সঙ্গে পরিচয় হোল আমার, যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিনবত্ব। প্রথম যৌবনে মন যখন অঞ্জলি ভ'রে পাওয়ার জন্যে, অঞ্জলি খালি ক'রে দেওয়ার জন্য উন্মুখ, তখন দেওয়া-পাওয়ার সব সম্ভার—কল্যাণসম্ভার যেন এক সঙ্গে এসে পড়ল আমার সামনে। সে-এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা জীবনে!

কোথাও এই কাহিনীতেই ব'লে থাকব, শিক্ষকতাই যে আমার জীবনের মূলাধার, জীবনের বহুক্ষেত্রে বিচরণ ক'রে এই বিশ্বাসটাই দৃঢ় হয়েছে আমার। মাড়োয়ারী স্কুলের সব দৈন্য, ছাত্রসংখ্যা থেকে শুরু ক'রে—সব যেন এখানে কাজে নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গেল ঘুচে।

প্রথমে আমার কর্মক্ষেত্রেই ধরা যাক।

সে সময়ে বিহারের প্রায় সব বড় বড় সহরেই একটি ছ'টি ক'রে বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত ও বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত হাই স্কুল রয়েছে। পাটনায় টি· কে· ঘোষ, রামমোহন রায় সেমিনারি; ভাগলপুরে দুর্গাচরণ, ছাপরায় বলদেব একাডেমি, মজঃফরপুরে মুখার্জি সেমিনারি ইত্যাদি। আজও নামে থাকলেও তাদের অনেকগুলিই হতগৌরব। সে-সময় সবগুলিই প্রথমশ্রেণীর স্কুল বিহারে, তায় দুর্গাচরণ, রামমোহন রায়, আর মুখার্জি সেমিনারি—এ তিনটি একেবারে প্রথম শ্রেণীর।

উত্তর বিহারে গবর্ণমেণ্ট প্রাইভেট মিলিয়ে সেমিনারির জোড়া ছিলনাই বলা চলে। এর ওপর, আমি যখন গেলাম তখন আবার সেমিনারীর বোলবোলাও একেবারে চরমে—ছয়শত ছাত্র, যা তখনকার দিনে কল্পনাতেই আনা অসম্ভব ছিল যে-কোনও স্কুলের পক্ষে। এগারোজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক, তার মধ্যে যতদূর মনে পড়ছে, অন্তত পাঁচ জন এম.এ.। আজকাল দ্রুত এবং ব্যাপক শিক্ষার যুগে যখন অস্বাভাবিক সংখ্যাস্ফীতির জন্য একই বিদ্যাগৃহে সকাল-দুপুর স্কুল না বসালে চলছেনা, শিক্ষকের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বহুগুণিত—সে সময় মুখার্জি সেমিনারির ছাত্রে-শিক্ষকে অনন্যতা বিশ্বাস করা শক্তই হবে। আর একটা কথা ছিল—যেখানে আজ আর সেদিনের মধ্যে মস্ত একটা প্রভেদ থেকে যাচ্ছে। তখনও বাঙ্গালী ছেলেরাই পড়াশোনা, খেলাধুলা প্রভৃতি স্কুলজীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রণী, নামের টানে ভালো ভালো বিহারী ছেলেরাও মুখার্জি সেমিনারি-তে এসে নাম লেখাত। ফলে পড়ার দিকে স্কলারসিপ-স্টাইপেণ্ড, খেলার দিকে শীল্ড-কাপে মুখার্জি সেমিনারির জায়গা বাঁধা ছিল।

এর ওপর একটা নূতন পরীক্ষা চলছে স্কুলে। করছেন স্বয়ং হেড-মাষ্টারই নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজের নামী ছাত্র; ট্রিপল্ অর্থাৎ তিনটি বিষয়ে এম.এ.। এর অধিক তখন তাঁর আর একটি সুবিধা আছে যা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁকে অবাধ মুক্তি দিয়েছে। তিনি মঝঃফরপুরের তৎকালে অবসরভোগী অগ্রণী, যশস্বী এড্ভোকেট, অপিচ স্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট—যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা।

নলিনীবাবুরা পরীক্ষা করছিলেন, স্কুলটি কতটা মিশনারী স্পিরিট বা সেবার মনোভাব নিয়ে চালানো যায়। আমায় যে বললেন, উপস্থিত বেশি দিতে পারছেন না, তার ভেতরকার কথা এই। বললাম না ?—আমারও অঞ্জলি ভ'রে দেওয়ার বয়স তখন, নব উদ্যমে কাজ শুরু ক'রে দিলাম। মাইনে মাত্র চল্লিশটি টাকা। কাজের আনন্দ যেন ঘাটতিটার পূর্ণ ক'রেও বাইরে উপচে পড়ল। টের পেলাম, আর সবাইও এই মিশনারী স্পিরিট নিয়ে এসেছেন। এম.এ.'র বোধহয় কিছু বেশি ছিল। যতদূর জানি, নলিনীবাবু নিজে কিছু নিতেন না বা, নিতান্ত অবেতন-ভোগী থাকা নিয়মবিরুদ্ধ ব'লে, যেটা নিতেন সেটা কোনও এক আকারে আবার ফিরিয়ে দিতেন—পুওর-বয়েজ ফাণ্ড্, বা, ঐরকম কিছুর নামে।

সৌম্যকান্তি মানুষ, অমায়িক প্রকৃতি, মুখে একটা হাসি লেগেই

আছে। এদিকে শিক্ষকদের বেশিরভাগ এই সহরেরই বাসিন্দা, এমনকি এই স্কুলেরই ছাত্রও—ফলে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত একটা সমব্রতী সখ্যের ভাব—একটা ক্যামারাডেয়ারী (Camaraderie) উপস্থিত থেকে বিদ্যায়তনের পরিমণ্ডলটা নির্মল এবং মধুর ক'রে রেখেছিল। হেডমাষ্টার, সহকারী হেডমাষ্টার আর জন তিনেক পুরানো ষ্টাফের ছাড়া আর সবাইয়ের বয়সের একটা কমবেশ সমতা ছিল। আদর্শ-নিষ্ঠার বয়স, তাইতেও একটা সাধারণ যোগসূত্র এনে দিয়েছিল। এই থেকেই জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে এক, অভিন্ন, সেখানে সম্বন্ধটা আরও নিবিড়তর হ'য়ে গিয়ে আর একটা জিনিস মাঝখানে এসে পড়ে, চিত্তের অভিন্নতা। এজিনিসটা আবার অসপত্ন, একজনের সঙ্গেই হয়। আমার নানাভাবেই তুষ্ট কোষ্ঠীর একটা গুণ আছে—জীবনের প্রতি স্তরেই একজনকে পেয়ে গেছি। বাল্যে দ্বারভাঙ্গায় ছিল অনিল। যৌবনারম্ভে শিবপুরে ছিল ব্রজেশ, পরে পাটনায় ললিত। মজঃফরপুরে এল প্রকাশ। প্রকাশ চক্রবর্ত্তী। মজঃফরপুরের ছেলে। সেমিনারী থেকে বৃত্তি নিয়ে পাস করা, পরে এম.এ.। চরিত্রবান, সরসমন। সরস-বুদ্ধি-দীপ্ত কথাবার্তা, যার জন্যে ওর সঙ্গে আলাপে কোনও রকম আড়ষ্টতা জমা হ'তে পারত না মনে। যাদের জন্য আমার বৈরাগীমন একেবারে শুকিয়ে যেতে পারেনি, এ চারজনের স্থান তাদের মধ্যে খুব ঊর্ধ্বেই।

আর একটা বিষয় আমাদের দু'জনের অন্তরঙ্গতা নিবিড় হ'তে সাহায্য করেছিল কিনা ভাবি মনে মনে। সেটা নিতান্তই আকস্মিক বা হেতু-বহির্ভূত, তবে খানিকটা কৌতুক জাগায়ই মনে।

প্রকাশরা ছিল আট ভাই, দুই বোন; ঠিক আমাদেরই মতো। ওদের বাবা মতিবাবু হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ছিলেন। বিচক্ষণই, তবে এই বৃহৎ সংসার পুষে ছেলেদের মানুষ ক'রে তুলতে আমাদের বাবার মতোই বেগ পেতে হয়েছিল।

মজঃফরপুরে আমি প্রকাশদের বাড়ির ভেতর পর্যন্ত একটা স্নেহ-প্রীতির স্থান পেয়ে গিয়েছিলাম, যার জন্যে যতদিন সেখানে ছিলাম, দ্বারভাঙ্গার বিরহটা তেমন ক'রে গায়ে লাগতে পায়নি। অনিল, ব্রজেশ, প্রকাশ—কাল তিনজনকেই অপসারিত ক'রে দিয়েছে আমার জীবন থেকে, ললিতের কথা জানিনা। কিন্তু আমার জীবন থেকে এদের স্মৃতি অবলুপ্ত ক'রে দেবে বা বিবর্ণ, ধূসর ক'রে দেবে কালেরও সে-শক্তি কোথায়? হারিয়ে যাওয়ার বেদনায় ওরা সন্ধ্যার অস্তরাগের মতোই সমুজ্জ্বল হ'য়ে আছে।

জীবনে, চলার পথে এক একবার অকস্মাৎ এক একটা নূতন তোরণ

খুলে গিয়ে যেন বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত ক'রে দেয়। একবার চাতরায় প্রথম পর্যায়ে, একবার দ্বারভাঙ্গায়, একবার শিবপুরে হয়েছিল ; আবার হোল মজঃফরপুরে। এতে আর কিছু না হোক, একটা লাভ থেকেই যায়—সুখদুঃখের মধ্যেও জীবনের দাক্ষিণ্যে নূতন ক'রে বিশ্বাস আসে, এগিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগায় পায়ে।

মজঃফরপুরে বাঙ্গালী সমাজটা ছিল পরিপূর্ণ। এই "পরিপূর্ণ" কথাটার একটু টীকা দরকার, সেটা দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে তুলনায় আরও স্পষ্ট হবে। দ্বারভাঙ্গা সহরটা দ্বিধা-বিভক্ত। রাজ-টাউন নিজ্ দ্বারভাঙ্গা, আর কোর্ট-টাউন লাহেরিয়াসরাই। তখনও বাঙ্গালীদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি রয়েছে বিহারে। বার, অর্থাৎ উকিলমহলে পুরোধা একরকম সবাই বাঙ্গালী। এ ছাড়া বড় বড় অফিসার—সাব্‌জজ, সদরালা, মুন্‌সেফ, ডেপুটি, কিছু কিছু জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট—এদিকে বড় বড় কর্মচারী—অনেকেই থাকতেন বাঙ্গালী। বড় বড় ডাক্তাররাও ওদিকেই। এদিকে দ্বারভাঙ্গায় রাজে ওপরের কয়েকজন ছাড়া সবাই বাঙ্গালী কেরাণী—বিভিন্নস্তরের। ফলে দ্বারভাঙ্গার সমাজে বাঙ্গালীর জীবনের যেটা Intellectual side বা বুদ্ধিবৃত্তির অংশ, তার অনেকখানিই বাদ প'ড়ে গিয়েছিল। এর ফলে, চিত্তেরও, তাই থেকে স্বভাবতই শিক্ষা-সংস্কৃতিরও।

মজঃফরপুরে এক সহরেই সব, ঐতিহ্যও বড় পুরাতন। সমস্ত বাঙ্গালী সমাজটি ছিল সুসংবদ্ধ আত্মসম্পূর্ণ। আমার এই সমাজে খানিকটা ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ হোল। পরিচয় হোল খানিকটা। এতে সেমিনারির কাজ ছাড়া রটাইয়ের পরিচয় আমায় অনেকখানি সাহায্য করল।

যন্ত্রসংগীতে রটাইয়ের দক্ষতার কথা আমি পূর্বে বলেছি। সেই অপরিসর, অপরিচ্ছন্ন বাসায় নিভৃতে রটাই একটা যেন তপস্যায় নিরত ছিল বললে অত্যুক্তি হয়না। ও আর সব যন্ত্র ছেড়ে একটি নিয়ে পড়েছিল তখন, সুরবাহার। সেতার-অঙ্গের যন্ত্র। এই যন্ত্র নিয়ে অনেক জায়গায় তার যাতায়াত ছিল। বাঙ্গালীদের সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানগুলিতে তো বটেই, তাছাড়া পারিবারিক উৎসবাদিতেও তার ডাক পড়ত। শিক্ষিত, অ-পেশাদার ব'লে একটা বিশেষ খাতির ছিল। এদিকে রটাই ছিল খুবই সুপুরুষ—সাজগোজে সুরুচিসম্পন্ন। সে-দিক দিয়েও সবরকম আসরেই সে শুধু মানানসই-ই ছিল এমন নয়, অধিকন্তু আসরের মধ্যে একটা শ্রী ফুটে উঠত সে থাকলে।

ওর বাদ্য শোনবার জন্য ভালো ভালো লোক উপস্থিতও হতেন। জায়গাটা ছিল আমাদের বাসার কাছেই শৈলেনবাবুর সু-সজ্জিত

ফটোগ্রাফিক স্টুডিও। এখানে যাঁদের দেখতাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত খোসলা। পাঞ্জাবী, ইতিহাসে সে-সময় একজন অথরিটি ব'লে গণ্য।

এদিকে অন্য কোনও কাজ না থাকলে আমি রটাইয়ের সঙ্গে প্রায়ই যেতাম। মজঃফরপুর বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে পরিচয়ের একটা লোভ ছিল, সুযোগ পেলে ছাড়তাম না।

আমার মধ্যেও যা অল্প কিছু পরিচয় দেওয়ার মতো ছিল, স্বীকৃতি পেয়ে সেদিক দিয়েও খানিকটা সুবিধা হোল।

এখানকার বাঙ্গালীর দু'টি প্রতিষ্ঠান—থিয়েটার আর বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান নিয়ে "বীণা কনসার্ট," আর লাইব্রেরী এবং স্পোর্টস্ নিয়ে বিরাট ফুটবল গ্রাউণ্ডের সঙ্গে "ওরিয়েণ্টল ক্লাবের" মেম্বার হওয়ার জন্যে আহূত হ'য়ে যোগদান করলাম। দু' একটি ক'রে লেখাও এই সময় প্রবাসী, মানসী-মর্মবাণীতে বোধহয় বেরিয়ে থাকবে। অল্পকথায় ব'লতে পারি, ছাত্রাবস্থায় আমার জীবনের যে-দিকটা শিবপুরে শুরু হ'য়ে পাটনায় খানিকটা পুষ্ট হয়েছিল, মাঝে নানাদিকে ব্যর্থতার মধ্যে শুষ্কপ্রায়ই হ'য়ে এসেছিল, অনুকূল বাতাস পেয়ে আবার সজীব হ'য়ে উঠল।

মানুষের জীবনে নিজেকে আবিষ্কার করার মতো, ধীরে ধীরে নিজেকে উদ্ঘাটিত হ'তে দেখার মতো আনন্দ নেই। মজঃফরপুর আমায় অকাতরেই এ-আনন্দ দিয়ে যেতে লাগল।

দিনগুলা হালকা পাখায় উড়ে চলল—

এবার বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ। সেখানে একটু কিছু যে এসেই পড়েছিল সেটাকে কি ব'লে স্পষ্ট করব ঠিক বুঝতে পারছিনা।— অমনভাবে কাউকে কিছু না ব'লে হঠাৎ চ'লে আসা, অভাবের সংসারে একটা আয়ের পথ বন্ধ ক'রে, তারপর দীর্ঘকাল কোন চিঠিপত্র না লিখে সবাইকে সংশয়, উদ্বেগে ফেলে রাখা, এর ওপর একটা ব্যাপারে একটা স্থায়ী অসন্তোষই থেকে গেছে, অ-দার পরিগ্রহ। যাব কিনা ফিরে, গেলে কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াব—যতদিন যেতে লাগল, এই চিন্তাটা মাঝে মাঝে গভীর ছায়াপাত করতে লাগল মনে। মজঃফরপুর-দ্বারভাঙ্গার দূরত্বও বেশী নয়। খবর কি পাচ্ছেন? পেয়ে থাকলে, কেউ এসে পড়লে—হয়তো দাদাই—সেও এক বড় লজ্জার কথা। ...গেলে, আবার সেই বিবাহের কথা। ...আমার আপত্তির যুক্তিগুলোও কমে আসছে বৈকি।...কিন্তু জীবন কত কঠিন, তাও তো দেখতে পাচ্ছি।

মাস দুই ইতস্তত ক'রে একদিন গেলাম। মার অশ্রুর মধ্যে ক্ষমাই ছিল। দাদার প্রসন্ন স্মিত হাস্যের মধ্যে কোথাও একটু ভর্ৎসনাও প্রচ্ছন্ন ছিল কিনা বোঝা গেলনা।...সব মিলিয়ে মনে হোল—এ ছেলে, এ-ভাই এইরকমই হবে এটা মনকে মানিয়ে নিয়ে খানিকটা—কি বলা যায়?—নিশ্চিন্তই আছেন।

বাকি রইল বাবার সম্মুখীন হওয়া। একটা সমস্যাই।

আরও এই জন্য যে, বাবা তখনও মহম্মদপুরে তাঁর নিঃসঙ্গ একক জীবন অতিবাহিত করছেন। বাড়িতে থাকলে বড় সংসারের ভিড়ের মধ্যে, মা-দাদার ক্ষমা-প্রশ্রয়ের মধ্যে, ওঁর উষ্মা বা অভিমান যাই থাক, অনেকটা নরম হ'য়ে আসতে পারত; একক সাক্ষাতে সে-সম্ভাবনাটুকু দূরেই থেকে গেল। অপরাধটা আরও গুরুতরই হ'য়ে গেছে। এইজন্য যে, বাবা রয়েছেন আরও অনেক কাছে। মহম্মদপুর মজঃফরপুর থেকে মাত্র এগারো মাইলের ব্যবধানে, পরিষ্কার ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের রাস্তা,—যে ক্ষেত্রে দ্বারভাঙ্গা রেলপথে বাহান্ন-তিপান্ন মাইল।

দ্বারভাঙ্গা থেকে ফিরে এসে ক'টা দিন প্রবল অস্বস্তির মধ্যে কাটল। বাবা নিশ্চয় জানতে পেরেছেন দ্বারভাঙ্গায় গিয়েছিলাম; এর পর যতই বিলম্ব হবে, অপরাধের বোঝা তো বেড়েই যাবে।

সামনেই কি একটা ছুটি ছিল, আর অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে বেরিয়ে পড়লাম একটা সাইকেল জোগাড় ক'রে। একটি ঘণ্টার কিছু এদিক লাগল। সকাল আন্দাজ আটটা হবে। নীলকুঠির ছুটি-ছাটার বালাই ছিলনা। বাবা চা-জলযোগ সেরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, আমি সাইকেল বাইরে রেখে ভেতরে প্রবেশ করতে একটু থমকে গেলেন। মুহূর্তখানেক, তার পরেই বললেন—"কে, বিভূতি?"

গিয়ে প্রণাম ক'রে উঠতে আশীর্বাদ করলেন। মাথায় হাতের তেলোটা চেপে আশীর্বাদ করার একটা আলাদা ভঙ্গিই ছিল ওঁর, মুখে স্পষ্ট কিছু না ব'লে। পরিচিত স্নেহ-স্পর্শটুকু পেয়ে বুঝলাম—সব আগের মতোই ঠিক আছে।

বাবা বেশ ভাবপ্রবণই ছিলেন, তবে তার উচ্ছ্বাস কখনও বাইরে প্রকাশ পেতে দেখেছি ব'লে মনে পড়েনা। মুখটা রাঙা হ'য়ে উঠত, চোখ দুটো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত, আর গতিবিধি একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠত। যেন কি বলবেন, কি করবেন ঠিক করতে না পারার জন্যে যেন হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, এইভাবে বললেন—"তা, তুমি এলে কি ক'রে?... এতটা পথ।"

বললাম—"সাইকেলে এসেছি।"

"তা'হ'লে তো বেশ মেহনত হয়েছে।"

—একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন এতক্ষণে। চাকরটাকে হাঁক দিয়ে কি বলতে গিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—"তুই আগে কুঠিতে গিয়ে লালবাবুকে ব'লে আয় আমি এ বেলা আর আসছিনা।··· বিভূতি এসেছে।"

ভেতরের উল্লাসটুকু শেষের এই তু'টি কথায় যা প্রকাশ পেল। এরপর অবশ্য প্রকাশ পেয়েই যেতে লাগল একথা-সেকথার মধ্যে, চাপা দেওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও। গল্প-প্রসঙ্গে আমার প্রতি অবিচারের জন্যই মাড়োয়ারী স্কুলের কাজটা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলায় হঠাৎ একটু গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। হুঁকা হাতে গল্প করছিলেন, একটু বন্ধ ক'রে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—"এই যে কুঠিয়াল সায়েবগুলা, বেশির ভাগই অগামারা, মুখ্যু—কাজ বোঝেনা, কদরও জানেনা কাজের—যার জন্যে পাণ্ডুলের অমন কাণ্ডটা হ'য়েও গেল।...আমাদের সহ্য করতে হয়েছে অবস্থার ফেরে, তোমরা সহ্য করবে কেন? শশী বললে—নাকি এমন কড়া চিঠি দিয়েছিলে, আর বিবেচনা ক'রে দেখার রাস্তা রাখনি। খুসীই হয়েছিলাম শুনে।"

অন্যায় নিজেদের সহ্য ক'রে যেতে হয়েছিল অনেক কিছু, ছেলে আদৌ সহ্য করেনি, এটা নিজেরই প্রতিবাদ এক হিসাবে, মুখটা দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ায় পর আমাদের আগেকার মতো গল্প হচ্ছিল। একটা কথা সমস্ত দিন আমার মনে খচখচ করছিল। একটা দোষ তো স্খালন ক'রে নেওয়া হ'য়ে গেল। বেশ ভালভাবেই হোলও। একটা, একহিসাবে গুরুতরটাই বাকি থেকে গেছে—কাউকে কিছু না ব'লে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাওয়া, তারপর এতদিন ধ'রে এই তীব্র উৎকণ্ঠায় ফেলে রাখা। ওঁর দিক থেকে কথাটা উঠলেই ভালো হোত, কিন্তু বাবা ঘণাক্ষরেও তুলছেন না। এদিকে রাত্রিটুকুই হাতে, সকালে জলটল খেয়েই আমায় বেরিয়ে যেতে হবে।

এক সময় একটু ফাঁক পেয়ে আরম্ভ ক'রে দিলাম—"কড়া চিঠিটা দিয়েই সেই রাত্রে বেরিয়ে পড়লাম, কাউকে কিছু না ব'লে, ভাবলাম..."

বাবা কৌতুকপ্রিয়ও ছিলেন। আমার এখনও সন্দেহ হয়, আমি নিজে হ'তে কথাটা তুলি কি না-তুলি, বা কি ভাবে তুলি, দেখবার জন্যে ইচ্ছে ক'রেই ও-দিকটা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন, একেবারে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, বললেন—"তা তুমি ওটুকুর জন্যে এত 'কিন্তু'

হ'চ্ছে কেন? ও তোমার রক্তের মধ্যে রয়েছে, তুমি কি করবে? বাবা ষোলো-সতেরো বছর বয়েসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, চাতরা থেকে পাণ্ডুল। সে যুগে! মন্দটাই বা কি হয়েছিল? তোমারও তো ভালোই হোল। মুখার্জি সেমিনারির খুব নামও আছে। একটা ভালো জায়গাও মজঃফরপুর...”

বরফ একবার গ'লে যাওয়ার পর আসতে-যেতে আর আটকাল না। ঐটুকু খুঁৎ ছিল মনে, স'রে যেতে মজঃফরপুরের জীবন যেন আরও রমণীয় হ'য়ে উঠল আমার কাছে, স্বপ্নময়ই বললে ভুল হয়না।

দিন এগিয়ে চলল। মাস আষ্টেক কেটে গেল মজঃফরপুরে।

এরপর এই মুক্ত, স্বপ্নময় জীবনে একটি স্বপ্ন যে ভেতরে ভেতরে কি অপরূপ হ'য়ে রূপে-রেখায় পূর্ণ হ'য়ে এসেছে, একদিন হঠাৎ স্পষ্টভাবে আবিষ্কার ক'রে বিস্মিত হ'য়ে উঠলাম।

কথাটা হচ্ছে আমাদের সংকল্প কত শিথিল, আর, তার ওপর নির্ভর ক'রে আমাদের দম্ভ কত দুর্বল হ'তে পারে, তা বুঝতে পারিনা ব'লে অনেক সময় আমরা একটা মিথ্যা আত্মাভিমান নিয়ে কাটিয়ে যাই। মজঃফরপুরের চারিদিকে সুখ-সাফল্যের মধ্যে যৌবন যে তার দাবী নিয়ে এগিয়ে আসছে, এটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হ'য়ে আসছিল। একটা 'নিমিত্ত' কিছু হয়ই, তার সূত্রপাত আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছিল এর মধ্যে।

আমাদের পাড়ায় সে-সময় একটি বাঙ্গালী পরিবার বাস করতেন। অবস্থা বেশ ভালো নয়; একটি ছেলে স্কুলে পড়ে, বোধহয় গুটিতিনেক কন্যা। বড়টি সে কালের হিসাবে 'বয়োত্তীর্ণা-ই', বিবাহ হয়নি। এদিকে খুবই নাকি সুন্দরী। এই ধরণের মেয়ে নিয়ে একটু বেশি আলোচনা হয়ই। আমাদের শিক্ষকদের মধ্যেও হোত; বেশিরভাগই আমার মতো কম-বেশ ক'রে নূতন-পাস করা যুবক, আর মজঃফরপুরের বাসিন্দা। দেয়াল দিয়ে ঘেরা স্কুল-সংলগ্ন মাঠের এক প্রান্তে টিফিন্ পিরিয়ডেই বেশির ভাগ আড্ডাটা বসত একটা কি গাছের ছায়ায়। যাদের এর পরেও ক্লাস থাকত না, তারা ব'সেই থাকত। আলোচনা ভালোমন্দ নানা রকমেরই এসে পড়ত। সমকালীন গরম গরম পলিটিক্স্, সহরের টাটকা খোস-খবর, স্কুলের পরিচালনা—যখন যা এসে পড়ল। লঘু চপলতাও বেশ ভালোরকম, মুখরোচক ব্যক্তিগত আলোচনা নিয়ে। স্কুলেরই উচ্চতন কয়েকজন প্রাচীন শিক্ষকের অতি-গাম্ভীর্য বা কোনও রকম মুদ্রাদোষ। সংক্ষিপ্ত চল্লিশ মিনিটের সময়টুকু একটু সরস ক'রে তোলা। যার ধূমপানের অভ্যাস তারও ছিল এই সময়।

সরসতা এক একদিন একটু মাত্রা ছাড়িয়ে দাম্পত্য কাহিনীও পড়ত

ঢুকে হাস্য পরিহাসের মধ্যে দিয়ে, যাদের বিবাহ হ'য়ে গেছে তাদের নিয়ে, বেশিরভাগই এক সহরেরই পরিচিত বন্ধুবান্ধব তো। অবিবাহিত যে দু'একজন ছিলাম, তাদের ওপর একএকটা ঝাপটা এসে পড়ত—"বিভূতিবাবু, কি রসেই যে বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন নিজেকে! প্রকাশ, দেখো, এটাও না ফসকে যায়!"

এরই মধ্যে এক একদিন একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে ভদ্রলোকের মেয়েটির কথা এসে পড়ল। কলেজের নীচের দিকের ছাত্রী, মুক্ত গতিবিধি আছে খানিকটা, আলোচনার বিষয়ের অভাব হোতনা সত্য-কল্পনা মিলিয়ে। ভালো লাগত না। কিন্তু নীতিবিশারদের ভাব নিয়ে সবার মধ্যে থেকে উঠে যেতেও পারতাম না। আমার সেই আড়ষ্ট শাইনেসের (Shyness) ভাবটা তখনও যায়নি, মুখে একটু অপ্রতিভ ভাব নিয়ে টিফিন পিরিয়ডটা কেটে যাওয়ার অপেক্ষায় ব'সে থাকতাম।

এইরকম অবস্থা প্রায় প্রকাশেরও হোত। তবে সে এই সহরের ছেলে, বেশ স্মার্টও, পাল্টা জবাব দিয়ে দিতে পারত। কে একদিন বলল—"প্রকাশ, হাতের কাছে ছেড়ে কোথায় বনে বনে ঘুরছ?"

প্রকাশ হেসে উত্তর করল—"যা কুনজর দেখছি চারিদিকে, হাতের কাছের লোভে শেষকালে তাকে নিয়ে বনবাসী হব?"

লঘু-গুরু সমন্বয়ে প্রকাশের মতো চরিত্র আমি আর দেখেছি কিনা মনে পড়েনা। একদিন আমায় ধরল।

গণ্ডকী নদীর ধারে পোলো-মাঠের প্রান্তে ব'সে আছি আমরা দু'জনে। সন্ধ্যা হবে, আকাশের খণ্ড খণ্ড মেঘে সূর্যের অস্তরাগ। আগেই বলেছি, এই সব ব্যাপারে আমাদের দু'জনের মনের বেশ একটা মিল ছিল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সেই আছি দু'জনে। একসময় প্রকাশ বলল—"কদিন থেকেই আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছি···যদি শোনেন।"

বললাম—"বলুন।"

"আপনি...বাবুর মেয়েটিকে নিন।"

একেবারে আচমকা, যদিও তখনই বুঝতে পারলাম প্রকাশ আমায় ইচ্ছে ক'রেই আজ এতদূরে নিয়ে এসে এইখানে বসিয়েছে। একটু চুপ ক'রেই রইলাম।

প্রকাশ বলল—"বলবেন, আমার নিজের কি হোল? আমারও তো কোনও বাধা নেই।"

আমি চেয়ে একটু হাসলাম—অর্থাৎ প্রশ্নটা তাই।

একটু হেসে বললেন—"আছে বাধা আমার। বাকদত্তা মেয়েই হয়, আমি আবার বাক্‌দত্ত পুরুষ। বাক্যের আদান-প্রদান আমার মা আর

ভাবী শাশুড়ীর মধ্যে। জানাশোনা ঘর, যাওয়া-আসা আছে, ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ হ'য়ে যায়নি, বুঝতেই পারেন।"

আবার একটু হাসলেন। আমিও হাসলাম।

প্রশ্ন করলাম—"তা, এতদিন শুনিনি তো ?"

বললেন—"কি জানি কেন বলা হয়নি। ...হয়তো ব্যাপারটা প্রায় হ'য়ে যাওয়া ব'লে পুরনো মনে হয়েছে।"

—বেশ ভালোভাবেই হেসে উঠলেন। উত্তরটায় কি ছিল, আমিও উঠলাম হেসে।

সূর্যের দীপ্তি স্তিমিত হ'য়ে এসে, আকাশ আরও বর্ণাঢ্য হ'য়ে এসেছে। সেই দিকেই চেয়ে বসেছিলাম। উনি প্রশ্ন করলেন—"কৈ কিছু বলছেন না ?"

বললাম—"ছু'টো দিন সময় দেবেন না ভাবতে ?"

বললেন—"তা দোব, তবে অ-সম্মতির কোন প্রশ্ন থাকবেনা।"

মুখ-চাওয়া-চাওয়ি ক'রে হেসে উঠে পড়লাম দু'জনে।

আগেই বলেছি যৌবন তার দাবী নিয়ে ভেতরে ভেতরে নিঃসাড়ে এগিয়ে আসছিলই। নূতন পরিবেশে জীবনকে নূতন ক'রে পাওয়া, তার মধ্যে একটি রূপসী মেয়ের আলোচনা, উপযোগী ব'লেই আমাকে খানিকটা জড়িয়ে—মনের কোণে কোথায় একটু রং ধ'রে আসছিলই নিশ্চয় ; প্রকাশের প্রস্তাবে বেশ খানিকটা স্পষ্ট হ'য়ে এল। ...চিন্তায় একটা মাদকতা এসে সব কাজেই অন্যমনস্ক ক'রে দিতে লাগল। ...বেশ ভালোই ছিলাম ; হঠাৎ একটা নূতন ধরণের অভাববোধ জেগে উঠে একটা মধুর অশান্তিতে যেন ভ'রে দিতে লাগল দিনগুলো। এই অভাবটা পূর্ণ ক'রে নিলেই জীবন যদি পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে তো, এমন একটা সুযোগ হেলায় নষ্ট করি কেন ?

অন্য দিক দিয়েও ভালো ভালো যুক্তি এসে পড়ল। দীর্ঘকালের জন্য বাড়িতে একটা যে বিষণ্ণতার ছায়া ফেলে রেখেছিলাম সেটা গেছে, এই সময় এই ধরণের নিতান্তই একটা অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব এনে ফেলতে পারলে, ছায়া যেমন ছিল ঘন, আলো তেমনি দীপ্ত হ'য়ে ফুটে উঠবে মার মুখে, দাদার মুখে, কার মুখেই বা নয়। সব চেয়ে বেশি ক'রে মনে পড়ে বাবার কথা। অপরাধটা ওঁর কাছেই বেশিদিন ধ'রে আটকে ছিল। ওঁর মুখের দীপ্তি, চাপা উল্লাসে রাঙা হ'য়ে উঠেছে।...

গণ্ডকী-তীরের কথার পর প্রকাশ বেশ কিছুদিনই আমার কাছে ও-প্রসঙ্গটা তুলল না। আমিও কিছু বলছি না, ওর বোধহয় একটা আশঙ্কাই ছিল, আমি অসম্মত হ'লে, ছুই বন্ধুর মধ্যে সম্বন্ধটা কি রকম

দাঁড়াবে। বেশ কিছুদিন যেতে দিয়ে একদিন বলল—"না হয় দেখবেনই একদিন? ...মানে সবার আইডিয়া তো একরকম নয়; যদি না-ই হয় পছন্দ।...দেখবার অনেক সুবিধা হ'তে পারে।"

দেখাটা আমার কাছে বড় কথা ছিল না। বাড়িতে গিয়ে দেখায় একটা দারুণ সংকোচই ছিল। অপরদিকে, যার সঙ্গে চিরজীবনের সম্বন্ধ হ'তে যাচ্ছে, তাকে যেখানে-সেখানে সুযোগ খুঁজে দেখার চৌর্যবৃত্তিতে মন সায় দেয়না। একটু যে নীরব রইলাম, তাতে প্রকাশ আমার মনোভাব কিছুটা হয়তো আন্দাজ ক'রে থাকবে—বলল, "—আমাদের বাড়িতেই হ'তে পারে, একেবারে ইনফরম্যাল (Informal), কেউ-ই জানবে না।"

বললাম—"পুজোর ছুটিটা এসে পড়ল। বাড়ি যাচ্ছি, সবাই থাকবেন। বাবাও আসবেন। একেবারেই ফরম্যাল ক'রে নেওয়া যাবে। ওঁরাই দেখে যান।"

হেসে বললাম—"অনেক ভোগান্তি দিয়েছি, এ সুবিধাটুকু ছাড়ি কেন,...যতটুকু পাপ স্খালন হ'য়ে যায়। আমার নিজের অমত নেই।"

খুসী হ'য়েই উঠলেন। বললেন—"হ্যাঁ, এর চেয়ে ভালো কিছু হ'তে পারে না।"

পূজার ছুটিতে বাড়িতে বলা হয়নি। অতবড় একটা সংকল্পের এরকম হঠাৎ অপমৃত্যুর কথা তুলতেই প্রথমটা সংকোচ বোধ হ'য়ে থাকবে। তারপর হঠাৎ একটা দল পেয়ে বাইরে বেড়াতে চ'লে গেলাম। স্কুল খোলার পরেই প্রকাশ একটা লম্বা ছুটি নিয়ে বাইরে কোথায় চ'লে গেল। কারণটা মনে পড়ছে না। তারপর তার নিজের বিবাহ এসে পড়ল। সময়টাও ক্লাস-পরীক্ষা টেস্ট প্রভৃতি ঝামেলার সময়, ফাঁকে-ফুঁকে এদিকে মন দেবার অবসর রইল না। এরপরই বড়দিন—নিউ-ইয়ারের ছুটি এসে পড়ল।

ছুটির শেষে গিয়ে শুনলাম, নব-নিয়োজিত অনেকের সঙ্গেই আমার চাকরীটাও আর নেই।

এ পরিণাম অনেকটা জানাই ছিল, তবে এত শীঘ্র যে এসে পড়বে এ সন্দেহটা কেউ করতে পারেনি। কেউ, অর্থাৎ একেবারে ভেতরের কথা যে-কয়েকজন জানত তাদের ছাড়া।

মুখার্জি সেমিনারীর হঠাৎ এরকম ফ্লে ওঠা, বছরখানের মধ্যে, এটা ছিল রোগের স্ফীতি। হেড্‌মাষ্টার প্রেসিডেন্সী কলেজের মেধাবী ছাত্র, ট্রিপ্‌ল্ এম.এ., বি.এল.; কিন্তু অতিরিক্ত কল্পনাবিলাসী। এদিকে অত্যন্ত ঢিলেঢালা মানুষ। একটা বড় কিছু গ'ড়ে তোলবার স্বপ্নই

দেখতেন। কিন্তু সে-স্বপ্নকে একটা স্থায়ী, সার্থক রূপ দেওয়ার দৃঢ় বাস্তববোধ ছিলনা। ছেলে এসেছে, নির্বিচারে ভর্তি ক'রে গেছেন, সেক্‌সনের পর সেক্‌সন খুলতে হয়েছে, শিক্ষকের পর শিক্ষক নিয়োগ ক'রে গেছেন। বড় মানুষের ছেলে, এখানে বড় মানুষের জামাই, হিসাবের দিকটা অত্যন্ত আলগাই ছিল। সামনের বছরের গোড়া থেকেই কমিটীকে একেবারে ভোল পালটে দিতে হোল স্কুলের। অবশ্য হেড-মাষ্টারও রইলেন না।

মজঃফরপুরের সঙ্গে আমার দু'বার যোগাযোগ হয়। দ্বিতীয়বারের কথা পরে আসবে। প্রথমবারের মজঃফরপুর ছিল যেন আঁধার-করা বর্ষার পর শরৎ; সংক্ষিপ্ত—কিন্তু আলোয় ঝলমল।

এখনও সে-সব দিনের স্বপ্ন দেখি আমি। তবে তার সঙ্গে একটা প্রশ্ন থাকে যার সদুত্তর আমি এখনও দিতে পারিনি মনকে। থাকলেও যে-রোমান্সটা প্রায় সার্থকই হ'য়ে এসেছিল। স্বরূপতঃ সেটা কি?··· তার পরিপ্রেক্ষিতে শিবপুরের শীলার স্থান তাহ'লে কোথায়? একজন চিরকালের বন্ধন, মায়াজালের নব নব তন্তুতে জড়িয়ে জড়িয়ে। একজন চিরমুক্তি, তার স্মৃতির দীপটি শুধু অম্লান ক'রে জ্বালা রয়েছে আমার মনে।

দু'টিই হয়তো মোহ। কিন্তু মজঃফরপুরের মোহের বোধহয় শেষ ছল, শিবপুরের সে মোহের শেষ নেই।

ঐ কথাই আবার বলতে হয়— "বঞ্চিত হ'য়ে" বেঁচে গেছি আমি।

পূর্বে ব'লে থাকব, আমার কোষ্ঠীর নানাদোষের মধ্যে একটা বড় গুণ ছিল, গোড়াতেই সেই একটা বছরের কঠোর তপস্যা ছাড়া চাকরির জন্য জীবনে আর বিশেষ মাথা ঘামাতে হয়নি আমায়। আপনিই গেছে, বা আপনিই দিয়েছি ছেড়ে, তারপর আপনিই গেছে জুটে। মজঃফরপুর থেকে চ'লে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্কুলে একটা কাজ পেয়ে গেলাম। যেখান থেকে কয়েকবছর আগে পাস ক'রে বেরিয়েছি।

কে যেন আগে থাকতেই জায়গাটা ঠিক ক'রে রেখেছিল। মেজদাদা গোষ্ঠবিহারী ছিলেন সেকেণ্ড মাষ্টার। মহারাজকুমার দুই ভাই—কামেশ্বর সিং আর বিশ্বেশ্বর সিং স্কুলে এসে পড়ছিলেন; মহারাজ তাঁদের সরিয়ে নিয়ে মেজদাদাকে গৃহশিক্ষক ক'রে টেনে নিলেন। থার্ডমাষ্টার উঠে তাঁর জায়গায় গেলেন। সহরেরই ছেলে, পরিচিত, প্রেসিডেণ্ট বাঙ্গালী সেক্রেটারী বাঙ্গালী, হেডমাষ্টার বাঙ্গালী, খালি জায়গায় গিয়ে বসতে বেশি বেগ পেতে হোলনা আমায়।

বাড়িতে ব'সে, বাড়ির ভাত খেয়ে চাকরি। জীবন বেশ সহজ, স্বচ্ছন্দ হ'য়ে এল। কিছু পূর্বে একটা বড় রকমের ট্র্যাজেডি হ'য়ে গেছে আমাদের সংসারে কিন্তু তার সদ্য এবং প্রত্যক্ষ আঘাত আমার লাগেনি। আমি মাড়োয়ারী স্কুল ছেড়ে যখন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ একরকম ছিন্ন, সে সময় কাকাজী মারা যান। বর্তমান সাহারসা জেলার রেল স্টেশন মানসীতে রেলের একটা ইন্‌জিনিয়ারিং অফিস ছিল, সেখানকার একটা সেক্‌শনে তিনি কাজ করতেন, হঠাৎই হৃদ্‌রোগে মারা যান। বাবা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন, একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। তাঁর পক্ষে ট্রাজেডিটা আরও গভীর হয়ে পড়ে, যেহেতু কাকাজীর সংসার ঘাড়ে এসে পড়ায় এই শোক বহন ক'রে তাঁকে পূর্বের মতোই বাইরে বাইরে একক জীবন অতিবাহিত ক'রতে হয়। আমার চাকরি হওয়ায় তিনি কিছুদিনের মধ্যে মহম্মদপুরের কাজ ছেড়ে বাড়িতে এসে বসতে পারলেন।

তাঁর সুকঠোর কর্মজীবনের অবসান হোল।

আমাদের সংসারে এই সময়টা ছিল যাকে ইংরাজিতে বলা যায় বিগিনিং অব্ দ্য এণ্ড (Beginning of the end) অর্থাৎ শেষ পর্যায়ের শুভারম্ভ। বাবা মা যেন দীর্ঘ তপস্যার পর তার ফলশ্রুতির সামনে এসে পড়েছেন। ...ঠাকুরমা তাঁর জপের মালা হাতে নিয়ে তখনও বেঁচে। দুই ছেলের উপার্জনে সেই সস্তার যুগে সংসার একরকম সচ্ছলভাবেই চলছে। এদিকে তাঁদের সংসারে সবদিক দিয়েই যে পরিপূর্ণতা রেখে গিয়েছিলেন তাঁরা, তারও সূত্রপাত হ'য়ে গেছে। ঘরে নব-বধূদের আগমন শুরু হ'য়ে গেছে। শিশু-পৌত্র এসে বংশের ধারা এগিয়ে দিল আর এক পুরুষ। কিছুদিনের মধ্যে একটি কন্যারও বিবাহ হ'য়ে গেল। আমরা দু'ভাই উপার্জ্জন-রত। আমার পরে হরি, প্রায় প্রস্তুত হ'য়ে উঠল। মেধাবী ছাত্র, এম.এস্‌সি. পড়ছে; পাকা ঘুঁটি। বাকি সবাই এগিয়ে আসছে। দৃঢ়, সুনিশ্চিত পদক্ষেপেই। বাবা মা তখনও প্রৌঢ়ত্বের এ-প্রান্তেই—জীবনের অনেকখানিই এখনও সামনে প্রসারিত।

আমার বেশ ভালোই কাটছে। আমাদের হেডমাষ্টার তখন বগলাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃতয় এম.এ.। শ্রীরামপুরে বাড়ি, আমি যোগ দেওয়ার কয়েকমাস আগে এসেছেন। একটি অভিনব চরিত্র। আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ ডিসিপ্লিনেরিয়ন্ (Disciplinarian), আদর্শ পরিচালক (Administrator) —একজন হেডমাষ্টারের যে তিনটি গুণ থাকা দরকার, পুরো মাত্রায় বর্তমান। কিন্তু সেসব স্কুলেই। তার বাইরে তাঁর মতো আড্ডাবাজ আমি কম দেখেছি। উইট, পান, হিউমার, স্যাটায়ার (Wit, Pun,

Humour, Satire)—হাস্যরসের প্রধান কয়টি যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে বাসা বেঁধে থাকত। একটা কিছু উপলক্ষ হ'লেই হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিতেন। নস্যি নিতেন্। ডিবেটায় তর্জনীর টোকা মেরে গম্ভীরভাবে মুখটা নীচু ক'রে একটু মগ্নকণ্ঠে বলবার একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল, যার জন্য বক্তব্য আরও তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠত। দু'টো নমুনা এখানে দিয়ে দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

শ্রীরামপুর। তখন তিনি সেখানে ইউনিয়ন্ হাইস্কুলের শিক্ষক। হেডমাষ্টার নন, সহকারী।

বিকালে একত্র হয়েছেন দলের সবাই। স্বদেশী যুগ, অসহযোগ আন্দোলনের। সেই নিয়েই গল্প চলছে। তখন মহিলা-নেত্রীদের মধ্যে লাবণ্যপ্রভা দেবীর আর কয়েকজন মহিলার নামডাক খুব চলছে, তাঁদের নিয়েই আলোচনা। লাবণ্যপ্রভা ছিলেন গৃহিণী হিসাবেও আদর্শ নারী। অপরজনের হয়তো রাজনীতিগত মতানৈক্যের জন্যই স্বামীস্ত্রীর মধ্যে তখন বনিবনা ছিলনা। বোধহয় ডিভোর্সেরও কানাঘুষো শুরু হ'য়ে গেছে।

আন্দোলনের দিকে ভালোই ছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে তাঁরও নাম এনে ফেলে একজন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন, দলের আর একজন আপত্তি করে উঠলেন—"বাগ্মী, কর্মী যাই হোন, ওঁর ত্যাগ স্বীকার কোথায়, যেটা এই সত্যাগ্রহের যুগে আরও বিশেষ ক'রে দরকার?"

এ-পক্ষে ও-পক্ষে মিলে একটা তুমুল তর্ক উঠতে যাচ্ছে, বগলাবাবু নস্যির ডিবেয় টোকা মেরে মুখ নীচু ক'রে বললেন্—"কেন, ওঁর চেয়ে বড় ত্যাগ আর কার হ'তে পারে?"

চুপ ক'রে ব'সেই ছিলেন এতক্ষণ, তর্কটা কয়েককণ্ঠে ওঁর দিকে ঘুরে গেল—"ওঁর ত্যাগ!···কই দেখান্ তো একটা।···ব'লে দিলেই হোল না তো।...দেখান্ একটা ত্যাগের মতন ত্যাগ!"

"কেন, স্বামী ত্যাগ!"

—বিপক্ষ-স্বপক্ষ মিলে একটা বিরাট উচ্চকিত হাসির মধ্যে বগলাবাবু আড়চোখে, মুখ নীচু ক'রে ডিবেয় টোকা মারতে লাগলেন।

বগলাবাবু হেডমাষ্টার হ'য়ে সবে কিছুদিন এসেছেন। ছাত্রভর্তি করার খাতা আর চিঠিপত্রের খাতা নিজের হাতেই রেখেছিলেন। একটি ছেলে নাম লেখাতে এসে প্রশ্ন করায় নিজের নাম বলল—চুল্হাই ঝা। পাশেই টেবিলে একজন সহকারী শিক্ষক বসেছিলেন। লেখার মুখে একটু থেমে গিয়ে বগলাবাবু মাথাটা নীচু ক'রে তাঁর দিকে আড়চোখে চেয়ে

চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন—"বাপ-মায়ে নাম রেখেছে—চুলোয় যা !"

হাতের মুঠায় উদ্যত হাসি চেপে শিক্ষকটিকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হোল। এ-ধরণের পান, উইট্ লেগেই থাকত ঠোঁটে। একটু কিছু পেলেই হোল। আড্ডাটা আমাদের বসত পাশেই মেজদাদা গোষ্ঠবিহারীর বাড়ির বাইরের ঘরে। বেশ পুষ্ট একটি দল। সন্ধ্যার পর থেকেই আসর জমে উঠত। দু'তিনটি গ্রুপে তাস-দাবা-লুডো। ও-রসে বঞ্চিত এমন "নির্দলীয়" সভ্যও কয়েকজন ছিল, তার মধ্যে আমি একজন। আসরটা সরস রাখতে শুধু বগলাবাবুই ছিলেন না। অন্ততঃ আরও দু'জনের নাম করতে হয়; একজন মেজদাদা গোষ্ঠবিহারী নিজে আর একজন রাসবিহারী চ্যাটার্জি। মেজদাদার সম্বন্ধে আগে খানিকটা বলেছি। কারুর প্রকৃতির কোন বৈষম্যের নকল করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এদিকে রাসভারী আর স্বল্পভাষী হওয়ায় তাঁর মাঝখান থেকে হঠাৎ কিছু একটা ব'লে ওঠা, বা কোন কৌতুকজনক ঘটনার কথা এনে ফেলার প্রতিক্রিয়াটা হোত পুরোমাত্রায়। রাসবিহারী, বা বগলাবাবুর কোনও কথার পিঠে এনে ফেললে হাসির যে ঢেউটা উঠত তা আর থামতে চাইত না।

রাসবিহারীও ছিল আমার জীবনে দেখা একটি অভিনব চরিত্র। স্কুল কলেজের দিকে কিছু সঞ্চয় ছিলনা, তবে ক্ষুরধার বুদ্ধির জোরে, হাতে-কলমে কাজ করতে করতে কলকব্জায় সে ছিল সিদ্ধহস্ত। সে-সময় এ-অঞ্চলের বড় বড় মাড়োয়াড়ীদের তেলকল চালকলগুলো প্রায় সবই তার গড়া। শিক্ষা বাংলাদেশেই, ছেলেবেলা থেকে কলকারখানায় উমেদারী ক'রে। ওদিক থেকেই আসে। এদিকে নানারকম সমাজে মিশে—বিশেষ ক'রে ঐ স্তরের, তার বাংলা ইডিয়ম, ছোট ছোট কাহিনী আর প্রবাদের পুঁজি ছিল অফুরন্ত। ঠিক তাকের মাথায় একটা লাগসই ঝেড়ে দিয়ে হাসির হুল্লোড় তুলত রাসবিহারী। মাঝে মাঝে গ্রাম্যতা দোষও এসে পড়ত। আমাদের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বড়দের সম্ভ্রম রক্ষা করতে হোত। এদিকে, এসব ক্ষেত্রে যেমন হ'য়ে থাকে, তার ছিল "সাত খুন মাফ।" ওর সঙ্গে আমার একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে পড়ে। মনটা ছিল বড় দরাজ।

ও-বাড়ির আড্ডার কথা একটু বড় ক'রেই বললাম আমি। দরকার হোল।

নিজের কাছে নিজে নিকটতম হলেও, মানুষ নিজেকে কম বোঝে। আমার লেখায় কৌতুকরসের পরিমানই বেশি, তবু মনে হয় আমার

মনটা গড়পড়তা বাঙ্গালীর মতো করুণ রসেই সিক্ত বেশি করে। স্কুল যুগে সাহিত্য যশের উচ্চাভিলাষ নিয়ে যে সব গল্প লেখার চেষ্টা করেছি, যতদূর মনে পড়ছে, সেগুলি নায়ক-নায়িকাদের অশ্রুধারা দিয়েই শেষ করার অভিসন্ধি নিয়ে করি আরম্ভ। অন্ততঃ কলেজযুগে আমার প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত গল্প 'অবিচার' ছিল একেবারেই করুণ রসাত্মক। তার পরেরটি 'দাদা'-ও তাই। লেখার দিকে শুরু এইভাবে, অথচ শোনার দিকে, পড়ার দিকে, কৌতুকরসের কাহিনী, উইট, হিউমারই আমার প্রিয়। করুণ কিছু আমার মনের সঙ্গে খাপ খায়না। ব্যাপারটা কেমন যেন স্ববিরোধী ব'লে মনে হয়, মনস্তাত্ত্বিকের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

আমার সাহিত্যজীবনে যা ঘটেছে তা এই যে, আমি গোড়াথেকেই নানা সূত্রে কৌতুকরসের একটা জোগান পেয়ে গেছি। জ্যাঠামশাই (মেজদাদা গোষ্ঠবিহারীর বাবা) ছিলেন হাসির গল্পের মহাজন। নীলকুঠির বড়বাবু, বাড়িতে সে-গাম্ভীর্য অনেকখানি লেগেই থাকত। কিন্তু শীতকালে আমকাঠের গুঁড়ির আগুনের চারিদিকে আমাদের দু'বাড়ির ছেলেদের নিয়ে যখন তিনি শোনা, পড়া, বা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করা গল্প আরম্ভ করতেন তখন তাঁর ছিল একেবারে অন্য রূপ। এরপর এলেন মামারা, বিশেষ ক'রে মেজোমামা, যাঁর কথা আগেও বলেছি। রটাই ডিকেন্‌স্‌ প্রভৃতি হাস্যরসিক লেখকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—এরপর ও-বাড়ির-আড্ডা। আমার নিজের সিদ্ধান্ত, হাস্য-করুণ দু'টি রসেরই ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত ছিল আমার মনে, ক্রমাগত জোগান পেয়ে পেয়ে এইটাই পুষ্ট হ'য়ে থাকবে, ফলে, পাশের ধারাটি সংকীর্ণ হ'য়ে গিয়ে থাকবে।

এই সময় আর একটি ব্যাপার শুরু হোল যা আমার জীবনে অনেকখানিই অধিকার ক'রে রয়েছে। দ্বারভাঙ্গা রাজপরিবারের সঙ্গে পরিচয়। এটাও হোল মেজদাদার মাধ্যমে, মেজদাদা কুমারদের গৃহশিক্ষক হওয়ার ফলে। উনি যখন চার্জ নিলেন, দু'জনের বয়স তখন বারো থেকে চৌদ্দ পনেরর মধ্যে। মেজদাদা বাড়িতে থেকেই ওঁদের পড়িয়ে আসতেন। কিছুদিন যাওয়ার পর ওঁরাও গাড়ি ক'রে আসতে লাগলেন দেখা করতে। নামতেন না, রাস্তায়ই গাড়ীতে ব'সে কিছু গল্পস্বল্প ক'রে চ'লে যেতেন। আমরাও এসে দাঁড়াতাম। সেই থেকে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সূত্রপাত। বড়টি তখন থেকেই গম্ভীর, ছোটটি একটু চটুল।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজ সারা ভারতবর্ষেই জমিদার রাজাদের মধ্যে

(অর্থাৎ জয়পুর আদি নেটিভ্ ষ্টেট্, গোত্রের নয়) অর্থে এবং মর্যাদায় সবচেয়ে বড় ছিলেন। মর্যাদায় দেশবাসীর কাছে ওঁর একটা বিশেষ স্বীকৃতি ছিল এইজন্য যে, উনি একমাত্র ঐ স্তরের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। রাজা, তার সঙ্গে মিথিলার বিরাট ব্রাহ্মণ-সমাজের সমাজপতি।

একদিকে কাঞ্চন-কৌলীন্যে এত উঁচুতে, অন্যদিকে একটি বংশগত প্রথা আবার সমাজের সাধারণ্যের সঙ্গে এঁদের যুক্ত ক'রে রেখেছিল। ঠিক ওঁদের উপযোগী মৈথিল-ব্রাহ্মণ-রাজবংশ আর না থাকায়, কন্যা নিতেন ওঁরা সাধারণ গৃহস্থ পরিবার থেকে, বংশে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ হ'লেই হোল—এখানে শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণের যেটা পদবী। এঁদের সংখ্যা ছিল খুব কম, আমাদের সে-সময় মাথা গুণতি মাত্র হাজারখানেক। এই মুশকিলটা, আসান করবার জন্যে একটা রীতি বা প্রথা ছিল। বিশেষ অসুবিধা হ'লে বা অন্য কোনও বিশেষ কারণ থাকলে 'যোগ' (যোগ্য ?) বা তারও নীচের শ্রেণী থেকে মেয়ে নিয়ে তাকে শ্রোত্রীয় ক'রে নেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা ছিল রাজার হাতে।

সংক্ষেপে এই :—

মহারাজ রামেশ্বর সিং-এর ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ ছিল কন্যা অর্থাৎ ভাবী মহারাণীর অসাধারণ সৌন্দর্য। এদিকে একেবারেই দরিদ্র গৃহস্থের কন্যা, তার ওপর 'যোগ' পর্যন্তও নয়। কথিত আছে মহারাজ একবার তহশীল দর্শনে বা অন্য কোন কারণে বাইরে যেতে এঁকে অতি সাধারণ অবস্থায় কুটিরের বাইরে দেখে, মুগ্ধ হ'য়ে জাতে তুলে নিয়ে বিবাহ করেন। রোমান্স্‌টাকে বর্ণাঢ্য ক'রে তোলবার জন্যই বোধহয় একটা কথা চ'লে গিয়েছিল, কন্যা তখন নাকি কুটিরের মেটে দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছিলেন।

এটা ছিল মহারাজের দ্বিতীয় বিবাহ। অবশ্য, প্রথম মহারাণীর বিদ্যমানতায়। তাঁর কোনও সন্তান হয়নি।

কাঞ্চন-কৌলীন্য সৌন্দর্যের কাছে ভালোভাবেই মাথা হেঁট করল।

পরিচয়টা আমাদের ক্রমে গাঢ় হ'তে লাগল। দুই ভাই-ই বেশ মিশুকে ছিলেন। জানিনা, নীল রক্তের সঙ্গে গার্হস্থ্য ধারার সংমিশ্রণের ফল কিনা। এই পরিচয়টা বেড়ে মেলামেশায় দাঁড়ায় কিছুদিন পরে, মহারাজ ওঁদের শিক্ষার অন্যভাবে ব্যবস্থা করায়—যেটা ছিলই ওঁর মনোগত অভিপ্রায়। কাশী থেকে বোধহয় থিয়জফিষ্ট এ্যানি বেসেণ্ট শিষ্যা মিস্ এডগার নামে একজন প্রৌঢ়া ইংরাজ মহিলাকে এনে তাঁর হাতে কুমারদের শিক্ষার সমগ্র ভার দিয়ে দিলেন। মেজদাদা তাঁর

সহকারী হ'য়ে রইলেন, ইংরাজি ছাড়া অন্য সব বিষয় নিয়ে। সংস্কৃতের জন্য একজন আলাদা পণ্ডিত ছিলেনই। রাজ-বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা তফাতে মিস্ এড্গারের বাসার একটি ঘরে রীতিমতো স্কুল বসল।

যেমন নামেই স্ব-প্রকাশ, মিস্ এড্গার ছিলেন চিরকুমারী। আমি ভারতীয় বা ভিন্দেশী ও-রকম একজন মহিলার সংস্পর্শে খুব কমই এসেছি। অত্যন্ত ধর্মিষ্ঠা; ধর্মবিশ্বাসে উনি থিয়জফিষ্ট এবং তা থেকে হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। নিরামিষাহারিণী, মৃদুভাষিণী, অত্যন্ত স্নেহময়ী। কি ভাবে, কবে থেকে ঠিক বলতে পারিনা, উনি আসার কিছুদিন পর থেকে, আলাদা বাসার জন্যই, আমাদের যাওয়া আসা শুরু হ'য়ে গেল। আমাদের মানে, আমার আর মেজদাদার কনিষ্ঠ, আমার সমবয়সী তারকের। সে তখন বোধহয় ছাত্রাবস্থায়। পরে বি.এ. পাস ক'রে রাজস্কুলেই কাজ পেল। মিস এড্গার্ আমাদের খুবই স্নেহ করতেন। অন্য কারও সঙ্গ তো পেতেন না, মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন আমাদের। এর পর আমাদের যাওয়া-আসা আরও খানিকটা নিয়মিত হ'য়ে পড়ে, কুমারদ্বয় যখন খেলা শুরু করলেন। তারক ছিল টেনিসে খুব দক্ষ-আউটডোর-ইন্ডোর উভয়বিধ খেলাতেই তার বেশ দক্ষতা ছিল—খেলার শেষে আমরা প্রায়ই মিস্ এড্গারের বাসাতে ব'সে, নানা বিষয়ে গল্পস্বল্প করতাম। কুমাররা কখনও কখনও থাকতেন, কখনও কখনও দেউড়ি চ'লে যেতেন। দু'জনেরই মায়ের দিকে টান ছিল খুব বেশি। বয়স বাড়ার সঙ্গে বড় কামেশ্বরের মুখে কিছু কিছু রাজকীয় পলিটিক্স্-এর টুকরা টাকরা এসে পড়ত; ছোট বিশ্বেশ্বরের ছিল শিকার, খেলা, গানবাজনা, কিছু এদিক-ওদিক; বাকিটা মা। অমন মাতৃগত-প্রাণ কম দেখা যায়।

এইভাবে চলল।

তারপর আমি অন্য দিক দিয়ে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হ'য়ে পড়লাম রাজপরিবারের সঙ্গে। মহারাজের দুই পুত্র এক কন্যা। কন্যাই বড়। তার বিবাহ হ'য়ে গেল।

ঐ চিরাচরিত পদ্ধতিমতোই। মাত্র শ্রোত্রীয় হওয়ার গুণে একটি নিতান্তই সাধারণ গৃহস্থ ঘর থেকে ছেলে এনে বিবাহ দেওয়া হল। তারপর তাঁকে নিয়ে এসে দ্বারভাঙ্গাতেই রাজবাড়ি-সংলগ্ন একটি বাড়ি ক'রে দিয়ে রাখা হোল। জামাতার নাম মুকুন্দ ঝা। মহারাজ যতদিন বেঁচে ছিলেন, উনি ঐ বাড়িতেই কাটান। বিবাহের পর তিনিও কুমারদের সঙ্গে মিস্ এড্গারের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া আরম্ভ ক'রে দিলেন। বয়সে তিনি বড় কুমারের চেয়ে অল্পই বড়। ওঁদের দু'ভাইয়ের নাম বা

পদবী দাঁড়িয়েছিল মহারাজকুমার, কুমার সাহেব। এঁর দাঁড়াল ওঝাজি। মিথিলার জামাইয়ের সাধারণ ডাকনাম 'ওঝা'। মেয়েকে 'দাইজী' ব'লেই ডাকা হোত। আসল নাম বাইরে বেরোয়নি।

ওঝাজির সঙ্গে আমি ধীরে ধীরে খুব বেশি অন্তরঙ্গ হ'য়ে পড়ি। পরেও আমাদের সম্বন্ধটা মোটামুটি সেই রকমই থেকে যায়, যদিও নানা কারণেই আর সে-সময়ের মতো মেলামেশা সম্ভব ছিলনা।

অতিশয় অমায়িক প্রকৃতির মানুষ। দূরপল্লীর গৃহস্থ সন্তান। সে-সময় ইংরাজী শিক্ষা এ প্রান্তে খুবই অল্প থাকায়, সে দিক দিয়ে বিশেষ কিছুই হয়নি। মিস্ এডগারের কাছেও শিক্ষার ব্যবস্থাটা কোনও স্ট্যাণ্ডার্ড ধ'রে ছিলনা, কারুরই জন্যে। ইংরাজি, আর সর্ববিষয়ে কাজ চালাবার মতো সাধারণ জ্ঞান, এই ছিল লক্ষ্য।

ওঝাজি ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। ঐ পদ্ধতি ধ'রে তিনি বেশ এগিয়ে যেতে লাগলেন।

ওঁর আর একটি মস্ত বড় গুণ ছিল। নিতান্তই সাধারণ গৃহস্থের সন্তান, আর এক দিকে এই রাজজামাতা, এ ক্ষেত্রে মনের ভারসাম্য রক্ষা ক'রে চলা খুবই কঠিন; কিন্তু ওঝাজি তা ক্ষণেকের জন্যেও হারাননি। রসিক পুরুষ, বেশ খোলা মনেই আমাদের গল্প হোত, কখনই আমাদের পার্থক্যটা বুঝতে দেননি। পরামর্শ চেয়েছেন, দিয়েছেন, অযাচিতভাবে উপকারও করেছেন।

ওঁর আর একটা মস্ত বড় গুণ ছিল, গুণীর সমাদর। উত্তরকালে বড় হ'য়ে যখন উনি আলাদা বাড়ি করেছেন, মহারাজের মৃত্যুর পর, সেখানে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবেই মাঝেমাঝে ভালো ভালো লোকের দেখা পেয়েছি, যাঁদের এদিকে আসবার সম্ভাবনাই ছিল কম। বাঙ্গালীর প্রতি যেন বেশি টান। ডন্ সোসাইটির (Dawn Society) কর্ণধার, অনেকের কাছে রাজেন্দ্র প্রসাদের গুরু ব'লে পরিচিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। কয়েকবারই দ্বার-ভাঙ্গায় এসে থেকে গেছেন। সহর থেকে খানিকটা বাইরে ওঁর বড় কম্পাউণ্ডওলা বাড়ির সামনে একটি বড় পুষ্করিণী তার অপর পারে, খানিকটা একান্তেই এই ধরণের অতিথিদের জন্যে ছোট, সুদৃশ্য আলাদা একটি বাড়িই ছিল।

যথাসময়ে মিস্ এড্গারের স্কুল থেকে (যদি তাই বলতে হয়) বেরিয়ে আসার পর জমিদারী পরিচালনায় তালিম পেয়ে ধীরে ধীরে ওঝাজি বড় বড় দায়িত্বের পদ নিয়ে পূর্ণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসেন। তখনও সেই এক ভাব। মোটরে ক'রে বাড়ি যেতে আমাদের বাড়িটা

পড়ে। আমি থাকলেই গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে গেছেন, কখনও কখনও গাড়ি থেকে নেমে এসেও। বাগানের পথ। এখানেও ওঁর সঙ্গে আমার একটা মিল ছিল। আমার ছোট বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখতেন। তাতে ওঁরই দেওয়া অনেক গাছ। এখনও দুষ্প্রাপ্য ফ্রান্-সিসিয়া গাছটায় গ্রীষ্মে, বর্ষায় অজস্র ফুল ফুটিয়ে তাঁর প্রীতি ভালোবাসার সাক্ষ্য দেয়।

উচ্চ আভিজাত্যের সঙ্গে সাধারণের সমন্বয়ে দ্বারভাঙ্গা রাজবংশের একটা সম্পূর্ণ আলাদা ট্রাডিশন্ গ'ড়ে উঠেছিল। তাই বোধহয় ওঁদের মেলামেশার মধ্যে কখনও আভিজাত্যের কাঠিন্য আসতে পারেনি।

প্রথম পর্যায়টা এইভাবে কাটে। পরে দেউড়ি পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। মহারাণীর নিজের হাতের রান্না পর্যন্ত খেয়েছি। অনেক পরের কথা। তখন মহারাজ রামেশ্বর সিং গত হয়েছেন, গদিতে কামেশ্বর সিং। উনি রাজমাতা। যোগাযোগটা চাকরি-সূত্রে আরও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। সে সব কথা যথাস্থানে হবে। মাঝখানে কিছু বাদসাদ দিয়ে আমি ১৯৪২ সাল পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গা রাজে কাজ করেছি ভিন্ন ভিন্ন পদে। রাজের সুবর্ণ যুগ।

আজ যুগের বিধানে সারা দ্বারভাঙ্গা রাজটাই একটা স্মৃতিমাত্র। একটা ইতিহাস, যার শেষ হওয়া অধ্যায় পর্যন্ত লেখা হ'য়ে গিয়ে সমাপ্তির ছেদ টেনে দেওয়া হয়েছে।

একটা কথা এইখানে বলে রাখবার লোভ সংবরণ করতে পারছিনা। আত্মগরিমার নয়, তবে আত্মপ্রসাদের তো বটেই। ভগবান নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমার জীবনের পরিধিটা বেশ বড় ক'রেই দিয়ে গেছেন। আর নিতান্ত সহজভাবেই আমার মন বিচরণ করেছে এই বিস্তৃত পরিধির মধ্যে। আমি একদিন অধুনালুপ্ত কালিঘাট-ফলতা রেলের টিনের ছোট্ট স্টেশনের মধ্যে গাড়ির প্রতীক্ষায় একমাত্র সঙ্গী গ্রাম্যকৃষক বদনের সঙ্গে ব'সে মুড়ি খাওয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ চালিয়েছি, নিঃসঙ্কোচে, মানুষে-মানুষে অকৃত্রিম আত্মীয়তার আনন্দে। আবার সেই সহজ আনন্দ নিয়েই উচ্চতম অভিজাতের নিবিড় সংস্পর্শে এসেছি। একদিকে যেমন হীনজ্ঞানে নাসিকা কুঞ্চিত হয়নি, অন্যদিকে তেমনি দুর্লভ কিছু ঘটছে ব'লে কৃত-কৃতার্থতার একটা হীনমন্যতাও মনে উদয় হয়নি। যিনি সর্বন্তরেই এই আত্মার আত্মীয়কে সহজ আনন্দেই খুঁজে নেওয়ার আশীর্বাদটুকু দিয়েছেন তাঁকে কোটি কোটি প্রণাম করি।

দ্বারভাঙ্গার জীবন এগিয়ে চলল। অনুকূল বায়ুতে পাল তুলে দেওয়া

একটি তরণীর মতোই নিস্তরঙ্গ স্রোতে ভেসে যাওয়া। প্রায় তিন বছর কেটে গেল। তারপর অকস্মাৎই একেবারে একটা কঠিন সংকটের সামনে এসে পড়লাম।

বাতাসটা অপ্রত্যাশিতভাবেই অনুকূল ছিল। বোধহয় একটা বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এমন কতকগুলো যোগাযোগ ঘ'টে গেল, যাতে থার্ড মাষ্টার থেকে আমি সরাসরি হেডমাষ্টারের পদে উঠে গেলাম। অবশ্য অস্থায়ীই। তারপর স্থায়িত্বের সম্ভাবনা পাকা হ'য়ে এসেছে এই সময় ঘটনাটা ঘটল।

স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশ চলছে। আমি তখন এই সময়টায় কলকাতায় চ'লে যেতাম। উদ্দেশ্য শীল্ড আর লীগের ম্যাচ দেখা, তার সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখে শুনে বেড়ানো। ফুটবলে সঙ্গী থাকতেন মেজোমামা। তখনও ইষ্টবেঙ্গল মহামেডান্ স্পোরটিং আসেনি। ফিল্ডের সিংহ শার্দূল ছিল তখন 'মোহনবাগান' আর ইংরাজ সিভিলিয়ন্ টিম 'ক্যালকাটা'। এ ছাড়া থাকত মিলিটারি টিমগুলো। এরা স্থায়ী নয়, কান্টন্‌মেণ্ট বদল করতে করতে যেটা যখন ফোর্ট উইলিয়ম-এ এসে জুটত, দু'বছর তিন বছর, চার বছরের মেয়াদে। এক একটা টীম থাকত দুর্ধর্ষ, তাদের ক্রীড়া-নৈপুণ্যে সাড়া জাগিয়ে যেত কলকাতায়।

লেখার দিকেও কিছু কিছু পরিচয় হ'তে আরম্ভ হয়েছে। আলোর আভাস যত অল্পই হোক, একটা নূতন দিক তো বটেই।

বেশ তাজা মন নিয়েই দ্বারভাঙ্গায় ফিরে নূতন উদ্যমে কাজ শুরু করতাম।

সেবার এসেই শুনলাম, আমার কাজ আর নেই, ছুটির মধ্যে নূতন স্থায়ী হেডমাষ্টার নিয়োগ করা হ'য়ে গেছে। না বিজ্ঞাপন, না কিছু, একেবারে লোক এনে বসিয়ে দেওয়া।

ব্যাপারটা যত আকস্মিক মনে হয়, আসলে কিন্তু ততটা নয়। পেছনে একটি অপ্রীতিকর কাহিনী আছে।

তখন স্কুলের সেক্রেটারী রাজহাসপাতালের চীফ মেডিক্যাল অফিসার একজন বাঙ্গালী। ভদ্রলোক রাজে অদ্ভুত প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং তাই দিয়ে বাঙ্গালীদেরও বেশ খানিকটা উপকারও হয়। কিন্তু দুর্গা-পূজার কয়েকটি ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অনেক অনিষ্টও ক'রে যান এবং শ্রদ্ধা হারান তাদের। মূল কথাটা ছিল, নিজের স্বার্থ এবং কর্তৃত্বের সামনে তিনি আর কিছুকেই আমল দিতেন না। পরিণামে সেই পুরনো প্রবাদই দাঁড়াল—যেখানে বাঙ্গালী, সেখানেই দুর্গাকালী, সেখানেই দলাদলি। সেখানে আমার—ওঁর সম্বন্ধটাতেও একটু চিড় খেল। তবে উনি বাইরের ব্যবহারে তার

কোনও লক্ষণ প্রকাশ হ'তে দিলেন না। এরপর একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন হোল। প্রার্থীদের মধ্যে ওঁর নিজের একজন লোক ছিল। ওঁর ইচ্ছা ছিল আমি তাকে সুপারিশ করি, তাহ'লেই পেয়ে যায় কাজটা। ঠিক মনে পড়ছেনা, তবে পদটা ছিল অস্থায়ী। কোনও শিক্ষক দীর্ঘকালের জন্য ছুটি নেওয়ায় এ একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা, যার জন্য অল্পই দরখাস্ত প'ড়ে থাকবে। ওঁর কথা রাখতে গেলে একজনের প্রতি অবিচার হয়—তারক। সে সর্ববিষয়েই সেরা, তাছাড়া কয়েকবার ছোট ছোট ছুটিতে কাজও ক'রে এসেছে। আমি তারকের দরখাস্তটাই সুপারিশ ক'রে দিলাম। পেয়ে গেল কাজটা। বাইরে বাইরে সেক্রেটারীর কিছু বলবারও উপায় ছিলনা, কেননা প্রেসিডেণ্ট ছিলেন রাজের চীফ ম্যানেজার। তাঁর স্কুল নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর থাকত না, তবে, তারকের নিয়োগটা যে ন্যায়সঙ্গত হয়েছে এটা স্বীকার করলেন।

আমাদের সম্বন্ধের ফাটলটা বাড়ল।

কিছুদিন পূর্বে এরই সমান্তরালে আর একটি ব্যাপার শুরু হ'য়ে যায়। মহিলা রাজ-হাসপাতালের লেডি ডাক্তার হ'য়ে একজন ক্রিশ্চান মহিলা এলেন, মিসেস্ বোস। তাঁর স্বামী মিঃ বোস ছিলেন এম.এ.। পূর্বে কোথাও নাকি শিক্ষকতা করতেন। সাম্প্রতিককালে স্ত্রীর উপার্জনের উপরই নির্ভরশীল হ'য়ে দ্বারভাঙ্গাতেই ব'সে ছিলেন। প্রৌঢ়, গৃহকোণ-বিলাসী মানুষ, তাঁকে আমরা বাইরে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে পেতাম না। ফলে, একজন মিঃ বোস আছেন এইটুকুই মাত্র আবছা গোছের জানা ছিল, তাঁর উপস্থিতিটা কেউ অনুভব করতাম না।

এসে শুনলাম মিঃ বোস হেডমাষ্টারের পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়েছেন। ব্যাপারটি আমার জীবনের দিক পরিবর্তনের ঘটনা, সুতরাং একটু বিশদ ক'রে দেওয়া প্রয়োজন।

পূর্বেই বলেছি, শিক্ষাপ্রচারে দ্বারভাঙ্গারাজের বিশেষ উৎসাহ ছিলনা। একটা স্কুল না রাখলেই নয়, তাই দাঁড়িয়েছিল। ১৯০৮ সালের অগ্নিকাণ্ডের পর স্কুলকে স্থায়ী গৃহ আর দেওয়া হয়নি। একজন ম্যানেজারের বাসা খালি করিয়ে তার সঙ্গে নিতান্তই সাধারণ খোলার চালা জুড়ে কোন রকমে কাজ চলছিল। এক আধ বছর নয়। আমি এই স্কুল থেকে পাস ক'রে এই স্কুলের হেডমাষ্টার, তখনও এই অবস্থাই চলছে। মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষের দিক থেকে স্কুল ডিস্‌এ্যাফিলিয়েট (Disaffiliate) করার হুম্‌কি আসত। রাজের নির্দেশেই সহরের মধ্যে উপযুক্ত জমি দেখা হচ্ছে, ইত্যাকার অজুহাত দেখিয়ে কাটিয়ে দেওয়া

হোত। বাড়াবাড়ি হ'লে মহারাজ ওপরে-ওপরেই—অর্থাৎ একেবারে গভর্ণরের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে লঘুভাবে উল্লেখ ক'রে দিতেন—পাটনায় সাক্ষাৎ হ'লে বা তিনি দ্বারভাঙ্গায় নিমন্ত্রিত হ'য়ে এলে। বেশ কয়েক বছর আবার সব কথা চাপা পড়ে যেত।

অস্থায়ী স্কুলের সব ব্যবস্থাই ছিল স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে। এই অবস্থার মধ্যে সাধ্যমতো বিপদ-আপদ কাটিয়ে, পরিচালনার দিকে স্কুলের যশ অক্ষুণ্ণ রেখেই যখন স্থায়িত্বের আশা করছি, ইংগিতে আভাসও পাচ্ছি, সেই সময় নিতান্ত আকস্মিকভাবে অ-প্রস্তুত অবস্থায় কোপটা পড়ল আমার ওপর। গোপনীয়তা ছাড়া সেক্রেটারী খুব দক্ষতার সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করেন। চীফ মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে অন্দরমহল, বারমহল সর্বত্রই প্রভূত প্রতিপত্তি, তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে, প্রেসিডেণ্ট, কমিটি সবাইকেই বাদ দিয়ে একেবারে মহারাজের সম্মতি নিয়ে আসেন। প্রশ্ন তোলার সব পথই বন্ধ।

চাকরি জীবনে এত বড় আশাভঙ্গ আর হয়নি আমার। একেবারে মুষড়ে পড়লাম। কি করব কিছুই মাথায় আসেনা, শেষে মরিয়া হ'য়ে একদিন সাক্ষাৎকার চেয়ে নিয়ে স্বয়ং মহারাজের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার অপরাধটা কি? আমার ইন্স্পেক্শন্ রিপোর্ট বরাবরই ভালো, এদিক থেকে যে স্থায়ী পদ পাওয়ার আশা পেয়ে এসেছি তা মহারাজের অজানা নয়—এমন অবস্থায় আমায় কোনও রকম সূচনা না দিয়েই, নিজের কেস উপস্থাপিত করবার সুযোগ না দিয়ে এভাবে বঞ্চিত করবার কথা তাঁকে ভিন্ন কাকে বলি?

মহারাজ সবটা শুনে গেলেন হেঁট মুখে, বেশ যেন মন দিয়েই, তারপর হঠাৎ মাথা তুলে একটু হাত নেড়ে বললেন—"আমি কি করতে পারি?...বাবু আমায় বললেন, এম. এ. ছাড়া হেডমাষ্টার হ'তেই পারেনা, আমি এত সব কি বুঝি? অর্ডার করিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁদেরই চার্জ দিয়ে রেখেছি, আমি কি করতে পারি?"

তাঁর কথাগুলি এবং বলার ভঙ্গি বেশ মনে আছে। কাজটা যে অন্যায় হয়েছে এবং সেক্রেটারী যে খুব একটা সুযোগ পেয়ে তাঁর সম্মতিটুকু নিয়ে গেছেন এর মধ্যে একটা বিরক্তির ভাবই প্রকাশ পেল তাঁর ভাবভঙ্গিতে। ওঁর অর্ডারগুলোও খুব সংক্ষিপ্ত হোত সাধারণতঃ—"Yes, 'No,' 'PP,"-শেষটির অর্থ ছিল Put up personally অর্থাৎ ফাইল নিয়ে নিজে হ'তে সাক্ষাৎ করো। তেমন কিছু পরামর্শ করবার দরকার হ'লে।

ও-সম্পর্কে আর কিছু বলবার ছিলনা। তবু, কিছু বলা দরকার, সেই হিসাবেই, আমার কথাটা মনে রাখবার অনুরোধ জানিয়ে নমস্কার ক'রে চ'লে এলাম।

দিন তিনেক পরে মেজদাদা (গোষ্ঠবিহারী) বিকালে রাজকুমারদের পড়িয়ে এসে আমায় ডেকে পাঠিয়ে বললেন—"বিভূতি, মহারাজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পোষ্ট নিবি? তা'হলে বল। খালি আছে, হ'য়ে যাবে।"

দ্বারভাঙ্গা মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির পদ!...হেডমাষ্টারি যাওয়ার চেয়েও অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস ক'রে, মনটা গুছিয়ে নিতে যেটুকু দেরি। তারপর বললাম—"পেলে নোব বৈকি, মেজদা!"

"পেয়ে যাবি। কাল বা পরশু অর্ডার বেরিয়ে যাবে।"

হ'য়ে যাওয়ার পরে মেজদা রহস্যটা প্রকাশ করলেন। মহারাজকুমার পিতার সঙ্গে তর্ক করেন—বিভূতিবাবুর দোষটি কি যে এরকমভাবে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হোল? তাহ'লে তাঁকে অন্যদিকে ডেকে নিন—আবার নীচুতে ফিরে যাওয়া ওঁর পক্ষে অপমানই—যতদূর জানি তাঁকে, রাজিও হবেন না—রাজের একজন ভালো কর্মচারী—রেকর্ডে কোন দাগ নেই।"...

উনিই প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পদটার কথা বললেন—"লেখাপড়ার কাজ, পোষাতেও পারে আমার..."

মেজদাকে দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে পাঠান—রাজি আছি কিনা...

প্রাইভেট্ সেক্রেটারী-গিরির সময়টা আমার যে খুব তৃপ্তির মধ্যে দিয়ে কেটেছে, একথা বলতে পারিনা। কাজ তেমন শক্ত ছিলনা। মহারাজের ব্যক্তিগত অর্থাৎ জমিদারি-বহির্ভূত ফাইলগুলো ঠিক রাখা, বাইরের কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়ন্ত্রিত করা, সময়ের হিসাব রেখে। উনি সে সময় দু'টি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন, এক বেঙ্গল-বিহার ল্যাণ্ড-হোলডারস্ এসোসিয়েশন (Bengal Bihar Land-holders' Association) অর্থাৎ বাংলা-বিহার জমিদার সঙ্ঘের, দ্বিতীয়, ভারত ধর্মমহামণ্ডল। এ দু'টির চিঠিপত্রের হিসাব আমায় রাখতে হোত। Investment অর্থাৎ ব্যবসায়ের ফাইল ছিল। মহারাজের ড্রাগ-হ্যাবিট (Drug habit) অর্থাৎ নানাজাতের ঔষধ খাওয়ার অভ্যাস ছিল, সে সব আনানো—এই ধরণের ছোট বড় নানা ধরণের ফাইল ছিল। গুণতিতে প্রায় খান ত্রিশেক, তার মধ্যে ভারত ধর্মমহামণ্ডলেরটাই বেশি বড়। ইনভেষ্টমেণ্ট, মহারাজের আয়ের একটা বড় দিক ছিল। জমিদারি মিলিয়ে এককোটির প্রায় অর্ধেকটা ওদিক থেকেই আসত। তার

অফিসটা ছিল আলাদা এবং বড় গোছেরই—বড় বড় শেয়ারের লেন-দেন, পাট, তুলার কল কেনা-বেচা, নূতন কল নির্মাণ—এ সবই ছিল সেই অফিসের এলাকায়। আমায় শুধু হালকা চিঠিপত্র এবং পার্টির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাটুকু করতে হোত। এদের ছাড়া সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটায় আরও নানা ধরণের লোকের সঙ্গে করতে হোত। তার মধ্যে রাজা-মহারাজা জমিদারদের প্রাধান্য ছিল। আমায় সাহায্য করবার জন্য একজন কেরানি এবং চিঠির ডিক্‌টেশন্‌ নেওয়ার জন্যে একজন সর্টহ্যাণ্ড টাইপিষ্ট ছিল। এছাড়া মহারাজের ট্যুর (Tour) অর্থাৎ বাইরে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা আমার অধীনেই ছিল। এর জন্যও আলাদা একজন লোক ছিল।

মহারাজা অতিরিক্ত ট্যুর করতেন, রেলের একটা আলাদা সেলুন ছিল এর জন্য।

এসব ছাড়া আর একটা বড়রকমের কাজ ছিল, মহারাজের স্পীচ (Speech) অর্থাৎ নানা সভা-সমিতিতে তাঁর ইংরাজি ভাষণগুলো তৈরী ক'রে দেওয়া। উনি আমায় ডেকে নিয়ে, কি বলতে হবে তার কাঠামোটা বুঝিয়ে দিতেন, আমায় নিজের ভাষায় সেটা সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে হোত। বেশি প্রয়োজন হোত জমিদার সঙ্ঘের জন্য। তখন বিহার বাংলা থেকে আলাদা হ'য়ে গেছে, কিন্তু বাংলায় তখন মহারাজের বিস্তৃত জমিদারি রয়েছে, উত্তরবঙ্গে, বাঁকুড়ায় এবং অন্যত্রও। অর্থের দিক দিয়েও তিনি সবার ওপরই, বহু জমিদারেরই মোটা ঋণ নেওয়া তাঁর কাছে, পদগৌরবেও ওঁর একমাত্র সমকক্ষ বর্ধমানের মহারাজা—মাত্র এঁরা দু'জনেই "মহারাজাধিরাজ" এবং জি· সি· আই. ই. (G. C. I. E.)। আগেকার কথা বলতে পারিনা। অন্ততঃ আমি যখন রয়েছি তখন 'দ্বারভাঙ্গা-'ই রয়েছেন সংঘের সভাপতি।

মহারাজের জীবনের সবচেয়ে উচ্চাশা ছিল, জমিদার থেকে নেটিভ প্রিন্স (Native Prince) অর্থাৎ জয়পুর, যোধপুর, বারাণসীর সম-গোত্রের মর্যাদা পাওয়া। এর জন্য উনি দ্বারভাঙ্গা থেকে 'রাজধানী' এক রকম তুলে নিয়েই ত্রিশ মাইল উত্তরে, সে সময়ে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে রাজনগরে নূতন রাজধানীর পত্তন করেন। একান্তই জন-বিরল গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে। আমি যখন কাজে ঢুকেছি তখন দ্বারভাঙ্গা একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি। বাইরে ট্যুরের সঙ্গে এই দু'টো জায়গাতেই যাওয়া-আসা চলছে। রাজনগরেই নূতন বিরাট রাজপ্রাসাদ, হেডঅফিস, সব কিছু। মহারাজের পার্সোনাল স্টাফ্‌কে (Personal staff) একবার এখানে একবার ওখানে কাটাতে হয় তাঁর সঙ্গে।

একটা সম্পূর্ণ নূতন, একান্তই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা আমার জীবনে। আমার মানসিক গঠনের সঙ্গে খুব যে মিল ছিল একথা বলতে পারিনা। সমস্তটুকু যে প্রীতিজনক ছিলনা একথাও পূর্বে বলেছি। যদিও, একটা বিশেষ মর্যাদার পদ, অনেকখানি নূতন পরিধি, নূতন প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ারই চেষ্টা ক'রে গেছি, প্রশংসাও পেয়েছি, তবু বলতে হয় ওঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে উত্তর ভারতের কিছু জায়গা দেখা, কিছু একেবারেই নূতন ধরণের লোকের সঙ্গে জানাশোনা, পরিচয়—সংক্ষিপ্ত বা স্থায়ী ছাড়া, আমার বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। দেখাশোনার মধ্যে ছিল—দিল্লী, সিমলা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী আরও হয়তো কিছু জায়গা। কলকাতা তো ছিলই।

অসুবিধার মধ্যে ছিল সময়ের একেবারেই অভাব। যখন রাজধানীতে থাকতেন—দ্বারভাঙ্গা বা রাজনগর—একটা বাঁধা সময় ছিল—দশটা বা এগারোটা থেকে বিকাল, মহারাজের বেশি কাজ থাকলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এর মধ্যে সকালে বা ক্বচিৎ সন্ধ্যার পরও হঠাৎ রাজের ঘোড়সওয়ার এসে খবর দিত, বিশেষ কাজে ডাক পড়েছে, 'তল্‌বি' হয়েছে।

সময়ের একান্তই অভাব ছিল যখন মহারাজা বাইরে ট্যুরে যেতেন। একেবারেই সঙ্গে থাকো, কখন যে কি কাজে ডাক পড়বে তার স্থিরতা ছিলনা। বিশেষ ভিড় থাকতো সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে। নানা উদ্দেশ্য নিয়ে নানা শ্রেণীর লোক। নিজের অফিসের কাজ যেত বেড়ে, তার ওপর এদের সামলানো একটা সমস্যাই ছিল। এসব বিশেষ ক'রে থাকত কলকাতা, সিমলা আর দিল্লীতে।

এর জন্যেই, অনেক ঘুরেছি বটে, কিন্তু কোন জায়গাই বেশ ভাল ক'রে দেখার অবসর মিলত না। ঐ কথা, কখন ডাক পড়ে। একটা অবসর পাওয়া যেত সন্ধ্যার পর, একটা রিলিফ্ (Relief) বা দম নেওয়ার সময়, যখন মহারাজা সান্ধ্যপূজার পর দরবারে এসে বসতেন। সে-সময় দরবারীরা এসে ঘেরে বসত ফরাসে, মহারাজা একটা গির্দায় হেলান দিয়ে বসতেন, নানা রকমের খোস গল্প হোত, মাঝে মাঝে কিছু কাজের কথাও। অফিসের স্টাফের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিলনা। তবে মাঝে মাঝে কেউ এসে বসলে, বিশেষ ক'রে বাইরে থাকলে, এটা বোধ হয় ভেতরে ভেতরে তাঁর অপছন্দ ছিল না। আমি একটু দ্বিধার মধ্যে থাকতাম। দরবারটা মুখ্যতঃ মোসাহেবদের ব্যাপার, তাঁদের সঙ্গে সামিল হওয়ার একটা সংকোচ থাকত, অথচ একেবারে মুখ বুজে থাকাটাও অশোভন হোত। নিয়মিত অনুপস্থিতিটা নিজেরই খারাপ লাগত, নিজেকে যেন বড় বিশিষ্ট ক'রে রাখা, তাই মাঝে মাঝে গিয়ে

বসতাম। অবশ্য বাইরে গেলেই। চুপ ক'রে ব'সেই থাকতাম, নিতান্ত যদি কোনও প্রসঙ্গে কিছু দরকার হোত তো এক-আধটা মন্তব্য করতাম। হাসির দিকটা, অর্থাৎ মজলিশী-হাসি তোলবার দিকটা একেবারেই বাদ দিতাম। বলা বাহুল্য, এই রিল্যাকসেশন (Relaxation) বা হাত পা এলিয়ে অবসর ভোগের সময় মহারাজের মনটা কৌতুকরসে সিঞ্চিত ক'রে রাখবার চেষ্টা অনেকের থাকতই। এদিক দিয়ে আমার মৌনতা যা কিছু বিশিষ্ট ক'রে রাখত আমায়। তারপর, অদৃষ্টের পরিহাস একদিন আমিই বেশ খানিকটা হাসির কেন্দ্র হ'য়ে উঠলাম ক্ষণেকের জন্য।

সিমলা ট্যুরের কথা। দু'বার যাই মহারাজের সঙ্গে জুন আর অক্টোবরে।

বেশ জমাটি দরবার। চুপ ক'রে ব'সে আছি। বোধহয় মহারাজ সেদিন বিশেষ প্রয়োজনে কোনও কাগজ নিয়ে দেখা করতে বলেন। কাজ শেষ হ'য়ে গেলে তাঁর কাছাকাছি অর্থাৎ প্রথম সারিতেই ব'সে আছি, সামনে একটা পাত্রে মহারাজের কলম, কিছু আলাদা কাগজ, পাশেই একটা কলিং বেল (Calling bell) অর্থাৎ বেয়ারা আর্দালিকে ডাকবার ছোট আফিস-ঘন্টি। সেটা কপাল দোষে ছিল একেবারে আমার হাতের কাছে। গল্প শুনতে শুনতে নিতান্ত অন্যমনস্ক-ভাবে আমি টিপে দিলাম বেলটা। একান্তই মহারাজেরই ব্যবহারের জিনিস। পাশের ঘর থেকে একেবারে দু'তিনজন লোক এসে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াল। বেশ একটা চাপা হাসি উঠল ঘরটায়। মহারাজও বাদ গেলেন না। মুখটা টিপে হাসিটা চেপে রাখলেন।

নিতান্তই অভ্যাসের একটা অটোমেটিক এ্যাক্সন্ (Automatic action) বা স্বয়ংভূত ক্রিয়া। কলিং বেল হাতের কাছে থাকাতেই আপনা আপনি প্রকাশ পেয়ে গেছে। ঘরে কিন্তু এক আমি ছাড়া সবার মুখেই হাসি। কোথায় যে চোখ দুটো রাখব ভেবে পাচ্ছিনা।

একটু অশান্তিতেই কাটে খানিকটা, নীতি বিরুদ্ধই ব্যাপার তো, বিরক্ত হওয়ারই কথা। কিন্তু মহারাজ অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সেন্‌স্ অব্ হিউমার (Sense of humour) অর্থাৎ কৌতুকরসের দৃষ্টিটাও যে ছিল প্রখর তার পরিচয়ও পেতাম মাঝে মাঝে। গলদটা যে কোথায় সেটা ধরতে তাঁর দেরি লাগেনি। শুধু তাই নয়। ঘটনাটুকু মাঝে মাঝে তার মনে শুড়শুড়ি দিয়ে গেছে। তার পরদিন একজন দরবারি আমায় হাসতে হাসতে বললেন—"জানেন বিভূতিবাবু, আজ মহারাজ হঠাৎ হাসতে হাসতে আমায় জিজ্ঞেস করলেন—'কী ফুর্‌ল্যান্ হুন্‌কা?"

—অর্থাৎ কি খেয়াল হোল ওঁর ?

এই একটা অসুবিধা ছিল, সময়ের আত্যন্তিক অভাব। এর জন্যে আমার লেখা বা কোনওরকম সাহিত্যচর্চা একেবারেই বাদ প'ড়ে গিয়েছিল। প্রায় বছর খানেকের চাকরির মধ্যে আমি একবার সিমলায় থাকার সময় মাত্র একটি গল্প লিখি—'অকাল বোধন'। করুণরসের গল্প, আমার মাত্র কয়েকটি ঐ রসের লেখার মধ্যে একটি। এটুকুই বা ঘটল কেন বলতে পারিনা। তবে, একটা কথা ঠিক। এই রাজকীয় চাকরির মোহে প'ড়ে থাকলে আমার এদিকটা বোধহয় একেবারেই নিঃশেষ হ'য়ে যেত।

আমার জীবনে কয়েকটা বিষয়ের মতো এও ছিল ভগবানের অশেষ দয়া। সেই—"বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে।"

দ্বিতীয় অসুবিধা ছিল মহারাজের কথা ধরা এবং লেখার পাঠোদ্ধার করা। আমি যখন কাজ করছি, মহারাজের তখন বেশ বয়স হ'য়ে গেছে ; প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে বার্ধক্যের কাছাকাছি। বাঁধানো দাঁত, কথা খানিকটা অস্পষ্টই হোত, তার ওপর বলতেন খুব দ্রুত, যার জন্য অনেক শব্দই মাঝে মাঝে যেন ছেড়ে ছেড়ে যেত। হাতের লেখা ছিল যেন আরও বড় সমস্যা—অস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত। দুইয়ে মিলে বক্তব্যের নোট নেওয়া, বা ফাইলের অর্ডারের পাঠোদ্ধার ক'রে নোট দেওয়া—দুই-ই এক এক সময় দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠত। বিশেষ ক'রে খানিকটা অভ্যস্ত না হ'য়ে পড়া পর্যন্ত।

এর মধ্যে বিধাতার একটা আনুকূল্য ছিল। অফিসে সঙ্গী পেয়েছিলাম একজন বেশ ভালো লোক। বিনয় করে ব'লে একজন বাঙ্গালী যুবক। ইনি রাজেরই একজন পুরানো ডাক্তার, আমাদের পরিবারের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ, সূর্যবাবুর জামাই হিসাবে পূর্ব থেকে পরিচিতও। বেশ বুদ্ধিমান আর রসিক লোক, আমার প্রায় সমবয়সীও।

ইনি ছিলেন মহারাজের স্টেনোগ্রাফার। আমার অফিস থেকে একটু আলাদা, তবে একই ঘর এবং ট্যুরেও নিত্যসঙ্গী। বাইরে থাকতামও একত্র এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও এক হেঁসেলেই ছিল।

রসিক রগুড়ে মানুষ, বিশেষ ক'রে ট্যুরে থাকলে আমাদের পরস্পরের সঙ্গটা বেশ উপভোগ্য হ'য়ে উঠত। মহারাজের কতকগুলি মুদ্রাদোষ ছিল, তা নিয়েও মাঝে মাঝে আমাদের সরস, মুক্ত আলোচনা চলত। মুক্ত হাস্যোচ্ছল মন্তব্যের সঙ্গে। মাঝখানে অন্য কেউ থাকলে তার সম্ভাবনা ছিলনা। এতে ক'রে মনের উপর সমস্তদিনের চাপটা যেত হালকা হ'য়ে, পরের দিন চাপের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারত মনটা।

এবার লাভের কথায় আসা যাক। তার মধ্যে দু'টির স্মৃতি মনে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। মহারাজের এই একান্ত-সচিবের চাকরি না হ'লে হওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা। পরিচয়ের দিক দিয়ে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী দুই 'উকিল'-ভ্রাতা সারদাচরণ ও রণদাচারণ উকিলের কথা সবচেয়ে বেশি ক'রে মনে পড়ে। সারদাচরণ তখন দিল্লীর একজন বড় শেঠ কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় চিত্রকলা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল্ হ'য়ে রয়েছেন। তাঁর কনিষ্ঠ রণদা তাঁর সঙ্গেই আছেন। পরিচয়টা—কি ক'রে হোল, ঠিক মনে নেই—হয়ও বেশ ভালো সময়ে, যখন মহারাজা আমাদের দিল্লীতে রেখে বেশ দীর্ঘদিনের জন্যই রাজপুতানার সফরে গেছেন, ওদিকে মাত্র তাঁর স্টেনোগ্রাফার বিনয় করকে নিয়ে। ঐ সময়টুকু রসচর্চার দিক দিয়ে আমার পক্ষে মরুভূমির মাঝখানে ছিল খানিকটা ওয়েসিস্। প্রায়ই ওঁদের বাড়িতে যেতাম। দিল্লীর রসিক সমাজের কেউ কেউ থাকতেন, সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হোত।

সারদা ছিলেন আমার চেয়ে বেশ কিছু বড়ই, কিন্তু বড় মিষ্ট স্বভাবের মানুষ; আলাপ আলোচনায় বয়সের কোনও পার্থক্য থাকতে দিতেন না। বেশ একটা অন্তরঙ্গতার মধ্যে দিয়ে কাটত সময়টা।

বেশি ক'রে পাওয়া যেত রণদাকে। দাদার পথ ধ'রে তিনিও তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন, "প্রবাসী" প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁরও আঁকা ছবি বেরুচ্ছে মাঝে মাঝে, এদিকে বয়স প্রায় আমার সমান। বাইরেও বেরিয়ে যেতাম আমরা। একদিন হয়তো দিল্লীর লালকেল্লার মিউজিয়মে ভারতীয় কলার নিদর্শণরাজি দেখে, কেল্লার বাইরে দেওয়ালের কাছা-কাছি একটি নির্জন ঘাস-জমিতে আধশোওয়া হ'য়ে আলোচনায় রত রয়েছি—স্মৃতিটি উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে মনে। উনি তখন সরস্বতীর একটি চিত্র নিয়ে রয়েছেন, খানিকটা অভিনব ধরণের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি। আমায় বোঝাচ্ছেন যাতে দেবীর ভাবরূপটি বিকশিত হয় ওঁর ধারণা অনুযায়ী।

ছবিটি পরে কোনও পত্রিকায় প্রকাশ হ'তে দেখেছি।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে হরিহরক্ষেত্রে গংগা-নারায়ণীর সংগমস্থলে শোনপুরের মেলা দেখা, যা মহারাজের ক্যাম্পে না জায়গা পেলে অত ভাল ক'রে দেখার কোনও সম্ভাবনাই ছিলনা। বিশেষ ক'রে একটি অভিজ্ঞতার—

"সোনপুর" পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং নিশ্চয় সব পুরাতন মেলা ব'লে স্বীকৃত। শোনা যায় আয়তনে মাত্র এক রাশিয়ার নিজনি নাভগোর্ড (Nijni Novogord) এই মেলার সঙ্গে তুলনীয়। সেটি নাকি পুস্তক সমাবেশের জন্য বিখ্যাত।

শোনপুর প্রধানত হাতি-ঘোড়া, গো-মহিষাদির জন্য প্রসিদ্ধ। তাছাড়া সমস্ত ভারতের পণ্য-শিল্প সম্ভার তো আছেই। বড় বড় রাজা-মহারাজা, এমন কি নেটিভ্ প্রিন্সদেরও ক্যাম্প (Camp) পড়ত। সবক্ষেত্রে যে তাঁরা স্বয়ং থাকতেন, এমন নয়, কর্মচারীরাই কেনা-বেচার কাজ চালাত। এখনকার মতো যান-বাহনে মোটরের যুগ নয়, হাতি-ঘোড়াই মেলার সবচেয়ে বড় "সওদা" ছিল।

আমার তিনটি অভিজ্ঞতার কথা বেশি ক'রে মনে আছে। অমন ধোঁয়ার চাপের মধ্যে আমি জীবনে কখনও পড়িনি। নিতান্ত স্বাভাবিকই। লক্ষ লক্ষ লোকের রন্ধনাদির চুল্লি। তখন আবার জ্বালানি হিসাবে একমাত্র কাঠই ভরসা। একদিন ক্যাম্প থেকে মন্দিরে ফীটনে যাওয়া-আসা করতে—বিশেষ ক'রে রাত্রে যখন ফিরছি—দীর্ঘ প্রায় এক মাইলের পথ—যা নাকালটা হই জীবনে ভোলবার নয়। ঘন, তীব্র, জ্বালাময়ী ধূমের মধ্যে দিয়ে, প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নিতান্ত মন্থর গতিতে সমস্ত পথটা আগাগোড়া চোখবুজে এসেছি, আর বিস্মিত হয়েছি, এ-অবস্থায় লোকেরা দিনানুদিন কিভাবে কাটিয়ে যাচ্ছে।

এবার আসল অভিজ্ঞতায় আসা যাক।

পূর্বে বলেছি, মহারাজা ভারত ধর্মমহামণ্ডলের স্থায়ী সভাপতি ছিলেন।। সে সময় কি একটা ব্যাপার নিয়ে সারা ভারতে, বিশেষ ক'রে সনাতনী হিন্দুদের মধ্যে খুব বড় একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে—সম্ভবতঃ সারদার হিন্দু কোড বিল। মহামণ্ডলের পক্ষ থেকে বিরোধিতার এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে মহারাজ সমস্ত ভারতের পণ্ডিত সমাজ এবং বিভিন্ন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে আহ্বান দিয়েছেন। মহারাজেরই দ্বারভাঙ্গা থেকে নিয়ে আসা বিরাট এক সামিয়ানার মধ্যে সভার আয়োজন হয়েছে। মাথার সমুদ্র—নগ্ন, বিভিন্ন শিরস্ত্রাণপরা, পিঙ্গল জটাবৃত মাথা, এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও।

সেই মেলায় আমি প্রথম নাগা অর্থাৎ সম্পূর্ণ উলঙ্গ সন্ন্যাসী দেখি। বেশ একটি বা কয়েকটি বড় সম্প্রদায়ই, তার মধ্যে কয়েকজন ছিন্নলিঙ্গও। এঁদের সামনের সারিতেই বসানো হয়েছিল। ফরাস বেছানো ডায়াস্ বা বেদির পরেই। বেশ বড় ফরাস, মাঝখানে তিনদিকে গির্দা দেওয়া মখমলের আসনে মহারাজ উপবিষ্ট। তিনিই সেইদিনের সভাপতিও। বেশ গরম গরম কয়েকটি বক্তৃতার পর মহারাজা উঠলেন। যখন তাঁর লিখিত ভাষণ নিয়ে খানিকটা এগিয়েছেন, হঠাৎ সে এক দৃশ্য! একেবারে সামনে, ডায়াস্ থেকে পাঁচ ছয় হাতের খালি জমিটার

পরেই এক নাগা সন্ন্যাসী, ছিন্নলিঙ্গ। সিধা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। দীর্ঘাঙ্গ, বিরাট বপু, কোমরে নীচে পর্যন্ত জটাজাল নেমে এসেছে, যেন হঠাৎ একটা বনস্পতি মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। তারপরে হুঙ্কার আর অঙ্গচালনা। বোধহয় মৌনী, কিম্বা হয়তো প্রবল ক্রোধেই কথা বেরুচ্ছে না, চাপা গর্জন, মাথা চালনায় জটার ঝুরিগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে কণ্ঠে, বুকে, বাহুতে; প্রবল ঝড়ে বনস্পতি যেন বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে।

সংক্রামক হ'য়ে উঠল ব্যাপারটা। মহারাজের ভাষণে এমন কি ছিল, কে কি শুনল, কে কি বুঝল, সমস্ত জনতা দাঁড়িয়ে উঠে সে এক সাগর-কল্লোল। তবে, সৌভাগ্যের বিষয়, মাত্র মিনিট তিন চারের জন্য। ওঁরই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা, নিশ্চয় তাঁর মনমেজাজের সঙ্গে পরিচিত ছিল, চারিদিক থেকে উঠে তাঁকে ধ'রে অনেক চেষ্টা ক'রে বসিয়ে দিল। আবার সব শান্ত।

সজ্জিত রঙ্গমঞ্চের নাট্যে শিবতাণ্ডবের মূকাভিনয় নয়, প্রপীড়িত ধর্মের আর্ত-আহ্বানে স্বয়ং রুদ্রেরই তাণ্ডব! আশুতোষ অচিরেই শান্ত হলেন, নয়তো সেই পুণ্য তিথিতে, হরিহরের যুগ-পূজিত মিলন ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত বলা যায়না।

এবার তৃতীয় অভিজ্ঞতার কথা ব'লে শোন-পর্ব শেষ করি। এটিকে ছোট একটি অভিনয়ই বলা চলে। কৌতুকাভিনয়। রচয়িতা মহারাজ-কুমার কামেশ্বর সিং।

আমাদের ক্যাম্পটা ছিল মেলা থেকে খানিকটা দূরে, বেশ একটি নির্জন জায়গায়। বেশ বড় ক্যাম্পই, মহারাজের আলাদা, দরবারি, আর খরিদ-বিক্রয়ের জন্য যে কয়জন কর্মচারী এসেছিল, তাদের আলাদা, প্রাইভেট স্টাফের জন্যও আলাদা একটা ঘর।

প্রায় মাঝামাঝি একটা ছোট শামিয়ানা, গালিচা আর সোফা চেয়ার দিয়ে ভালোভাবে সাজানো। বড় ছোট নানা রকমের মানুষ নানা উদ্দেশ্যে আসে—রাজা, জমিদার পর্যন্ত। এইখানে বসিয়ে "এত্তালা" দেওয়া হয়। বড়দের থাকে সাক্ষাৎকারই। আর সবার প্রয়োজন মতো বাইরে বাইরেই ব্যবস্থা হ'য়ে যায়। ক্বচিৎ ভেতরেও ডাক পড়ে, বিশেষ ক'রে হীরা-জহরতের মতো কোন খুচরা অথচ মূল্যবান দ্রব্য নিয়ে কেউ এলে, যাতে মহারাজের যাচাই দরকার।

কারুরই নিয়মিত রুটিনবদ্ধ কাজ নয়। মহারাজ থেকে আর সবারও বেশ একটা অবসর বিনোদনের ভাব ছিল। কুমারদেরও স্কুলের ছুটিই যাচ্ছে।

মাঝখানের সামিয়ানাটা ছিল আড্ডার জায়গা। যার যেমন ফুরসৎ, অভিরুচি,—আসছে, যাচ্ছে ব'সে গল্প করছে। আগন্তুকদের মধ্যে বেশির ভাগ থাকত করকোষ্ঠী-বিচারক এবং নানারকম মাদুলি-কবচ বিক্রেতা। ধর্মের স্থান, এ দু'টির বাড়াবাড়িই ছিল। কুমাররাও প্রায়ই এসে বসতেন।

একদিন বিকালে একজন করকোষ্ঠী-বিচারক এসে হাজির। এরা প্রায়ই সব ভুয়ো। কিন্তু তথ্য সংগ্রহের বেশ একটা আলাদা আর্ট আছে। মহারাজকুমারদ্বয় প্রভৃতি বড়দের সম্বন্ধে তো বটেই, পরবর্তী অনেকেরও নাড়ি-নক্ষত্র আগে ভাগে জেনে নিয়ে কিছু প্রস্তুত হ'য়ে আসত। কিছুটা এদিক ওদিক হ'লেও রোজগার ক'রে নিয়ে যেত মন্দ নয়। কুমারদ্বয় উভয়েই বেশ রগুড়ে ছিলেন। ছোট একটু দুষ্টুমি-ঘেঁষা। একদিন একটা পালা শেষ ক'রে একজন চ'লে গেলে, বড় কুমার ঘোড়ায় ক'রে বাইরে কোথা থেকে এসে নেমেই সব শুনে হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলেন—"বিভূতি বাবু, আপনি কখনও হাত দেখিয়েছেন?"

বললাম—"না হুজুর। ও সব বুজরুকি ব'লেই মনে হয় আমার..."

"বাঃ, অমনি বুজরুকি! এই তো সেদিন আমাদের ক'জনের হাত দেখে হুবহু সব ব'লে গেল অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ।...আর, কিছু ভালো কবচও কিনে নিয়ে যান। দারভাঙ্গার জেনারেল ম্যানেজারের পদটা কেনা থাকবে। এত বড় ধর্মস্থানের মেলায় এসে হাতি-ঘোড়া কিছু কিনলেন না অন্ততঃ ভবিষ্যৎটা ভালো ক'রে কিনে রাখুন!...এবার কেউ এলে আমায় নিশ্চয় খবর দেবেন।"

কোনও রাজা-জমিদারের ক্যাম্প থেকেই হয়তো আড্ডা দিয়ে ফিরছেন, ভাবটা একটু বেশি চটুল।

গাম্ভীর্যের মধ্যে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি নিয়েই ভেতরে চ'লে গেলেন।

বোধহয় তার পরদিনেরই ব্যাপার। একজন বেশ জাঁদরেল গোছেরই কোনও গণৎকার এসে উপস্থিত হয়েছে, অনেকেই জুটেছে, বিচার বেশ জমে উঠেছে, আমি ইশারায় খবর পাঠিয়ে দিতে মহারাজকুমার এসে উপস্থিত হলেন। "বাঃ, জ্যোৎখীজি নাকি? যা খুঁজছিলাম!"—নাটকীয়ভাবেই কথাটা ব'লে একটা সোফায় ব'সে হাতটা বাড়িয়ে বললেন—"আমার হাতটা দেখুন জ্যোৎখীজী, যা জায়গায় আছি কোন ফাঁড়া-টাঁড়া আছে কিনা।"

ওদের পক্ষে এসব নিতান্তই "অ-আ"। রাজারাজড়ার বিপদ খণ্ডিত হ'য়ে যাওয়ার জন্যই আসে, জ্যোতিষীজী ডান হাতটা নিয়ে একটু টেনে

রেখাগুলি জাগিয়ে মাথা নেড়ে বিচার ক'রে বলল—"আছে, তবে কেটে যাবে।"

মহারাজকুমার চোখ বড় বড় ক'রে সবার দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—"আশ্চর্য ! এক্ষুনি হাথোয়া ক্যাম্প থেকে আসতে আসতে ঘোড়াটা হঠাৎ 'বোল্ট' ক'রে প্রায় শেষ হ'য়ে গিয়েছিলাম !···আচ্ছা, এবার এঁর হাতটা দেখুন। বাঙ্গালী এরা এসব আবার বিশ্বাস করতে চাননা।"

জ্যোতিষীজী টেনে নিলেন আমার হাতটা। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু দেখে নিয়ে বললেন,—"ভাগ্যবান মানুষ, রাজ দরবারে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—অতি শীঘ্র।"

মহারাজকুমার আবার চোখ বড় বড় ক'রে বিস্মিতভাবে চাইলেন। বললেন—"আচ্ছা, এবার পারিবারিক প্রশ্নয় আসা যাক্। ক'টি বিবাহ? ···একটু ইঙ্গিত দিয়ে দিই না হয়। এঁরা কুলীন ব্রাহ্মণ, কর্মবিবাহী।"

এবার জ্যোতিষীজীর মুখটা যেন একটু নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। নীচু ক'রে নিয়ে, তারপর একবার মুখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে যেন বয়সের হিসাবে একটা সঙ্গত সংখ্যা আন্দাজ ক'রে বললেন—"বিবাহ তো আপাতত দু'টি···"

মহারাজকুমার আবার বিস্মিত দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে প্রশ্ন করলেন,—"সন্তানাদি?"

মাথা আরও নেমে গেছে জ্যোতিষীর যেন তুলতেই পারছেন না। অনেকক্ষণ হাতটা নেড়ে চেড়ে দেখে, আর একবার চোখ তুলে আমায় দেখে নিয়ে বললেন—"দু'টি ছেলে, একটি মেয়ে।"

একটা চাপা খুক্ খুক্ খিক্ খিক্ আওয়াজ শুরুই হ'য়ে গিয়েছিল, একেবারে 'হো, হো' শব্দে বাঁধভাঙ্গা হাসিতে ভ'রে গেল সামিয়ানাটা। ভিড় আরও জমাট হ'য়ে উঠেছে, তারই মধ্যে বিপুল দেহটি সূক্ষ্ম ক'রে নিয়ে কখন যে বেরিয়ে গেছেন জ্যোতিষীজী, অত লক্ষ্য করা হয়নি।

প্রথম গণনাটা পূর্ব হ'তেই ভুল হয়েছিল—আইবুড়া মানুষের দুই স্ত্রী, তিন সন্তান! জ্যোতিষীজীর দ্বিতীয়টিও ফলেনি। এর কিছুদিন পরেই রাজের সঙ্গে আমার সম্পর্কই গেল ছিন্ন হয়ে।

হঠাৎই। সুতরাং তার ইতিহাসও সংক্ষিপ্ত।

দ্বারভাঙ্গায় ফিরে এসে রাজনগর। সেখানে কিছুদিন কাটাবার পর মহারাজের দিল্লী ট্যুর এসে পড়ল, যার কথা আগে বলেছি। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিনের জন্য কিছু দরবারি, কিছু স্টাফ্, দিল্লীতে রেখে রাজপুতানার দিকে চ'লে গেলেন। থেকে যাওয়ার মধ্যে আমার অফিসটুকু

রইল। এই অবসরেই আমার চিত্রশিল্পী সারদা, রণদা ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়, যাঁদের কথা একটু আগে বললাম।

ফিরে এসে মহারাজ একটু হঠাৎই—যেন আমার সময় না দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে একটা ফাইল্ চেয়ে পাঠালেন। মুখটা একটু গম্ভীর। ফাইল সম্পূর্ণ প্রস্তুতই ছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দিলাম। খুব যে খুশী এমন মনে হোলনা। কেননা, চাইছিলেনই অ-প্রস্তুত আমায়। এমনি ভাসা ভাসা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"এখানকার অবসরটা তোমরা ঘুরে বেড়িয়েই কাটিয়েছ।"

বললাম—"একটা অফিসের টাইম ঠিকই রেখেছিলাম। কাজ কিছু না থাকায় আমার আগেকার কিছু ফাইল যে অগোছ পড়েছিল, ঠিক করি।"

একটু মুখ গোঁজ ক'রেই রইলেন। তারপর বললেন—"তোমাদের দ্বারভাঙ্গায় পাঠিয়ে দিয়ে গেলেই হোত।"

এর ওপর উত্তর দেওয়ার আর কছু থাকেনা। উনি কথাগুলা ব'লে চ'লেও গেলেন ভেতরে।

তার পরদিন আমি আমার রেজিগ্‌নেশন্ অর্থাৎ ইস্তফা দিয়ে দিলাম। লিখলাম—অনুগ্রহ ক'রে আমায় ডেকে নিয়েছিলেন, আমি সাধ্যমত তাঁর দয়ার মর্যাদা রাখবার চেষ্টা ক'রে এসেছি, তবু মনে হয় আমি তাঁর প্রত্যাশা মতো নিজেকে গ'ড়ে তুলতে পারছিনা, সুতরাং...

অনেকগুলি ব্যাপার একত্রে হ'য়ে আসছিল। প্রথমত, একজন বাঙ্গালী, ওভাবে তুড়ি মেরে অমন একটা সম্মানের কাজ পেয়ে গেল এতে অনেকে, এমনকি অফিসার মহলেও অনেকে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে পড়ে। রাজ দরবার, যার যতটুকু সাধ্য, সুবিধামতো ক'রেই যাচ্ছিল।

আমার দিকেও, পদটুকুর যথেষ্ট মর্যাদা থাকলেও ভেতরে ভেতরে একটা ক্লান্তিই এসে গিয়ে থাকবে, আমার জীবনের যে মুখ্য আনন্দ, সাহিত্য, তা থেকে যে বঞ্চিত হচ্ছি—এ দু'টোই নিশ্চয় মনের অবচেতন স্তরে কাজ করছিল। শেষ চোট্‌টা ছিল, চেষ্টা ক'রেও স্বীকৃতি না পাওয়ার একটা অভিমান। তখন বয়সটাও অভিমানেরই।

মহারাজ খপ্ ক'রে বরখাস্ত করতেন না কাউকে। স্টেটে অনেক কাজ, সরিয়ে দিতেন অন্য কোন বিভাগে। অনেকেই এই পদ থেকেই পুরস্কার হিসাবে বা অন্য কারণে সার্কেল ম্যানেজারের পদও পেয়ে গেছেন। একটু ধৈর্য ধ'রে থাকলে হয়তো সেইরকম কিছু উদ্দেশ্যই থেকে থাকবে মহারাজের। কেননা, দুঃখিতই হয়েছিলেন, নিজেরও খানিকটা হঠকারিতা ছিল তো। একজন আমার শুভাকাঙ্খী দরবারি

আমায় বলেন—"বড্ড তাড়াতাড়ি করলেন বিভূতিবাবু। মহারাজ দরবারে বলছিলেন—'আমার নিজের ছেলেই যদি আমা থেকে পৃথক হ'তে চায়, কি করতে পারি আমি ?"

অবশ্য আর ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই আসেনা। আমি নেপথ্য-স্বীকৃতির ঐ পুরস্কারটুকু নিয়ে বিদায় নিলাম দ্বারভাঙ্গা রাজ থেকে।

পূর্বেই বলেছি, কাজটা সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার যে খুব বেশি মোহ ছিল, এমন নয়। তবে খবরটা দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছাতে পরিবারের সবাই যে খুবই রূঢ় একটা আঘাত পেয়েছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। বিশেষ ক'রে বাবা, মা আর দাদা। দিন যত এগুতে লাগল, ও-দিককার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াটুকু আমার মনে ধীরে ধীরে অধিকার বিস্তার ক'রে মনটাকে অবসন্ন ক'রে দিতে লাগল। ভাবালুতা থেকে কঠোর বাস্তবতায় ধীরে ধীরে জেগে উঠতে লাগল মনটা। আমাদের পরিবারের যা গঠন, আমার ওপর যা নির্ভর, আমাকে অবলম্বন ক'রে একটা যে নূতন দিগ্বলয় গ'ড়ে উঠছিল—তাতে এই হঠকারিতা যে একটা অভিসম্পাত হ'য়ে দেখা দিয়ে থাকবে সেটা যতই উপলব্ধি করতে লাগলাম, ততই মুহ্যমান হ'য়ে উঠতে লাগলাম। কি ভাষায় কি যে লিখব ঠিক ক'রে উঠতে পারছিনা ব'লে কলম উঠছেনা হাতে। দিল্লীতেই থেকে গেছি, দ্বারভাঙ্গা রাজার একান্ত সচিবের গন্ধটা তখনও লেগে রয়েছে গায়ে, একটা ভালো কাজ জোগাড় ক'রে ক্ষতিটা সম্ভবমতো পূরণ করবার চেষ্টা করছি, পেয়েছিও আশা কিছু কিছু, এই সময় দাদার একটি চিঠি পেলাম। দিন দশেক পরে। ওঁরা উড়ো খবরটা পেয়ে নশ্চ য় বিশ্বাস করতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, মহারাজের পার্টি ঘুরে ফিরে দারভাঙ্গায় পৌঁছাতে দিয়েছেন চিঠিটা।

দাদার চিঠিটা পেয়ে সেই আমার প্রথম চোখে জল এল। ক্ষতির দিকটা একেবারেই তোলেনি। লিখেছেন, নিশ্চয় কোন একটা সঙ্গত কারণেই আমি ছেড়ে দিয়েছি কাজ। তার জন্য বাবা, মা বা ওঁর কোন চিন্তা নেই। চিন্তা, আমি বিদেশে একেবারে একা প'ড়ে আছি ব'লে। যে কারণেই হোক, কাজটা ছেড়ে দিয়ে মন আমার বিশেষ ভালো থাকবার কথা নয়। আমি যেন কালমাত্র বিলম্ব না ক'রে ফিরে যাই দ্বারভাঙ্গায়।

ফিরে এলাম, ওঁদের আঘাত দিয়ে যাওয়া আমার যে অদৃষ্টলিপি এটা আমায় অনেকবারই মেনে নিতে হয়েছে। এর পর আমার অদৃষ্ট-লিপির আর একটা যে অংশ আছে—ব'সে না থেকে ভালোমন্দ কিছু একটা পেয়ে যাওয়া, সেটাও গেল ফ'লে। কিছুদিন পরেই একটা কাজ

জুটে গেল। যেমন জুটে এসেছে এ পর্যন্ত, অনায়াসে বা অল্প আয়াসে। এটা জুটে গেল একেবারেই বিনা আয়াসে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। প্রস্তাব এসে পৌঁছাল রাঘোপুরের পশ্চিম দেউড়ির বাবু রঘুনন্দন সিংহের ছেলের গৃহশিক্ষকতা করব? তার সঙ্গে তাঁর ইংরাজি চিঠিপত্র প্রভৃতির দায়িত্বটাও থাকবে। মাহিনা কিছু অল্প, তবে থাকা আর আহারাদির ব্যবস্থা দেউড়ি থেকেই।

জিনিষটা এই রকম ঃ—

দ্বারভাঙ্গা রাজের নিয়মমতো রাজার একেবারে কোনও নিকট আত্মীয় থাকলে—সহোদর-সহোদরা, অভাবে অভাবে ভাইপো-ভাগনে কেউ, তাঁদের একটা ক'রে জমিদারি দিয়ে আলাদা ক'রে দেওয়া হোত। সম্বন্ধের তারতম্য অনুযায়ী পঞ্চাশ ষাট হাজার থেকে একলাখ দেড় লাখ পর্যন্ত। এঁদের সাধারণ খেতাব ছিল "বাবুয়ান"। বাবু রঘুনন্দন সিং ছিলেন এইরকম এক "বাবুয়ান," বোধহয় দু'-তিন পুরুষ থেকে রাজ পরিবার থেকে পৃথক। যে সময়ের কথা সে সময় জমিদারি ভাগাভাগি হ'য়ে পশ্চিম আর পূর্ব দেউড়িতে দাঁড়িয়েছে। মূল সম্পত্তি বোধহয় লাখ দেড়েকের ছিল, উপস্থিত রঘুনন্দন ছিলেন সালিয়ানা পঁচাত্তর হাজার টাকার মালিক। ছেলে মাত্র একটি, দ্বিতীয় বিবাহে। তারই গৃহশিক্ষকতা। তৃতীয় শ্রেণী, অর্থাৎ তখনকার হিসাবে ম্যাট্রিকের দুই ক্লাস নীচের কোর্স পড়ে।

বাবুসাহেবের স্টেটের উকিল ছিলেন দ্বারভাঙ্গার সে সময়ের ফৌজদারি তরফের প্রধান উকিল বীরেন্দ্র বিশ্বাস। তাঁর কাকা বসন্ত-বাবুর ঐ সূত্রেই দেউড়িতে যাওয়া-আসা ছিল; তিনিই প্রস্তাবটা নিয়ে এসে বাবাকে জানিয়েছেন। নিয়ে নিলাম কাজটা।

জায়গাটা দ্বারভাঙ্গা থেকে ক্রোশ ছ'য়েক উত্তরে। এখান থেকে তৃতীয় রেলস্টেশন সাকরিতে নেমে যেতে হয়। পাণ্ডুল ক্রোশ দেড়েক উত্তরে। রাঘোপুর প্রায় ততটাই দক্ষিণে।

রাঘোপুরে প্রায় তিনটে বছর কি ভাবে কেটেছিল, ভালোমন্দ খতিয়ে বলা একটু শক্তই।

সে-চেষ্টা করার আগে একটা প্রশ্ন যা আমার মনে কৌতুকের আকারে দেখা দিয়েছে মাঝে মাঝে তার কথা একটু ব'লে রাখি—মাটি যেখানে মা, মাতৃভূমি, সেখানে তার আকর্ষণটা সত্যিকার মায়ের মতোই কি প্রবল থাকে? মায়ের মতোই একটা ছুতা-নাতা করিয়ে, একটা কিছু ঘটিয়ে, মাঝে মাঝে টেনে টেনে নিতে চায় নিজের কাছে।...এই তো পাণ্ডুলেরই আওতায় হঠাৎ এসে পড়েছি। পাণ্ডুল, তারপরেই সাকরি,

তারপরেই রাঘোপুর—ক্রোশ আড়াই-তিনের মধ্যে গায়ে গায়ে সাঁটা তিনটে গ্রাম, একই জল, একই বাতাস। এতটুকুই শেষও নয়। এর পরও পাণ্ডুল আমায় আবার টেনে নিয়েছে একেবারে নিজের কোলে। তার আরও অনেক পরে আবার এক নূতন যোগসূত্র। তারও অনেক পরে, একেবারে উত্তর জীবনে, সে আর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সেদিন আমার মাতৃভূমি যেন মূর্তিমতী হ'য়েই শতবৎসরপূর্বে প্রথম আগত আমার পিতামহ মধুসূদনের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের একটি বৃত্ত পূর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন।... একটা বাড়ি থাকলে, এক ছটাক জমি থাকলেও একটা পার্থিব যোগ থাকত, একটুখানি বৈষয়িক সম্বন্ধ। সে দিক দিয়ে একেবারেই নিঃসম্পর্ক। শুধু একদিন জন্মেছিলাম এই মাটিতে ব'লে তার এই জীবন্ত স্নেহ। আশ্চর্য লাগে। একটু সেন্টিমেণ্টাল বা ভাবালুতার মতো শোনায়, কেননা জীবনে আকস্মিকতার ক্ষেত্রে এমন কত যোগাযোগ ঘ'টে যাচ্ছে। তার মধ্যে এগুলো যে মাটি-মায়ের পরিকল্পিত এটা মনে করা নিশ্চয় মনের একটা ছেলেমানুষীই। হয়তো তাই, মায়ের সামনে ছেলে 'ছেলেমানুষই'। ভূমিকে যেখানে মায়ের স্তরে টেনে তোলা, সেখানেও তাই হবে বৈকি। তবু বড় রহস্যময় ঠেকেছে যোগাযোগগুলি। কথাটা এখানে একটু তুলে রাখলাম। যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে এসে পড়বে।

রাঘোপুরের কথায় আসা যাক।

পঁচাত্তর লাখ টাকার মালিকানা নিয়ে দ্বারভাঙ্গারাজ, তার জায়গায় মাত্র পঁচাত্তর হাজার টাকার মালিকানা নিয়ে রাঘোপুর দেউড়ি, সেই পরিমাণেই অখ্যাত, অনাড়ম্বর হবে। একটি খানিকটা জমিদারি স্টাইলের বড় বাড়ি। সামনে একটা বেশ বড় খোলা মাঠ। তার সামনে একটা বড় পুষ্করিণী। তার দক্ষিণে লম্বা খড়ের চালের নীচে খান চার-পাঁচ ঘর। চাকরবাকর আর অতিথি-অভ্যাগতের জন্য। জমিদারির একটা বড় প্রতীক, পুকুরের উত্তরদিকে খানিকটা দূরে একটা হাতিশালা। তাতে পায়ে শেকল বাঁধা একটা বেশ বড় হাতি ক্রমাগতই 'চারা' খাচ্ছে, আর গা দোলাচ্ছে। সমস্ত দেউড়িটা একটা বেশ বড় চত্বর নিয়ে, উঁচু দেওয়াল দিয়ে, সামনেটা বাদ দিয়ে, প্রায় সমস্তটা ঘেরা। তার পরেই একটা খাল বা পরিখা খানিকটা রাজকীয় মর্যাদা দিয়েছে দেউড়িটাকে। চারিদিকেই গ্রাম, তবে দূরে দূরে, ছাড়া ছাড়া, আর যেন একটা সসম্ভ্রম তটস্থ ভাব।

পরিবারটি নিতান্তই ছোট। বাবুসাহেব নিজে, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের

পরিবার "ববুয়াসিন সাহেবা," আর আমার চোদ্দ-পনেরো বছরের ছাত্র, কলাধারী সিং। ডাকনাম "বাচ্চা" অর্থাৎ খোকা। অন্দরমহলে হয়তো কিছু স্থায়ী স্বজন-আত্মীয়া। কারো কারোর শুধু যাওয়া-আসা, দূরে-কাছের অন্য সব বাবুয়ান-দেউড়ি থেকে। তবে, পূর্ব দেউড়ির সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। বাবুসাহেবের বয়স হয়েছে ষাটের কাছাকাছি। খুব সুস্থ নয়। বাইরে ঘোরাফেরা খুব কম, প্রায় নেই বললেই চলে। বারবাড়িতে একটা বেশ উঁচু হলঘর। সেখানেই থাকেন, সেখানেই একটা গদিতে ব'সে জমিদারির কাজ করেন। একেবারে দেশী, সেকেলে কায়দায়। সবচেয়ে বড় কর্মচারী 'দেওয়ানজী' মুক্তিনাথ দাসকে পাশে উবু হ'য়ে ব'সে কাগজপত্র বোঝাতে, সই নিতে দেখেছি। খালি গা, শুধু একটা উড়ানি জড়ানো।

অত্যন্ত সাদামাঠা মানুষ বাবু রঘুনন্দন সিং। কৃপণ ব'লে বদনাম আছে। তার সঙ্গে 'টাকার কুমীর'—ব'লে বদনাম বা সুনাম।

ইংরাজি লেখাপড়া বিশেষ জানা নেই। তবে, খুব তীক্ষ্ণধী—জমিদারি কাজে খুব বিচক্ষণ। মহারাজের সঙ্গে সম্পর্কটা খুব প্রীতির ছিলনা। জমিজমা নিয়ে রাজের সঙ্গে অনেক বাবুয়ানদেরই মামলা মোকদ্দমা লেগে থাকত। ঋণেও অনেকের মাথা বিকোনও ছিল। বাবুসাহেব ছিলেন দু'দিক থেকেই মুক্ত। সুতরাং মাথা নোয়াবার মতো কিছু ছিলনা। অ-সম্প্রীতির ব্যাপারটা বোধহয় ছিল কোন সামাজিক প্রশ্ন নিয়েই। মহারাজ ছিলেন সমস্ত শ্রোত্রীয় শ্রেণীর সমাজপতি।

আমার চাকরি নেওয়ার অনেক পরে একটা উড়ো কথা শুনি। এক সময়ের মহারাজের কর্মচারী আমাকে নিজের কর্মচারী ক'রে রাখার মধ্যে বাবুসাহেবের একটা দম্ভ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতারও নাকি ভাব ছিল।

আমার দিক দিয়ে পরিবর্তনটা ভালোই লাগল। অন্ততঃ প্রথম বেশ কয়েকদিন। মহারাজের মতো একজন অতিবিশিষ্ট ব্যক্তির একান্ত সচিব, প্রভুর মুখের আদেশের দিকে চেয়ে অবসরহীন দায়িত্বপূর্ণ চাকরি, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-অবসরহীন পর্যটন, তার স্থানে এই শান্ত পরিবেশে নিতান্তই অল্লায়াসের কাজ—প্রচুর অবসরের মুক্তি, যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচা গেল।

বাঁধা, রুটিন। সকালে জলযোগ সেরে ঘণ্টা দুই ছাত্রকে পড়ানো। এসে, চাকরকে দিয়ে দেহটাকে প্রচুর তৈলমার্জিত ক'রে পুকুরে অবগাহন স্নান, খানিকটা সাঁতারের সঙ্গে। ইতিমধ্যে আমার পাচকঠাকুর এসে রন্ধনশালায় প্রবেশ করেছে। সংক্ষিপ্ত আয়োজন। সম্পূর্ণ আনাড়ি, রন্ধনশিল্পে তার একমাত্র সার্টিফিকেট তার গলার মোটা পৈতার গোছা।

লোকটা কালা হওয়ায় রন্ধনে আমার যেটুকু বিদ্যা সেটুকুও তার কর্ণকুহরের মধ্যে প্রবেশ করাতে অসমর্থ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিতে হোল শেষ পর্যন্ত। সান্ত্বনামাত্র, যেটা পাতে এসে পড়ল, প্রচুর এবং পরিশুদ্ধ তৈল-ঘৃতের এবং সংযোগে রন্ধনশিল্পের দৈন্যটা অনেকখানি পূরণ ক'রে নিয়েই পৌঁছাত। ফল হোল, মাস দুই তিনের মধ্যে আমার স্বাস্থ্যের যা উন্নতি হোল তেমনটি এত অল্প সময়ের মধ্যে আর কখনও হয়েছে ব'লে মনে পড়েনা। অন্য দিক দিয়ে এর একটা কুফলও হোল। কয়েকবারই মনে হয়েছে লোকটাকে ছাড়িয়ে দিই। কিন্তু ঢালা অবসর, পাড়াগাঁয়ের মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু, অবগাহন স্নান, বিশুদ্ধ পর্যাপ্ত দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল—সব বাদ প'ড়ে গিয়ে সবার মুখে "বহেরু ঝার" হাতের স্পর্শ এত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে উচ্চারিত হ'তে লাগল যে, চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে আর তাকে ছাড়াতেও পারা গেলনা। ক্রমে স'য়েও এল।

আহারের পর একটি সুখনিদ্রা দিয়ে দু'টো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আবার ছাত্র নিয়ে বসা।

তারপর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টা বড় ভারি হ'য়ে চেপে থাকত মনের উপর। বাবুসাহেবের ইংরাজি লেখাপড়ার কাজ কিছু থাকলে আগেই ব'লে রেখে ডেকে নিতেন। না থাকলে, বাগানের সখ আছে চিরকাল, উঠানটা ঘেরে নিয়ে তাই নিয়ে খানিকটা কাটাতাম। তারপর আলো জ্বেলে কিছু বইখাতা নিয়ে বসতাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, শব্দের মধ্যে ঘরের বাইরে আগাছার জঙ্গলে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক, আর মাঝে মাঝে পাকশালায় "বহেরু ঝার" সদম্ভ হাতাখন্তি নাড়ার শব্দ। একটা অভঙ্গ শান্তি। রাত্রিটা সন্ধ্যার পরই যেন বারোটা বাজিয়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসেছে। লেখার খুব একটা মাহেন্দ্রযোগ। কিন্তু রাঘোপুরে প্রায় যে তিনটে বছর ছিলাম তার মধ্যে একটা লেখাও শেষ ক'রে কোথাও পাঠিয়েছি ব'লে মনে পড়েনা। আজ ভেবে বিস্মিত হই, এতবড় অবসরটাকে আমি হেলায় নষ্ট করেছিলাম কি ক'রে! তারপর আত্ম-বিচার ক'রে যা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সেটা বোধহয় খুব ভুল নয়। দেখেছি, একেবারে নিঃসঙ্গতার শূন্যতার মধ্যে আমার কলম যেন নিষ্প্রাণ হ'য়ে যায়। মানুষ ঘাড়ে এসে না পড়ুক, পরিবেশ খানিকটা নির্জন নিস্তব্ধ থাকুক, কিন্তু ইচ্ছা করলেই যেন সঙ্গ পাই; শিশু থেকে নিয়ে যে-বয়সেরই হোক, আসন ছেড়ে এগিয়ে গিয়েই হোক বা ডেকে নিয়েই হোক। আরও একটা কথা আছে। সেটা 'দেশ' বা কলকাতার সাহিত্যিক বাতাবরণ থেকে নিশ্চয় দূরে থাকার জন্যই। প্রথম বই "রাণুর প্রথমভাগ" প্রকাশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত—এদিকে যে আমার একটা সম্ভাবনা

আছে, এ বোধটা ভালো ক'রে আসেইনি। দ্বারভাঙ্গা—মজঃফরপুর থাকতে তবু অল্প যে একটা যোগসূত্র ছিল, রাঘোপুরের অজ পাড়াগাঁয়ে সেটা যেন একেবারে ছিন্ন হ'য়ে গেল। শখ ক'রে হয়তো এক-আধবার কলম তুলে নিয়ে থাকব, কিন্তু কাজ কিছু হয়েছিল ব'লে মনে পড়েনা।

এরপর আমার এই বৈকালিক নিঃসঙ্গতাও ঘুচল। যতদূর মনে পড়ে, নিতান্ত আকস্মিকভাবেই।

একদিন বাবুসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি সাকরির ডাক্তার শিবদাস ভট্টাচার্য ব'সে আছেন। কল পেয়ে বাবুসাহেবকে দেখতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে পূর্বে থেকে খানিকটা জানাশোনা ছিল, তবে তিনি যে দেউড়ির ডাক্তার এটা জানা ছিলনা। ওখানে কাজ হ'য়ে গেলে তু'জনে আমার বাসায় চ'লে এসে অনেকক্ষণ ধ'রে গল্পগুজব করা গেল। সে যে একটা কি স্বস্তি, এখনও ভুলতে পারিনি। খুব রসিক লোক, আমার সমবয়সীও, ভালো ডাক্তার, এদিকে বেশ আড্ডাধারীও, উনিই আমায় বিকেল-সন্ধ্যেটা সাকরিতে এসে কাটাতে বললেন। মাত্র তু'মাইল, আমার সাইকেল আছে, মিনিট পনের-কুড়ির পথ।

বেঁচে গেলাম। নয়তো আমার এই অসহ্য বৈকালিক নিঃসঙ্গতা বোধহয় এ কাজটাও ছেড়ে দিতে বাধ্য করত।

যদিও, আবার এ কথাও ব'লে রাখতে হয় যে, শেষ পর্যন্ত সাকরিই আমার কাজটা ছেড়ে দেওয়ারও হেতু হ'য়ে দাঁড়ায়। সে কথা পরে আসছে।

সাকরি অজানা জায়গা নয়, তবে রেল থেকে নেমে পাণ্ডুল থেকে ফিরে আসতে যা একটু ভাসা ভাসা পরিচয় মাত্র ছিল। স্টেশন ঘেঁসে ছোট্ট একফালি জায়গা, কিন্তু গিয়ে দেখি গুটি চার-পাঁচ বাঙ্গালী পরিবার নিয়ে ঐটুকুর মধ্যে বেশ জমজমাট।

শশীবাবু প্রবীণ ডাক্তার, জেলার এই অঞ্চলটায় প্রভূত পসার। বড়, বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার ; শিববাবুরও বয়স হিসাবে ভালোই চলে। স্টেশনে তু'একটি বাঙ্গালী পরিবার থাকেই। এ ছাড়া শশীবাবুর বাড়ির সঙ্গেই একটা কাপড়ের দোকান, "পরমনাগ" ব'লে একজন বাঙ্গালীরই। দ্বারভাঙ্গায় ছিলেন, সেখানেই আমাদের সঙ্গে পরিচয় ; এখন এখানে উঠে এসেছেন। সন্ধ্যার পর শশীবাবুর বাইরের বারান্দায় আড্ডা বসে। কয়েকজন ডাক্তারদের অনুগত বা অন্তরঙ্গ মৈথিলীও থাকেন। এমন ওঁদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের একটা মিল আছেই ; গান বাজনা, নানারকম গল্পগুজবে গুলজার হ'য়ে ওঠে বারান্দাটা। শশীবাবু ধর্মপ্রাণ মানুষ। ছোট ছোট মৈথিল ছেলেদের নিয়ে, তাদের জন্যে লাল রঙের জামা

করিয়ে একটা কীর্তনপার্টি গ'ড়ে তুলেছেন। কোন কোন দিন তারাই আসর মাৎ ক'রে দেয়।

আমার সবচেয়ে কষ্টকর সময়টা সবচেয়ে তৃপ্তির হ'য়ে উঠল। পড়ানো শেষ ক'রেই সাইকেল ক'রে চ'লে যাই। ঘণ্টা দুই কাটিয়ে মনটাকে তাজা ক'রে নিয়ে ফিরি। কোনদিন দেরিও হ'য়ে যায়। ফিরে এসে একেবারে আহারে ব'সে যাই। যে নিঃসঙ্গতা, যে স্তব্ধতা একটা আতঙ্ক হ'য়ে উঠেছিল, তার রূপ যেন একেবারে বদলে গেল। মেটে রাস্তা বেয়ে সাইকেল ক'রে আসতাম। মাথার ওপর তারাভরা নিঃসীম, নিস্তব্ধ আকাশ, আর নীচের অভঙ্গ ঝিল্লীরব আমার সঙ্গী হ'য়ে থাকত। বাড়ি এসেও হাত-পা ধুয়ে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকতাম অনেকদিন। আহার, তার পরেই নিদ্রায় রাত্রিটাকে এত শীঘ্র বিদায় দিতে যেন মনই করত না।

রাঘোপুর ভালো লাগতে লাগল। সপ্তাহান্তে আমি বাড়ি চ'লে আসতাম। রবিবারটা দ্বারভাঙ্গা, তারপর সোমবার সকালের গাড়ি ধ'রে রাঘোপুর। ট্রেনে মাত্র চল্লিশ মিনিটের পথ। আগে সাইকেলটা ব'য়ে আনতাম, অথবা এক্কা। সাকরির সঙ্গে পরিচয় হ'তে, আর একটা সুবিধা হোল। সাইকেল শশীবাবু বা শিববাবুর বাড়িতে রেখে দিতাম, সকালে গাড়িতে এসে আরও অল্পসময়েই পৌঁছে যেতাম কর্মস্থানে।

কেটে যেতে লাগল একরকম ক'রে। কিন্তু যতই হোক গ্রাম্য জীবনের একটা একঘেঁয়েমী লেগেই থাকে, বিশেষ ক'রে তার পক্ষে, যে-লোকটা খেলাধুলা, ক্লাব থিয়েটার, পাঁচরকমের হুজুগের মধ্যে মানুষ। এখনও একরকম সেই বয়সের মধ্যেই রয়েছে। তবে এই একঘেঁয়েমির খানিকটা দেউড়ির দিক থেকেও কেটে কেটে যেত।

সেও এক নূতন অভিজ্ঞতা আমার জীবনে।

বাবুসাহেব দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় বেশ কৃপণই ছিলেন। তবে পর্বে-উৎসবে একেবারে হাত খুলে দিতেন। গানবাজনা, কি 'নাটুয়া'র নাচ এসবে বড় একটা নয়, দেওয়া-থোওয়া আর খাওয়ানো-দাওয়ানোয়— এই রকম কি একটা উপলক্ষ—আমার ঠিক মনে পড়ছেনা—দ্বারভাঙ্গার বাড়িতে বলদের গাড়ি ক'রে এসে পড়ল এক বোরা চিঁড়ে, এক বোরা ভালো চাল, বড় চ্যাঙ্গারি ক'রে এক চ্যাঙ্গারি খাজা,—এক একটা আধসের তিনপো ওজনের, এক চ্যাঙ্গারি 'পাগল' অর্থাৎ চিনিতে-পাক করা মাখানা, একটিন ঘি, একটিন তেল। গাড়ির ওপর চার-পা বাঁধা একটা বড় খাসি। আমার একটা ছুটির তালিকা ছিল। তারই একটায় তখন দ্বারভাঙ্গায় রয়েছি খাসিটার ডাকেই সবাই বাড়ি থেকে

বেরিয়ে আসতে, বাবুসাহেবের একজন কর্মচারী একটা চিঠি দিল—দেউড়িতে অমুক পর্বের জন্য সওগাত পাঠিয়েছেন বাবুসাহেব।

ঠিক যে এই বিপুল পরিমাণে সব সময় আসত, এমন নয়। তবে, দেউড়ির কোন 'তেহবারে'—পর্বই বাদ যেতনা। বিশেষ ক'রে খাজা আর 'পাগল'—মাখানা নামক এক জলজ ফল। পাড়ার লোকে পর্যন্ত এসে যেত খেয়ে।

কেটে যেতে লাগল। এক বছর গড়িয়ে গিয়ে দ্বিতীয় বছর। আজ সেটা বুঝছি। কি অপব্যয়ই হ'য়ে গেছে যৌবনের সেই তিনটা বছর। অভ্যাসে মনের ওপর যেন একটা পলেস্তরা প'ড়ে গিয়ে, সে-বোধটুকু তখন নষ্ট হ'য়ে গেছে।···বেশ তো চলছে, চলুক না। ব্যক্তিগত অভাব-অনটনের পথ বন্ধই ক'রে দিয়েছি। সংসারের যা প্রাপ্য সেটুকু একরকম জুগিয়েই যাচ্ছি, আর চাইবারই বা কি আছে জীবনের কাছ থেকে?

মনটা টনটন ক'রে উঠত বর্ষার সময়টা। সাকরি প্রায়ই বাদ প'ড়ে যেত। এমনও হয়েছে, শনি, রবি বা অন্য কোন ছুটির দিনেই বৃষ্টি নামল, দ্বারভাঙ্গা যাওয়া পর্যন্ত গেল বন্ধ হ'য়ে। একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাড়িতে আবদ্ধ হ'য়ে সে যে কি ভয়াবহ সব দিন যেত এখনও মনে পড়লে হৃদ্‌কম্প উদয় হয়। আমি স্বদেশী করিনি, কিন্তু ইন্‌টারন্‌-মেণ্ট্‌ বা অন্তরীণ যে বিপ্লবীদের কত বড় শাস্তি উদ্ভাবন করেছিল ইংরাজ সরকার, যার জন্যে উন্মাদ পর্যন্ত হ'য়ে যেত মানুষে, তার তিক্ত স্বাদ আমার পেতে বাকি নেই।

দম ফুলত ভেতরে ভেতরে। দু'টো কথা ক'য়েও যে হালকা হব—তা কার সঙ্গে? চাকরকে দু-চারটে ফরমাসেই ফুরিয়ে যায়। "বহেরু ঝার" রান্না নিয়ে অনেক কিছু বলার থাকে অবশ্য, কিন্তু শুনছে কে?

ছেড়েই দোব চাকরি?

এই সময় একদিন অনিল এসে হাজির। আমার বাল্যবন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের সেই অনিল শীল।

তার কথা গোড়াতেই বলেছি। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে যেন নিক্ষিপ্ত হ'য়েই যে-অনিল একদিন এসে পৌঁছায় সে-অনিল তার পূর্ব সত্তার ধ্বংসাবশেষই। অন্ততঃ, প্রথম এসে যখন আমার নাম ধ'রে ডেকে দোর গোড়ায় দাঁড়াল, তখন একেবারে যেন তাই। অভুক্ত, পথশ্রান্ত, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

তবু অনিলই তো, মনে হোল যেন দেবদূত হ'য়েই সে আকাশ থেকে নেমে এসেছে।

তারপর, যেমন ওকে পেয়ে আমি, তেমনি আমাকে পেয়ে অনিলও

একটা তুর্লভ বস্তু পেয়ে থাকবে। একটা দ্রুত পরিবর্তন এসে পড়তে লাগল ওর মধ্যে। আগেকার তুলনায় একটু বেশি মৌন, তবু আমার ঘরের বাতাসে মানুষের কণ্ঠস্বর জাগাটা বাড়তেও লাগল। যত্নে, আহারে অনিল সুস্থ হ'য়ে আসছে, সহজ হ'য়ে আসছে, হাস্যপরিহাসে সেই আগেকার এক একটা দিনই আসছে ভেসে। বোধহয় প্ল্যানও ক'রে থাকব, থাকিনা তুই বন্ধুতে এখানেই। বাবুসাহেবকে বললে একটা যা হোক কাজ জুটে যেতে পারে।...জীবনে তু'জনের তো এক জায়গায় মস্তবড় মিল রয়েছেই...

সাড়াও পেয়ে থাকব।

তারপর বোধহয় মাস তিনেকের পর একদিন দ্বারভাঙ্গা থেকে ফিরে আসতে চাকরটা বলল—অনিল কিছু না ব'লে-ক'য়ে, যেমন বেড়াতে যায় আমার অনুপস্থিতিতে, সেই রকম বেরিয়ে গেছে—আর ফেরেনি।

আর ফিরলও না। আলোটা হঠাৎ নিভে গিয়ে অন্ধকারটা যেন একেবারে নিরেট নিশ্ছিদ্র হ'য়ে উঠল।

দোবই ছেড়ে চাকরি?...আর যে দম নিতে পারছিনা এই বদ্ধ হাওয়ায়।

কিন্তু এত সহজও তো নয়। একটা চাকরি ছাড়ার ঘা তখনও শুকায়নি ভালো ক'রে। সংসার আবার খানিকটা গুছিয়ে এসেছে, পড়াশোনার ধাপে ভাইয়েরা আরও খানিকটা উঠেছে, এবার ছাড়লে যে বিশৃঙ্খলাটা এসে পড়বে সংসারে সেটা আর হয়তো সামলানোই যাবে না।

তা ছাড়া, অন্ততঃ বাবা মাকে আঘাতটা এবার অনেক বেশি ক'রেই বাজবে। যে অস্থিরতা এসেছে আমার মনে, যে সব কারণে, সে সব তো নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যপার। তাঁরা তো দেখছেন বাড়ির কাছে বেশ একটি নিরুপদ্রব জীবন যাপন করছে তাঁদের ছেলে। একজন উদার-হৃদয় বিত্তশালী ব্যক্তির প্রীতি-স্নেহচ্ছায়ার মধ্যেই। তার প্রমানগুলি এত স্থূল, স্পষ্ট আর সন্দেহাতীতভাবে নিত্য এসে উপস্থিত হচ্ছে যে, সে-সম্বন্ধে আর প্রশ্ন করার কিছু থাকেনা। তাঁরা নিশ্চিন্ত।

মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বটা এক একসময় অসহ্য হ'য়ে উঠত। একবার ঠিকই ক'রে ফেললাম, বেশ কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে বাইরের জগৎটা আবার এক ঝোঁক দেখে আসি—এই তু-আড়াই বছরের অপরিচয়ে যতটা উষর মনে হচ্ছে সে-জগৎ, ততটা নাও হ'য়ে যেতে পারে। পেয়ে যাই কোন

একটা ঠাঁই তো ভালোই, নচেৎ...কিম্বা বাবুসাহেব যদি না-ই দিতে চান ছুটি? দিতে যে চাইবেন না, শুধু আমার ওপরই তাঁর ছেলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, না চাইবার যুক্তিটাই প্রবল—এসব কথা এবং এর পরিণাম আমার অবচেতনার স্তরে প্রচ্ছন্নই রইল।

বুঝছি অনিল এসে চ'লে যাওয়ার জন্যে সমস্ত ব্যাপারটা আগের চেয়েও আরও এত উৎকট হ'য়ে উপস্থিত হয়েছে। বুঝছি, কিন্তু দিনদিনই বেশি ক'রে অভিভূত হ'য়ে পড়ছি।

এই প্রবল দোটানার মধ্যে একটা পরীক্ষা করাও হ'য়ে গেল। এক-ঘেয়েমিটা নষ্ট করবার জন্যে মাঝেমাঝে সবচেয়ে ছোটভাই বিনয়কে এনে দু'চারদিন ক'রে রাখতাম। ঠিক করলাম, তাকে একটানা কিছুদিন এনে রাখলে কেমন হয়—দেখা যাক না। সবচেয়ে ছোটভাই, সমবয়স্কর সাহচর্য দিতে পারবে না, তবে অভাবে-অদর্শনে মনের স্নেহরসটা যে শুকিয়ে আসছে, সেটাকে ধ'রে রাখতে তো পারবে। ডাকেনামে "খোকা" তখনও (এখনও তাই আছে)। প্রকৃতিটা চঞ্চল। তাতে বাড়িতে সামলে রাখতে যে-পরিমাণে অসুবিধা, সেই-পরিমাণে এখানে আমার সুবিধাই হ'তে পারে।

নিয়ে এলাম তাকে।

কিন্তু স্কুলের ছাত্র। এখানে তার পড়াশোনার দিকটা অব্যাহত রাখলেও, ব্যবস্থাটা কায়েমী করা যায় না। একবার বাড়ি গিয়ে, কি কারণে ঠিক মনে পড়ছে না, কয়েকটা দিনের জন্যে আটকে গেলে একঘেয়েমিটা আরও উৎকট হ'য়ে উঠতে, আবার সেই সংকল্প। এবার "দিল্লী"র প্রায় কাছাকাছি।

কিন্তু কি ভালো যে করেছিলাম আর হঠকারিতা না ক'রে। এর দিনকতক পরেই এই অখ্যাত অজ্ঞাত অজ পাড়াগাঁয়ে আমার যে এক অভিজ্ঞতা, একটা যে অমূল্য সঞ্চয় আমার জীবনে তা আর কোথায় পেতাম বলতে পারিনা।

সেই কথায় আসি।

বোধহয় রবিবার, বা, কোন ছোট একটা ছুটির আগের দিন। ছাত্র বাচ্চাকে পড়াচ্ছি। আমার 'স্কুলটা' ছিল আমার বাসা আর দেউড়ির মাঝামাঝি একটা দোতলা ঘরে, সিঁড়ি বেয়ে একজন কর্মচারী এসে বলল—"পড়ানো হ'য়ে গেলে আমি যেন একবার বাবুসাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।

বেশ ভাল লাগল না। এ রকম দিনে বড় একটা ডাকেন না। ট্রেন ফেল করা, অন্ততঃ প্রথম ট্রেনটা ফেল করার সম্ভাবনা থাকে।

মনের বিরক্তিটা সাধ্যমত চেপে বললাম—"বেশ, আসছি"। পড়ানো শেষ হ'লে নেমে গিয়ে নমস্কার ক'রে বসলাম। আমার বিশেষ খাতিরের একটা নিদর্শন ছিল, গেলেই ফরাসটার ওপর—বাবুসাহেবের কাছাকাছি একটা চাদর চারপাট ক'রে পেতে দেওয়া থাকত।

বাবুসাহেব বললেন—"আপনাকে ডেকেছি একটা দরকারি কথা ব'লে দেওয়ার জন্যে। আজ তো যাচ্ছেন দ্বারভাঙ্গায়, আপনার পরিচিত একজন ইংরাজি জানা ভালো লোক এবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে হবে।"

আমি একটু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইতে বললেন—"আপনাকে অনেক আগে ব'লে থাকব, তবে তেমন ক'রে বলা হয়নি, অন্য কোনও কথার মধ্যে এসে পড়েছিল, মনে নেই আপনার। কথাটা হচ্ছে আমার মার "একাদশা" এসে পড়ছে এবার, মাস পাঁচেকের কিছু কমই আছে আর। এতে আপনার কাজ অনেক বেড়ে যাবে, বিশেষ ক'রে চিঠি পত্রের দিক থেকে। আপনাকে সাহায্য করবার একজন লোক দরকার হবে—নকল রাখতে, পাঠাতে, ফাইল করতে,—আরও কতরকম কাজ আসতে পারে যা আমরা এখন আন্দাজ করতে পারছি না। আমি এ কাজটা একটু বড় ক'রে করতে চাই। মায়ের কাজ, সামনে সপ্তাহ-খানেকের মাথায় একটা ভালো দিন পেয়েছি। আপনি নিয়েই আসবেন একজন, দ্বারভাঙ্গায় তো এরকম অনেক বাঙ্গালী থাকতে পারেন। দু'চারদিন যদি দেরিও হয় এর জন্যে তো থেকে যাবেন। বাঙ্গালী। আপনার সঙ্গেই থাকবেন। মাস ছয়েকের জন্যে।...হবে ?"

বললাম—"একটু ভেবে দেখি। অস্থায়ীই তো। তবে, মনে হয় অসম্ভব হবে না।"

"অসম্ভব হ'লে চলবে না। আরও কিছু আগে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমার। তবে, এদিকের ব্যবস্থায় বড় জড়িয়ে পড়েছিলাম। বলব বলব ক'রে হ'য়ে উঠছিল না।...আপনি যান, উঠুন। প্রথম গাড়িটা যেন না ছেড়ে যায়। অনেকখানি সময় পাবেন তাহ'লে।...আর হ্যাঁ, খাওয়ার ব্যবস্থা আপনার সঙ্গেই দেউড়ি থেকে। আর মাইনে আপনি যেমন বলবেন লোক বুঝে। যান।"

ট্রেনে আসতে আসতেই লোকও আমার একরকম ঠিক হ'য়ে গেল। শুধু জিজ্ঞেস ক'রে তাঁর মতটা নেওয়া।

পৃথ্বীশ বাবু। প্রায় আমারই বয়সী। তাঁর এক নিকট আত্মীয়া দ্বারভাঙ্গায় মহারাণীর প্রসাধনের কাজ নিয়ে রয়েছেন। তাঁরই আয়ের ওপর সংসার চলে। সংসারটি বড়ও। স্বামী আগে কোথায় কাজ

করতেন, উপস্থিত অবসরভোগী। কয়েকটি ছেলেমেয়ে। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে পৃথ্বীশবাবুও এসে রয়েছেন।

সাত ঘাটের জল খাওয়া, নানাধরণের বিদ্যা জানা, গান বাজনা থেকে কিছু কিছু ম্যাজিক—কসরৎ পর্যন্ত। ছিপছিপে, একটু খর্বাকৃতি, মাথায় বড় বড় চুল, সেই চুলের সঙ্গে দড়ি বেঁধে মোটর রুখে রাখা—এই জাতীয় কসরৎ দেখান। বিপদেও পড়েন। একটা বড় পরিচয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে স্বল্পদিন স্থায়ী বাঙ্গালী পল্টনে ছিলেন। মোটকথা, এদিকের ভাষায় যাকে "হর্‌ফন্দ্‌বন্দা" বলে সেই ধরণের মানুষ। চৌকশ, সব কাজেই আছেন। দ্বারভাঙ্গার যুবক সমাজে বেশ একটি জায়গা ক'রে নিয়েছেন। বেশ আমুদে-আহ্লাদে, অথচ সিগারেট-বিড়ির বেশি অন্য কোনও রকম দোষ নেই।

বসেই আছেন। রাজি হ'য়ে গেলেন। পরের দিন বিকালেই তাঁকে নিয়ে এসে বাবুসাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে সব ঠিক ক'রে ফেললাম। পরের দিন থেকেই কাজ শুরু হ'য়ে গেল। রাঘোপুরের কঠোর, বিশুষ্ক দিনগুলোর চেহারা একদিনেই গেল পালটে।

রাঘোপুরের বাবু রঘুনন্দন সিংয়ের সপ্তম মাসের মাতৃশ্রাদ্ধে (ওদের ভাষায় "ছায়া") সে সময় সারা মিথিলায় একটা বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। পূর্বেই বলেছি, দৈনন্দিন জীবনে কৃপণ হ'লেও মাঝে মাঝে এক একটা কাজ করতেন যা, এমনকি মহারাজের কাজকেও ছাপিয়ে যেত। খরচ নিশ্চয় মহারাজই বেশি করতেন, কিন্তু বাবুসাহেবের এমন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ করবার ক্ষমতা ছিল, আর, এমন ফলাও ক'রে যে, তিনি যেন তারও উপরে টেক্কা মেরে যেতেন, অন্য রাজা জমিদারদের কথা দূরে থাক। আমি আসার অনেক পূর্বে আমার ছাত্রের যে উপনয়ন হয়, আমি আসার সময় পর্যন্ত তার আড়ম্বরের কথা তখনও চারিদিকে ছেয়ে রয়েছে।

মাতৃশ্রাদ্ধে বাবুসাহেব নিজেকেও ছাড়িয়ে যান। এমন একটা বিরাট সমারোহ—যা পৌরাণিক যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়, আমি আর দেখিনি, কেউ আর দেখবেও না। তার কারণ, বিশ্বাস-ভক্তি-শ্রদ্ধায় পিতামাতার শ্রাদ্ধের সে-মর্যাদা আর নেই, তার একটা কারণ, পিতামাতাই এযুগে তাঁদের আসন থেকে সন্তানের দৃষ্টিতে যাচ্ছেন নেমে।

সে-দুঃখের কথা থাক।

আমাদের প্রথম কাজ হোল, একরকম সমস্ত ভারতবর্ষেরই বাছা বাছা নামকরা পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া। দু' শ্রেণীতে। বড় বড় দরবার-পণ্ডিত—বরোদা, মহীশূর, বিজয়নগরম্; রাজস্থানের সব বড় বড়

দরবার; জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, গোয়ালিয়র; পাঞ্জাবের পাতিয়ালা; কাশ্মীর, আরও অনেক। অ-দরবারভুক্ত সর্বভারতীয় যশ-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্মণ শাস্ত্রী আর তাঁর স্তরের কয়েকজন। বিহারের বড় বড় বাছা বাছা পণ্ডিত। মণিপুর, ত্রিপুরা, কুচবিহার। মিথিলার মহামহোপাধ্যায় পরমেশ্বর ঝা (দ্বারভাঙ্গার সভাপণ্ডিত) থেকে নিয়ে নির্বিচারে সব বড় বড় পণ্ডিত।

বাবুসাহেবের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি ক'রে পড়েছিল বাংলার ওপর। সে কথা একটু আলাদা ক'রেই বলতে হয়।

বাবুসাহেবের একটু বিশেষভাবেই বাঙ্গালীপ্রীতি বা বাঙ্গালীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল। সম্পর্কটাও দু-পুরুষ ধ'রে। ওঁর বাবার গৃহশিক্ষক ছিলেন বাঙ্গালী। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বীরেন্দ্র বিশ্বাস পরে ওঁদের স্টেটের উকিল হন। বাবুসাহেব গ্রাম ছেড়ে বড় একটা বেরুতেন না। আমার সময় একবার মাত্র বেরোন কলকাতায় চিকিৎসার জন্য। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ডাকা হয়। আমি ছিলাম। এর পূর্বে একবার কলকাতা যাওয়ার পথে ওঁর অপ্রত্যাশিতভাবে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে গাড়িতে পরিচয় হয়। তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে সেবার নেপাল রাজলাইব্রেরীতে পুরাতন পুঁথিপত্রের কাজ ক'রে ফিরছিলেন। যেতে যেতে গাড়িতে সাক্ষাৎ, পরিচয় এবং যেতে যেতেই পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য। পত্রাচারও হয়তো চলেছিল কিছু কিছু। নিমন্ত্রণও ক'রে রেখেছিলেন। তবে, আসবার সুযোগ হয়নি, এবার মাতৃশ্রাদ্ধে আসার সম্মতি জানিয়ে পাঠালেন। শুধু একা নয়। তাঁর পুত্র (বোধহয় সর্বকনিষ্ঠ) ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তখন বরোদার স্টেট লাইব্রেরিয়ান্, তাঁকে নিয়ে আসবেন জানালেন। অপরদিকে তিনিই তখন বাংলার পণ্ডিত সমাজের কিং মেকার (King maker) বা হর্তাকর্তাবিধাতা। তাঁর কাছ থেকে ঠিকানা আনিয়ে সে সময় বাংলার যত মহামহোপাধ্যায় তাঁদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এটা যেন বাংলার বিশেষ খাতির। যাতায়াতের ব্যবস্থায় দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া, একজন শিষ্য বা সঙ্গীর মধ্যম শ্রেণীর রেলভাড়া। এবং যথোপযুক্ত "বিদায়"।

একটু পাদটীকা দরকার। সে সময় রেলে চারটি ক'রে শ্রেণী ছিল। প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম বা ইণ্টার এবং তৃতীয় শ্রেণী। তখনকার দ্বিতীয় শ্রেণীটা, আজকালকার মধ্যম শ্রেণী উঠিয়ে দিয়ে এবং তৃতীয় শ্রেণীর একটা দাঁড়ি লুপ্ত ক'রে দিয়ে দুই দাঁড়ি মাত্র সম্বল কাষ্ঠাসনযুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণী নয়। সে-সময়ে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং ঐ স্তরের অফিসাররা

সাধারণতঃ মধ্যম শ্রেণীই ব্যবহার করতেন। প্রথম শ্রেণীটা ছিল ইংরাজ এবং জজ-ম্যাজিস্ট্রেট গোত্রের বড় বড় ভারতীয় অফিসারদের জন্য। সাধারণ জমিদার শ্রেণীর লোকেরাও দ্বিতীয় শ্রেণীই পছন্দ করতেন। প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াতের কোনও আইনগত বাধা অবশ্য ছিল না। তবে, সাহেবদেরই একচেটিয়া এবং তাদের আচরণও অনেকটা উদ্ধত হবার জন্য আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও ওটা সাধারণতঃ পরিহারই ক'রে যেতেন সবাই।

সে সময় বাংলার চারিদিক দিয়েই সুদিন। 'মহামহোপাধ্যায়'ও সব চেয়ে বাংলাতেই বেশী। ঠিক কতজন ছিলেন এখন মনে নেই, তবে সবাইকেই লেখা হয় এবং আসেন এক সেখান থেকেই প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ জন। স-শিষ্য।

আর একটি ব্যাপার হ'য়ে এই যজ্ঞে বাংলাকে আরও বিশিষ্ট ক'রে তুলল। সে সময়, যতদূর মনে পড়ছে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন প্রখ্যাত এটর্ণি ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। অথবা কিছুদিন পূর্বে ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকে অবসর নিয়েছেন। পত্রাচার চলছে—অনেকেরই সম্মতি এসেও গেছে—এই সময় হঠাৎ একদিন ডাঃ দেবপ্রসাদের এক চিঠি এসে হাজির। ব্যক্তিগতভাবে বাবু সাহেবকে লেখা—শুনেছেন, সম্পূর্ণ পৌরাণিক সমারোহে উনি মাতৃশ্রাদ্ধ করছেন, ডাঃ সর্বাধিকারী এক অভাবনীয় ঘটনা ব'লেই প্রত্যক্ষ করতে চান, যদি বাবুসাহেবের কোনও অসুবিধা না হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁকেও উপযুক্ত ভাষায় সাদরে নিমন্ত্রণ করা হোল।

এঁদের তিনজনের যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর টিকিট। বিদায় যা দেবেন তা মনের মধ্যেই রইল বাবুসাহেবের। খুবই উল্লসিত হ'য়ে উঠেছিলেন।

দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, সব রকম আয়োজনের ব্যস্ততায় সুপ্ত গ্রামটা দেউড়িকে কেন্দ্র ক'রে যেন জেগে উঠতে লাগল। সপ্তাহ-খানেক ধ'রে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের থাকা-খাওয়া, তারপর শ্রাদ্ধের তিনদিন ব্যাপী বিরাট ভোজ—"কুটুম্" অর্থাৎ যত শ্রোত্রীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বাবুয়ানদের নিয়ে (যাঁরা আসবেন) সপরিবার (অবশ্য স্ত্রীলোক বাদ), তারপর "যোগ" অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মণ, বাছা বাছা। এর সঙ্গেই। পণ্ডিতদের ব্যবস্থা আলাদা; তার মধ্যেও বহিরাগত পণ্ডিতদের ব্যবস্থা আরও আলাদা।

এঁদের জন্যে বিশেষ ক'রে বাঙ্গালী-পণ্ডিতদের জন্যে যা ব্যবস্থা তা বাবুসাহেব আমার দায়িত্বে ছেড়ে দেন।

আমার বাসার দক্ষিণে কিছুদূরে দেউড়ির উল্টো দিকে একটা আম-বাগানে, রাস্তা কেটে, কয়েকটা লাইনে তাবু ফেলা হোল। দরবার পণ্ডিতদের মধ্যে, যতদূর মনে পড়ছে, অধিকাংশই সম্মতি জানালেও আসতে পেরেছিলেন মাত্র বরোদা, ত্রিপুরা, মাদ্রাজের দিক থেকে জন তিন চার। এক-একটি তাঁবুতে দু'জনের ক'রে ব্যবস্থা; তবে অনেক-গুলো খালি থাকায়, একজন ক'রে রাখায় প্রায় গোটা কুড়ি-পঁচিশটা তাবুর সবগুলিই ভর্ত্তি হ'য়ে গেল।

এঁদের সবার পাকের ব্যবস্থা নিজের নিজের তাঁবুতে। দু'বেলা প্রচুর পরিমাণে এবং নানা বিচিত্র সম্ভারে "সিধা" পৌঁছাত। কাছাকাছি জন তিনেক নিয়ে একটা ক'রে চাকর, জল জোগানো আর অন্যান্য ফাই-ফরমাস খাটার জন্য।

প্রচুর ব্যবস্থা। সাধ্যমতো কোন খুঁৎ যাতে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই। অতগুলি পণ্ডিতকে সক্‌রিতে সব ট্রেনের জন্য লোক রেখে নামিয়ে আনা থেকে তিন চারদিন পর্যন্ত রেখে আবার পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সে যে কি ঝুঁকিটা বহন করতে হয়েছিল তা এখনও পর্যন্ত মনে আছে। একে পণ্ডিতী মেজাজ, (কিছু ব্যতিক্রম হয়তো ছিল), তার ওপর, মাদ্রাজী পণ্ডিতের মাত্র সংস্কৃত সম্বল—তাঁদের স্বকীয় উচ্চারণেই সব মিলিয়ে দিশেহারা ক'রে তুলেছিল সবাইকে।

আমি আমার দু'জন ভাই, একজন জ্ঞাতি ভাইপো, তিনজনেই ছাত্র, আর কয়েকটি বাঙ্গালী যুবককে নিয়ে দশবারোজনের একটি স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী গ'ড়ে নিয়ে প্রস্তুত রেখেছিলাম। দূরত্বের জন্য দু'দিন দু'এক ক্ষেত্রে আরও আগে থেকে নিমন্ত্রিতদের আসা শুরু হ'য়ে গেল। তাঁদের ব্যবস্থা আমার তত্ত্বাবধানে এরা সুচারুরূপেই সম্পন্ন করে। কয়েকজন বাঙ্গালী মহামহোপাধ্যায় বদ্‌মেজাজি ও ছিদ্রান্বেষী ছিলেন। ছেলেরা তাঁদের এড়িয়ে চলতেই চাইত, আমাকে কাজের মধ্যে থেকে গিয়ে সামলাতে হোত। এ ছাড়া এদের বেশী বিপন্ন হতে হোত মাদ্রাজী কয়েকজন পণ্ডিতকে নিয়ে। তাঁদের যেটুকু সংস্কৃত জ্ঞান, বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ কৌমুদীর দৌলতে, তাতে প্রথমতঃ বক্তব্যের 'পাঠোদ্ধার' করাই শক্ত হ'য়ে পড়ত। তারপর সংস্কৃতে উত্তর দেওয়া। এমনও হয়েছে, মাদ্রাজীরা আপামর সবাই ইংরেজী জানে মনে ক'রে ইংরাজিতে উত্তর দিতে গিয়ে, তাঁদের অজ্ঞতার জন্য ঠাট্টা করা হচ্ছে মনে করায় তাঁদের সংস্কৃত আরও উগ্র এবং দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠেছে। এরা এদিকে এদের অপটু এবং দুর্বোধ্য সংস্কৃতের সঙ্গে নানা রকমের আকার ইঙ্গিত মিলিয়ে যতই নিজেদের বক্তব্য স্পষ্ট করবার চেষ্টা করছে ততই রীতিমতো

একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হ'য়ে ওঠাতে আমার ডাক পড়েছে, গিয়ে কোনও রকমে ঠাণ্ডা করেছি।

এর সঙ্গে আর একটা কথা ব'লে রাখা দরকার যার জন্যে পরিস্থিতি কখনই আয়ত্তের বাইরে গিয়ে পড়েনি এবং ঠাণ্ডা করতেও বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। দেখেছি বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মৈথিল, বারাণসী বা যে-স্থানেরই হোক, সংস্কৃত-পণ্ডিত মাত্রেই "আশুতোষ"। আশুতোষ শিবের মতই তাঁদের দপ ক'রে জ্বলে উঠতেও যেমন দেরি হয় না (যাঁদের এ রকম মেজাজ) আবার পরক্ষণেই একেবারে "জল" হ'য়ে পড়তেও সময় লাগেনা। আর, প্রথম প্রথমই এ ভাবটা একটু রইল। তারপর সবার অভাব-অভ্যাস জেনে যাওয়ার পর স্বেচ্ছাসেবকরা সতর্কই রইল। তাতে বিশেষ ক'রে মাদ্রাজী পণ্ডিতদের কোনও পক্ষের আর সংস্কৃত আমদানি করার প্রয়োজন একেবারে লুপ্ত হওয়ায় বেশ অ-সংস্কৃত, নীরব শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ চ'লে যেতে লাগল।

আমার বিশেষ তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডাঃ সর্বাধিকারী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই আর ডক্টর বিনয়তোষ। ডক্টর সর্বাধিকারীর জন্য, যতদূর মনে পড়ছে, আমার "স্কুলের" দ্বিতলের ঘরটা দেওয়া হয়। শাস্ত্রী মশাই আর বিনয়তোষ আমার সঙ্গেই আমার বাসাতেই ছিলেন। ওঁদের আহারাদির ব্যবস্থা, বাঙ্গালী রীতিতে, সেটাও ছিল আমারই এলাকায়।

আর মনে পড়ছে, কতকটা আমার সঙ্গেই ছিলেন, ভাটপাড়ার মহামহোপাধ্যায় রাখাল ন্যায়রত্ন। ইনি হয়তো রাত্রিবাস করতেন কাছের একটা তাঁবুতে, একা বা অন্য কারুর সঙ্গে, তবে স্বপাকে আমার বাসাতেই রন্ধন করতেন।

বলা বাহুল্য, আমার এই অস্থায়ী বিরাট 'পরিবার'এর জন্য, স্বেচ্ছা-সেবকদের নিয়ে—কয়েকখানা অস্থায়ী ঘর অনেক পূর্বেই খাড়া করা হ'য়ে গিয়েছিল।

কাজের অত্যধিক দায়িত্ব, অত্যধিক ভিড়ও। তবু, তারই মধ্যে আমার দিনগুলো বেশ লঘু আনন্দেই কেটেছিল। প্রথমতঃ, কাজ যতই কঠিন হোক, উপভোগ করতে পারলে তার কাঠিন্য বহুল পরিমাণে কমে যায়। সেদিক দিয়ে আমার দিনগুলো যেন হালকা পাখায় উড়ে উড়ে যেতে লাগল।

এর অনেকগুলি কারণ ছিল।

প্রথমতঃ, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের প্রধান যা অঙ্গ, যজ্ঞ, হোম ইত্যাদি, অন্যদিকে, দলে দলে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা—এর সঙ্গে আমার আদৌ কোনো সম্বন্ধ ছিল না। সেটা, মাঝখানে দেউড়ি রেখে আরও

ওদিকে। চাপা সাগর-গর্জনের মতো তার আওয়াজটা এসে পড়ত আমাদের কাণে। কিন্তু উর্মি-উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়বার সম্ভাবনা ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, আমার তত্ত্বাবধানে তু'জন বিশিষ্ট অতিথি-মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মশাই—আর ডক্টর সর্বাধিকারী—আজকালকার ভাষায় ভি. আই. পি.—যাঁরা কাছে থাকলে তটস্থই হ'য়ে থাকতে হোত, তাঁরা থাকতেন অনুপস্থিত। তু'জনেই শুদ্ধ বৈদিক পৌরাণিক প্রথায় মৈথিল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, মৈথিলদের ভোজ, সাত-আট ঘণ্টাব্যাপী ভোজ, কোনও দিন "চূড়া-দহি", কোনও দিন "পুরি-জিলাপি", তার সঙ্গে "লাড্ডু-খাজা" থেকে নিয়ে নানারকম মিষ্টান্ন—ঘুরে ফিরে এইসব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে বেড়াতেন। ঘুরতে ঘুরতেই পণ্ডিত-মণ্ডলীর কোনও তর্কাতর্কির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন—কিম্বা ক্লান্তি বোধ করলে বাবুসাহেবের দরবারে এসে ব'সে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতেন। মোট কথা, এক, আহার আর খানিকটা বিশ্রাম ছাড়া তাঁরা তু'জনে একরকম সর্বক্ষণই ওদিকেই কাটাতেন। ডক্টর সর্বাধিকারী চ'লেও গেলেন বোধহয় তু'টো দিন থেকেই—আসা-যাওয়া মিলিয়ে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা মাত্র।

আমাদের তিন জনের ঢালা আড্ডা অষ্টপ্রহরই চলত একরকম। পৃথ্বীশবাবু তো ছিলেনই, বিনয়তোষও এক নম্বরের আড্ডাবাজ। নানা ধরণের গল্প—পৃথ্বীশবাবুর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা, বিনয়তোষের বরোদা অঞ্চলের। হাসির খোরাকও থাকত প্রচুর, তার ওপর মৈথিল ভোজের বিপুলতা, এদিকে আমবাগানের বাঙ্গালী-মাদ্রাজী পণ্ডিতদের সদ্য-আহরিত কাহিনী—সব রং ফলিয়ে হাসির খোরাকে পরিণত করবার বিনয়তোষের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল—হাসিতে উচ্চকিত হ'য়ে উঠত আমাদের আড্ডা এক এক সময়। সেই নীরব-নিথর রাঘোপুরে ব'সেই যে এসব ঘটছে, ভুলে যেতে হোত।

কিন্তু এত হ'য়েও তো যজ্ঞ অসম্পূর্ণই; মিথিলার সমাজপতি, মিথিলা-নরেশ, দ্বারভাঙ্গা-মহারাজ কোথায়? পূর্বে বলেছি, বাবুসাহেবের সঙ্গে রাজের সম্বন্ধটা ভালো ছিল না। তবু মহারাজাও একদিন এলেন। বাবুসাহেব তীক্ষ্নবুদ্ধিশালী, তার ব্যবস্থাটা পূর্বেই গোপনে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। কাজ চুকেবুকে যাওয়ার পর আমায় একদিন কথাটা একান্তেই বল্লেন—

"মহারাজা না এলে যে চলবেনা এটা আমার সিদ্ধান্তই করা ছিল। কিন্তু সম্বন্ধ প্রায় বিচ্ছিন্ন, তায় তাঁর ওপর একরকম টেক্কা দিয়েই এ-কাজটা যে করতে যাচ্ছি, এতে আর সবাই যত বাহাবা দেবে, তাঁর

রাগটা আরও যাবে বেড়েই। একটা বড় কাজ করতে যাচ্ছি, বাবু (আমায় এই ব'লেই সম্বোধন করতেন)। মহারাজের অনুপস্থিতি যেমন অশোভন, তেমনি বিপজ্জনক। ইচ্ছে করলে রাঘোপুর 'পশ্চিম তরফকে' —গিলে ফেলতে দ্বারভাঙ্গার কতটুকু লাগে? আমি চিরকাল থাকব না, এরপর ছেলেটা আছে। অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ করতে হবে, এবং তা আমায় নিজেই গিয়ে। বয়সে জ্যেষ্ঠ, বড়-ভাই ছোট-ভাইয়ের সম্বন্ধ। পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করার রীতি আমাদের। আমি পা দু'টো চেপে ধরলাম। বললাম—সব মার্জনা ক'রে আমায় মাতৃদায় থেকে উদ্ধার করতেই হবে। আপনারও তো চাচি তিনি।'

অসুবিধা হোলনা। চতুর মানুষ, বোধহয় আমায় এই ধরণের একটা সুযোগ দেওয়ার জন্যেই একেবারে নিভৃতে সাক্ষাৎকার দেন। পিঠে হাত দিয়ে বললেন, বেশ যাও।'

মত বদ্‌লে ফেলতে কতক্ষণ বাবু?—কোন একটা ছুতোনাতা ক'রে? বড়লাট, কি গভর্ণর কেউ ডেকেছেন বললেই তো স্বর্গের চাচিকে স্বর্গেই থেকে যেতে হয়, ভাসুরপোর শ্রদ্ধার লোভ ছেড়ে। আমি তার ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছিলাম মনে মনে। ···আপনি ঐ যা দেখলেন, কাজকর্মের শেষ দিনে—আমি বেঁধে ফেললাম মহারাজাকে"—

একটি চতুর হাসি নিয়ে বাবুসাহেব আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

সে এক বিরাট ব্যাপার। বাবুসাহেবের মাতৃযজ্ঞের মতোই। সে রকম বিরাট ব্যাপার, মিথিলাতেও আর সে-রকম জিনিষ কেউ দেখতে পাবে না। নানা কারণেই। প্রথমতঃ, বিশ্বাস আর নিষ্ঠার অভাব। সে যুগই নেই, ফেরার সম্ভাবনাও নেই। দ্বিতীয়তঃ, সে পণ্ডিতসমাজই অবলুপ্ত একরকম। ছড়িয়ে-টড়িয়ে থাকলেও তাদের একত্র ক'রে সে দিনের সেই "দানসাগর" শ্রাদ্ধ প্রশ্নেরই বাইরে একরকম।

দ্বারভাঙ্গা রাজের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সুদৃশ্য শামিয়ানা আনিয়ে খাটানো হয়েছে দেউড়ির সামনে প্রশস্ত মাঠটায়। এত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সমাবেশ, একটা "শাস্ত্রার্থ" বা তর্কসভা হবে সকালে। তার শ্রেষ্ঠাংশও বাঙ্গালী পেলে। না দিয়ে উপায়ও ছিল না। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা-নাথ তর্কাবাগীশ্ তখন সারাভারতেই ন্যায়শাস্ত্রের মুকুটমণি, বয়সেও প্রবীণ। তিনি হলেন অধ্যক্ষ বা বিচারক।

তারপর যে উপায়ে, স্বর্ণসূত্রেই বলি, বাবুসাহেব বেঁধে ফেললেন মহারাজাকে বিকালে তার উদ্বোধন হোল।

মহারাজা ভারতধর্ম-মহামণ্ডলের স্থায়ী সভাপতি। এরকম বিপুল এক

পণ্ডিত-সমাগম—মহামহোপাধ্যায়ই বোধহয় জন চল্লিশের কাছাকাছি—এ সুযোগ সম্ভব ছাড়া মহারাজের পক্ষে ?

এর পূর্বে তাঁকে একদিন দেখেছিলাম এই ভূমিকায়। হরিহর ক্ষেত্রে, সে ছিল নিছক সন্ন্যাসীদের সমাবেশ। এ হোল চারদিকের যত দেশ-বিশ্রুত পণ্ডিত, বিদ্বান, জ্ঞান-গরিমায় সনাতন ধর্মের স্তম্ভস্বরূপ। রাজকীয় সমারোহের সঙ্গেই আয়োজিত সভা। শীর্ষদেশে তাঁর মসনদের আসনে দাঁড়িয়ে মহামণ্ডলের সভাপতি। মহারাজা তাঁর লিখিত ভাষণ দিলেন। সে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা গেছে আমার জীবনে।

একটু যে ব্যক্তিগতভাবে আমার কথাও এসে পড়ে সে সম্বন্ধেও ব'লে রাখি—গুটিকতক শব্দেই হ'য়ে যায়। একসময় মহারাজের নিকট কর্মচারী, আজ এখানেও মনিবের সঙ্গে প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ, এদিকে ওঁদের দু'জনের মধ্যেকার সম্বন্ধ বেশ স্বাভাবিক নয়ই বলা যায়, এ অবস্থায় আমাদের আকস্মিকভাবে পরস্পরকে দেখে ফেলা উভয়ের পক্ষেই অস্বস্তিকর ব'লে মনে হয়েছিল আমার। সুখের বিষয়, মহারাজাকে অভ্যর্থনার ব্যাপারে আমার কোন অংশই ছিল না। নিজেকে দূরে দূরে রাখার কোন অসুবিধাও হয়নি আমার।

উনি চ'লেও যান অল্প সময়ের মধ্যে। আসামাত্র বোধ হয় দেউড়িতে পুরস্ত্রীদের পক্ষ থেকে বিদ্যাপতির গীত সংযোগে আবাহন, অভিনন্দন, কিছু মাঙ্গলিক উপঢৌকনের সঙ্গে। বেরিয়ে এসে সভামণ্ডপে উদ্বোধন-বক্তৃতা, তারপরই মোটরযোগে দ্বারভাঙ্গা। সব মিলিয়ে ঘণ্টা দেড়েকের ব্যাপার।

শেষ হোল বাবুসাহেবের মাতৃপূজা।

আমার "খাতির" বাবুসাহেব খুব ভালোভাবেই করেছিলেন। আর সব কথা বাদ দিয়েও "বিদায়"-এর যে কাশ্মীরী শালটা পাই, হাজার টাকায়ও সে শাল এখন মেলেনা। একটা পুণ্য উপলক্ষের স্মারক হিসাবে রক্ষা ক'রে বছর চার আগে পর্যন্ত ব্যবহার করেছি। এখনও আছে, তবে গায়ে তোলা যায়না। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর জিনিস।

তবে আমার সবচেয়ে লাভ হোল বাংলার দু'টি সেকালের বিশিষ্ট মনীষীর সঙ্গে পরিচয়। তা থেকে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা। কাজ শেষ হ'য়ে গেলে আমি শাস্ত্রী মশাইকে দ্বারভাঙ্গায় নিয়ে আসি। দু-তিন দিন ছিলেন আমাদের বাড়ী। দু'তিন দিনেই বাবার সঙ্গে যে অত সৌহার্দ্য জমে উঠেছিল, সেটা টের পাই ফিরে গিয়ে তাঁর লেখা চিঠিতে। বাবাকে কি লেখেন, সোজাসুজি তাঁকে নিজের মনের ভাব উপযুক্ত ভাষায় মণ্ডিত ক'রে লেখায় অসুবিধা ছিল নিশ্চয়, তবে, আমার চিঠিতে

মন উজাড় ক'রে বাবার প্রশংসা করেন। দু'টো দিনেরই সংস্রবে এক-জনকে বুঝে নিয়ে অমন একটা নিখুৎ চিত্র এঁকে দেওয়া খুবই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল সে-সময় আমার। দুঃখের বিষয় সুপরিকল্পিত, সুনিয়ন্ত্রিত জীবন নয়, অনেক অমূল্য চিঠির সঙ্গে সেটিও হারিয়ে ব'সে আছি।

এখানেই শেষ হোলনা। এর কিছুদিন পরে কলকাতায় যাওয়ার সুযোগ হয় আমার। দু'জনের সঙ্গেই দেখা করি বাবুসাহেবের কিছু সওগাত নিয়ে। শাস্ত্রীমশাই আমায় নিয়ে খুব ঘুরলেন। তাঁর নিজেরই কাজে অবশ্য, তবে সর্বত্রই আমায় সঙ্গে নিয়ে, নানা বিষয়ে গল্প করতে করতে, নানা দ্রষ্টব্য জিনিসের পরিচয় দিতে দিতে। নানা অভিজ্ঞতায় ঠাসা মাথা, সরসমন, সদালাপী, গল্প করতেন যেন বয়সের প্রভেদ না রেখেই। মনে আছে ইউনিভারসিটির সিনেট হলে নানা বিভাগে ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাঘোপুরের গল্পও ফুরোতে চায় না।

এরপর 'সাহিত্য পরিষদে' নিয়ে গেলেন আমায়। নিজেরই কাজ ছিল। সেখানেও অফিসের সবার সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিয়ে আমায় নিয়ে ভেতরে চ'লে গেলেন। স্বভাবতঃই দু'তিনজন কর্মচারী সঙ্গ নিলেন। গল্প করতে করতে আমায় লাইব্রেরীর বিভিন্ন বিভাগ দেখাবার সঙ্গে হলে টাঙ্গানো ছবিগুলোর পরিচয় করাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে চলছে পরিষদের আদ্যন্ত ইতিহাস। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বদান্যতা, পরিষদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা পর্যন্ত। সেই আমার "সাহিত্য পরিষদে" প্রথম যাওয়া। সেই আমার জীবনে প্রথম জ্ঞান, ও-রকম দরের লোকও মনের প্রসাবের জন্য আমাদের মতন সামান্য মানুষের সঙ্গে অত অন্তরঙ্গভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারেন।

সে সব লোক গেল কোথায়?

একদিন ডাঃ সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম—তাঁর বাড়িতে। সন্ধ্যার বেশ খানিকটা পরে। সে আবার একটু নূতন অভিজ্ঞতা। রাঘোপুরে শাস্ত্রীমশাইয়ের মতো অতটা ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হয়নি আমার। তবু বাবুসাহেবের কাছ থেকে আসছি শুনে উনি কোনরকম ফর্মালিটি বা রীতিগত 'ভদ্রতা' না ক'রে যে রকম সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নিলেন সেও ভোলবার কথা নয়। একটা জাঙ্গিয়ামাত্র প'রে নগ্ন গাত্রে বিছানায় শুয়ে একজন পেশাদারী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে দিয়ে ম্যাসাজ (Massage) করাচ্ছিলেন, বেয়ারা এসে নিয়ে গেল আমায়। একটা চেয়ার পাশে ছিল। গিয়ে বসলাম। সওগাত ছিল বোধহয় মধুবাণীর বিখ্যাত কোখ্‌টি তুলার একটি থান আর মাখানা। শেষেরটা ফরমাসই

ছিল তাঁর। খুব খুসী। দেখে নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করলেন নানা বিষয়—বাবুসাহেবের মাতৃশ্রাদ্ধের কথা, মিথিলার আচার-আচরণের; আমার এ দরবারে আসা আরও বিভিন্ন রকমের তথ্যাদি। এদিকে সম্ভ্রমহানি হচ্ছে মনে হ'য়ে আমার একটা সংকোচ স্বভাবতঃই লেগে রয়েছে, ওঁর কত সময়ই বা নোব? একসময় বিদায় নিতে চাইলে আবার বসালেন। গল্প চলছে, ও দিকে "ম্যাসার" তার কাজ ক'রে যাচ্ছে। উনি যেন মাঝে মাঝে একটু বিশেষভাবে আমায় দেখছিলেন, এক সময় প্রশ্ন করলেন—"আপনাকে কি আমি আগে আর কোথাও দেখেছি—রাঘোপুরের আগে?"

দেখেছেন, তবে আমি সেকথা ইচ্ছে ক'রেই চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। দেখেছিলেন একবার সিমলা পাহাড়ে, আমি তখন মহারাজের একান্ত-সচিব। উনি মহারাজের বাড়ী হুইট ফিল্ডে (Wheat field) দেখা করতে আসেন।

একটু কৌতূহলী হ'য়েই প্রশ্ন করলেন—"তা ছাড়লেন কেন, সে একটা প্রাইজ পোষ্টই (Prize post)...মহারাজের কি বাঙ্গালী-বিদ্বেষ ছিল?" বললাম—"মোটেই নয়। বরং ওঁর বাঙ্গালী-প্রীতিই ওখানকার লোকের একটা অসন্তোষের কারণ ছিল।"

"তবে?"

সমস্তটা শুনে একটু চুপ ক'রে রইলেন। পরে বললেন—"তা'হলে ভালোই করেছেন। টিকে থাকাটাই জীবনে বড় কথা নয়। বাবুসাহেবের আপনার প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে দেখলাম।"

আমিও খানিকটা এদিক-ওদিক গল্প ক'রে বিদায় নিয়ে নমস্কার ক'রে উঠে পড়লাম। বললেন, কলকাতায় এলে যেন দেখা করি। আর যোগাযোগ হয়েছিল কিনা মনে পড়ে না।

•

এইবার আমার রাঘোপুর জীবন কাহিনীর পরিশিষ্ট।

ডক্টর সর্বাধিকারী যে বললেন, বাবুসাহেব আমায় খানিকটা প্রীতি-শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, সেটা ভুল নয়। এই প্রীতিশ্রদ্ধার সঙ্গে যে একটা স্বার্থের সম্বন্ধ ছিল, আমার মনে হয়েছে তার ওপরেও তিনি যেন আমায় একটু অন্তরের সঙ্গেই কিছুটা ভালোবাসতেন। এদিকে রাঘোপুর নিদারুণ নিঃসঙ্গতার জন্যে আমার একেবারে অসহনীয় হ'য়ে উঠেছিল—একথা বলেছি। কাজ মিটে যাওয়ার পর দিনকতক তার জের কাটতে লাগল। এরপর পৃথ্বীশবাবু চ'লে গেলেন। সেই নিঃসঙ্গতা আর নিষ্ক্রিয়তা যেন দ্বিগুণ ভারী হ'য়ে চেপে বসল আমার ওপর। জায়গাটা

অতিরিক্ত প্রাণ চঞ্চল হ'য়ে ওঠার পর হঠাৎ যেন একটা প্রেতপুরী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভরসা সাকরি। আর সপ্তাহে একবার ক'রে বাড়ি। তাও যদি কোন কারণে বন্ধ রইল তো অস্থির ক'রে দিত। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করত। একটা আতঙ্ক এসে পড়ত। নিজেকে নিয়ে অনবরত এই চিন্তায় রক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছে না তো!

বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর এ ভাবটা ক'মে এল। একটা জিনিস হচ্ছে ইতিমধ্যে। মনটা সংসারের ক্রমবর্ধমান সমস্যার মধ্যে বসিয়ে নিজেকে নিজের নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।...আর ক্রমাগতই এখান ওখান ক'রে ঘুরে বেড়ালে চলবে কেন?

"বাচ্চা" অর্থাৎ আমার ছাত্রও তার পরীক্ষার দিকে এগিয়ে আসছে। কাজটায় খুব বড় রকম ক্ষতিই হয়েছে পড়াশুনার দিকে, তাকে নিয়ে একটু বেশী রকম ক'রে লেগে প'ড়ে, সেদিক দিয়েও খানিকটা অন্যমনস্ক ক'রে রাখবার চেষ্টা করলাম নিজেকে। তাকে অবলম্বন ক'রেই এখানে আমার ভবিষ্যত। পাশটা করলে কোনও কলেজে গার্জেন-টিউটার হ'য়ে থাকা, কোন বড় একটা শহরেই। আর বেরিয়ে আসার পরও এখানেই একটা মোটামুটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতই আছে আমার ভাগ্যে—জমিদারি এস্টেট—শিক্ষকতার কাজ হ'য়ে গেলে একটা বেশ ভালো চাকরি নিয়ে বসেছে সেরেস্তায়, এমন দৃষ্টান্ত এদিকে বিরল নয়।

চালিয়েই যাচ্ছিলাম, তারপর হঠাৎ টের পেলাম, এ চাকরিতেও তলে তলে ঘুণ ধরেছে।

সাকরিই আমার সম্বল, প্রাণবায়ুও বলা চলে। এদিকে বাচ্চার দিকে বেশী সময় দেওয়ায় আরও বিশেষ ক'রে তাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল একটু দেরী ক'রেই ফিরছি। শশীবাবুর ওখানটা সেরে, এদিকে এসে শিববাবুর বাড়িতেও খানিকটা কাটিয়ে। উনি শশীবাবুর ওখানে গেলে, তাঁর সঙ্গেই এসে বসি কোনও কোনও দিন। না এলে তো যাই-ই। উনি ছিলেন খুব রসিক লোক, কোনও কোনও সময় বাইরে থেকেও ওঁর কোনও আত্মীয় বন্ধু এসে উপস্থিত হতেন। বেশ জমে উঠত আড্ডা।

একদিন একটু রাতই হ'য়ে গেছে। হঠাৎ বেরিয়ে আসতে দেখি, একটা লোক গেটের সামনে থেকে ফস্ ক'রে পাশে স'রে গেল। কি রকম মনে হ'তে একটু পা চালিয়েই বেরিয়ে এসে দেখি দেউড়িরই নীচুর দিকের একজন কর্মচারী। আমি দেখে ফেলায় আর স'রে না গিয়ে দাঁড়িয়েই পড়েছে। রাস্তার ওপরই ফটকাটা।

ডাক্তারের বাড়ি। স্বভাবতঃই যে-সন্দেহটা আগে মনে আসে তাই

নিয়ে ওর নাম ধ'রে একটু ব্যস্ত হ'য়েই প্রশ্ন করলাম, "ব্যাপার কি? দেউড়ির কারো কিছু হয়নি তো!"

লোকটা থমমত খেয়ে আমতা আমতা ক'রে উত্তর করল—"না,... ইয়ে...ইষ্টিসানে এসেছিলাম একজনকে পৌঁছাতে...আপনার গলা শুনে মনে করলাম...মনে করলাম—রাত হ'য়ে গেছে...তাই মনে করলাম..."

আমার মনে তখন দেউড়ির কথাটাই বড় হ'য়ে রয়েছে, ওর জবাব-দিহিতে কান না দিয়ে বললাম—"নাঃ, ভয়ের কি আছে, তুমি যাও"—ব'লে সাইকেলে উঠে পড়লাম।

একটু কেমন যেন মনে হোলই, তবে ও নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না, খানিকটা যুক্তি তো রয়েছেই—স্টেশনে লোক তুলে দেওয়া, আমার গলা শোনা—রাত হ'য়ে গেছে একলা যাব···

'ব্যাপারটুকু মন থেকে মিলিয়েও গেল।

বেশ কিছুদিন চলল, তারপর একদিন আবার প্রায় এই ধরণেরই এক ব্যাপার; তবে অন্য ক্ষেত্রে।

পড়াচ্ছিলাম 'বাচ্চা'কে। কি একটা দরকারে হঠাৎ চেয়ারটা ঠেলে উঠে বাইরে আসব একটু, চৌকাঠে পা দিতেই দেখি সিঁড়ির মাঝামাঝি একটা লোক হন্ হন্ ক'রে নেমে যাচ্ছে। আগেই বলেছি, দোতলায় একটি মাত্র ঘর নিয়ে আমার স্কুল। সিঁড়িটা নীচু থেকে সোজা উঠে এসেছে। একপাশে ঘরের দেওয়াল, একপাশে উঁচু ইটেরই রেলিং। নামাটা অস্বাভাবিক রকম মনে হওয়ায় ডাক দিয়েছি, ঘুরে চাইতে দেখি সেইদিনের লোকটাই। প্রশ্ন করলাম "কিরে?"

সেইরকম থতমত খেয়ে গিয়ে বলল—"না···বাচ্চা পড়ছে···ইয়ে··· বাবুসাহেব···"।

"ডাকছেন?"—প্রশ্ন করলাম।

বলল—"না...পড়ুন..."।

আমার কিরকম ক'রে সেদিনকার ভুলে-যাওয়া ব্যাপারটা হঠাৎ মনে প'ড়ে গিয়ে এর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে গেল। একটু গম্ভীর হ'য়ে গিয়েই বললাম —"এবার শেষ হওয়ার সময় হ'য়ে এল, বাচ্চা না এলে চুপ ক'রে বসে থাকতাম আমি?"

"না···সে কথা নয়···যাই বলিগে, অনেকক্ষণ এসে গেছেন বাচ্চা···।"

বাচ্চাও উঠে বেরিয়ে এসেছিল—প্রশ্ন করল—"কি মাষ্টার সাহেব?" ততক্ষণে বিরক্তিটা সামলে নিয়েছি। ওকে আর এর মধ্যে টানতে না চেয়ে বললাম—"না, কিছু নয়। চলো ভেতরে।"

অঙ্ক দিয়েছিলাম, বসতে বসতে লোকটার নাম ক'রে বলল—

"...তো, বুঝেছি।" একটু হাসির সঙ্গে মাথাটা বার তিনচার তুলিয়ে অঙ্কে মন দিল। এরপর, বেশি সতর্ক থাকবার জন্যই, ছোটখাট কয়েকটা ঘটনা চোখে পড়ল যাতে বুঝলাম একটা গোয়েন্দাগিরি চলছে আমার ওপর। এরপর, হঠাৎ এমন কি কারণ হয়েছে কৌতূহল হওয়ায় টের পেলাম—ব্যাপারটা আজকের নয়। গোড়া থেকেই চ'লে আসছে। চাকরটা আমার একটু হাঁদা গোছের। বক্‌বক্‌ করে—বকতও একটু বেশি একটু প্রশ্রয় পেলেই। আমায় সকালে তেল মাখাবার সময় এই সুযোগটা পেত। তখন একটু উস্‌কানি পেলেই গাঁয়ের পলিটিকস্‌, হু'দেউড়ির রেষারেষি প্রভৃতি অনেক কথা এনে ফেলত। বিশেষ ক'রে ওঁদের পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণের কথা, তাই নিয়ে ক্রমেই মনোমালিন্য বৃদ্ধি। একদিন এর মধ্যে খুব সন্তর্পণে আমার কথাটাও ঢুকিয়ে দিলাম —আমার প্রতি ভাবটা কি রকম? বাঙ্গালীই তো।

একটু হালকা ক'রে দিয়ে হেসেই বললাম—"বাঙ্গালীয়া" ব'লেই ডাকে তো আড়ালে?

বলল—"না; সে আপনার উপর খুব খাতির।...তবে জমিদারির রেওয়াজ তো, খোঁজ খবর নিয়ে আসছেন। পরখও ক'রে আসছেন— সেই গোড়া থেকেই।"

"পরখটা কি?"...

অর্ধেকটা ব'লেই থেমে গিয়ে বললাম—"থাক।...জল ঠিক ক'রে দিগে।"

শব্দটা হঠাৎ বেশি রকম কানে বাজায় আর বাড়ালাম না।..."পরখ" অর্থে পরীক্ষা, বাজিয়ে নেওয়া।

নিক্‌না, নিশ্চয় পায়নি কিছু, পাবেও না যে, সে বিশ্বাসটা নিজের ওপর আছে। হালকাভাবেই নিলাম ব্যাপারটা। গোয়েন্দাগিরি সেই রামচন্দ্র যুগ থেকে চ'লে আসছে, রাজা রাজড়াদের মজ্জাগত। তা থেকে সব খুদে রাজাদের মধ্যে এসে পড়বে এ আর আশ্চর্য কি?

হুট্‌ করে চাকরিও তো ছাড়তে পারছিনা; মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা।

কিন্তু সততা নিয়ে, চরিত্র নিয়ে একজনের নিয়ত পরীক্ষা চলছে, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ত দেহের ওপর নিবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে—এর গ্লানি এত সহজে তো গা থেকে ঝেড়ে ফেলা সম্ভব নয়।

তারপর একদিন আমার নিজের একটা খুব তৃপ্ত মুহূর্তে সহসা একটা কথা মনে প'ড়ে গিয়ে আমার নিজেরই শান্তি টুকরো টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

গ্রীষ্মকাল। দুপুরে একটি গাঢ় ঘুমের পর বিছানাতেই অলসভাবে প'ড়ে আছি। মাথার কাছে একটা ছোট জানলা। দেউড়ির চারিদিকে যে পরিখার কথা আগে বলেছি তার একটা প্রান্ত ঠিক আমার মাথার নীচে হাতচারেক দূরে এসে শেষ হয়েছে। বেশ খানিকটা চওড়া এখানটা। পরিষ্কার জল, একটা ফুরফুরে হাওয়া যে বইছে তাতে ছোট ছোট ঢেউয়ের সারি উঠে আমার মাথার নিচে এসে ভেঙ্গে পড়ছে। চোরের ভয়ে এদের দেউড়ি থেকে নিয়ে সব ঘরের দেওয়ালই বেশ পুরু। তাইতে ছোট জানলার মধ্যে দিয়ে হাওয়াটা যেন একটা গলির মধ্যে দিয়ে কুল কুল ক'রে এসে গায়ে-মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে। চিত্রটিকে আরও পূর্ণ করেছে দু'টি জিনিস। একটা মহিষ খানিকটা দূরে তার জলে-ধোওয়া কুচকুচে কালো দেহের শুধু পিঠটুকু জাগিয়ে স্থির ভাবে গা ভাসিয়ে প'ড়ে আছে, আর তার চালক, একটা দশ-বারো বছরের ছেলে, দু'হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে তার পিঠের ওপর। জেগেই, মাঝে মাঝে জল তুলে নিয়ে আবার ছেড়ে ছেড়ে দিচ্ছে আঙ্গুলগুলো ফাঁক ক'রে দিয়ে।

আরও একটি জিনিষ।

ঠিক জানলার নিচেই একটা বুনো ফুলের গাছ। খুবই সাধারণ ফুল। প্রায়ই যেখানে-সেখানে দেখা যায়। অপরাজিতা বা অতসীর মতো গড়ন ছোট ছোট ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে রয়েছে ফুটে, রংটা গোড়ার গায় কমলালেবু থেকে প্রান্তভাগে অতসীর মতো হলদে হ'য়ে মিলিয়ে গেছে।

বোধহয় একটা ভাল স্বপ্নও দেখে আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়ে গা এলিয়ে প'ড়ে আছি। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর। স্তব্ধ জায়গাই রাঘোপুর, ক্লান্তিকরই, কিন্তু আজ হঠাৎ এমন রূপে সে-স্তব্ধতা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, যেন মূর্তই কিছু একটা, যেন ডুবেই গেছি তার মধ্যে। একটা অপরূপ তৃপ্তি। গাছটার ফুলগুলোর আর সব ভাল, শুধু গন্ধটা—তা, বদই বলতে হয়, উগ্র, এক ধরণের কটু। গাছটা একটু দূরে থাকলেও গন্ধটা হালক্যাভাবে ভেসে আসছে এক একবার। সব ভালোর মধ্যে আমার এটাও যেন ভালোই লাগছে। মনটা যেন এত ভালোর মধ্যে এটুকু খুঁৎকে আমলই দিতে চাইছে না। যদি বলি মনের এই প্রবৃত্তির জন্যই আগাগোড়া সুন্দর মুখের মধ্যে ছোট একটি কৃষ্ণ তিলকে ক্ষমার চোখে দেখে তো বেশ ভুল বলা হবে?

শুধু ক্ষমাই বা কেন? মুগ্ধ চোখেও তো।

মনের এসব দুরবগহ রহস্যের কে হদিস দেবে?

এখানেই তো শেষও নয় রহস্যের। এই অভঙ্গতৃপ্তির কোন্ গুপ্তপথে

সম্পূর্ণ এক বিপরীত ধরণের অনুভূতি প্রবেশ ক'রে সমস্ত চিত্রটার ওপরই যেন কালি লেপে দিল।

সেও এমনি এক দ্বিপ্রহরের ঘটনাই।

ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে বাচ্চাকে পড়াতে যাব। আমার উঠানের দেওয়াল বেশি উঁচু নয়, প্রয়োজনের অভাবে, বাইরের চারিদিকেই নজর যায়। দেখি, দক্ষিণের যে আমবাগানটার কথা বলেছি, সেখানে একটি মেয়ে যেন এইদিকেই চেয়ে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দেখার চেয়ে নজরটা আপনি গিয়ে পড়ল বলা ঠিক। খুব সুন্দরী, শ'খানেক গজ দূরে, এক নজরে মুখাবয়ব চোখে পড়বার নয়, তবে রংটা খুব উজ্জ্বল—চারিদিকের সবুজের মধ্যে যেন আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। হঠাৎ একটু বিস্ময়, সঙ্গে সঙ্গে এ-সময় উপস্থিতির হেতুটাও বোঝা গেল। হাত কয়েক দূরেই সবৎসা একটি গাভী চরছে। হাতে একটা পাঁচন ছিল, ঘুরে সেটা চালিয়ে স'রে গেল মেয়েটি গোরুটাকে নিয়ে। তার পরের দিনও প্রায় এই চিত্রেরই পুনরাবৃত্তি, শুধু হাত কয়েক আরও যেন এদিকে এগিয়ে। একটু যেন অস্বাভাবিক মনে হ'য়ে থাকবে, তবে কোনও রেশই রইল না মনে। পড়াতে চ'লে গেলাম। দু'তিন দিন আর কিছু নয়। তারপর আবার উপরোউপরি দু'দিন। তারপর আর একেবারেই নয়।

বাবুসাহেবের মায়ের কাজের মাস দু'য়েক আগের ঘটনা। পড়ানো, তারপরে প্রায় রোজই বাবুসাহেবের কাছে চিঠি পত্রের জন্য যাওয়া, কৌতূহলের যেটুকু জেগে উঠেছিল মনে, একেবারে স'রে গেল।

আজ আবার চিত্রটা হঠাৎ কি ক'রে আজকের চিত্রের পাশে এসে দাঁড়াল। মনটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। সেও কি বাবুসাহেবের একটা "পরখ" বা পরীক্ষা ছিল না আমায়!

সামনের চিত্রটাকে যতই স্পষ্ট ক'রে রাখবার চেষ্টা করি—প্রত্যক্ষই তো—এই ফুল, ঐ নীল জলে বীচিভঙ্গ, তৃপ্ত মহিষের পিঠে ছেলে, যতই স্পষ্ট ক'রে রাখবার চেষ্টা করি, ততই সেই দিনের চিত্রটা, যেটা হালকা কৌতূহলেই দেখি তখন, সেটাই রূপে-রেখায় স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল। একটা মেয়ে—বছর পনের-ষোলোই—গৌরী—সুসজ্জিতা না হোক, অপরিষ্কারও নয়। বয়স থেকে নিয়ে সব মিলিয়ে এমন একটা মেয়ে যাকে তার অভিভাবক-অভিভাবিকা, স্তব্ধ মধ্যাহ্নে, নির্জন আমবাগানে, একাকিনী গোরুর রাখালী ক'রে নিশ্চয় পাঠাবেনা। এর ওপর তার যেন প্রতীক্ষা ক'রেই আমার বাসার দিকে চেয়ে থাকা। কোনখানটাতেই মন স্বাভাবিক ব'লে সায় দেয়না।

তাহ'লে এ নীরব অভিনয়ের অর্থ কি?

চেষ্টা করছি বর্তমানকে আশ্রয় ক'রে অতীতকে ভোলবার, লুপ্তই হ'য়ে গিয়েছিল যে অতীত আমার স্মৃতি থেকে; কিন্তু যত চেষ্টা করি ততই যেন একটি প্রশ্ন মনের অন্তঃস্থল থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে থাকে—অর্থ কি এর? সাম্প্রতিক যে সব অভিজ্ঞতা সাকরিতে শিব-বাবুর বাড়ি থেকে সে-রাত্রে শুরু হয়, সব একটি প্রশ্নকেই পুষ্ট করছে—হীন গোয়েন্দাগিরি ছাড়া আর কি হ'তে পারে?—"পরখ" বা পরীক্ষা।...

উঠে পড়লাম। বাচ্চাকে পড়াতে চ'লে গেলাম। চেয়ারে বসতে যাচ্ছি, বাচ্চা বলল—"কুর্তাটা উল্টো পরেছেন মাষ্টার সাহেব।"

সকালে গিয়ে খোলবার সময় যে উলটে গিয়েছিল, আর সোজা ক'রে মাথায় গলানো হয়নি। ঠিক ক'রে নিয়ে, ব'সে প'ড়ে বললাম—"নাও পড়ো। কি আছে এখন?"

ভুল হ'য়ে যাচ্ছে পড়াতে গিয়ে। এক সময় ও আবার টুকলো—"শরীরটা আপনার খারাপ আজ? তাহ'লে নাই আসতেন।"

"তোমার পোয়াবার হোত, তাহ'লে, না?"—মনটা হালকা ক'রে নেওয়ার জন্যেই একটু হেসে ঠাট্টাটুকু করলাম। বললাম—"নাও, মুখস্ত ক'রে ফেল যা ব'লে দিলাম।"

"মাষ্টার সাহেবের কাছে আমি আর কখনও ভালো হলাম না!"—কপট অভিমানের সঙ্গে আরম্ভ করল বাচ্চা।

একটু ঘুরিয়ে নিলাম কথাটা। দেখিনা যদি মনটা হালকা হ'য়ে গিয়ে একটু গুছিয়ে ওঠে। বললাম—"একটু পড়ছি অন্যমনস্ক হ'য়ে, না?... একটা চিঠি পেয়েছি বাড়ি থেকে আজ, ভালোই, তবে বোধহয় একবার যেতে হবে দু'টো দিনের জন্যে। যদি যেতেই হয় তো তোমার আরও পোয়াবারো, না?"

"নয় আর?"

আমায় গল্পে টানার চেষ্টা ক'রে পারেনা ব'লে একটু প্রশ্রয় পেলেই ওর ভেতরকার "আদুরে—আহ্লাদে" ছেলেমানুষটা বেরিয়ে আসে। আমার মুখের উপর চোখ তুলে বলল, "নয় আর? দু'দিনের জন্য যাবেন, আমি তো তাহ'লে আমার টাট্টু ঘোড়াটার মতন চারপা তুলে লাফাই।"

হেসে বললাম—"তা তুমি তোমার দুষ্টু টাট্টুটার মতোই Intractible (অনমনীয়) বটে। নাও, এখন তো রয়েছিই, পড়ো।"

আবার বইয়ের উপর মুখটা ঝুঁকিয়ে বিড়বিড় ক'রে বলল—"আপনি মোটেই ছুটি দেননা। আগেকার মাষ্টার সাহেবের..."

আমি হেসে উঠেই বললাম—"এ গুরুতর দোষটা একেবারেই ছিল না, এই তো ?...কি আর করা যাবে ? তুমি যা করছ করো ?"

ওকে দিলামই একটু রাশ ঢিলা আজ, ওর নিষ্পাপ কিশোর-মনের স্পর্শটা বেশ ভালোই লাগছে। পড়ার ক্ষতি হোল সেদিন খানিকটা। ব্যাপারটুকু আমার পক্ষে যেন কতকটা ভেষজের কাজ করল। ভাবলাম্, ও থেকে থেকে আমায় টুক্‌তে থাকবে অন্যমনস্কতার জন্য তার চেয়ে এ বরং ভালো। ঢিলে পেয়ে বাচ্চা একরাশ গল্প এনে ফেলল। বিশেষ ক'রে এখানকার ভোজের কথা। শ্রোত্রীয়দের হ'লে সমস্ত রাত কেটে যায় ভোজের সঙ্গে গল্প-গুজবে। প্রথাটা হচ্ছে পাতে যতই দিয়ে যাক্, "না" বলবে না ; তাই ব'লে খাবেও যে বেশি তাও নয়। জমুক পাতে পাহাড় প্রমাণ।...তবে খাইয়েও আছে, যদিও কুটুম অর্থাৎ শ্রোত্রীয়দের মধ্যে বেশি নয়। নাম করা ব্রাহ্মণ—খেয়েই যাচ্ছে খেয়েই যাচ্ছে, উঠতে চায় না, "সৈলকন্" অর্থাৎ নিম্নজাতের লোক দিয়ে তাদের ছুঁইয়ে তুলতে হয়।

বাচ্চা চোখ দু'টো আয়ত ক'রে বলল—"হাঁ, মাষ্টার সাহেব, একটুও মিথ্যে বলছি না। দাদীর কাজ আবার আসছে তো, নিজের চোখেই দেখবেন খন !"

"স্কুল" থেকে বেরুতে দেরি, আবার সেই অবস্থা, চিন্তাটা যেন তাড়া ক'রে ফিরছে।

আরও সকাল-সকাল সেদিন সাকরি চ'লে গেলাম।

পরের দিন পড়াবার সময়টা কাটাবার জন্য একটা নূতন উপায় উদ্‌ভাবন করলাম। পড়ানোতে মন বসাতে পারব না, পদে পদে ছাত্রের কাছে ধরা প'ড়ে যাওয়ার লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে, বাংলা স্কুলে সুধীরবাবুর রীতির অবলম্বন করলাম। উনি যেমন এক একদিন কোন প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে বই ছেড়ে একেবারে অন্যদিকে চ'লে যেতেন—বিশেষ ক'রে বড় লোকের জীবনী ধ'রে, জীবনের মহত্তর আদর্শের দিকে। বীররসের ভক্ত ছিলেন—ওঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল এ্যবটের "নেপোলিয়ন" (Abbot's Life of Napoleon), আমার প্রসঙ্গের অভাব হোল না। এবার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে বিদ্যাপতির "কীর্তিলতা" ব'লে যে বইখানা নিয়ে আসেন—গবেষণার ক্ষেত্রে যাতে আলোড়ন প'ড়ে যায়, সেটা রাঘোপুরেও নিয়ে আসেন ; একদিন আমায় শোনানও। অব্‌ভট্ট অর্থাৎ অপভ্রংশ মৈথিলী ভাষায় লেখা।

রাজা শিবসিংহের দরবার থেকে কোনও একটা বিষয় নিয়ে কয়েকজন দূতের দিল্লী যাত্রার বিচিত্র কাহিনী। আমি তাই থেকে শুরু ক'রে বিদ্যাপতির কাব্যের আধ্যাত্মিক দিকটার মিথিলার আর বাংলার ওপর প্রভাব—তাই থেকে হিন্দু সংস্কৃতিতে মিথিলার অবদান সম্বন্ধে অনেক কথা ব'লে গেলাম। আজ আমি বক্তা, বাচ্চা শ্রোতা।

বেশ তৃপ্তিই পেলাম। মনে হোল গতানুগতিকভাবে রুটিনবাঁধা সময়ে শুধু দিনগত পাঠ্যের পাতা না উল্‌টে যদি মাঝে মাঝে এ ধরণের "কর্তব্যহানি" ঘটাতাম তো অনেক কাজ হোত। আজ যেন আমার ছাত্রকে একদিনেই অনেকখানিই এগিয়ে দিয়েছি। ওর মুখের একটা দীপ্তি, প্রতিদিনের শ্রান্তির জায়গায়।

ভালো হোল এটুকু। আমরা একটু প্রসন্নতার মধ্যে বিদায় নিতে পারলাম। বাচ্চার সঙ্গে আমার সেটা ছিল শেষ দিন।

ওখান থেকে বেরিয়ে আবার সেই অবস্থা। মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছি। ছেড়েই দোব ? আর যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছিনা এই বিষাক্ত বায়ুতে।...কিন্তু চলবে ছেড়ে দিলে ?

হয়তো রাঘোপুরের অনেক অসহনীয়কে সহনীয় ক'রে নিয়ে যেমন চালিয়ে আসছি, এটাকেও পরিপাক ক'রে নিয়ে থেকেই যেতাম, কিন্তু হঠাৎ ব্যাপারটা এমন চরমে উঠে গেল যে আর কোন উপায়ই রইল না।

বাচ্চাকে কথাটা রহস্যছলে বানিয়েই বলেছিলাম যে, দ্বারভাঙ্গায় গিয়ে হয়তো দু'টো দিন থাকতে হবে, কতকটা ওর মনের ভাবটা বের করার জন্য। সেদিন সাকরি সাইকেলে যেতে হঠাৎ মনে হোল, একবার ঘুরেই যদি আসি দ্বারভাঙ্গা থেকে তো কেমন হয় ?...পাঁচটা পাঁচরকমের কথা।...সবাইকে একবার দেখা...বাড়ির প্রতি টানটা একটু নূতন হ'য়ে উঠে যদি এ-ভাবটা যায় কেটে···কিছু না হোক্, একবার শুধু ঘুরে আসা বাড়ি থেকে।...

হটাৎ খেয়াল হ'য়ে ছটফটিয়ে দিয়েছে মনটা। সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিয়ে স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছি। প্রথম গাড়িটা পেলে ঘণ্টা দেড়েক বেশি সময় পাওয়া যাবে। ···একটা লেভেল ক্রসিং পার হ'য়ে ওপারে গিয়ে স্টেশন। তার ফটকটা বন্ধ। এর মানে গাড়ীটা কাছে এসে গেছে। আমি এপারেই শিবুবাবুর বাড়িতে সাইকেলটা তাড়াতাড়ি রেখে দিয়ে সোজা রেলপথ ধ'রেই স্টেশনে গিয়ে উঠলাম। গাড়িটাও এসে গেল। ফিরতি গাড়ী রাত এগারোটা। প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক যে সময় পেলাম, তার প্রতিটি মুহূর্ত যেন বাড়ি দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে অনেকটা অন্য মন নিয়েই

আমি যখন ফিরলাম রাঘোপুরে তখন রাত্রি প্রায় একটা। চাকরটাকে তুলে হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন বাচ্চাকে পড়াতে যাব, বাবুসাহেবের খাস চাকরটা এসে বলল, বাবুসাহেব একবার ডেকেছেন।

প্রশ্ন করলাম—"এখুনি?"

বলল—"যখন সুবিধে আপনার।"

বললাম—"বেশ, আসছি।"

পড়িয়ে নিয়েই যাব, যেমন যাই, স্কুলের সিঁড়ির কাছে গিয়ে মনে হোল আগে সেরেই আসি। কাজের কথার সঙ্গে সঙ্গে এক-একদিন গল্পও ফেঁদে বসেন, সে ক্ষেত্রে সাকরির সময় থেকে কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

একটা মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে সামনে একটু ঝুঁকে আসন-পিঁড়ি হ'য়ে বসতেন বাবুসাহেব। দু'তিনজন আমলাকে নিয়ে কি কথাবার্তা কইছিলেন। একটা খেরোর খাতাও সামনে খোলা ছিল। আমি হলের একটা বড় দরজা দিয়ে ঢুকতে খাতাটা ঠেলে দিয়ে বললেন—"আসুন।"

চাকরটা একটা জাজিম চারপাট ক'রে রেখে দিল—যেখানটায় রাখে। আমি ব'সে প'ড়ে প্রশ্ন করলাম—"আমায় ডেকেছেন?" মাথাটা একটু নামিয়ে নিয়ে তখনই তুলে বললেন—"হাঁ, ডেকেছিলাম··· মানে···একটা কথা বাবু···আপনি কাল রাত্রে বাড়িতে ছিলেন না?"

চন্ ক'রে আমার মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"কে বললে আপনাকে?"

—সঙ্গে সঙ্গেই খেয়াল হোল প্রশ্নটা ওঁর কথাটা মিথ্যে ব'লে চ্যালেঞ্জ করার মতো শোনাল। হঠাৎ বিচলিত হ'য়ে উঠেছিলাম, সামলে নিয়ে কণ্ঠস্বর শান্ত ক'রে নিয়েই বললাম—"হাঁ, রাত একটা পর্যন্ত ছিলাম না বাড়ি গিয়েছিলাম। দ্বারভাঙ্গায়।"

"দ্বারভাঙ্গায়? কই? জানতাম না তো?"

বাবুসাহেব জমিদার হিসাবে কড়া হ'লেও ভেতরে খানিকটা দুর্বলই ছিলেন। মাথাটা ঝুঁকেই গিয়েছিল, তুলে নিয়ে বললেন কথাটা। ভেতরে ওঁরই একটা গলদও রয়েছে তো।

আমি উত্তর করলাম—"এতে আপনার না জানায় কি ক্ষতি হয়েছে বুঝছি না তো। আমার যা কাজ এখানে তাতে ক্ষতি হ'তে দিইনা কখনও। সুতরাং আপনাকে বলা দরকার এটা কখনও মনে হয়নি আমার। আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপারই তো? আপনিই বলুন।"

"তাহলেও...বাবু...রোজ সাকরি...এখন আবার বাড়ি আরম্ভ করছেন...”

আবার মাথায় রক্ত উঠে গেল। আর সামলাতে পারলাম না নিজেকে। কণ্ঠস্বরকে সাধ্যমত সংযত আর নীচু পর্দাতে ধ'রে রেখে একেবারেই বিরতি না দিয়ে ব'লে গেলাম—

"তাহ'লে যা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন ব'লে এতদিন বলা হয়নি, সেটা বলি। কিছু নতুন আরম্ভ নয়। দ্বারভাঙ্গায় আমি মাঝে মাঝে এরকম অনেক দিন থেকেই যাই, গাড়ির সুবিধা আছে, সাইকেল অছে, রাত্রেই চ'লে আসি।...তাহ'লে যখন বলতেই হোল, আরও একটু বলি আপনাকে। সাকরিতেও আমার যাওয়াটা আপনার মনঃপুত হয় না।”

হেঁট হয়ে শুনতে শুনতে মাথাটা তুললেন বাবুসাহেব। আমি ব'লে চললাম—“মনঃপুত যে নয়, এটা আমি টের পেয়েছি, আমার উপর গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে।”

“গোয়েন্দা!”—চোখে একটু বিস্ময় ফোটাবার চেষ্টা ক'রে চাইলেন। আমি ব'লেই চললাম। সেই আমলাটা একধারে বসেছিল, মনের দুর্বলতার জন্য ওঁর দৃষ্টিটা তার ওপর গিয়ে পড়ল। কিছু হয়তো ইঙ্গিতও ছিল, সে আস্তে আস্তে উঠে গেল। আমার তখন মুখ খুলে গেছে, মুক্তি চাইছে কতদিনের রুদ্ধ বাষ্প, ব'লেই চললাম—“আমি জানি বাবুসাহেব গোয়েন্দা লাগানোটা একটা দরবারি প্রথা। যদি ধ'রেই নিতে হয় যে, এটা জমিদারি পরিচালনায় অনিবার্য—তাহ'লে আমলাদের মধ্যেই থাক; গৃহশিক্ষকের ক্ষেত্রেও সেটা চালাতে হবে—সে ঠিকমতো পড়াচ্ছে কিনা, সাকরিতে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কি রকম গল্প করছে—রাত্রে বাসায় আছে, কি...কোথাও গিয়ে কাটাচ্ছে—একটা দু'কড়া মূল্যের কর্মচারী হয়তো আপনার মনোমতই এসে রিপোর্ট দেবে, আর আপনি তাই শুনে...”

“আপনি অযথাই রাগ করছেন বাবু। আপনার ওপর আমার বিশ্বাস ...”আবার মাথা তুলে শুরু করেছেন, বাধা দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বললাম—“সে আপনি নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে কিছু না পেয়ে—”

“পরীক্ষা!”—আবার বিস্মিত দৃষ্টি তুলে চাইলেন।

বললাম—“হাঁ, পরীক্ষাই বলব বৈকি। আর সে যে কি...” হয়তো আমবাগানের সংশয়টাও এবার বেরিয়ে যাবে মুখ দিয়ে। আমি একেবারে যেন জিভ কামড়ে চুপ ক'রে গেলাম। গলার স্বর মুক্তি পেয়ে খানিকটা উপরেই উঠে গিয়েছিল, সংযত ক'রে নিয়ে এলাম। হলটা

একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে, উঠতে পারছে না ব'লেই আমলারা পাথর হ'য়ে বসে আছে। আমি একটু বিরতি দিয়ে কণ্ঠস্বর সাধ্যমতো সহজ ক'রে এনে বললাম—"আপনি আমায় মাফ করবেন বাবুসাহেব, আপনি মনিব, খানিকটা বেয়াদপিই ক'রে বসলাম। সেটা, এ ধরণের আচরণে আমি অভ্যস্ত নই ব'লেই একটু হ'য়ে গেল, এটা বুঝেই মাফ করবেন আমায়। আমায় উঠতে হুকুম দিন।"

ওঁর প্রধান কর্মচারি সামনেই ব'সে ছিল, উঠে প'ড়ে বললাম—"বাচ্চাকে চ'লে আসতে ব'লে পাঠান মুক্তিনাথ। আমি একটু বাসাতেই যাচ্ছি এখন।"

ঘোলাজলের মতোই বেশি বিক্ষুদ্ধ মানসিক অবস্থায় স্মৃতিটা অস্বচ্ছই হ'য়ে যায়। এরপর এটুকুই মনে আছে, দ্বারভাঙ্গায় অসুস্থ অবস্থার মধ্যে থেকে আমি আমার ইস্তফাটা পাঠিয়ে দিই বাবুসাহেবের কাছে।

অম্লমধুরে রাঘোপুরের জীবন আমার ভালোই ছিল একরকম। এখনও তার কতকগুলি রঙিন স্মৃতি জেগে আছে মনে, তার মধ্যে বাবুসাহেবের মাতৃশ্রাদ্ধের স্মৃতিটুকুতো একেবারে মনের মণিকোঠায়।

এখনও মাঝে মাঝে মনে ভাবি, থেকে যেতে পারলে কেমন হোত? আমার ঘূর্ণিময় জীবনে রাঘোপুরের শান্ত মুখচ্ছবি ভেসে ভেসে উঠছে। ...কেমন হোত থেকে গেলে?

তার উত্তরে সেই একটা কথাই আবার আসে ফিরে—"বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে..."

—রাঘোপুরের প্রায় তিনটে বছরে বোধহয় একটা লাইনও প্রসব করতে পারেনি আমার লেখনী।

আবার নিষ্কর্ম হ'য়ে পড়লাম। এও আমার অদৃষ্টের এক লিখন, কিছু টিঁকবে না জীবনে। আর দেখেছি, তিনটে বছরেই শেষ। আমার কর্ম জীবনের ইতিহাসে এক একটা অধ্যায়ের দীর্ঘতম ব্যাপ্তি তিন বছর মাত্র।

তবে, একদিকে আমার ভাগ্যবিধাতার প্রসাদের কথা ভেবেও বিস্মিতই হয়েছি। সে কথা আগেও কোথাও ব'লে থাকব; আমায় বেশিদিন কখনও ব'সে থাকতে হয়নি, দরখাস্ত হাতে ঘুরে বেড়াতেও হয়নি। একটা দোর বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা দোর খুলে গেছে। খুলে দিয়ে কেউ না কেউ আমন্ত্রণ ক'রেই নিয়েছে বলা ভালো। কয়েক ক্ষেত্রে আবার আগেরটা খোলা থাকতেই...।

কতদিন ব'সে আছি, ঠিক মনে নেই, তবে, মাস দু'য়েকও নয়, আমায় একজন ভদ্রলোক ডেকে পাঠালেন। পরিচিতই, এঁরও নাম রঘুনন্দন

সিং, তবে ইনি ভূমিহার ব্রাহ্মণ। এঁর একটু পরিচয় দিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয়ের কথা বলি।

রঘুনন্দন রাজের কোনও উঁচুর দিকের কর্মচারি ছিলেন না, দরবারি মোসাহেব হওয়ার মতো লোকই নয়, তবু মহারাজের সঙ্গে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। প্রায়ই আসতেন, দেখা সাক্ষাৎ হোত মহারাজের সঙ্গে, অতিথি হিসাবে থাকতেন কিছুদিন, তারপর আবার চ'লে যেতেন। মহারাজ মাঝে মাঝে কাজও দিতেন তাঁকে।

অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। সুপুরুষ অমন প্রায় চোখে পড়ে না। যখনকার কথা, তখন ওঁর বয়স প্রায় ষাট বাষট্টি হবে। গৌর-কান্তি, একটু স্থূল দেহ, মাথায় একটি চুল কাঁচা নেই। স্বল্পবাক্, শান্ত। মানুষ হিসাবেও অমন একটি মানুষ সহসা চোখে পড়ে না।

আমার সঙ্গে পরিচয়, যখন আমি মহারাজের একান্তসচিব। পূর্বে বলেছি, মহারাজ তাঁর ভাষণের মূল কথাটি ব'লে দিতেন, আমায় সেটি নিজের ভাষায় পূরণ ক'রে নিয়ে যেতে হোত। বোধহয় প্রথমটারই কথা, আমি তখন সদ্য নিযুক্ত হয়েছি। জমিদার সঙ্ঘের (Land Holders' Association) একটা সম্মেলনে স্থায়ী সভাপতিরূপে মহারাজের ভাষণ।

মহারাজ আমায় চুম্বকটা দেবার দু'তিনদিন পরে রঘুনন্দন সিং আমায় একটা চিরকুটে লিখে পাঠালেন, আমি যেন ভাষণটা প্রস্তুত হ'লে ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করি। মহারাজের নির্দেশে উনি চিঠিটা দিচ্ছেন।

একটু কি রকম মনে হ'লেও মহারাজের উল্লেখ থাকায় গেলাম। উনি আমাদের বাড়ির কাছেই হড়াহি পুকুরটার ধারে রাজের একটা অতিথিশালায় উঠতেন। সে সময় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সহায়ক হিসাবে একটা প্রক্রিয়া অনেকের মধ্যে চলছে—একটা বাথটবে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে ব'সে আস্তে আস্তে গামছা দিয়ে উদরটা মার্জনা করা। বারান্দায় ব'সে তাই করছিলেন, আমি গিয়ে নমস্কার ক'রে দাঁড়াতে, একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন—"হয়েছে তোয়ের? তাহ'লে পড়ুন একবার।...আমায় দিয়েও মাঝে মাঝে এই কাজ করান ব'লে ধাঁচটা ঠিক হয়েছে কিনা একবার দেখে দিতে বলেছেন আমায়।"

"যাচাই করছি মনে করবেন না যেন।"—ব'লে একটু হাসলেন। বললাম—"না, তা কেন করব? ত্রুটি থাকলে আপনি নিঃসংকোচেই ব'লে দেবেন। আমার তো এই প্রথম।"

প'ড়ে গেলাম।

শেষ হ'য়ে গেলে বললেন—"না, ঠিকই আছে। কাল টাইপ করিয়ে দিয়ে দেবেন মহারাজকে।"

নমস্কার ক'রে উঠে পড়তে বললেন—"কাল সন্ধ্যার পর পারেন তো একবার দেখা করবেন আমার সঙ্গে। পরশু পর্যন্ত আছি।"

পরের দিন গিয়ে দেখি একটা বই পড়ছেন। কোন একটা ধর্ম পুস্তকই মনে হোল। নমস্কার ক'রে দাঁড়াতে বললেন—"ও, এসে গেছেন? বসুন। আজ মহারাজ আপনার লেখাটার প্রশংসাই করছিলেন।"

অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করলেন। বিশেষ ক'রে, আমি যে, ব্যাচিলার তাই নিয়ে...তাহ'লে তো অনেক সুবিধা, একটা কোনও সাধনার পথ ধ'রে এগিয়ে যেতে পারি।

এদিক ওদিক কিছু গল্পও হোল, তবে মূল বক্তব্যটা—ওদিকেও যেন চর্চাটা রেখে যাই।

আলোচনাটা বড় ভালো লেগেছিল সেদিন, একটা স্নিগ্ধ পবিত্র মনের স্পর্শ।

বাইরে বাইরেই থাকতেন। আমারও নিত্য ট্যুর মহারাজের সঙ্গে, এরপর আর কমই দেখা হয়েছে। নিতান্ত সংক্ষিপ্তও, তবে সেই পরিচয়ের সূত্রটা থেকে গেছে।

প্রায় তিন বছর পরে এই আবার দেখা হোল।

প্রথম কুশল জিজ্ঞাসার পর বললেন—"শুনলাম, এ চাকরিও নাকি ছেড়ে দিয়ে ব'সেই আছেন।"

"এ-চাকরি" র ওপর ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, এমন একটা ঝোঁক পড়ে গেল, আমি লজ্জিতভাবে একটু হাসলাম শুধু। বললেন, —"না, আমি সে কথা বলছি না। মন যেটা চাইছে না, মনকে সেটা জোর, ক'রে চাওয়ানোর কোনও মানে হয় না।...আপনি তো শিক্ষকতার কাজই বেশি ক'রে এলেন। স্কুলে করবেন কাজ? একটা আমার হাতে রয়েছে। ভাল স্কুলই। মজঃফরপুরে বি· বি· কলেজিয়েট স্কুল। আমি সেক্রেটারী। খালি রাখতে ব'লে এসেছি।

"কি পোস্ট?"—একটু চুপ ক'রে থাকার পর প্রশ্ন করলাম আমি।

উনি আমার মনের ভাবটা বুঝে নিয়ে বললেন—"হেডমাষ্টারির পোস্ট নয়। সেটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত খালি ছিল, আমরা ভর্ত্তি ক'রে ফেলেছি।...তিনিও বাঙ্গালীই।"

চুপ ক'রে থাকতে দেখে বললেন—"নিয়েই নিতে বলব কাজটা। আমি যতটুকু দেখেছি আর বুঝেছি আপনাকে, তাতে চাকরিতে একনায়কত্ব বরদাস্ত হবেনা আপনার। আপনার জীবনটাকেও তো মুক্তই রাখবেন। তাহ'লে আমি যদি বলি, কি পদ, কত তার মূল্য,

অত খতিয়ে না দেখে যদি একটা মিশন হিসাবেই শিক্ষাবৃত্তির দিকে ফিরে এলেন, তো মন্দ কি?"

এবারও আমার মুখে আপনিই একটু হাসি ফুটে থাকবে, তবে, তার অর্থ কি তাঁর বুঝে নেওয়ার কথা নয়। মনে মনেই ভাবলাম—কোনও বড় মিশন নিয়ে জন্মানো কি সবার কপালে লেখা থাকে? আর উদ্বাহ—বন্ধনে ধরা না দেওয়া সেটা অন্য কোথাও একটা বন্ধনের জন্যেও কি হ'তে পারে না?

কিন্তু সে-সব কথা তো কাউকে বলবার নয়, নেপথ্যে থেকে কারোর কারোর জীবন নিয়ন্ত্রিত ক'রে যায় মাত্র।

ওঁকে বললাম—"আপনি তো আছেনই। একটু সময় নিচ্ছি, কাল আমি এসে বলব।"

পরদিন সকালে উনি বাথ-টবে ব'সে অঙ্গমার্জন করছিলেন, এসে বললাম—"আমি রাজি আছি।"

ভেবে দেখলাম, সংসারের ভবিষ্যৎ দাদার পরই আমার ওপর নির্ভর করছে, অথচ যে-কারণেই হোক, আমিই পদে পদে আশাভঙ্গের নিমিত্ত হ'য়ে যাচ্ছি; তাছাড়া পদটির লঘুত্ব-গুরুত্ব নিয়ে বিচার মনের একটা বিলাস মাত্র আমার পক্ষে।

সেই বছর ছয়-সাত পূর্বের মতো এই দ্বিতীয় পর্বেও মজঃফরপুর আমায় সবচেয়ে বড় জিনিস যা দিল তা মুক্তি। আমি আবার যেন নিজেকে ফিরে পেলাম। ঠিক সেই পরিচিত পরিবেশটি সম্পূর্ণ নেই, তবে জানা জায়গা, যা কিছু পাওয়া গেল, যাদের পাওয়া গেল—সব নিয়ে মনের মতো পরিবেশ গ'ড়ে নিতে বিলম্ব হোল না।

স্কুলটার কথাই আগে ধরি। প্রথমবারে মুখার্জ্জি সেমিনারির আর অনেক কিছুই মন-মাফিক হ'লেও—বাঙ্গালীর স্কুলই তো—একটা বড় ঢিলেঢালা ভাব ছিল, যার জন্যেই একটা ওলোট-পালোট ঘটিয়ে শুধরে নিতে হোল। সে তুলনায় বি.বি. কলেজিয়েট বেশ সুপরিচালিত। ঢেউয়ে-দোলা নৌকার তুলনায় তরতরে স্রোতে অনুকূল বাতাসে ব'য়ে—যাওয়া নৌকায় যে নিশ্চিন্ততা সেটা গেল পাওয়া। আমি নিজে হেড্-মাষ্টারি ক'রে এসেছি, সে কারণ এই মসৃণ গতি, এই ডিসিপ্লিনটা আমার আরো যেন বেশি ক'রেই লাগল ভালো। কমিটির নজর পড়তে দেরি হোল না। তার চেয়েও যে একটা বড় সার্থকতা আছে শিক্ষকের জীবনে, ছেলেদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, সেটাও পেয়ে যেতে বিলম্ব হোল না।

কিন্তু এসব পেয়েও যদি আর একটা জিনিসের অভাব হোত তো কলেজিয়েট কেমন লাগতো বলতে পারিনা। সে জিনিসটা হচ্ছে মনের

মতো সঙ্গী। আমার নিজের স্বভাবে একটা বিশেষ দুর্বলতা যে আছেই —একটা হালকা দিক—এটা না-স্বীকার ক'রে পারিনা। এর জন্যে ডিসিপ্লিন যদি নিজের জায়গা ছেড়ে আমার সেই চিহ্নিত চৌহদ্দির— সেই স্যাংটমের (Sanctum) মধ্যে প্রবেশ করে তো আমি বরদাস্ত করতে পারিনা।

এই বিষয়ে আমি আমার মনের মতো লোকও পেয়ে গেলাম্। তাঁর মধ্যে একজন আবার বাঙ্গালী। এঁরা হলেন মথুরাপ্রসাদ দুবে, ওপরের দিকে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক, নাব হাসান সাহেব, উর্দু শিক্ষক আর বাঙালী শিক্ষক রামরঞ্জন গোস্বামী, মথুরা দুবের মতোই গ্র্যাজুয়েট। তিন জনেই নিজের নিজের সাবজেক্টে বিশিষ্ট, আদর্শ শিক্ষক। কিন্তু ক্লাস শেষ ক'রে টিচার্স কমন রুমে (Common room) অবসর যাপনের সময়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে চেহারা যেত বদলে। তিনজনেরই হাসির গল্পের অফুরন্ত স্টক। আমার সঙ্গে যেদিন রুটিনে বিশ্রাম-সময় নিয়ে যোগাযোগ ঘটত, বেশ ভালোভাবেই নিজের স্টকটা বাড়িয়ে নিতে কসুর করতাম না আমি। রামরঞ্জন ছিলেন সে সময়ের বিখ্যাত পেশাদারি কৌতুক-অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভাই। চিত্তরঞ্জন স্টেজ বা সিনেমার অভিনেতা ছিলেন না। সে সময় বড় লোকদের বিবাহাদি অনুষ্ঠানে, বড় বড় পার্টিতে, বড় রকমের কোনও সাংস্কৃতিক উৎসবে একধরণের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল যা আজকাল আর একেবারেই দেখিনা। একই অভিনেতা একটা বিষয় ধ'রে খোলা স্টেজেই, চেহারায়, পরিচ্ছদের অল্প স্বল্প দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় ক'রে যেতেন—মেয়ের ভূমিকাও বাদ যেত না, ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে, ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে একেবারে ভোল ফিরিয়ে দিয়ে। হাসির ফোয়ারা ছুটত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে। আমার লেখায় কোথাও হয়তো ব'লে থাকব, আমি বি.এন. কলেজে পড়ার সময় পাটনায়, বোধহয় বাঙ্গালীদের 'আখড়া' নামক প্রতিষ্ঠানে চিত্তরঞ্জনকে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "বলবান জামাতা"র অভিনয় করতে শুনে যা হেসে-ছিলাম, জীবনে একটা বৈঠকে সে রকম হাসি আর হাসিনি। মনে আছে, হাসির দমকে পেট চেপে বাইরে গিয়ে তবে বাঁচি।

এ-ধরণের পেশাদার ছোট ছোট আরও অনেকে ছিলেন। ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান যে হাসি, তাকে সাধারণ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সে কালের সব উৎসবের একটা অঙ্গ ছিল। খুব নাম করা একদিকে ছিলেন চিত্তরঞ্জন, অন্যদিকে সাহেবিয়ানা স্টাইলের মজলিসে ইংরাজিতে অভিনয়ে ছিলেন "ফানিম্যান" (Funnyman)।

ভাঁড় নয়। শিক্ষিত মার্জিত মন, উঁচুদরের হাস্যরসিক। চিত্তরঞ্জন ছিলেন গ্র্যাজুয়েট, যেমন রামরঞ্জনের মুখে শুনেছি। Funnymanও ছিলেন মার্জিতরুচিসম্পন্ন একজন দক্ষ অভিনেতা। বিশুদ্ধ ইংরাজীতে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে। একবার দ্বারভাঙ্গায় আসেন, বোধহয় মহারাজের দৌহিত্রের উপনয়নে ইউরোপীয় নিমন্ত্রিতদের একটা ভোজে। ছিলেন বাঙ্গালীই।

জিনিসটা গেল কোথায়? কেন গেল? কোথায় আর সেই হাসির হরির লুঠ? "চিরভঙ্গ রঙ্গদেশ তবু রঙে ভরা।" "লঘু," "হালকা"-ছাপ লাগিয়ে জীবন থেকে বাদ দিয়ে কি আজ বাঙ্গালী উন্নতির শীর্ষে উঠে গেছে? তাও তো দেখিনা। জীবনে হাসিকে তার পাওনা না দিয়ে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই হাসার অধিকারটুকুও হারিয়ে যাচ্ছে, এইতো দেখছি।

কথাটা তুলে কি ক'রে প্রসঙ্গ ছেড়ে অনেকটা স'রে এসেছি। দুঃখেই। এবার স্কুলের কথায় ফিরে আসা যাক্।

অবশ্য কমনরুমের লঘুচপলতা ঠিক আড্ডাবাজি ছিল না। জিনিসটা যাতে কমনরুমের চার দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, বেরিয়ে প'ড়ে স্কুলের সাধারণ ডিসিপ্লিনের ঘাড়ে গিয়ে না পড়ে, সে মাত্রাজ্ঞানটা সবারই ছিল—কণ্ঠস্বরে এবং পরিবেশনে। তবু, সমস্ত বাতাসটা বোধহয় ভিজিয়ে রাখতই কিছু কিছু। একদিনের কথা বলি। সে আবার আমারই ক্লাস। ক্লাসে আর সবাই একটু ঢিলেপনা দিতেন মাঝে মাঝে, আমার বদনাম ছিল একেবারে থমথমে গম্ভীর।

ভূগোল পড়াচ্ছি। দেওয়ালে ম্যাপ টাঙানো। একটা ছোট্ট কি জায়গা ছেলেরা বের করতে পারছিল না। খুব সুঁচালো-ডগা একটা কিছু দিয়ে দেখিয়ে দিলেই টের পায়, আমি একটা ছেলেকে বাইরে থেকে কিছু একটা নিয়ে আসতে বললাম। ছেলেটা বোধহয় ঠিক বুঝল না, "ক্যায়সা স্যার?"—বলে দাঁড়িয়ে উঠেছে, তার পেছনের বেঞ্চে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"হাম্ লে আঁবে স্যার?"—বললাম, "লে আও, দেরি মৎ করো।"

একটু দেরি হোলই। চুপ ক'রে ব'সে আছি, প্রায় দেড় হাত লম্বা একটা ছেলের হাতের মতো মোটা একটা আঁকাবাঁকা আমের ডাল এনে আমার ডেস্কের ওপর রেখে দিয়ে গম্ভীরভাবে নিজের জায়গায় গিয়ে ব'সে পড়ল। ও প্রবেশ করার সঙ্গেই একটা যে চাপাহাসির খুক-খুকানি উঠেছিল ক্লাসে, সেটা একবারে ফেটে ছড়িয়ে পড়ল ক্লাসময়। আমিও আর নিজেকে সামলাতে না পেরে হাসিতে দুলে দুলে উঠতে লাগলাম।

আমের ডালটা যে এনেছে ভেঙ্গে সেটা শুধু মোটা আর আঁকাবাঁকা নয়, মুখটা একটা বড় মুঠোর মতো এত থ্যাবড়ানো যে, ছোট নামটা দেখাতে গেলে সমস্ত জায়গাটাই চাপা প'ড়ে যাবে। একটা বেশ উঁচু-দরের ইংরাজীতে যাকে বলা যায় 'প্র্যাকটিকাল জোক' (Practical joke)।

"বিভূতিবাবু কো ভি হাসায়া হ্যায়"—ব'লে ছেলেদের মহলে খানিকটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। টির্চাস কমনরুমে সবাই বললেন—"সাবধানে থাকবেন, দেখতে নিরীহ হ'লে কি হয়, ছেলেটা ভয়ানক ফিকিরবাজ আর দুষ্টু।"

বেশ ভালো লাগতে লাগলো আমার কলেজিয়েটের জীবনটা। এক সময় নিজে হেডমাষ্টারি করেছি ব'লে স্বভাবতঃই অবস্থার চাপে একটা খেদ নিয়েই প্রবেশ করি, কিন্তু এটা বেশিদিন রইল না; ধারটা ভোঁতা হ'য়ে এলো। এতে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সাহায্য করলেন আমাদের হেডমাষ্টার নীহাররঞ্জন সেন নিজে। প্রথমতঃ, তাঁর বয়সটাই। আমার নিজের বয়স তখন ত্রিশের বেশ খানিকটা নীচেই; নীহারবাবু তখন বোধহয় পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.বি.টি. ও-দিকেই বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে এসেছেন। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে ভাবতে গেলে এ দু'টো জিনিষ কাজ ক'রে থাকবে আমার মনে। এটুকু হোল আমার দিক থেকে, ওঁর অজ্ঞাতসারে বলা যায়। জ্ঞাতসারে যা হোল তা ওঁর ব্যবহার। নীহারবাবু ছিলেন যেমন উদার প্রকৃতির মানুষ, তেমনি তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। আমার যে একটা কম্‌প্লেক্স (Complex) থাকতে পারে, সেটা ধ'রে নিয়ে, সব দূরত্ব মিটিয়ে এমন একটা সীমারেখা টেনে আমার সঙ্গে ব্যবহার করতেন, যেন কখনও মনে না করি, এক হেডমাষ্টারের উপর হেডমাষ্টারি করছেন। স্কুলের সম্বন্ধটুকু বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে এমন একটা অন্তরঙ্গতা গ'ড়ে উঠল যে সমস্ত প্রভেদটুকু যেন একেবারে মুছে গেল। পরিবারটি বড় স্নিগ্ধ, ওঁর স্ত্রী, দু'টি ছেলে, একটি মেয়ে। বড় ছেলেটি বড় সন্তানও, সে-সময় বছর দশেকের হবে। নীহারবাবুর বাড়ি পেয়ে আমি দ্বারভাঙ্গার বাড়ির অভাবটা অনেকখানিই ভুলে ছিলাম বলা যায়।

মজঃফরপুরে আমি একটা নতুন জিনিসের স্বাদ পেলাম, মেস জীবন। রটাই—যার সঙ্গে আমি প্রথমবারে ছিলাম—সে নেই। শুনলাম দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, তবে সেটা সুফলপ্রসূ হয়নি। দোষটা নাকি রটাইয়েরই দিকে। এর পরের ইতিহাসটা রহস্যময়ই। আমার জীবনে দু'টি প্রতিভা যেন কি থেকে কি হ'য়ে নষ্ট হয়ে গেল; অনিল

আর রটাই। দু'জনেই মনে গভীর দাগ রেখে গেছে। জীবনের এও এক ট্র্যাজেডি, প্রতিশ্রুতি দিয়ে এরকম কত যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে কে তার হিসাব রাখবে ?

রটাই নেই, এবার গোড়া থেকেই একটা মেসে গিয়ে উঠলাম। সহরের মাঝখানে কল্যাণী মহল্লা বা পাড়া। বাজারটি বেশ বড় আর সাজানো। তার পেছনে একটা দোতলা বাড়িতে ছয় সাতটি বাঙালী যুবক মেস ক'রে আছে। সবাই চাকরে—ম্যুনিসিপাল আফিস, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড, বাটলার এণ্ড কোং নামে সহরে একটা বড় ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, কেউ কেউ সেখানেও। যতদিন ছিলাম বেশ আনন্দে কেটেছিল। এরা সবাই আমার চেয়ে বেশ খানিকটা ক'রে ছোট। এমন একটা সমীচীন প্রভেদ যার জন্যে, যেমন বেশি মাখামাখিও করা যায়না, অথচ হুঁকো খেতে হ'লে সমীহ ক'রে নলচের আড়াল দিয়েও খেতে হয়না। কথাটা বললাম বটে, কিন্তু ক'জনের মধ্যে, হুঁকো গড়গড়া দুরে থাক্ (এগুলো তখন একেবারে অবলুপ্ত হ'য়ে যায়নি) কাউকে কখনও সিগারেট পর্যন্ত খেতে দেখিনি। বয়স কম, যতদূর মনে পড়ে সবাই অবিবাহিত, পেছটান নেই, মুক্ত প্রাণ, আফিস যাচ্ছে, এসে হুল্লোড়বাজি, নিরীহই ; শুধু একঘেয়ে আফিস করার পর নিজেদের যেন ছেড়ে দেওয়া। একটি ঘরে একটি ক'রে সীট। একটানা গুটি সাতেক ঘর, সামনে একটা চওড়া বারান্দা। সন্ধ্যার পর এর-তার বন্ধুরাও এসে জুটত, বেশ জমে উঠত মেস। আমার ঘরটা ছিল একপাশে। আমার সাধারণ রুটিন, স্কুলের পর এসে জলখাবার খেয়ে বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টাল ক্লাবে চ'লে যাওয়া সাইকেলে। সেখানে ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন—যেটা খুশি খানিকটা খেলে, লাইব্রেরী ঘরে ব'সে খানিকটা পত্র-পত্রিকা উল্টে, গল্পগুজব ক'রে, অন্য কোথাও যদি কিছু না রইল ফিরে এসে ছোট ঘরটিতে টেবিলের সামনে খাতা কলম নিয়ে বসা। কেউ না এলে।

প্রায় আসতই কেউ-না-কেউ। মুখার্জি সেমিনারির সঙ্গীরা ছড়িয়ে পড়েছে। যাদের বাইরে বাড়ি তারা চ'লে গেছে, তবে যারা মজঃফর-পুরেই, তাদের ক'জন কোন-না-কোন কাজ নিয়ে এখানেই আছে। তাদের কেউ কেউ আসত। বেশি আসত প্রকাশ। সে এলে আমরা বেড়াতে বেরিয়ে যেতাম। একটা জায়গা ছিল সহরের বাইরে গণ্ডকী নদীর ধারে সেকেন্দারপুরের মাঠ। নীলকুঠিয়ালদের পোলো গ্রাউণ্ড। এক-আধটা চক্কর দিয়ে নদীর ধারেই গিয়ে বসতাম আমরা। প্রকাশের জীবনে ইতিমধ্যে একটা বড় পরিবর্তন ঘটেছে ; তার বিয়ে হ'য়ে গেছে এবং সে সুখীও। গল্প বলতে ভালোবাসত দাম্পত্যজীবনের। তবে যখন-তখন বা

যেখানে-সেখানে নয়। সরস মন, এইরকম নির্জন, উন্মুক্ত পরিবেশে কোন কোন দিন ওর মনের কপাট যেন আপনি খুলে যেত। আমার অবিবাহিত থাকা নিয়ে মাঝে মাঝে বলত, "থাক্, বেশ ভালোই আছেন —কি প্রকাণ্ড এক দায়িত্ব যে ঘাড়ে তুলে নেওয়া!" কিন্তু সেকেন্দার-পুরের নদীতীরে, আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় তার ছোট ছোট দাম্পত্য কাহিনীর মাদকতা বিস্তার করার ভঙ্গিতে মনে হোত, সে যেন আমায় দলে টানার ইঙ্গিত রেখে চলেছে।

সে দিন নাকি বেশিরকম ভাবালু হ'য়ে উঠত। তবে, ভাবালুতা ওর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব'লেই বোধহয় ওঠবার সময় সব দেহমন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একইভাবে ব'লে উঠত—"না, না, দিল্লীকা লাড্ডু, ওদিকে দৃকপাত না ক'রে ভালোই করেছেন। কি যে একটা ঝুঁকি মাথায় তুলে নেওয়া!"

আজ জীবনের বিরাশিটা বৎসর পেরিয়ে এসে মনে হয় বটে, তা মন্দই বা এমন কি কাটল?—তবে অবিবাহিত জীবনেরও যে একটা ঝুঁকি আছে তার কিছু কিছু নমুনা আমি মেসে থাকতেই পাই। একটা অবশ্য তেমন কিছু নয়, আমার সহিষ্ণুতার পরীক্ষা নিয়েই কেটে যায়, তবে একটা বেশ উদ্বেগের কারণ হ'য়ে উঠেছিল দিনকতক।

বাড়ি ছেড়ে মেসে থাকে, এটা একটা বৈরাগ্যের ভালো লক্ষণ—বিশেষ ক'রে আমার মতো বয়সে। তার উপর অবিবাহিত থাকা—কোনও নেশা-ভাং নেই, যতদূর খোঁজ পাওয়া যায়, বিশেষ কোনও চরিত্রদোষও নেই—এরকম নির্ভেজাল মানুষের একটা বড় বিপদ চারিদিকের কুদৃষ্টিই নিশ্চয়, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় কুদৃষ্টির চেয়ে সুদৃষ্টির অত্যাচারই বেশি। যত সাধু-সন্ন্যাসী, আশ্রমের স্বামীজি সবার গোপনে, প্রকাশ্যে দলে টেনে নেবার প্রয়াস থাকে, এবং পাছে অন্যে টেনে নেয় এজন্য প্রত্যেকের প্রয়াস অধ্যবসায়ের শেষ রেখা পর্যন্ত উঠে যায়। অনেক ভুগে একটা বয়স পর্যন্ত আমাকে ভয়ে ভয়েই কাটাতে হয়েছে—শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আছে এমন মহাপুরুষের কাছে বেশিদূর এগোইনি বা আশ্রম, সংঘ প্রভৃতির দুয়ার বেশি মাড়াইনি। বৈরাগ্য আর সংসার, মুক্তি আর বন্ধন—এ দু'য়ের মাঝামাঝি একটা জায়গা ক'রে নিয়ে ভালোই আছি মনে হয়।

কিন্তু মেসের মধ্যে "মুক্তি" একদিন যেন ছদ্মবেশে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

বাঙ্গালীদের মেস ব'লে মাঝে মাঝে উটকো লোক এসেও আমাদের মেসে থেকে যেত—ওষুধ বা অন্য কোনও রকম ফার্মের ক্যানভাসাররাই

বেশি। একবার একটি ভদ্রলোক এসে বললেন, তিনি অডিটর, কয়েকটা ফার্মে অডিট করতে এসেছেন, কয়েকদিন থাকবেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, প্রসন্ন চেহারাটি। আমায় এসেই বলেন। একটা ঘর খালি থাকে, কিন্তু কি কারণে তখন ছিল না, আমার ঘরেই তাঁকে নিয়ে এলাম। বেশ আলাপী, মিষ্টভাষী মানুষ, অল্প সময়ের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলাম দু'জনে।

আমার একটা দুর্বলতা, পৃথিবীতে ভালোমানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম ব'লে দৈবাৎ কোন ভালোমানুষ পেলে প্রথম পরিচয়েই একবারে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ি। ঠিকভাবে বলতে গেলে, অন্ততঃ খানিকটা পরিচয় না পাবার আগেই। ভদ্রলোক সদালাপী বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম— তাঁর আলাপ একেবারে যতি-বিরতিহীন, আর একেবারেই এক-তরফা। কলকাতার একটা বড় ফার্মের প্রতিনিধি হ'য়ে বাংলা-বিহারের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়, নানা ধরণের অভিজ্ঞতা, অনর্গল ব'লে যাচ্ছেন, মুখহাত ধুয়ে গিয়ে সেখান থেকে এসে বিছানাপত্র গুছিয়ে নেওয়া, চা-জলযোগ করার মধ্যে। উনি বক্তা আমি নিরুপায় শ্রোতা, একটা প্রশ্ন করতে ফাঁক পাচ্ছিনা। প্রকাশ এল। তখন প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'য়ে গেছে। আলাপ কান আর জিহ্বার সহযোগেই হ'য়ে থাকে, একা সমস্তটা সামলাতে কান তখন আমার ক্লান্ত, অবসন্ন। প্রকাশ আসতে ভেতরে ভেতরে হাঁফ ছেড়ে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। ও লোক চেনে, ভালো লোক দেখেই আমার মতো হেদিয়েও পড়ে না। খানিকক্ষণ শুনে পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে আমায় বলল— "বেরুচ্ছেন তো ?...আজ আমারই দেরি হ'য়ে গেল।"

আমি জবাব দেওয়ার আগেই ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন— "আপনিও না হয় আজ থেকেই যান না। ওঁর বন্ধু, দু'জনকেই যখন পাওয়া গেছে..."

প্রকাশের আরও একটা ক্ষমতা ছিল, রূঢ় সত্য কথাটা অপ্রিয় না ক'রে বলবার। হেসেই বলল—"উপায় নেই। উনি যেমন এক খুঁটিতে বাঁধা পড়েছেন, ব্যাচিলার মানুষ পেছটান নেই, আমি আবার সম্পূর্ণ অন্য খুঁটিতে বাঁধা, দেরি হ'লেই টান পড়ে।...থাকতে পেলে তো খুশিই হতাম।"

আশা করেছিল উপকার ক'রে গেল। ফল কিন্তু উল্টো হোল। আমি ওঁকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দেখি সম্পূর্ণ অন্যরূপ। নিজের বিছানায় মুঠোয় চিবুক রেখে হেঁট মুখে ব'সে ছিলেন, আমায়

দেখে বললেন—"আসুন।...ইয়ে...আপনি এখনও বিবাহ করেন নি?"—একনজরে আগাগোড়া দেখে নিলেন।

বললাম—"না"—একটু অপ্রতিভ হ'য়েই।

"জানতাম না তো!"—বেশ বিস্মিত হলেন।

"এ আর এমন কি জানবার কথা?"—অপরাধীর মতোই আমি নিজেকে সমর্থন করলাম। বললাম—"তাছাড়া, আপনি তো এলেনও এই মাত্র।"

অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছেন, কথাটা কানে যায়নি। বললেন—"কোষ্ঠি-ঠিকুজি আছে? আমি গণনা করতে জানি।"

"কিন্তু আমার তো ইচ্ছেও নেই বিবাহ করবার।"

"রামঃ! অমন কাজ করতে আছে?...মানব জীবনের কত বড় বড় সম্ভাবনা—সমস্ত ঘুচিয়ে দিয়ে! ফাঁদে পা দিয়ে কম আফশোষটা হচ্ছে? কিন্তু এখন আর উপায় কি?...দেখি হাতটা।...ডান নয় বাঁ হাত। ডানের রেখা অনেক মুছে যায়।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত বাড়িয়ে দিলাম। অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, হাতটা টান ক'রে, চিতিয়ে দেখে এক সময় হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর আবার আলাপের স্রোত নামল। এবার একেবারে অন্য ধরণের। সুর—ঐ সংসারের বন্ধন কি কঠিন, ভয়াবহ—মুক্তির জন্যে—আর উপায় না থাকায় অন্ততঃ পাঁকাল মাছের মতো পাঁকের মধ্যে থেকেও মুক্ত থাকার জন্যে কত চেষ্টা করেছেন, এখনও করেন—কত সাধুসঙ্গ, কত আশ্রমে ঘোরাঘুরি—আমি যখন রেখেছি নিজেকে মুক্ত—আর ক'টা বছর যদি চোখ কান বুজে কাটিয়ে যেতে পারি...দাঁতে দাঁত চেপে...

ঘরে খাবার আনিয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত। তারপর বাক্স থেকে বই বের করতে লাগলেন—গীতা, কত মহাপুরুষদের বাণী, ছোটবড় পুস্তকাকারে—নিজের সংগ্রহ করা ভালো ভালো উদ্ধৃতি। নিদ্রায় চোখ বুজে আসছে, জাগিয়ে জাগিয়ে শোনাচ্ছেন। রাত্রে দূরে কোথাও—বোধহয় পুলিশ ফাঁড়িতে ঘণ্টা বাজে—তিনটে পর্যন্ত কানে যায়।

পরদিন যখন উঠলাম, তখন উনি স্নানাহার সেরে আফিস চ'লে গেছেন।

নিজে সচেষ্ট হ'য়ে সেই অতিথি-আগন্তুকের ঘরটা খালি করিয়ে ঠিক ক'রে রাখলাম। গেলেন না। বললেন—আমার মতো মানুষের দুর্লভ সংসর্গ ছেড়ে উনি অন্যত্র যাবেন না এ মেসে থাকতে।

তিন দিনে কাজ শেষ হ'য়ে গেল। যাওয়ার দিন বললেন—আবার মাস সাত-আট পরে আসতে হবে মজঃফরপুরে। মনের আতঙ্ক গোপন করে রেখে বললাম—চিঠি যেন নিশ্চয়ই পাই।

পেয়েছিলাম চিঠি। অমুক তারিখে সোমবারে আসছেন। আমি শনিবার দ্বারভাঙ্গায় চ'লে এসে সোমবার সকালে আবার ফিরে যেতাম কাজে। 'বারবেলা' কাটিয়ে একেবারে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ছুটি নিয়ে বাড়ি ব'সে রইলাম। এবার আবার কি নূতন নূতন অস্ত্র শান দিয়ে এনেছিলেন জানা যায়নি।

শাস্ত্রে যৌবন, অর্থ আর প্রতিপত্তি একজোট হ'লে এক ধরণের বিপদের কথা বলে—

যৌবন, মেস-জীবন আর অনূঢ়ত্ব একত্র হ'লে যে সম্পূর্ণ এক বিপরীত ধরণের বিপদের সম্ভাবনা আছে সে কথাটাও ধ'রে দিলে অনেকে সতর্ক থাকতে পারে।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তার মূলে ছিল তখনকার রাজনৈতিক আবহাওয়া, তার সঙ্গে খোদ মজঃফরপুর সহরটার ঐতিহ্য। বিহারে, বাংলার অগ্নিযুগের প্রথম বোমা ফাটে এই মজঃফরপুরেই... সতের বছরের কিশোর-বিপ্লবী ক্ষুদিরামের হাতে। গান্ধী আন্দোলনে সে আবহাওয়া এখন অনেক ঠাণ্ডা, তবু বাংলায় ধরপাকড় তখনও চলছে, সুদূর বিহারে হ'লেও মজঃফরপুর তীর্থস্থানই, ইংরাজ সরকারের কড়া নজর ছিল।

এর আগে যখন মুখার্জ্জি সেমিনারিতে কাজ করি, নীচের দিকে স্টাফে একজন শিক্ষক ছিলেন, বোধহয় ড্রিল টিচার তার সঙ্গে নীচের দিকের ক্লাস। ঠিক আমাদের দলের না হ'লেও আমার সঙ্গে কছু মেলা-মেশা ছিল। কি ক'রে সেটা বেশ মনে পড়ছে না। বেঁটে, রঙটা কালোই, বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা। নামটা মনে নেই, কি যেন "দত্ত"।

আমি মেসে আসবার মাস কয়েক পরে এক রবিবারে মেসে এসে খোঁজ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হলেন। বেশ হাসিখুশি মানুষ, নানারকম গল্পের স্টক, এই জন্যেই ভালো লাগত তাঁকে, অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প হোল। ওঠবার সময় বললেন—"উনিও আর মুখার্জ্জি সেমিনারিতে নেই, কাজের জন্যে চেষ্টা ক'রে বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। হঠাৎ টের পেলেন, আমি এখানে এসেছি, ভাবলেন, তা'হলে দেখাটা ক'রে আসি।

আমার সমবয়সীই। সেমিনারিতে চাকরির তারতম্যে ওঁর দিক থেকে

যা সঙ্কোচ ছিল, সেটা কেটে গিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই গল্প স্বল্প হোল। যাওয়ার সময় বললাম—আবার যেন আসেন।

কয়েকটা দিন দেখা নেই, তারপর আবার এসে কয়েকদিন উপরো-উপরিই এলেন। বেশ অন্তরঙ্গই হ'য়ে উঠতে লাগলাম আমরা। তারপর একদিন একটা ব্যাপার হোল।

এক লেখার খাতা, ভালো লাগলে কিছু উদ্ধৃতির নোটবুক, আর ইচ্ছে হ'লে কিছু লিখে রাখবার জন্যে একটা ডায়েরি—এ ছাড়া আর সব রকম বইখাতা আমার টেবিলের একধারে রাখা থাকত; ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক, দৈনিক পাঠ্যের খাতা, ইংরাজী-বাংলা নভেল, পত্র-পত্রিকা।

মেসের নীচেই বাজার। সেদিন কি একটা প্রয়োজনে নেমে গেছি, খানিকটা দেরীও হ'য়ে গেছে। ফিরে এসে দেখি, দত্ত কখন এসে গেছেন। একটা খাতার পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন, আমি ঢুকতে ঘুরে বললেন—"এই যে এসে গেছেন। কিছু কিনতে গিয়েছিলেন বুঝি।"

বললাম—"হ্যাঁ, কখন এলেন আপনি?"

"তা বেশ কিছুক্ষণ।...আপনি ডেলি লেসনের (Lesson) নোট রাখছেন দেখছি। আজকাল কে আর এতটা করে? ফাঁকিবাজির যুগ প'ড়ে গেছে।"

খানিকক্ষণ গল্প স্বল্পর পর কি একটা কাজের নাম ক'রে সেদিন একটু সকাল সকালই চ'লে গেলেন।

মিনিট দু'য়েক পরেই প্রকাশ এসে উপস্থিত হোল। চৌকাঠেই দাঁড়িয়ে একটু বিস্মিতভাবেই বলল—"...দত্তকে দেখলাম যে সিঁড়িতে। বললে আপনার কাছেই এসেছিল। কি ব্যাপার?"

ওর ভাবগতিক দেখেই প্রশ্ন করলাম—"কেন? কি হয়েছে?"

প্রকাশ আস্তে আস্তে এসে বিছানায় বসল, গলা নামিয়েই বলল—"পুলিশের স্পাই, গোয়েন্দাবিভাগের।"

"তাই নাকি?"

"এরপর যেটা আগে মনে আসে সেই কথাটাই বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে, বললাম—"তাহলে তো ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়।"

"তবেই হয়েছে!"—একটু ব্যঙ্গ হাসি ফুটে উঠল প্রকাশের ঠোঁটে, বলল—"বরং আরও জামাই-আদরে অভ্যর্থনা ক'রে বসাতে হবে।... এখানে হবেনা। চলুন বাইরে গিয়ে সব বলছি। আজ আর সেকেন্দার-পুর নয়। চলুন, স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে কোথাও ব'সে...আজ না হয় থাকই। ওয়াচ্ করবে আমাদের। আশেপাশে কোথাও নিশ্চয় দাঁড়িয়ে আছে ঘাপটি মেরে।"

নিম্নস্বরেই কথা হচ্ছে, বলল—"আজ আর এ নিয়ে আলোচনা নয়। 'ওরা যাওয়ার সময় দেওয়ালে কান দু'টো রেখে যায়। সাধ্যি থাকলে মাথা থেকেই কেটে নিলেই হয়, কিন্তু সে উপায় তো নেই। ...আজ অন্য কথাই হোক্। কি দরকার মশাই? হ্যাঁ, বুঝতাম দেশের জন্য কিছু করছি...তা যখন নয়—আমি এদিকে বিয়ে থা করে পুত্রমুখ দেখার স্বপ্ন দেখছি, আপনি···আপনি...একেবারেই হালকা গল্পের প্লট আঁকছেন—এইতো বেশ হয়েছে।"...

হঠাৎ গলা তুলে স্পষ্ট ক'রে বলল—"তা, আপনার সেই ভাইঝির খবর কি?...ওলটালো অচল অধমের পাতা?" একটু অন্যমনস্ক হ'য়েই শুনে যাচ্ছিলাম মাথা নীচু ক'রে, কণ্ঠস্বর বদলে যেতে একটু চকিত হ'য়ে উঠেই হেসে বললাম—"ও! রাণুর কথা বলছেন—প্রথমভাগ? না। সে দুঃখের কথা লিখে পাঠিয়েও দিয়েছি "প্রবাসী"তে।

অনেক আগের কথা হ'লেও প্রসঙ্গান্তরে চ'লে যাওয়ার জন্যে প্রকাশ তুলেছিল কথাটা, বলল—"শেষ পর্যন্ত কথাটা জাহির ক'রে দিলেনই আপনি? আহা বেচারি!"

কিছুক্ষণ আরও ব'সে থাকার পর সেদিন খানিকটা আগেই উঠে গেল। যাওয়ার সময় আবার গলা নামিয়ে ব'লে গেল—"মেসেও একটু সতর্ক থাকবেন। কে কি ধরণের কে বলতে পারে তা?"

খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। এখন সমস্ত খুঁটিনাটি, যে-সবের দিকে আগে অতটা খেয়াল হয়নি, অর্থবান হ'য়ে উঠল। দত্ত নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তাহ'লে আমার ক্লাস নোটের পাতাগুলো ওলটাচ্ছিল, নৈলে আমি ঢুকতেই অমন চকিত হ'য়ে বন্ধ ক'রে দিল কেন? তার আগে বইগুলোও যে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে তাড়াতাড়িই তার প্রমাণ, কয়েকখানা বই ছড়ানো। সমস্ত রাতটা খুবই দুশ্চিন্তায় কাটল। একবার ওদের খাতায় নাম উঠে গেলে সে যে কি দুর্ভোগ, শোনা ছিল; প্রকাশের কথায়—কিছু করলাম না, অথচ খামকা নজরবন্দী হ'য়ে কাটানো!

স্টেশনেই একটা সময় আর জায়গা ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। পরদিন প্রকাশ আর মেসে এলোনা। দু'জনে দু'দিক থেকে গিয়ে একত্র হলাম। প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল—"কিছু ভেবে রেখেছেন?"

বললাম—"মাথায় তো কিছু আসছে না। দ্বারভাঙ্গায় এ জিনিসটা তো নেই..."

"আছেই, জানতে দেবেনা তো। অবশ্য, এটা মজঃফরপুরই। তা আমাদেরও কিছু কিছু কাটান্ মন্ত্র জানা আছে। আপনি এক কাজ

করুন…তার আগে জিজ্ঞেস করি, টেবিলে যা দেখি তা ছাড়া আর কিছু বইখাতা আছে?"

বললাম যা আছে।

প্রশ্ন করল—ডায়েরিতে এসব কথা কিছু লেখা আছে?"

বললাম—"যতদূর মনে পড়ে, নেই।"

বলল—"তবু একবার দেখে নেবেন। না থাকলে মাঝে মাঝে ঐ তিনটে বের ক'রে হেলা-ফেলা ক'রে রেখে দেবেন টেবিলে।...আর এই বইখানা।"

শীতকাল। দু'জনের গায়েই র্যাপার। একটা মোটা বই বের ক'রে আমার হাতে দিল, একটু গোপনেই। একটু আড়ে চেয়ে দেখি, মলাটে লেখা রয়েছে—"হরিদাসের গুপ্তকথা।"

বলল—"পড়তে মাথার দিব্যি দিচ্ছিনা। তবে, এসব ব্যাপারে একেবারে মহৌষধি। আপনার ইহকাল পরকাল সম্বন্ধে ওরা নিশ্চিন্ত থাকবে। আজ এখন যান।"

বইটা র্যাপারের ভেতর নিয়ে নিলাম। দু'জনে দু'দিকে চ'লে গেলাম। দত্ত আসতেই লাগল। একদিন কয়েকটা বই পড়বার জন্য নিয়ে যেতে চাইল—ইংরাজির সঙ্গে দু'খানা বাংলাও মিশিয়ে। বলল পড়তে চায়, কাজকর্ম নেই, সময় কাটতে চায়না। পেটে কতবিদ্যে জানাই। তবু আপত্তি করলাম না। দিন ছয়-সাত পরে ফিরিয়ে দিল। বুঝলাম—ওপরওলাদের দেখিয়েছে।

একদিন ডায়েরিটা খুলে রেখে নেমে গিয়েছিলাম, ওর আসবার কথা ছিল। ফিরে দেখি, সেই প্রথমদিনের চেয়েও বেশি আগ্রহের সঙ্গে পড়ছে। ফিরে আসতে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করল—"আপনি ডায়েরিও লেখেন নাকি?"—যেন কি অমূল্যনিধি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে।

তাচ্ছিল্যভাবে টেনে টেনে বললাম—"লিখি,—কখনও কখনও যখন ইচ্ছে হয়।..."

"নিয়ে যেতে পারি এটা দুটোদিনের জন্যে। আপনার জীবন—একজন উদীয়মান লেখকই তো—কি করেন, কি ভাবেন—এত কৌতূহল হয়।"...

'কমলী' কি অত সহজে ছাড়ে? আরও একটু চেষ্টা করল। দিন তিনেক পরে ডায়েরি ফিরিয়ে দিতে এসে বলল—"আপনার সম্বন্ধে শুধু আমারই যে জানবার ইচ্ছে হয়, পরিচয় করতে ইচ্ছে হয়, এমন তো নয়। একটি ভদ্রলোক, পরিচয় আছে, পড়াই তাঁর নাতনীকে,

গল্পস্বল্পও হয় মাঝে মাঝে, আলাপ করতে চান আপনার সঙ্গে। বললেন, আপনার আপত্তি না থাকলে ঐখানেই চা-টা'এর ব্যবস্থা করেন।

বুঝলাম এত দরদ কার। কেননা, এরমধ্যে এদের জাল বিছিয়ে রাখা, আর কার হাতে জালের দড়ি তার কিছুটা জানতে পেরেছি। তাঁর নাকি আবার মুখ দেখেই বুঝে নেবার ক্ষমতা আছে। হেসে বললাম—"ভালোই তো, চায়ের সঙ্গে টায়ের ব্যবস্থা নিশ্চয় ভালো-রকমের থাকবে?"

আমি স্টেজেও নামতাম তখন, কৌতুক-ভূমিকাতেই বেশি। নিরীহ, খানিকটা বোকাবোকা গোছের মুখের ভাব ফুটিয়ে রাখতে অসুবিধা হোল না, যতক্ষণ গল্প স্বল্প হোল চা-জলযোগের সঙ্গে। খাতায় নাম না ওঠবারই কথা, তবু হাতে আর একটু যা ছিল সে-টুকুও বাকি রাখলাম না।

তার পরদিনই। জানি দত্ত আসবেই।

ঘরে আমার একটা ট্রাঙ্ক আর একটা চামড়ার সুটকেস থাকত। সেদিন সুটকেসটা টেবিলেই রেখে যেন কিছু খুঁজছি, এমন সময় দত্ত প্রবেশ করল। সুটকেসের ডালাটা খোলা ছিল, ও চেয়ারে বসতেই যেন একটু চকিত হ'য়েই নামিয়ে নিলাম। তবে একেবারে ঝপ্ ক'রে নয়। দত্তর তীক্ষ্ণদৃষ্টি গিয়ে পড়েছে ঐটুকুর মধ্যে, আগ্রহভরে বলল—"ও বইটা, একবার..."

একটু কুণ্ঠিত হেসে বললাম—"ও বই আর আপনার দেখে কাজ নেই, ...ছেলে মানুষ।"

ঠাট্টাটুকু জুড়ে দিয়ে ডালাটা চেপে দিলাম।

বেশ মোটা অক্ষরেই স্পষ্ট ক'রে লেখা ছিল—"হরিদাসের গুপ্তকথা।"

এরপর আর দত্ত আসেনি।

এটুকু বাদ দিলে আমার কল্যাণী মেসের স্মৃতি বেশ মধুরই। দলটি বেশ ভালো ছিল। সব বেশ একসুরে বাঁধা। পরস্পরের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা, মাঝে মাঝে কিছু নিয়ে হালকা গোছের হৈ-হল্লা—কারোর কোন মুদ্রাদোষ থাকলে তাই নিয়ে ক্ষেপানো—বয়সসুলভ চাপল্যে—সবই আছে, তবে, খাওয়া-দাওয়া, কোন ব্যবস্থার আগুপিছু এইসব নিয়ে অনেক মেসেই যে খানিকটা "ইতরামি" এসে পড়ে, সেটা একেবারেই ছিল না। খানিকটা বয়সের জন্য, খানিকটা আমার যা পেশা তার জন্যও আমার একটা খাতির ছিল। কখনও ম্যানেজারি করতে হয়নি, বাজারে নামতে হয়নি।

সর্বোপরি এতগুলি মুক্তপ্রাণ ছেলের সঙ্গ।

কপালে ভালো কোন জিনিসই যেমন টেঁকেনি বেশিদিন, কল্যাণী মেসও টিঁকল না। কি হোল ঠিক মনে নেই, তবে বাড়িটা ছিল এখানকার বড় বাঙ্গালী ব্যবসাদার বোসদের। নীচেয় বাজার, একটা প্রেস, একটা ওষুধের দোকান। বাড়িটা ওঁরা নিয়ে নিলেন নিজেদের প্রয়োজনে। মেসটা উঠে গেল।

আমি গিয়ে অন্য এক মেসে উঠলাম। মাত্র তিনজন মেম্বার। আমারই বয়সী, হয়তো কিছু বড়ই আর দু'জনে। একজনের বাড়ি বহরমপুরে। একজনের বেহারেই, বর্ত্তমান সাহারসা জেলার সুপৌল মহকুমায়—নাম নলিনী বাবু। বহরমপুরের উনি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ওভার-সিয়ার বা ড্রাফট্‌ম্যান। নামটা ঠিক মনে নেই, সুরেশ কি যোগেশ—এখানে শেষেরটাই চালাই। খুব হাসি-খুশি গল্পিকে মানুষ। ওঁর পিতা কাশিমবাজারের রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর এস্টেটে কাজ করতেন। মহারাজার অনাড়ম্বর জীবন, ধর্মশীলতা, বদান্যতা সম্বন্ধে কত যে গল্প শুনেছি তাঁর কাছে।

দু'জনেই ছিলেন বিবাহিত। দু'জনেরই মুখ একটু আলগা ছিল; কথাবার্তায় বেশি পর্দা টেনে রাখতেন না। এসব স'য়ে যায়, বিশেষ ক'রে মেস-জীবনে, আবার বিশেষ ক'রে যেখানে বয়ঃকনিষ্ঠ কেউ নেই। তবে, মাস ছয়েক যেতে না যেতে এমন একটা ব্যাপার ঘটল যার জন্য এ মেস ছাড়তে হোল।

আমাদের বাড়িটা ছিল ছোট। দোতলা; রাস্তার ওপর একটা বড় ঘর, তাতে আমি আর নলিনীবাবু থাকতাম। ঠিক উল্টোদিকের একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে থাকতেন যোগেশ। আমি যাওয়ার মাস কয়েক পরে আর এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। যোগেশবাবুর অফিসে নূতন চাকরি নিয়ে এসেছেন। ওঁর ঘরেই জায়গা ক'রে দেওয়া হোল। আমাদের সবার চেয়েই বয়সে খানিকটা বড়। লম্বা চওড়া, সকালে সন্ধ্যায় আফিস থেকে এসে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা গানের বই খুলে স্বরলিপি দেখে গান সাধনা করেন। তারস্বরে, কর্কশকণ্ঠে। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। নূতন এসেছেন, কিছু বলাও যায়না। এদিকে লোক খুব অমায়িক প্রকৃতির। খানিকটা খামখেয়ালী, দিল-দরিয়া গোছের। একদিন আফিস ফেরত কতকগুলো তেলেভাজা এনে খাইয়ে দিলেন। বর্ষার সন্ধ্যায় একত্রে ব'সে গল্পগুজব ক'রে কাটল। এর মধ্যেই কয়েকটা আফিস দেখেছেন, কয়েকটা মেসও, তাই নিয়ে নানা গল্প। বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলবার ক্ষমতা আছে। মোটামুটি বেশ ভদ্র-

ভাষাতেই, যার জন্য যোগেশ আর নলিনীবাবুদের নিজেদের জিহ্বা একটু সংযত ক'রে নিতে হোল। নবাগন্তুক বয়সে আবার একটু বড়ই তো।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। ভাষা এবং গল্পের বিষয়বস্তুর রং যেন আস্তে আস্তে বদলে আসছে। তারপর ভাষা এবং বিষয়বস্তু একদিন এমন হ'য়ে উঠল যে কানপাতা যায়না। দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে গল্প করার অভ্যেস ছিল, দেখা গেল পা একটু একটু টলছে।

একটা খুব শক্ (Shock) পেয়ে কি বিহিত করা যায় তিনজনে পরামর্শ করছি। রবিবার। সন্ধ্যাবেলা। খুব বর্ষা নেমেছে। উনি গোপেশ্বরবাবুর স্বরলিপি থেকে মুক্তকণ্ঠে একটা মল্লার রাগ ভাঁজতে ভাঁজতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন। গায়ে রেণ কোট, বাঁ হাতে একটা তেলেভাজার বড় ঠোঙা, ডান হাতে একটা তালের রসের ছোট কলসী। একেবারে কাঠ মেরে গেলাম তিনজনে ব্যাপার দেখে! মুখে কোন কথা সরছেনা। সইয়ে সইয়ে তাহ'লে এই আসল রূপ!

যোগেশবাবুর আফিসে ওঁর বিভাগেই খানিকটা উঁচুতে কাজ করেন। সরাতে পারছেন না হঠাৎ, ওঁর মনের মতো একটা জায়গা খুঁজে না দেওয়া পর্যন্ত। এই সময় আমি একটা ভালো মেসের সন্ধান পেয়ে উঠে গেলাম। কল্যাণীর কাছেই স্টেশন রোডের উপর। নীচে এখানকার কলেজের প্রফেসর গগনবাবুর ভাই একটা বড় গোছের দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে নীচে সাইকেলের দোকান করেছেন আর ওপরটা মেসের জন্য ভাড়া দিয়েছেন। রীতিমতো একটা কেতাদুরস্ত চাকর-ঠাকুর নিয়ে মেস। আগেরটার মতো "Combined hand" বা একাধারে চাকর ঠাকুর নয়। মেম্বার জনা আষ্টেক। পাঁচ মেশালি। বড়দের মেস, একজন শিক্ষকও আছেন শুনলাম।

বেশ সহজেই জায়গা পাইনি। বাঙ্গালীর মেস, ব্যবস্থা ভালো ব'লে একদিন খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলাম, ওঁরা মেম্বার বাড়ান না। আমার গগনবাবুর সঙ্গে আলাপ ছিল, তাঁর মাধ্যমে তাঁর ভাইকে বলিয়ে, তাঁর বিশেষ অনুরোধে একটা সীট পেলাম বটে, তবে উনি গোড়াতেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন—মেম্বারদের কতকগুলো খাম-খেয়ালীপনা আছে যার জন্য হয়তো শেষ পর্যন্ত থাকতে পারব না খাপ খাইয়ে।

তিন চার মাস বেশ কেটে গেল, এমন তো কিছু দেখলাম না তার মধ্যে। ভোরে উঠে প্রায় সকলের নিজের নিজের চৌকিতে ব'সে শির

দাঁড়া সোজা ক'রে যৌগিক আসনে বসা অভ্যেস আছে। অপরদিকে প্রায় সবারই মুখ একটু একটু আলগা। কারণ বলেন, ঐটেই স্বাভাবিকতা, গোপন-প্রয়াসটাই অস্বাভাবিক, সুতরাং ক্ষতিকর।

দেখলাম মেসে থাকতে হ'লে এটা যেন ধ'রে নিতেই হয়। অল্প-স্বল্পই, একেবারেই সে-রকম রুচিবিগর্হিত নয়। ব্যবস্থাটা বেশ ভালো। স'য়ে আসছিল। তারপর একদিন মোহিনীবাবু নীচে তাঁর দোকানে ব'সে জিজ্ঞেস করলেন—"কি রকম বুঝছেন?"

বললাম—"মন্দ কি?...ওঁরা নিজেদের প্রকৃতিপন্থী বলেন, কিছু রেখে ঢেকে রাখতে চান না। তবে মেসের মরাল টোনটা (Moral tone) তো বেশ ভালোই।"

বললেন—"আপনি পারবেন না। অন্য জায়গা দেখুন। ওরা প্রকৃতির দিকে কতটা এগিয়ে যাওয়া যায় তার পরীক্ষা করবে এবার।... জার্মাণীতে ওরা কি করছে খবর রাখেন নিশ্চয়?"

সম্প্রতিই একটা খবর বেরিয়েছে সে সময়ের একটা সাপ্তাহিকে—সচিত্রই—বার্লিনের সদর রাস্তা দিয়ে একদল সব বয়সের মেয়েপুরুষ সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হ'য়ে মিছিল ক'রে চলছে। আইনে কিছু করতে পারছেনা, সঙ্গে শুধু একদল ব্যাটন্‌ধারা পুলিশ। জার্মাণীর নূতন পরীক্ষা, ন্যুডিজম্‌ (Nudism)। কিছুদিন আগে সারা ইউরোপে পুরুষ-ঠ্যাঙানো সাফ্রেজেট (Suffregate) আন্দোলন হ'য়ে গেছে। এখন সবাই মিলে-মিশে প্রকৃতির কোলে দিয়ে যেতে চায়।

প্রশ্ন করলাম—"মেসের এরাও তাই করবে নাকি—সদর রাস্তার ওপর দিয়ে?"

বললেন—"একেবারেই সদর রাস্তায় নয়। তার আগে মেসের মধ্যে সবাই প্র্যাক্‌টিস্‌ করবে, খাওয়া-দাওয়ার পর চাকর-ঠাকুরকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে। সামনের পয়লা বৈশাখ দিন ঠিক করেছে। অবশ্য কম্‌পালসারি নয়, তবু..."

আমি চৈত্রের মাঝামাঝি একটা বাড়ি পেয়ে গেলাম। আমার মেস জীবন সাঙ্গ হোল। এ তিনটে মেস রেলের এপারেই ছিল, পুরনো শহরে। বাড়িটা পেলাম রেলের ওপারে। নূতন কলোনী গ'ড়ে উঠছে, তারই একপাশে। নাম নয়াটোলা; এখন হয়তো বদলে গেছে।

বাড়িটা একেবারে নূতন। একজন ভূমিহার ব্রাহ্মণের। একদিকে পাশাপাশি দু'টি ঘর, মাঝখানে একটা দরজা। সামনে একটু ঢাকা বারান্দা। তারপরে একটা পাকা উঠান। তার একদিকে কাঠ, কয়লা

প্রভৃতি রাখবার একটা ঢাকা জায়গা, অন্যদিকে রান্নাঘর, একটু নাইবার জায়গা। উঠানের মাঝখান থেকে একটা সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। ছু'দিকে বাঁশের রেলিং। বাড়িটা এই নূতন বস্তির শেষ বাড়ি। দেয়ালের পর থেকেই টানা মকাইয়ের ক্ষেত। ভাড়া এগারো টাকা।

আমার সংসার পাতলাম।

তার সঙ্গে একটা বড় রকমের আবিষ্কার। মনে হয়েছিল আমার বিধাতা বুঝি একেবারেই বঞ্চিত করেছেন আমাকে। কিন্তু দেখলাম, না, আমার গৃহিণীকে তিনি আমার মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছিলেন, প্রয়োজন হ'তেই পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলো। এমনভাবে—ছু'জনে মিলেই, বলা যাক্—ঘরকন্না গুছিয়ে নিলাম, ভাঁড়ার থেকে নিয়ে হেঁসেল পর্যন্ত একটুও খুঁত রইল না কোনখানে। বাড়িঘর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ক'রে নিলাম। ছু'টি ঘর, রেলগাড়ির ছু'টি কামরার মতো ছোট, মানানসই চেয়ার, টেবিল আর চৌকি দিয়ে সাজিয়ে নিলাম। বড় ছবির জায়গা নেই, মাসিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা কয়েকটি রঙিন ছবি ভালো ক'রে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে দিলাম, বেশি ভিড় না ক'রে। ছোট ঘরের যোগ্য নিজের পরিকল্পনায় একটি টেবিল করিয়ে নিলাম —একাধারে আলমারি আর লেখার টেবিল। ছু'টির মধ্যে একটি ঘর ভেতর-বার ছু'দিকেই পড়ে। তার ছোট বারান্দায় ছুটো বড় বড় টবে ফুলের গাছ বসিয়ে রেখে দিলাম। সবই স্বল্প, সংক্ষিপ্ত, যেন একটা খেলাঘর। দিনকতক ধ'রে টেনেও রাখল মনটা, খেলাঘরে যেমন শিশু-মনটাকে তদ্‌গত, একাগ্র ক'রে রাখে।

একটা আন্তরিক টান, একটা দরদ, মেসের ভাগাভাগি করা গৃহ নয়, গৃহস্থালী নয়। একান্ত আমার নিজের। সম্পূর্ণ নিজস্বতা যে কি জিনিস তার স্বাদ আমি এই প্রথম পেলাম।

আমি, আর একটি বোকা গোছের ছোঁড়া চাকর, কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড (Combined hand) পেয়ে গেলাম। দিনকতক পরে অন্য একটা আসে। বেঁটে, ধূর্ত, তবে বেশ কাজের। নামটা বুনিয়া।

তার কথাতে একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। এই বাড়িটাকে কেন্দ্র ক'রে এবং ঐ "বুনিয়াকে" নিয়েই আমি পরে একটা গল্প লিখি "দ্রব্যগুণ" নাম দিয়ে। গল্পটি প্রবাসীর শৈলেন লাহার (কবি) সম্পাদনায় একটি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয় এবং অল্পদিন হল নাট্যরূপে রেডিওতে প্রচারিত হ'য়ে গেল। একটা ভয় হ'য়েছিল, সঙ্গীপ্রিয় মানুষ, একা একা কাটাব কি ক'রে। রাঘোপুরের একটা অভিজ্ঞতা তো ছিলই। কিন্তু সে-ভয়ের কিছুই দেখা গেলনা। একটা শহর চারিদিকে

রয়েছে ঘিরে তার শত বৈচিত্র্য নিয়ে, একটু পা বাড়ালেই পৌঁছে যাওয়া যায় তাদের মধ্যে—এই যে ভরসা, এটাই একাকীত্বের মধ্যে শূন্যতাকে আসতে দেয় না। প্রভেদটা আমি কয়েকদিনের মধ্যেই উপলব্ধি করলাম। রাঘোপুরে তিনটে বছরে আমার কলম দিয়ে একটা লাইনও বেরোয়নি, নয়াটোলের নিঃসঙ্গতায় সেই লেখনী নিজেকে ফিরে পেল। সে-কথা বলতে গেলে, এই দ্বিতীয়বারের মজঃফরপুরেই আমার লেখনীর পুনরাভিষেক হোল বলতে পারা যায়। মেসের জীবনে একটু একটু সচল হ'তে আরম্ভ হয়েছিল, নয়াটোলার নূতন বাড়িতে এসে আরও খানিকটা বেশিই হ'য়ে উঠল। নিঃসঙ্গতার জন্যেই আমি নিজের সঙ্গে নিজে মুখোমুখী হ'য়ে বসলাম। ছোট ঘরে, ছোট টেবিলটির সামনে। কিম্বা গ্রীষ্মের জ্যোৎস্নারাতে ছাতের ওপর মাদুর পেতে, আলো নিয়ে বসতাম। চারিদিকে জীবনের বিচিত্র স্পন্দন, তার মাঝে আমি আমার কল্পলোকের জীবগুলির জীবনস্পন্দন নিয়ে থাকব, এই হোল আমার সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শ পরিবেশ। মেসগুলি কিছু কিছু রচনা ক'রে দিত, নয়াটোল ভাল ক'রে দিল।

আমি তখন গল্পই লিখছি, আর প্রায় "প্রবাসী"তেই। "প্রবাসী"র লেখকের একটা আলাদা পরিচিতি আছে, সেটা একটু একটু পাচ্ছি। মজঃফরপুরের বাঙালী-সমাজ বড়, কৃষ্টিসম্পন্ন ; অনুরূপাদেবী থাকার জন্য একটা বেশ জাগ্রত সাহিত্য-চেতনাই রয়েছে, এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল মনটাকে।

কোনও সাহিত্যগোষ্ঠী তখন ছিলনা মজঃফরপুরে, বা থেকেও থাকে তো আমি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলামনা। তবে, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবার দু'জন যে মানুষ পেয়েছিলাম, তাঁদের কথা ভোলবার নয়। একজন শৈলেশ রায়, আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট ; পরে বাংলাতেই এম.এ. পাশ ক'রে এখানকার মহিলা বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। দ্বিতীয়জন উপেন্দ্র সেন। আমার চেয়ে বয়সে বড়, এখানকার প্রতিষ্ঠিত আইন-ব্যবসায়ী। শৈলেশবাবুর সঙ্গে আলোচনা হোত পথে-ঘাটে যেখানেই যখন দেখা হোত। তাছাড়া তাঁর বাড়িতেও যেতাম, তিনিও আসতেন। ওঁর বাড়িতে গেলে আর একজনকে যে পাব তার একটা আলাদা লোভ ছিল। তিনি শৈলেশবাবুর পিতা রমেশ রায়। কবিরাজি করতেন। প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে গেছে, মাথায় পাকা চুল, এদিকে সাহিত্য সম্বন্ধে খুবই আগ্রহ। মাঝে মাঝে আমাদের আলোচনায় এসে যোগ দিতেন নিজের কাজের মধ্যে থেকেও। ওঁদের বাড়িতে বয়সের বিভেদ ভুলে একটি বেশ সখ্যভাবের মধ্যে সাহিত্য আলোচনাটা বড়

ভালোলাগত। তার মধ্যে ওঁদের সম্বন্ধ আবার পিতাপুত্রের। বাড়িটা এদের কল্যাণীর কাছেই ছিল। বাঙ্গালী পাড়াতেই।

উপেন বাবুর বাড়ি ছিল একটু একটেরেয়, টাউন হলের কাছে।

মাঝে মাঝে যেতাম ; নয়াটোলায় উঠে আসার পর খানিকটা কাছেও হোল আমার। ওঁর বাড়ির সাহিত্য-আলোচনা ছিল অন্য ধরণের। সেখানে অনেকেই আসতেন। প্রায় নিয়মিতই একটা বৈঠকের মতো দাঁড়িয়ে যেত নানারকমের আলোচনা নিয়ে। তবে যখনই গেছি, দেখেছি আলোচনা যেন শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের দিকেই ঢ'লে পড়ত। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে। উপেনবাবু ছিলেন বিশেষভাবে রবীন্দ্রভক্ত। তাঁর বৈঠকখানায়—সেখানে সবাই একত্রিত হ'তাম, রবীন্দ্রনাথ থেকে ভালো ভালো উদ্ধৃতি ভালো ক'রে লিখিয়ে, ফ্রেমে বাঁধিয়ে, দেওয়ালেটাঙানো থাকত। একটা সামনে থাকার জন্যে বেশি ক'রে চোখে পড়ত—"তোমার পতাকা যারে দাও, তাবে বহিবারে দাও শকতি।"

তারপর এই মজলিশেই আমরা আলাপ-আলোচনার মধ্যেই একটা বড় রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে ফেললাম।

তখন পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে "রবীন্দ্র জয়ন্তী"র দেশব্যাপী আয়োজনের সাড়া প'ড়ে গেছে। আমরা খবরগুলো নিয়েই আলোচনা করতাম, কোথায় কিভাবে করবার আয়োজন। একদিন কথা উঠল—কার মুখে তা মনে নেই—আমরাই বা পারব না কেন? এই প্রশ্নটুকুর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের যে স্ফুলিঙ্গটুকু ছিল, সেটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হোল না। অনুরূপা দেবী ছিলেন পুরানোপন্থী আদর্শ গৃহিণী, বাইরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রায় ছিলই না ব'লে মনে হয়, তবে, আগে যেমন বলেছি, তার উপস্থিতিই, মজঃফরপুরে একটা মস্তবড় প্রেরণা যোগাত। যতদূর মনে পড়ছে তাঁকেই কেন্দ্র ক'রে একটা শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হোল। তারপর প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে, প্রচুর ব্যয়ে একটা বিরাট শামিয়ানা খাড়া ক'রে, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, মূকাভিনয়ের সঙ্গে জয়ন্তী উৎসব পালন করা হোল। আয়োজনের মধ্যে আমায় একটা বড় ভূমিকাই দেওয়া হোল, বোধহয় নিমন্ত্রণ—অভ্যর্থনাদির দিকে। একটা প্রবন্ধও পড়ি। সেই একটা বড় অনুষ্ঠানে আমার প্রথম প্রবন্ধ পাঠও।

একটা কথা মনে আছে। নূতন আত্মবিশ্বাসের সময়ের এ ধরণের কথাগুলো বেশ মনে থাকে ব'লেই, নৈলে এমন কিছু নয়। আমাদের সভাপতি হ'য়ে এসেছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক নরেশ সেনগুপ্ত। স্টেশনে সবাই গেছি তাঁকে বিদায় দিতে। গাড়ি ছাড়ার আগে আমার দিকে

একটু চেয়ে হেসে বললেন—"আপনি আমায় ফোরষ্টল (Forestall) করেছেন বিভূতিবাবু।"

একটু ঠাট্টার অনুযোগের সঙ্গে।

কথাটার মানে হচ্ছে, অপরের বক্তব্য আগে থেকে ব্যক্ত ক'রে রাখা, (ফলে, তাঁর কৃতিত্ব একটু খর্ব ক'রে দেওয়া)।

ওঁর লিখিত ভাষণের সঙ্গে আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের এক জায়গায় কিছুটা মিল ছিল। নিতান্ত আকস্মিকই, তবে, কৃত্রিম অনুযোগের আকারে ওঁর এই ছোট্ট অভিনন্দনটুকু আমায় প্রেরণা যুগিয়ে দিলই বৈকি কিছুটা।

এইখানে আমার একটু স্মৃতিবিভ্রম ঘ'টে যাচ্ছে, বেশ ছক কেটে তিথি তারিখ দেখে গ'ড়ে-তোলা জীবন তো নয়। আমি মজঃফরপুরে থাকতে দু'টো বড় বড় সাহিত্যিক অধিবেশন হয। দ্বিতীয়টিও বোধহয় আমার এই দ্বিতীয় বছর-তিনেকের প্রবাসে। তাহ'লে জয়ন্তীটা যেমন প্রায় বছর দুই থাকার পর হয়, প্রথমটি হ'য়ে থাকবে খানিকটা গোড়ার দিকে, যখন আমি নবাগত। কেননা, এতে আমার কোন ভূমিকা ছিল ব'লে মনে পড়ছে না, কৌতূহলী দর্শকই ছিলাম আর সবার মতোই। সে-অধিবেশনের সভাপতি হ'য়ে এসেছিলেন রসরাজ নাট্যকার অমৃতলাল বোস। আগাগোড়া ধপধপে সাদা ধুতি-ফতুয়া-উড়ানি, মাথায় একমাথা পাকা চুলের বাবরি, তাঁর অভিভাষণে লহরের পর লহরে হাসির হুল্লোড় তুলে গিয়েছিলেন মনে আছে।

আর একটা সাহিত্যসভার সময় নিয়ে যে গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে সেটাও বোধহয় আমার এই মজঃফবপুরের দ্বিতীয় প্রবাস-কালেই। তবে মজঃফরপুরে নয়, পাটনায়, আর, সে এক খুব বড় ব্যাপারই। সেটা ছিল প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কোনও অধিবেশন। পরে সেটা নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে দাঁড়িয়েছে। পাটনায় এই অধিবেশনটা আমার ঠিক মজঃফরপুরে থাকা কালে যদি না-ও হ'য়ে থাকে তো এই সময়েরই কিছু এদিকে-ওদিকে হ'য়ে থাকবে, সুতরাং প্রসঙ্গটা যখন এসেই পড়ল তখন এইখানে তার কথা একটু বলে নিলে ক্ষতি নেই। তাতে অন্ততঃ এই একটা ব্যাপার দেখা যাবে যে, রাঘোপুর ছাড়ার পর যেমন লেখার দিকটায় সুবিধা হয়েছে, তেমনি একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের মধ্যে নিঃশ্বাস বায়ু নিতে পেরেছি, সেটা উত্তর জীবনে আমার স্বাভাবিক পরিমণ্ডল ক'রে নেওয়ার সাধনা হ'য়ে চলেছে। পাটনায় আমার দেখা এই ধরণের দু'টি সম্মেলন হয়। একটি বহুপূর্বে বি-এন্‌ কলেজে আমার ছাত্রাবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়, যার কথা পূর্বেই

বলেছি। এটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়, মূল সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ, সাহিত্য শাখার, চিত্তরঞ্জন দাস।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন সাহিত্য পরিষদের গৌরবের অধিকারী না হ'লেও, অনুষ্ঠান হিসাবে যেন আরও জমকালো হ'য়ে ওঠে। এক নম্বর, জায়গাটা এঁরা বেশ ভালো পেয়েছিলেন। সহরের মাঝখানে সিনেট হল্। এবারেও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসেন। উদ্বোধন করেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। মূল সভাপতি স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সাহিত্য শাখার সভাপতি মোহিতলাল মজুমদার। বিজ্ঞানের, যতদূর মনে পড়ে, ডাঃ শিশির ঘোষ—এই রকম অনেক মাতব্বরের দল। সেইবারেই প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রের "দাদামশাই", কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখলাম, পরিচয় হোল—অমন প্রথম দর্শনেই আপন ক'রে নেওয়ার ক্ষমতা তো আর কারুরই দেখিনি। হাস্য-পরিহাস আর চুটকি জাতীয় মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে গোড়া থেকেই সম্বন্ধটা পাকা ক'রে নিতেন।

এখন যাঁরা জীবনের শেষ প্রান্তে, কয়েকজন অস্তমিতও, তাঁরা তখন উদীয়মান। বলাইবাবু, তারাশঙ্করের সঙ্গেও সেই প্রথম পরিচয়। আরও অনেকের সঙ্গে। যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা প্রতিষ্ঠার কয়েক ধাপ উঠে গেছেন।

এতটা সমারোহের সঙ্গে পাটনায় বাঙালীদের আর কোন সভা হয়েছে ব'লে মনে পড়ে না।

একটু ছন্দপতনও ঘটে।

শনিবারের চিঠির দল এসেছিলেন সাহিত্যশাখার সভাপতি মোহিত-লালকে মাঝে নিয়ে। মোহিতবাবু কোপন-স্বভাবের মানুষ ছিলেন। প্রথম দিন যোগ দিয়েছিলেন সম্মেলনে, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে অনুপস্থিতই র'য়ে গেলেন। সভাপতির শূন্যস্থান জোড়াতাড়া দিয়ে কোনও রকমে চালিয়ে নেওয়া হয়। পরে টের পাওয়া গেল, স্টেশনে অভ্যর্থনায় নাকি কিছু আগু-পিছু হ'য়ে যাওয়ায় 'শনিবারের চিঠি'র গ্রুপের কেউ কেউ তাঁকে অসম্মান করা হয়েছে ব'লে তাতিয়ে দেয়। মোহিতবাবুর মর্যাদা-জ্ঞানটা যে খুব প্রবল ছিল, এটা উত্তর জীবনে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে জানবার সুযোগ আমার হয়েছে। তবে, সেদিন আমার এসব দলীয় তথ্য উদ্ঘাটন করবার না ছিল সুযোগ, না ছিল কোন কৌতূহল। ঘটনাটাও, উনি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন ব'লে, চাপাই দেওয়া হয়, এবং জোড়া-তালি দিয়ে সভাপতির শূন্য আসন পূর্ণ করার মধ্যে বোধহয় আমাকেও একটু আধটু টানা হয়েছিল।

মজঃফরপুরে ফিরে আসা যাক।

এই সব সভাসমিতির জন্যে "উদীয়মান" লেখক ব'লে আমার পরিচয়টা বেড়ে চলেছে, এরই মধ্যে একটা ব্যাপার হোল।

আমাদের স্কুলের সামনে বেশ খানিকটা খালি জায়গা। সেখানে কোর্ট ক'রে বিকেলে আমরা ক'জন শিক্ষক মিলে টেনিস খেলতাম। একদিন খেলা সাঙ্গ ক'রে বাড়ি যাচ্ছি, পেছন থেকে শৈলেশ বাবু হেঁকে বললেন—"একটু দাঁড়িয়ে যাবেন!"

ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়তে কাছে এসে বললেন—"আপনি 'প্রবাসী'র এবারের গল্প-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারটা পেয়েছেন—'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পের জন্যে।"

আজকালকার হিসাবে—যখন মৌলিক রচনার জন্য অনেক বড় বড় পুরস্কার রয়েছে—ব্যাপারটা কিছুই নয়। তখন কিন্তু এইচ. বোসের কুন্তলীন পুরস্কারের পর একমাত্র "প্রবাসীর" কর্তৃপক্ষরাই মাঝে মাঝে ছোটগল্পের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করতেন। আগে বলেছি, আমার সাহিত্যের জন্মই তাই থেকে। পরেও বার দুই পেয়েছি। মূল্যটা কমই থাকত, তবে, তখন টাকার মূল্য ছিল, সংখ্যার অল্পতাটুকু সেদিক দিয়ে পূরণ হ'য়ে যেত। যেটা হয়ত পঁচিশই সেটাকে বর্তমান মানে একশত ধ'রে নিলে গণিতশাস্ত্রের আপত্তি করবার কিছু থাকেনা। অনুরূপভাবে আজকের হাজারটাকে তখনকার আড়াইশ' ক'রে নিলে সত্যের অপলাপ হোল বা তার মর্যাদাহানি হোল, এমনকথা বলা যায় না।

সে বার "প্রবাসী" থেকে বলা হয়, এক বছরের মধ্যে যতগুলি গল্প তাতে প্রকাশিত হবে তার মধ্যে দু'টিকে পুরস্কৃত করা হবে। প্রথম পুরস্কার ২০০ এবং দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫০ টাকা। যতটা মনে পড়ছে, এবারে বিচারের ব্যবস্থাও ছিল আলাদা রকমের, "প্রবাসী"র পাঠক-পাঠিকারাই একটা ক'রে ভোট দিয়ে তাঁদের অভিমত জানাবেন এবং সেটাই হবে চূড়ান্ত। লেখক একাধিক গল্পও পারবেন দিতে।

সে সময় বেশ সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। আমি দু'টো গল্প দিই, "গজভুক্ত" এবং "রাণুর প্রথম ভাগ"; দ্বারভাঙ্গায় থাকতে আমার সাত-আট বছরের ভাইঝিকে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের "বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ" পড়াতে যে নাকালটা হ'তে হয়েছিল, তাই নিয়ে। সেদিন ছিল নাকাল, বিরক্তি, তার সঙ্গে চড়-চাপড়টাও। তারপর স'রে এসে বিরহবিচ্ছেদের বেদনা-অনুতাপের সূতিকাগারে জন্ম নিল গল্পটি।

প্রথম পুরস্কার পান রাজশেখর বসু (পরশুরাম) তাঁর একসঙ্গে প্রকাশিত দু'টি ছোট ছোট গল্পের জন্য।

প্রায় রুটিন ক'রেই সাহিত্য চর্চা শুরু হ'য়ে গেল আমার। এতে,

আমার একটা স্থায়ী উপকার হোল, সমস্ত জীবনটাকে রুটিনবদ্ধ ক'রে রাখার চেষ্টা। তবে, রুটিন দিয়ে আমি কখনও নিগড়িত করতে চাইনি নিজেকে। যথেষ্ট অবকাশ, যথেষ্ট মুক্তি দিয়ে এসেছি। যার জন্মই যাযাবরের বৃত্তিকে সঙ্গে ক'রে, তার পক্ষে অবকাশহীন কোনও বন্ধনে নিগড়িত হ'য়ে থাকা সম্ভবও নয়। অপরপক্ষে, বোধহয় বিক্ষিপ্ত, বহির্মুখী ব'লেই মনটাকে একটু হালকা শাসনে বেঁধে রেখে আনন্দ পেতাম।

অন্ততঃ, তাতে ফল ভালো পেয়েছি।

তখন সাধারণভাবে আমার দৈনন্দিন ছকটা মোটামুটি এইরকম :—সকালে সাইকেলে কল্যাণীতে বোসেদের বাড়িতে একটা টুইশনি সেরে ফিরে এসে চাকরটাকে দিয়ে ভাল ক'রে তৈলমর্দন। ওটা ছিল দেহের স্বাস্থ্যগঠনের চেয়ে মনের মুক্তিই বেশী ক'রে। দেহটাকে চাকরটার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি মনটাকে স্বেচ্ছায় বিচরণ করতে ছেড়ে দিতাম—যা সঙ্গী পায় তাই নিয়ে; বাড়ির স্মৃতি, স্কুলের সমস্যা, গল্পের প্লট, যেটা এসে পড়ে। এরপর স্নান, আহার, স্কুল। ফিরে এসে "ওরিয়েণ্ট ক্লাব" বা স্কুলের টেনিস; স্কুলের পেছনে একটা প্রমাণ সাইজের ফুটবলের মাঠ ছিল। কোনদিন বা ছেলেদের সঙ্গে তাইতে নেমে যেতাম। এরপর কোনদিন শৈলেশবাবুর বাড়ি বা উপেনবাবুর বাড়ি বা হেড্‌মাষ্টার নীহারবাবুর বাড়ি, বা অন্য কোথাও। এটা ছিল আমার দ্বিতীয় মুক্তি, গল্পগুজব, আড্ডা; তবে কোন নির্ধারিত জায়গায় নয়, বা সময় বেঁধেও নয়। যেদিন যেখানে ইচ্ছা হোল, গল্পেব প্রবাহটা যতক্ষণ, বা, যতটুকু চলল। ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা। উপেনবাবুর বাড়ির মজলিস্‌ তেমন জমে উঠলে আরও বেশিক্ষণ। এবপরে বাসায় এসে লেখার টেবিলে বসা।

সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি আসতাম। শনিবার চারটে পঁয়তাল্লিশের গাড়িতে বেরিয়ে সোমবার সকালের গাড়িতে ফেরা। ভরা বাড়ি তখন, সে যে আবার কি মুক্তি, ব'লে বোঝানো যায় না। চার-পাঁচটি ভাইয়ের বিবাহ হ'য়ে গেছে। কলকলানিতে ভরা বাড়ি। সোমবারটা ব্যথায় ভার হ'য়ে থাকত।...তা হোক...আবার তো শনিবার আসছেই, সন্তোষ দিতাম মনকে।

মজঃফরপুরে বাড়ির একটা খণ্ডসংস্করণ পাওয়া যেত। নীহারবাবুর বাড়িতে আর সুবিমলবাবুর বাড়িতে। আমি নয়াটোলায় এসে নীহার-বাবুর আরও কাছে এসে পড়ি। ওঁর বাসাটা ছিল রেলের এপারেই, লাইনের ধারে। সুবিমলবাবুরা ছিলেন ব্রাহ্ম। তিনি নিজে, তাঁর মা

বা কোন প্রৌঢ়া আত্মীয়া, তাঁর স্ত্রী এবং একটি ছোট মেয়ে। সুবিমল-বাবুর বয়স আমারই মতো। পরিবারটি ছিল বড় স্নিগ্ধ। ব্রাহ্মদের যেন আলাদা কালচার আছে, বাকসংযমে, শুচিতায়, খানিকটা আবার একটু কৃত্রিমতায়, যার আতিশয্য না হ'লে একটা সুষমাই এনে দেয় সংসারে, সামাজিকতায়।

ওঁদের বাসাটা ছিল আবার আমার সবচেয়ে কাছে। অল্প একটু গিয়ে বড় রাস্তার ওপর। প্রায়ই যেতাম ছুটি-ছাটা থাকলে। ছোট হ'লেও একটা সংসারের স্বাদ পাওয়া যেত। উনিও আসতেন।

তারপর একসময় দুই পরিবারের মধ্যে যাওয়া-আসা সুরু হ'য়ে গেল। হ্যাঁ, এই একক অকিঞ্চন গৃহস্থালী একবার পারিবারিক মর্যাদাও পেয়েছিল মাস তিন চারের মতো। মা এসে রইলেন আমার ছোট বোন আর একটি চার পাঁচ বছরের ভাইঝিকে নিয়ে।

যত ছোটই হোক আমার সংসার, যেন নিটোল হ'য়ে পূর্ণ হ'য়ে উঠল। যাঁকে এবং যাদের সবার মধ্যে ভাগ ক'রে পেয়ে এসেছি এতদিন, তাঁকে এবং তাদের আলাদা ক'রে পাওয়ার, যেন নিবিড়তর ক'রেই পাওয়ার সে এক অপরূপ আনন্দ।

কোনও কোনও দিন আরও পেতাম। হয়তো লিখছি আমার ঘরে কোনও সন্ধ্যার পর, মা পাশের ঘরে ব'সে মেয়ে-নাতনীকে নিয়ে গল্প করছেন, হঠাৎ কণ্ঠস্বর উঠলো—"মাসিমা কৈগো ?...লীলা ! আমরা এলাম।"

বড়দের আলাপে, ছোটদের দাপাদাপিতে উচ্ছল, উল্লাসে ভ'রে গেল বাড়িটা হঠাৎ। ছোট বাড়ি, দেরিও হোতনা ভ'রে যেতে—ঘর, উঠান, ছাতটা পর্যন্ত। নীহারবাবুর স্ত্রী এসেছেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে, সুবিমলবাবুর বাড়ি হ'য়ে তাঁর স্ত্রী কন্যাকেও টেনে নিয়ে এসেছেন।

এখানে একটা কথা, বোধহয় আমার এইসময়ের প্রবাসজীবনের অঙ্গ বলেই ছেড়ে যাচ্ছে। রাঘোপুরের মতো "খোকা" (বিনয়)কে নিয়ে এখানেও আমার পরীক্ষা চলে কিছুদিন; সে ভয়াবহ পরিবেশ না হলেও। সে তার আদর-আর্তি আদায় করবার ক্ষমতা দিয়ে দু'টি পরিবারেই বেশ জমিয়ে নিয়েছে, মুক্ত গতিবিধি দিয়ে তিনটিকে আরও ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলল।

প্রায় বছর দেড়েক আমি কাটিয়ে থাকব বাড়িটাতে। ভালোবেসে-ছিলাম। তার সঙ্গটা আমার মানুষের সঙ্গর মতোই জীবন্ত ব'লে মনে হোত। দেড়টি বছর; তার মানে ছয়টি ঋতুর প্রত্যেকটিকে আমি পেয়েছি এই বাড়ির মধ্যে। কোন কোনটি দু'বার ক'রে। প্রতিটি ঋতুর

যতটুকু দেবার দিয়ে গেছে এই বাড়িতে এসে। গ্রীষ্মের রাতগুলো ছাতের ফুরফুরে হাওয়ায় মাদুর পেতে পাশে একটা রেকাবীতে ফুল রেখে লিখতে বসেছি; বর্ষার দিনগুলোয় জানলার সামনে ব'সে। শীতের দিনে চারিদিকে চাপা ছোট ঘরটির একটা কবোষ্ণ স্পর্শ অনুভব করতাম বাইরের তীক্ষ্ণতার মধ্যে থেকে এসে। ভালোবেসে ফেলেছিলাম বাড়িটাকে। ভাবতাম, যাক্না জীবনটা কেটে এইরকম নিস্তরঙ্গ স্রোতে। তরঙ্গের দোলা তো খাওয়া হোল অনেক।

মা আসতে এ সুরটুকু যেন আরও গাঢ় হ'য়ে উঠল।

তারপর তিনি যাওয়ার পরই সুরটা একেবারে গেল কেটে। হঠাৎ একটা মনের পরিবর্তন ঘ'টে গেল, যেমনটি আর কখনও ঘটেনি। আমার মনটা বরাবরই বহির্মুখী, এক রাঘোপুরের মতো পাণ্ডববর্জিত জায়গা ছাড়া আমি কোনখানেই অস্বস্তি বোধ করিনি, মাকে ছোট-ভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে তুলে দেওয়ার পর থেকে মনটা হু হু ক'রে উঠল। গাড়ি ছেড়ে দিলে বেরিয়ে এসে কোথায় কোথায় ঘুরে রাত প্রায় ন'টার সময় এসে বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিতেই মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল—লীলা নয়, মা নয়, চাকরটা এসে দরজা খুলে হাঁ ক'রে দাঁড়াল শূন্য বাড়িটা পেছনে রেখে।

সেই বাড়ি যেন অসহ্য হ'য়ে উঠল। থাকাটা, তার চেয়ে বেশি বাইরে থেকে ফেরাটা।

সম্ভব নয় এভাবে কাটানো। সপ্তাহখানেকের ছুটি নিয়ে বাড়ি চ'লে এলাম।

অবশ্য স'য়ে গেল আস্তে আস্তে। তবে নয়াটোলার বাড়ি আর সে-বাড়ি রইল না আমার কাছে। মজঃফরপুরও যেন বড় পুরোনো হয়ে গেল আমার কাছে।

আরও একটা ব্যাপার হোল। কিছুদিন থেকেই চলছিল, এই সময় বরাবর চরমে এসে দাঁড়াল।

তার ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে বলব। সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও।

আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন একজন মোক্তার। জাতিতে ভুমিহার, যাদের প্রতিপত্তি এই জেলাটায় খুব বেশি। বেশ মোটামুটি ভালো পসার। স্কুলটা ভূমিহারদেরই। পুরো নাম—ভূমিহার ব্রাহ্মণ কলেজিয়েট স্কুল। ঐ নামের কলেজও রয়েছে। লোকটি এমনি বেশ ভালো, তবে অত্যন্ত চতুর। শিক্ষকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারই ছিল, বেশ সদালাপী, দু'একটা কাজে বার দুই আমি দেখা করি, আলাপ-আপ্যায়ন ভালোই পাই। কথাবার্তার মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ ভাব থাকত

কখনও কখনও; ইংরাজিতে যাকে বলে কন্‌ফাইডিং (Confiding) হ'য়ে পড়া, অর্থাৎ অন্তরঙ্গতার জন্য কিছু ভেতরের কথাও ব'লে দেওয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে।

একবার আলাপটা কোন দিক দিয়ে ঘুরে এল মনে পড়ছে না। আমায় কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বললেন—"জানেন বিভূতিবাবু, আমরা আপনাদের স্কুলে একটা বড় রকম পরিবর্তন আনা মনস্থ করেছি।" আমি সপ্রশ্ন নেত্রে চাইতে একটু হেসে বললেন—আলাপ আলোচনায় হাসির ভাবটা রেখে যেতেন—সামনে থেকে কি একটা কাঠি তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে একটা হেঁয়ালি ধ'রে দেওয়ার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা বলুন, এটাকে না ভেঙ্গে ছোট করতে হ'লে কি করতে পারা যায়?"

হঠাৎ অদ্ভুত প্রশ্নে একটু বিমূঢ় হওয়ার মধ্যে যেটুকু দেরি হয়েছে, তার ভেতরেই উনি হেসে একটা একটু বড় কাঠি প্রথমটার পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন—"এই নিন, ওটা ছোট হ'য়ে গেল।" কথাটার প্রাসঙ্গিকতা না বুঝতে পেরে চেয়েই আছি মুখের দিকে, ওঁর মুখের হাসিটাও লেগেই আছে, বললেন—"আপনাদের স্কুলে আমরা একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করা ঠিক করেছি।"

"কেন? যিনি হেডমাষ্টার রয়েছেন—নীহারবাবু?"

"উনি যেমন আছেন, থাকবেনই। ওঁর তো কোনও ক্ষতি করছিনা।"

খুব চিন্তিতভাবেই ফিরে এলাম সেদিন; সোজা বাড়িতেই। রাত হ'য়েও গিয়েছিল একটু। সেক্রেটারির সঙ্গে নীহারবাবুর যে কিছু কিছু মতভেদ শুরু হ'য়ে গেছে, এটা জানতাম, কিন্তু সেক্রেটারি যে একেবারে এই চাল চালবেন এটা আন্দাজ করতে পারিনি।' ভালো হেড্‌মাষ্টার, ছোটখাট মতভেদ ঠিক হ'য়েই যাবে। একটা অস্বস্তিতে প'ড়ে গেলাম। কথাটা নীহারবাবুর কানে তুলে দিলেই ভালো হয়, সতর্ক থাকেন, কিন্তু অন্তরঙ্গতার সুরে বিশেষ ক'রে বলা একটা গোপন কথাই তো, বের ক'রে দেওয়া সমীচীন হবে কিনা তাও ঠিক করতে পারছিনা। মথুরাপ্রসাদের কাছে পরদিন শুনলাম। খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তার সঙ্গে রহস্যপ্রিয় ব'লে ওঁর সঙ্গটা ভালো লাগত। তার পরদিন স্কুলেও বেশ অন্যমনস্ক রয়েছি, বিষণ্ণও খানিকটা, ওঁর চোখে ধরা পড়ল। প্রশ্ন করলেন—"আজ আপনাকে যেন একটু আনমনা দেখছি। যাতে আনমনা ক'রে রাখে সে পাঠ তো চুকিয়ে ব'সে আছেন।"

আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, মথুরাবাবুকে বলি না, ওঁর মুখ দিয়ে দু'এক কান হ'তে হ'তে যদি নীহারবাবুর কানে পৌঁছে যায় কথাটা তো দু'দিকই বজায় থাকবে।

খর্বকায় ফুটফুটে মানুষটি, কথা বলবার সঙ্গে লঘুত্ব-গুরুত্ব ভেদে হাস্যচপল বা গম্ভীর হ'য়ে কথা বলতেন, মোটা চশমার মধ্যে দিয়ে দ্রুত ভাবান্তর উঠত ফুটে, বললেন—"কি জ্বালা! আপনি এতদিন এ-স্কুলে রইলেন, এখনও অজ্ঞই র'য়ে গেলেন এঁদের সম্বন্ধে? এখানে পাঁচ বছরের বেশি কোন হেড্‌মাষ্টারকে রাখা হয় না—টি'কতে দেওয়া হয় না-ই বলা ভালো। প্রভাব, প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে না?...ভুঁইহারী চাল, এঁরা তো গর্বই করেন ঐ নিয়ে। কেন, সেক্রেটারি আপনাকে বলেননি যখন খুব কন্‌ফাইডিং মুডে (Confiding mood)? নীহারবাবুর কতদিন হোল?...পাঁচ বছর তো বটেই। তাহ'লে এবার তো হ'য়েও এসেছে "স্বর্গ হতে বিদায়ের" সময়। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে না?"...

ওঁর সেই চপল-গুরু ভঙ্গিতে হেসে হেসে ব'লে চললেন; যেন নিতান্ত সহজ, সাধারণ একটা ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতার কথা ব'লে যাচ্ছেন। আমার অজ্ঞতা এবং বিমূঢ়ভাবের জন্য একটু কৌতুকের স্বর রেখে গিয়ে।

উনি নিজে বোধহয় ছিলেন সরযুপাড়ি ব্রাহ্মণ।

ব্যাপারটা ঘোরালো হ'য়ে আসতে লাগল। একটা ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল স্কুলের ওপর। অভিযোগটা ঠিক কি ছিল আমার মনে নেই। বোধহয় নিতান্তই তেমন কিছু নয় ব'লেই নেই মনে। নীহারবাবু শুধু ছাত্র-শিক্ষকদেরই প্রিয় ছিলেন তাই নয়, কমিটির সবাই ওঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। স্কুলে সবার মনোরঞ্জন করতে পারা থেকে একটা দোষ অনায়াসে বের ক'রে নিতে পারা যায়—ইন্‌ডিসিপ্লিন (Indicipline) অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতার শৈথিল্য। জিজ্ঞেস করলে একদিন শুধু বললেন —"তুবেজীর কাছে শোনেন নি? ওদের ঐ পলিসি; একটা পেটি (Petty) মোক্তার, গদিয়ান হ'য়ে বসেছে; ওর "হ্যাঁ"—এ "হ্যাঁ" মেলাতে পার তো তুমি বড় ভালো। তা আমিও দেখে নোব, ডি. পি. আই. (D.P.I.) পর্যন্ত লড়ব।"

কমিটি বসলে অল্প ভোটেই সেক্রেটারির কোট বজায় রইল। বরখাস্ত হলেন নীহারবাবু!

কিছু না ক'রেই মজঃফরপুর ছেড়ে চ'লে গেলেন। কিছুদিন পরেই চন্দননগর থেকে চিঠি পেলাম, সেখানে একটি ভাল স্কুলে হেডমাষ্টারির চাকরি পেয়েছেন।

খুব আঘাত লেগেছিল মনে। রঘুনন্দনবাবু, যিনি আমায় নিয়ে যান, তিনি ছিলেন না। যতদূর মনে পড়ছে, এদিকে কমিটিতেও আর ছিলেন

না। তিনি যে প্রকৃতির মানুষ, নিশ্চয় বেশিদিন থাকা সম্ভবও ছিল না।

কিছুদিন পরে আমিও কাজে ইস্তফা দিলাম। কি ছুতো ক'রে এবার মনে নেই। তবে মনের তিক্ততা হয়তো কিছু প্রকাশ পেয়েই থাকবে।

এরপর আবার সেই কোষ্ঠীর কথা আসে। এবার আরও অল্পদিন পরে, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত দিক থেকে প্রস্তাব এল। পাণ্ডুলে একটা নূতন হাইস্কুল করার তোড়জোড় হচ্ছে। আমায় হেডমাষ্টার করতে চায়। যদি স্বীকার করি তো...ইত্যাদি।

প্রায় আমার বয়স যখন বারো-তেরোর মতো, সেই সময় আমরা পাণ্ডুল ছেড়ে চ'লে আসি। তারপর এই। অন্ততঃ স্থায়ীভাবে এই প্রথম আসা। হয়তো রাঘোপুরে থাকতে এক-আধবার জন্মভূমির মুখ দেখে গিয়ে থাকব। তখন আমার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। আজকের পাণ্ডুল অনেক বদলেছে। রাস্তাঘাট, ভালো স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, লোকসংখ্যা, বাজারের সৌষ্ঠব। আমি যখন হেডমাষ্টারি নিয়ে গেলাম তখন—দীর্ঘ সাতাশ-আটাশ বছর পরেও সেই পূর্বের মতোই রয়েছে প্রায়। নীলকুঠির সেইসব বাড়ি, তখন দ্বারভাঙ্গারাজের জমিদারির আফিস, ম্যানেজারের সুদৃশ্য বাংলো, বাগান, সব রাজের সার্কেল ম্যানেজারের অধীনে। সেই বিরাট নীলচাষের 'জিরাত', তখন চাকলা ভাগ ক'রে আখের ক্ষেত, গমের ক্ষেত। প্রায় সেইরকমই শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন। তারই মধ্যে প্রাণের একটু নূতনতর স্পন্দন। নদীতে নূতন জল ঢুকছে তার একটু-আধটু চপলতা, মৃদু কলতান। প্রাইমারি স্কুলটা মিড্‌ল-এ উঠে এসেছে। তার জায়গায় হয়েছেও একটা। আর, এই হাইস্কুলের সূচনা। নূতন ধারায় একটু ক্লাবজীবন। আমাদের বাড়ির সামনে জিরাতের চাকলাটা ফুটবলের মাঠে পরিণত হয়েছে। আরও কিছু কিছু এদিক-ওদিক।

এ টুকু ভালোই লাগে, মিষ্ট। সেদিন একেবারে যদি আজকের পাণ্ডুলের মধ্যে গিয়ে পড়তাম তো একটা ধাক্কা খেতাম মনে। উপমাটা ঠিক হবে কিনা জানিনা। এটা হোত সেই ধরনের ধাক্কা যেটা কাবলী-ওয়ালা ওসমান মিনিকে দেখে নিজের কন্যা সম্বন্ধে আশঙ্কা করেছিল।

যেমন কন্যাকে তেমনি মাকে, তাই থেকে মায়ের মতোই মাতৃভূমিকে যেমনটি দেখে গেছি, দীর্ঘ প্রবাসের পর ফিরে এসে তেমনটি দেখব ব'লেই আশা ক'রে আমি তেমনটি পেলেই বেশি তৃপ্তি পাই। আরও সব কিছুতেই যা বা যারা এইরকম অন্তরতম। পাণ্ডুলও যেন আমায় আমার সেই শৈশব থেকে ঘুরিয়ে আনল। যোগাযোগটা ছিল সত্যই অদ্ভুত।

আমি গিয়ে উঠলাম সার্কেল-অফিসের একাউণ্টেণ্ট্ যামিনীবাবুর বাসায়। পূর্বে থেকে পরিচয় ছিল, ব'লে রেখেছিলাম। আর অন্য যায়গা ছিল না থাকবার মতো।

তাঁর কোয়ার্টার্স বা বাসা—যেমন চারিদিকের আবেষ্টনী, রাস্তা, সংস্থান ইত্যাদি দেখে মনে হলো—ঠিক আমাদের বাসাটা যেখানে ছিল যেন সেইখানটাতেই। সেই রকম মাঝখানে উঠান রেখে চারিদিকে ঘর। তফাৎ এই, সেগুলো ছিল সবই মেটে, খড়ের চাল, এর খান দুই পাকা দেওয়াল। একটু আশ্চর্য বৈকি। আরও আশ্চর্য, আমার জন্ম যেখানটিতে হয়েছিল, রাত্রে শোবার ব্যবস্থা হোল প্রায় সেই জায়গারই একটা ঘরে।

এতটা মিল কি ক'রে হয়? একটা অল্প কোয়েন্‌সিডেন্‌স্ (Coincidence) মাত্র, একটা অহেতুক যোগাযোগ বললে মন সায় দিতে চায়না। বুঝছি বিজ্ঞান নয়; যুক্তিসাধ্য নয়; একটা সূতিকাগার জীবন্ত কিছু নয়, তবু মায়ের মতোই কোলে টেনে নিল কি ক'রে বুঝে উঠতে পারিনা।

ঘুমটা হোল ছমছমে; ছাড়া ছাড়া স্বপ্নে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। যখন রাত তৃতীয় প্রহরের কাছাকাছি, উঠে উঠানের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালাম। মাথার উপর সপ্তর্ষি জ্বলজ্বল করছে।...সপ্তর্ষি—মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, সবাই আছেন। নিম্নেই, অরুন্ধতী একটু প্রচ্ছন্ন, যেন অর্ধবগুণ্ঠণে। আমার জীবনের আজ এই অদ্ভুত কোয়েন্‌সিডেন্‌সে মনটা যেন কোথায় চ'লে গেছে—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের রেখা অতিক্রম ক'রে। ...সব আছে...সব থেকে যায় কোথায়?... আকাশের দীপ্ত সপ্তর্ষির মতো স্পষ্ট নয়, তেমনি আবার সুদূর, অনধিগম্যও নয়। এই মাটিতেই কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল। ধীরে ধীরে উঠে আসছে। ...বাবা আফিস থেকে এসে পায়রাদের হাঁক দিয়ে ডেকে ধান ছড়িয়ে খাওয়াচ্ছেন—মা আঁচল আড়াল দিয়ে প্রদীপ এনে তুলসীমঞ্চে রেখে প্রণাম ক'রে গেলেন—ঠাকুরমা দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে মালা জপছেন। উঠানের ওদিকে ছোটদের কারা খেলছে, খানিকটা দাপাদাপি ক'রেই; নজর সেইদিকে, মুখে একটা তৃপ্ত হাসি, মালার আঙুল ন'ড়ে চলেছে।...একটা খণ্ড চিত্র।...মূক বায়স্কোপের হঠাৎ কেটে যাওয়া চিত্রের মতো লুপ্ত হ'য়ে গেল।...ছুতোরপাড়ায় পড়াউ ছুতোরের ভূত খেলানোর আওয়াজ উঠল জেগে—ত্রিশটা বৎসরের দূরত্বে ক্ষীণ অস্পষ্ট...

সে সব দিনের এতটা কাছাকাছি যে, স্মৃতিমাত্র ব'লে বিশ্বাস হয়না।

নিজের একটি গাঢ় নিঃশ্বাসের শব্দে মনটা ফিরে এল বর্তমানের কঠিনতায়। একবার চারিদিকটা দেখে নিয়ে, উঠানে আর একটা নিঃশ্বাস ফেলে রেখে বিছানায় ফিরে গেলাম।

সকালে সবাই দলবেঁধে দেখা করতে এলেন ; অস্থায়ী হেডমাষ্টার, অপর গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক, দু'জন আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক, সংস্কৃতের পণ্ডিতজী, পার্শিয়ানের মৌলবীসাহেব। সবারই বয়স ত্রিশের নীচেই। প্রফুল্ল, উৎসাহদীপ্ত বদনমণ্ডল। হেডমাষ্টার পরিচয় করিয়ে দিলেন নাম ব'লে ব'লে। তাঁর নিজের নাম বাচ্চা ঝা—

"কি আনন্দই যে হচ্ছে আপনি আসায়, স্যার।...গরীব স্কুল, পাড়া গাঁ, আমাদের ভয় ছিল, হয়তো আসবেনই না···আপনার তো জন্ম-ভূমিই স্যার?..."

হেসে বললাম—"এই বাড়িতেই জন্মাই ; অর্থাৎ আমাদের বাসাটাও প্রায় এইখানেই ছিল।"

"তাই না কি!" সমস্বরে প্রায় সবাই। গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক ললনবাবু হেসে একটু বিস্ময়বিমূঢ়ভাবেই বললেন—"এ স্ট্রেঞ্জ কোয়েনসিডেন্স্, ইজিণ্ট স্যার?" (A strange Coincidence, isn't Sir?...)

বললাম—"সিওর, ইট ইজ" (Sure, it is)।

এত জায়গায় চাকরি করেছি আগে এবং পরেও, সমস্ত অন্তর ঢেলে সেদিনের মতো অভ্যর্থনা কোথাও পাইনি। আরও কিছু এদিক ওদিক কথার পর বাচ্চাবাবু বললেন—"আপনি ভালো ক'রে রেষ্ট নিয়ে ধীরে সুস্থে প্রস্তুত হবেন স্যার, আমরা এসে নিয়ে যাব। আমরা হয়তো খানিকটা সকাল সকালই এলাম।"—বললাম—"রেষ্ট এমন কিছু দুর্লভ জিনিস নয়। চলুন আগে স্কুলটা দেখে আসি। দূরে? কাল সন্ধ্যার পর পৌঁছুলাম, দেখা হয়নি।"

খুব কাছেই। পাণ্ডুলে থাকতে আমাদের স্নানাদি নিত্য ব্যবহারের বড় কুঁয়াটার পাশে, শ'দুয়েক গজের মধ্যে। ওপরের মাত্র চারটি ক্লাস নিয়ে স্কুল। একটা লম্বা ছ্যাঁচাবেড়ার হল-কে ছ্যাঁচাবেড়া দিয়েই বিভক্ত ক'রে চারটি ক্লাস করা হয়েছে। বেঞ্চ, ডেস্ক রয়েছে অবশ্য, তবে খুব কম। শুনলাম সব মিলিয়ে ছাত্র সংখ্যা এখনও একশ'য় পৌঁছায়নি। নন্-এ্যাফিলিয়েটেড্ (Non-affiliated) অর্থাৎ এখনও ইউনিভারসিটির অনু-মোদন পায়নি। ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেদের প্রাইভেট হিসাবেই পরীক্ষা দিতে হবে।

এ ঘরগুলো, বর্ষায় জল ঢোকার প্রতিষেধ হিসাবে অল্প একটু ভরাট ক'রে, প্রায় জমির সমতলেই। খানিকটা, প্রায় হাত পাঁচ-ছয় মাত্র দূরে

একটা হাত চারেকের উঁচু ইটের পোতার ওপর একটা আন্দাজ ১০'×১০' ঘর, ছ্যাঁচা বেড়ারই, তবে ভালো ক'রে মাটি দিয়ে লেপা এবং কলি ফেরানো। এটী একাধারে আফিস, লাইব্রেরী, হেডমাষ্টারের বসবার ঘর। সামনের চওড়া বারান্দার খানিকটা ঘিরে শিক্ষকদের অবসর সময়ে বসবার জায়গা।

এ অংশটা ক'ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়।

দ'মে যাওয়ারই কথা, কিন্তু বেশ মনে আছে, আগের দিন পাণ্ডুলে পা দেওয়ার সঙ্গে একটা যে আনন্দপ্রবাহ সর্বান্তঃকরণ দিয়ে অনুভব করেছিলাম তার এতটুকু ক্ষুণ্ণ হোল না এই নিতান্তই দৈন্যের চিত্র দেখে। মনে হোল, এককালে বড় বড় পণ্ডিতদের জন্মভূমি পাণ্ডুলের ঐতিহ্যের সঙ্গে এই স্বল্প, আড়ম্বরহীন আয়োজনের কোথায় চমৎকার একটা মিল রয়েছে; অন্ততঃ যুগ-স্বপ্নের সূত্রপাত হিসাবে অশোভন নয়।

দেখে শুনে বেড়ালাম খানিকটা, জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে। জেলা-বোর্ডের প্রশস্ত রাস্তার ধারেই একটা লম্বা প্লট, তার ওপরেই বাড়িটা। ...জনসাধারণের প্রবল উৎসাহ—ইতিমধ্যে 'এত' টাকা সংগ্রহ হয়েছে—'এত' ইট—'এত' শিশুকাঠ—দ্বারভাঙ্গা রাজ সহানুভূতিশীল—ম্যানেজার (একজন ইংরাজ), তহশীলদার (একজন রাজপুত আমার পরিচিতও)—এঁদের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। ম্যানেজার স্কুলের প্রেসিডেণ্টই—সদরেও রাজে চেষ্টা করা হচ্ছে—আশা আছে এই চাকলাটা বিনামূল্যে পাওয়ার, আর সামনের ঐ জিরাত, স্কুলের খেলার মাঠ হিসাবে—আর স্কুলের দক্ষিণের প্লটটা, স্কুলের হোষ্টেলের জন্য...

আলোচনার মধ্যেই একজন, বোধহয় ললনবাবুই, একটু যেন গলা নামিয়েই পলিটিক্‌স্‌-ও এনে ফেললেন—"পাওয়া যাবেই স্যার, আজ-কাল জনতার চাহিদাকে অগ্রাহ্য করা চলবেনা।"

ঘুরে ঘুরে দেখেশুনে বেড়াচ্ছি। নূতনের সঙ্গে পুরাতন মিলে মিশে কেমন যেন স্বপ্নালু ক'রে দিচ্ছে। এই পাণ্ডুল—প্রায় শতাব্দীর ওদিকে—ঠাকুরদাদা তিনশ' মাইল অতিক্রম ক'রে একদিন এখানে এসে দাঁড়ালেন—সতেরো বৎসরের যুবক—কি স্বপ্ন ছিল তাঁর নয়নে?... আজ আমি তাঁর পৌত্র—কি স্বপ্নকে আমায় দিয়ে মূর্ত করবার জন্য আজ আমায় ঘিরে দাঁড়িয়েছেন এঁরা?

স্কুলের এখনও বিধিমতো উদ্‌বোধন হয়নি। কারণটা কি মনে পড়ছে না। মিথিলাভূমি, শুভারম্ভে হোম-যজ্ঞের একটু ঘটা তখনও আজকের মতো শিথিল হ'য়ে আসেনি। উপচারে যেটুকু দৈন্য ছিল, শ্রদ্ধায়,

নিষ্ঠায় সেটুকু পূর্ণ ক'রে অনুষ্ঠানটা শেষ ক'রে আমরা কাজ শুরু ক'রে দিলাম পূর্ণ বেগে।

আমার উপস্থিতিটাকে যতটা পারেন বাড়িয়ে-সারিয়ে, কমিটি আর শিক্ষকেরা কাজে লাগাতে লাগলেন। ছেলে বাড়তে লাগল। ছু'জন আমায় অন্য দিক দিয়ে প্রচুর সাহায্য দিতে লাগলেন। ম্যানেজার, আর তহশীলদার। তখন তহশীলদারের স্থান ম্যানেজারের নীচেই। অভাব জানিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেই "না" বলেন না। তহশীলদার স্কুলের তহবিলের জন্য প্রজাদের খাজনা দেওয়ার সময় মাথাপিছু একটা করের মতো ধার্য ক'রে দিলেন। জমতে লাগল।

ওঁদেরই সাহায্যে ঘরগুলো ভালো ক'রে নিলাম। ছু'একটা বাড়িয়েও থাকব। অবশ্য ছ্যাঁচা বেড়ারই। রাজ থেকে কাঠ, বাঁশ, খড়, দড়ি চেয়ে নিয়ে। অন্যদিকে ইটের পাঁজার ব্যবস্থা হচ্ছে। পাণ্ডুলে বেশ সাড়া প'ড়ে গেছে।

আমি বহুদিন পরে আবার নিজেকে যেন ফিরে পেয়েছি অবাধ কাজের মধ্যে। ত্রিহুতের ছেলে, প্রায়ই সব ভালো, তার চেয়েও যা বড় কথা, বাধ্য, নম্র, সহরের ছোঁয়া লাগেনি ; বা, যেটুকু লেগেছে তার প্রয়োজনই আছে নবযুগের যাত্রী হিসাবে। পড়িয়ে আনন্দ পাই, যেমন হয়তো পূর্বে পাইনি। শিক্ষকেরা সবাই মিলে জল্পনা-কল্পনা করেন, ক'টা ছেলে পাস করবে? ভালো ব্যাচ, হবেনা শতকরা শতই? হোক্ প্রাইভেট, নাম তো হবে পাণ্ডুল হাইস্কুলেরই···

শুধু পড়ার দিকেই নয়। পুরোদস্তুর একটা আধুনিক হাই স্কুল। নিজে খেলি ছেলেদের সঙ্গে ফুটবলের মাঠে। তহশীলদার ভালো খেলোয়াড়ই, তহশীল থেকে ঘুরে এলে আসেন মাঝে মাঝে, ছু'জন শিক্ষকও থাকেন।

এইখানেই শেষ নয়। একটা কাপ্—কম্পিটিশন্ শুরু ক'রে দিলাম, এতেও তহশীলদার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

যতদূর মনে পড়ে, আন্তঃস্কুল কম্পিটিশন্ নিয়ে কাপ দেওয়ায় এ-তল্লাটে পাণ্ডুল হাইস্কুলই ছিল অগ্রণী।

যামিনীবাবুর ওখান থেকে উঠে আসতে দেরি হোলনা।

আমার বাসাটা তৈরী হচ্ছিলই মাটি ফেলে উঁচু ক'রে। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। পাশাপাশি ছু'খানা ঘর, ছ্যাঁচা বেড়ারই, তবে তারই মধ্যে খানিকটা হেড্মাষ্টারের মর্যাদা রেখে। সামনে দাওয়া, ছু'ধাপ সিঁড়ি নেমে খানিকটা ঘেরা উঠান, তার একদিকে রান্নাঘর। কাজ চলছিলই, আমি বাইরে একটা চারদিকে দেওয়াল, সামনে

খোলা উত্তরমুখো ঘর ক'রে নিলাম। বৈঠকখানা গোছের, দেখা-সাক্ষাৎ বা গল্প-গুজব করবার জন্য। অন্য দিক দিয়েও ঠাট বজায় রাখবার জন্য চাকরের ওপর একজন পাচক ব্রাহ্মণ রেখে নিলাম। নিজ্ মিথিলা, মধ্বু বাবুর পৌত্র, বিপিনবাবুর ছেলে, মজঃফরপুরের মতো এখানে কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড—পাচক-চাকর চলতও না।

চলল একটানা, এক অপূর্ব শান্তিময় জীবন। হয়তো পুরাকালের আশ্রম-জীবন এই ধরণেরই কিছু ছিল। মজঃফরপুরের নাগরিক জীবনের অনেক কিছু থেকে অবশ্য বঞ্চিত আছি, কিন্তু একদিনের জন্যও কোন কিছু নিয়েই অভাব বোধ করিনি। সাকরি থেকে প্রায় এতটাই দূরে রেল লাইনের দক্ষিণে রাঘোপুর। একটা সপ্তাহ বাড়ি না গেলে প্রাণ আইঢাই করত। এমনকি মজঃফরপুরে থাকতেও সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি আসা একটা নিয়মের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল; পাণ্ডুলে এমনও হয়েছে, হু'হু'টো সপ্তাহ কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, হুঁসও হয়নি। বিশেষ ক'রে কাজের চাপ এসে পড়লে।

পাণ্ডুল আর একটা জিনিস দিল আমায়; একটা তৃপ্তি, মনের ব্যালেন্স্ বা ভারসাম্য, সব চিন্তার মধ্যে একটা নিশ্চিন্ততা, যা না হ'লে সাহিত্যসৃষ্টি হয়না। মজঃফরপুরে আমার কলম আবার যে একটু সড়গড় হয়েছিল, পাণ্ডুলে একটা নূতন বিদ্যায়তন গ'ড়ে তোলার অতন্দ্র প্রয়াসের মধ্যেও সেটা অব্যাহতই রইল। অবশ্য, শুধু গল্পই চলেছে তখনও। কি কি গল্প লিখি পুরোপুরি মনে পড়ছেনা, তবে, দু'টো যে এখানেই ব'সে লিখি, সেটা আছে মনে, 'দাঁতের আলো' (রাণুর দ্বিতীয় ভাগ) আর 'রংলাল' (রাণুর তৃতীয় ভাগ)। দু'টোই আমার পাণ্ডুল জীবনের সঙ্গে জড়িত। 'রংলাল' রাস্তার কুকুর-কে খেতে দিয়ে পোষ-মানানো আমার ঐ-নাম দেওয়া একটা কুকুর নিয়ে। 'দাঁতের আলো'র নায়িকা আমার ভাইঝি ছবি, দাদার ছোট মেয়ে। তখন সবে নীচের দু'টো দাঁত বেরিয়েছে, বাড়ির শিশুজগতে (রাণু প্রভৃতি) তাই নিয়ে যে সাড়া প'ড়ে গেছে তারই দূর-পাণ্ডুলে প্রতিধ্বনি।

আরও একটা গল্প এখানকার ছাত্রজীবন নিয়ে লিখি, তবে এখানে ব'সেই কি পরে কোথাও, সেটা মনে নেই। গল্পটার নাম 'পারমোশিন'—বোধহয় 'প্রবাসী'তেই প্রকাশিত হ'য়ে গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। "বঙ্গশ্রী" হ'লেও হ'তে পারে।

এখানে আরও একটা জিনিস পেয়েছি যা অন্য কোথাও পাওয়ার উপায় ছিলনা একরকম বলা চলে। পাণ্ডুলের রাত্রি—প্রথম প্রহরের গোড়াতেই দ্বিতীয় তৃতীয় প্রহরের প্রগাঢ়ত্ব নিয়ে নেমে আসত। খাওয়া-

দাওয়ার পর প্রায়ই আমি আমার খোলা বৈঠকখানায় এসে একটা ডেক্ চেয়ারে বস্‌তাম। সমস্ত পল্লীটা একেবারে নিষুপ্ত। শব্দের মধ্যে থেকে থেকে দূরে কোথাও গ্রাম্য কুকুরের ধ্বনি। একটি আলোকরশ্মি নেই কোথাও। ছু'পাশের বসতি দূরে দূরেই, যাও অল্প আছে কচিৎ—জাগর কোন গৃহে, তাও দৃষ্টিগোচর নয়। বাসার নীচেই একটা গ্রাম্যপথ কুঠির দিক থেকে এসে ডাইনে বামনটুলিতে চ'লে গেছে; তার ওদিক থেকেই বিস্তীর্ণ আখের ক্ষেত, কুঠিরই। সার দেওয়া বড় বড় ঘনসন্নিবিষ্ট আখ। সামনের কিছু কিছু নজরে পড়েই, সমস্তটা অন্ধকারে অবলুপ্ত। একলা ব'সে ব'সে কিছু একটা চিন্তা এসে ক'রেই নিত দখল মনটাকে। তবে, আমি যে বসতাম গিয়ে তা স্বচ্ছতারকাখচিত পল্লী-আকাশ থেকে স্খলিত ঐ নিরেট-নিঝুম অন্ধকারের জন্যই।...সে যেন মাত্র আলোর অভাবই নয়, একটা আলাদা সত্তাই, রাস্তাটুকু পেরিয়ে একটু ওদিকে গেলেই তাকে যেন স্পর্শ করা যাবে।

বর্ষার দিনে সে আরও এক সর্বগ্রাসী অন্ধকার। আকাশের তারা পর্যন্ত লুপ্ত। এদিকে, রাস্তা তো দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলে দেখা যায় না। গ্রাম্য কুকুরেব ধ্বনিটুকুও স্তব্ধ, জীবনের সব সাক্ষ্য লুপ্ত ক'রে। শুধু একটিমাত্র ধ্বনি—অবিরল বর্ষার—ঝর-ঝব-ঝর-ঝর—। যেন সেই নিরেট অন্ধকারই তরল হ'য়ে গিয়ে গ'লে গ'লে পড়ছে।

চুপ ক'রে ব'সে থাকতাম। কি যে পেতাম স্পষ্ট ক'রে বলতে পারিনা, কেননা কোনদিনই স্পষ্ট ক'রে কিছুই পাইনি। ব'সে ব'সে আমারই একটা অপূর্ব পুলক শিহরণ ধীরে ধীরে সমস্ত দেহমন পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলত। বিপদও ছিল। চাকর-ঠাকুরের সন্দেহ হওয়া অসম্ভব নয় যে তাদের মনিব শুধু "বিলচ্ছন" (বিলক্ষণ) হেডমাষ্টারই নয়, একজন প্রচ্ছন্ন যোগীপুরুষও সেইসঙ্গে। বেশি বিলম্ব হ'য়ে গেলে যোগনিদ্রা ভাঙাবার মতো ক'রেই ভেতর থেকে সন্তর্পণে আমায় টুকে দিত, "রাত ভ' গেলেই"—অর্থাৎ অনেক রাত হ'য়ে গেছে।

আগে অতটা ভাবিনি। তারপর একদিন খেয়াল হ'ল, মনিব-গৌরবের গুরুভার নিজেরা বইতে না পেরে বাইরে দেবেই বণ্টন করে; তখন, একে তো শিশু-স্কুলটাকেই সামলাতে পারছিনা, এর ওপর জড়ি-বুটি, ঝাড়-ফুঁকের জন্য ভিড় প'ড়ে গেলে স্থান ত্যাগ করা ছাড়া উপায় থাকবেনা।

একদিন টুকতে এলে বিরক্ত হ'য়েই বললাম—দেখতেই পাচ্ছে সমস্ত-দিন সময় থাকেনা, এই সময়টা স্কুলের ভাবনা নিয়ে একটু বসি, হোক্ রাত, যেন টুকে না দেয়।

বিশ্বাস করল কিনা বলতে পারিনা। তবে আর টোকেনি তার পর থেকে। বাইরে কি করল জানিনা, তবে অন্ততঃ ভিড় করবার মতো উৎসাহ দেয়নি কাউকে। আমারও অন্ধকার-বিলাসে আর বাধা পড়েনি।

যতটা মনে পড়ে, আমি বৈশাখের মাঝামাঝি কোন সময় পাণ্ডুলের কাজ শুরু ক'রে থাকব। একটা একটা ক'রে মাস কেটে যেতে লাগল কর্মোন্মদনার মধ্যে দিয়ে। এক রকম অবিচ্ছিন্নভাবেই। একটা যে অভাব-অসুবিধা সেটাও একটা সুযোগ হ'য়েই দেখা দিল। বাঙ্গালী সমাজ নেই। থাকলে খানিকটা যে যেতই সময় সেটা গেল বেঁচে। সাকরির কথা বলেছিই, রাঘোপুরে থাকাকালীন সে-আকর্ষণটা আর নেই। দ্বারভাঙ্গায় যাওয়ার সময়, বা, সেখান থেকে ফিরতে একটু দেখা-সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে গেলাম। পাণ্ডুল আমার জন্মস্থান, কিন্তু যে বয়সে ত্যাগ ক'রে গেছি, তাতে বেশি পরিচয় বা কোন যোগবন্ধন এখানকার সমাজের সঙ্গে গ'ড়ে ওঠবার কথা নয়। স্কুলের শিক্ষক, কখনও যামিনীবাবুর বাড়ি গিয়ে বসা—সামাজিক জীবন বলতে এইটুকু মাত্র।

একটু বৈচিত্র্য—মুখ বদলানো—স্কুলের কমিটি মিটিং; কোনও প্রয়োজনে সায়েবের বাংলোতে বা তহশীলদারের বাসায় যাওয়া; গেলেই খানিকটা এদিক-ওদিকও গল্প। তহশীলদারও আসতেন মাঝে মাঝে।

একদিন এরই মধ্যে আর একটি জিনিস এসে প'ড়ে আমার পাণ্ডুল জীবনে একটি নূতন স্বাদ এনে দিল, তার মাধুর্য এখনও আমার জিহ্বায় লেগে রয়েছে।

সেদিন স্কুল থেকে এসে জলযোগ সেরে বাইরে গিয়ে বসেছি দৈনিক কাগজটা হাতে নিয়ে, একটি ছেলে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে কুণ্ঠিত চরণে এগিয়ে এসে বারান্দার নীচে দাঁড়াল। ছেলেটিকে রোজই স্কুলে দেখি, কিছুদিন আগে চতুর্থ অর্থাৎ সবচেয়ে নীচের ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। ক্লাসে গেলে আমার দিকে যেন একটু বেশি চেয়ে থাকে ব'লে কৌতূহলও হয়েছে, কিন্তু সেটা কোন প্রশ্নের কারণ নয় ব'লে কিছু বলা হয়নি। সেদিন এভাবে পেয়ে প্রশ্ন করলাম—"কিছু বলবে আমায় ?"

মাথা দোলাল। সঙ্গে সঙ্গে বলল—"দাদী আপ্‌নেকে লে যায় কহলখিন।" (ঠাকু'মা আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বলেছেন)।

তা'হলে না হয় সেদিন কথাবার্তা যা হয়েছিল মৈথিলীতেই সেটা ব'লে যাই। মিষ্ট ভাষা, আমার অভিজ্ঞতাটুকুও মিষ্ট, মাধুর্যটি পুরোপুরি পাওয়া যাবে।

একটু বিস্মিত হ'য়েই প্রশ্ন করলাম—"আঁহাকে দাদী হমরা বোলৈলখিন? কে থিকি?" (তোমার ঠাকু'মা আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন? —কে তিনি?)।

"হমর দাদী" (আমার ঠাকু'মা)।

"কথিলা বোলৈল্খিন্?" (কেন ডেকেছেন?)।

বাইরে গিয়ে এদিক-ওদিক দেখছে, আমিও কিছু বুঝতে পারছিনা। ঘনানন্দ ব'লে একটি যুবক এসে দাঁড়াল।

কিছু দূরে একটা পাঠশালা আছে, তার গুরুমশাই। পাড়া গাঁ, ওপর পড়া হ'য়েই অন্যের ব্যাপারে এদের ঢুকে পড়তে বাধে না, পরিচয়ও হয়েছে আমার সঙ্গে; দু'জনেরই একটু হতভম্ব ভাব দেখে বলল—"ইছখিন্ ফনীন্দ্র ঝা'ক্ পোতা" (এ ফনীন্দ্র ঝা'র নাতি)।

এর পরেই যে কথাটা আসে,—তা, আমায় ডাকতে এসেছে কেন। জিজ্ঞেস করতে যাব, সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি-স্ফুরণে একটা কথা মনে প'ড়ে যেতে, সামলে নিয়ে বললাম—"বুঝলঁও, আপ্নে যাউ।" (বুঝেছি, তুমি যাও)।

হঠাৎ স্মৃতি-স্ফুরণের সঙ্গে একটু অনুতাপও। ফণীন্দ্র ঝা ছিলেন বাবার খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু। বাবার জন্মস্থানও এই পাণ্ডুল, সুতরাং বাল্যকাল থেকেই সে বন্ধুত্ব চ'লে এসেছে নিশ্চয়। সম্পদে, বিপদে ছেলেবেলায় এঁকেই সবচেয়ে বেশি ক'রে বাবার পাশে এসে দাঁড়াতে দেখেছি। আমরা পাণ্ডুল থেকে যাওয়ার পর দ্বারভাঙ্গাতেও আমাদের বাড়ি এসেছেন, থেকেছেন, এদিকে বয়স হওয়ার জন্যই বোধহয় যাওয়া-আসা কমে গিয়েছিল।

টুলো পণ্ডিত না হ'লেও ফণীন্দ্র ঝা বেশ শিক্ষিত, বিচক্ষণ লোক ছিলেন। ওঁর আর একটা পরিচয়, উনি ছিলেন পাণ্ডুলের স্বনামধন্য পণ্ডিত বিশ্বনাথ ঝার নিকট জ্ঞাতি। বিশ্বনাথ রাজপুতানার কোন স্টেটে গিয়ে —জয়পুর, কি, যোধপুর—বিশেষ খ্যাতি ও সম্পদ অর্জন করেন। ফণীন্দ্রবাবু নিকট আত্মীয়, তাঁর দেহমনে বংশের একটা ছাপ ছিল।

সমস্তটুকু মনে প'ড়ে গিয়ে ভেতরে ভেতরে যেন ছটফটিয়ে গেলাম। ফনীন্দ্রবাবু তখন আর ইহজগতে নেইও; সেইজন্যই এমন ভুলটা হ'য়েও গেছে।

নিজেকে এতই অপরাধী বোধ হোল যে তেমন প্রস্তুত না থাকা সত্ত্বেও আমি ছেলেটিকে আর অন্য সময়ের কথা না ব'লে, গায়ে কামিজ দিয়ে যেমন ছিলাম তেমনি তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

পো'টাক দূরে ফনীন্দ্রবাবুর বাড়ি।

"ছুরুখিড়" পহুঁছে অর্থাৎ সদর দরজার সংলগ্ন ছোট চালাটার মধ্যে গিয়ে ছেলেটাকে বললাম—ভেতরে গিয়ে খবর দিতে। গিয়ে, একটু পরেই বেরিয়ে এসে বলল—"এ্যান্ যাও।" (আসুন)।

ওর পেছনে পেছনে উঠানে গিয়ে উঠলাম। মিথিলার সম্পন্ন গৃহস্থের মতো বড় উঠান, চারিদিকে ঘর। উঠানের মাঝখানে বিবাহ-উপনয়নাদি অনুষ্ঠানের জন্য উঁচু পোতায় চারিদিক খোলা একটা ছোট আটচালা। এঁদের উঠানের একধারে একটা ধানের মরাইও।

আমি প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে সামনের ঘর থেকে একজন মহিলাও বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বেশ বয়স হয়েছে, মার চেয়েও বোধহয় একটু বেশিই, মাথায় পাকা চুলই বেশি, আর, একটু ঝুঁকেও পড়েছেন সামনে, পরনে থান কাপড়। আমি ছেলেটির দিকে চাইতে বলল—"দাদী থিকি।"—(ঠাকু'মা)। আমি এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছি, উনি মাথায় হাত দিয়ে কাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—"কাঁহা গেলি হে? পাহুন এলা, আসৃনি দিয়া।" (কোথায় গেলে গো? কুটুম এসেছেন, আসন পেতে দাও)।

সঙ্গে সঙ্গে—"হঁ রে বিভূতি, তোঁহু সচ্‌মুচ্‌ কুটুমে ভ' গেলে?" (হাঁরে বিভূতি, তুইও সত্যিই কুটুম হয়ে গেছিস্?)।

ব্যঙ্গটুকু বুঝেছিলাম, লজ্জিতভাবে বললাম—"কাম্‌মে বাঝালছেলঁও চাচী, নয়া স্কুল।...তাহিও চুক্ ভ' গেল, ছমা ক্যাল্ যাও।" (নূতন স্কুল, কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম কাকীমা।...তবু ভুলই হ'য়ে গেছে, ক্ষমা করবেন)।"

ছেলেটা একটু হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে, মাথায় আধ ঘোমটা টেনে, একটা কালো কম্বল পাট ক'রে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল, যেন ছেলেটির অপেক্ষায়, মাথার কাপড়টা আর একটু নামিয়ে দিয়ে দাওয়ার ধারে দু'পাট ক'রে বিছিয়ে দিয়ে গেল। "আ, বৈস,"—(আয়, বোস্) ব'লে উনি আমার পিঠে হাত দিয়ে নিয়ে গিয়ে বসালেন। পাশ ঘেঁষেই নিজেও ব'সে হাতটা একটু তুলে বললেন—"তোরা এত্তেকৃটা দেখ্‌লে ছেলওঁ হ্যাঁ"—(ছেলেটির দিকে চেয়ে) হিন্‌কে জঁকা। আই তোঁ পইখ্‌ ভ' গেলে হ্যাঁ, হেডমাষ্টার ভ' গেলে হ্যাঁ। তেঁই, হম্‌রো লেকেঁ পৈখ, হমরো লেকেঁ হেডমাষ্টার হ্যাব্যা? হ' রে বিভূতি?" (তোকে এই এতটুকু দেখেছি [ছেলেটির দিকে চেয়ে] এই এর মতো। আজ তুই বড় হয়েছিস, হেডমাষ্টার হয়েছিস—তা আমার কাছেও বড়? আমার কাছেও হেডমাষ্টার?)।

পিঠে আস্তে আস্তে হাতের টান চলছে। কথাগুলোর মতোই হাতের

টানেও, স্নেহ, গরব, তার সঙ্গে খানিকটা অভিমানও ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে, যার জন্যে আমার মধ্যেও একটা রূপান্তর ঘ'টে চলেছে।...ছেলেবেলায় কবে এ বাড়িতে এসেছি, ইনিই বা কবে গেছেন আমাদের বাড়ি, মনে পড়ছেনা, তবে এখন আমিও আর হেডমাষ্টার নেই, এ-বয়সেও নেই, কোন যাদু বলে চ'লে গেছি সেই সব দিনে। অনেকক্ষণ ধ'রেই এইভাবে চলল। বুড়ো মানুষ, ভাবের আবেগে কথার স্রোত নেমেছে। ব'কে যাচ্ছেন। সে-সব দিনের খণ্ড খণ্ড ঘটনা জুড়ে জুড়ে একটা যে মীনার কাজ হ'য়ে চলেছে, মানসনেত্রে সেই দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছি, এক সময় সেই মেয়েটিই একটা কালো পাথরের থালা বসিয়ে দিয়ে গেল। 'পাগল্'—অর্থাৎ চিনিতে পাক-করা মাখানা, সরু ধানের চিঁড়ে, গুড়, একপাশে কিছু শুক্‌নো মেওয়া—আখরোট, কিস্‌মিস্, পেস্তা, বাদাম। আর একবার এসে একটা শ্বেতপাথরের রেকাবিতে গোটাকতক লাড্ডু এনে রেখে, ছেলেটার গায়ে হাত দিয়ে পাশে ডেকে নিয়ে কি বলতে, সে বলল—"পুছইছথিন্, খাজো ছেই, দেতি?" (জিজ্ঞেস করছেন, খাজাও আছে, দেবেন?)। বর্ষীয়সী গল্প করতে করতেই জিনিসগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিলেন, একটু চকিত হ'য়ে গিয়েই বললেন—"দেখু তো, তোরেই হেৎ খাজা বনৈলেছলঁও, রাহ্ দেখৈৎ দেখৈৎ বাসিও ভ' গেলেই।" (দেখতো কাণ্ড, তোর জন্যেই খাজা তৈরী করেছিলাম। তোর পথ দেখতে দেখতে বাসিও হ'য়ে গেল)। কিছু একটা পেয়েই আমার যেন প্রথম কথা ফুটল, একটু উল্লসিত হ'য়ে উঠেই বললাম—"বাইস্ খাজা হামরা অধিক প্রিয় থিক্।" (বাসি খাজা আমার বরং বেশি প্রিয়)।

অন্যমনস্কতা থেকে হঠাৎ একটু চকিত হ'য়ে কথাটা বলায় কি ছিল—তার ওপর বাসি জিনিসের প্রশংসাও—উনি একটু হেসেই উঠলেন, বললেন "শুনুহে, বাইস্ বোস্তু কতউ প্রিয় হুয়্যাঃ?" (শোন গো, বাসি জিনিস কখনও প্রিয় হ'তে পারে?)।

মেয়েটিও যেন হাসি সামলাতেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরের ভেতর চ'লে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঁসার রেকাবিতে প্রায় বিঘৎ খানেক চারটে চৌকো খাজা নিয়ে এসে থালাটায় দিতে যাবে, আমি একটু গা-টা গুটিয়ে নিয়ে বললাম—"তেঁই এত্তেক্!" (তা বলে এত গুলা!)। মেয়েটি থমকে যেতে বললাম—"দু'টা দিয়, ব্যস্।" (দুটো দাও, ব্যস)।

উনি বললেন—"চারিয়েটা ত ছৈক্।" (চারটেই তো মোটে আছে)।

বললাম—"লগ্‌লে ভর্‌পেট জল্‌খৈ কৈনে আবৈছি চাচী।" (এইমাত্র পেট ভ'রে জলখাবার খেয়ে আসছি কাকীমা)।

"আঁহাঁ, একটা ল' যাউ'। বাঙ্গালিক্ পেট হম্ জানৈছি কিনা।" (তুমি একটা নিয়ে যাও। বাঙ্গালীর পেট আমি জানি তো)।

কথায়-বার্তায় হাতের টানটা থেমে গিয়েছিল, আবার শুরু ক'রে দিয়ে ব'ললেন—"লে, খো"—(নে, খা)।

হাসিটুকু আনন্দের পূর্ণতা, তারপর থেকেই কণ্ঠস্বরে যেন একটু খেদ মিশে গেছে। বাঁ হাতটা আমার পিঠে, হঠাৎ—"আই যও তোরা চচা জীবিৎ রহৈৎ! (আজ যদি তোর কাকা বেঁচে থাকতেন)—বলতে বলতেই ডান হাতে আঁচলে খুঁটটা তুলে চোখে চেপে ধরলেন। কয়েক সেকেণ্ড;:তারপরেই চোখ মুছে নিয়ে নিজেকে তিরস্কার ক'রে—"দেখু ত, বাচ্চাকে খায় দ'ক আঁখমে আঁশু!...নই, তোঁ খো। হম্ রা নসিব, কি করব্যা?" (দেখো তো, বাছাকে খেতে দিয়ে চোখে জল? না, তুই খা। আমার অদৃষ্ট, কি করবি?)।

বাবার অতবড় বন্ধু, আমার মনটাও উৎলে উঠেছে। একগাল চিঁড়ে আর খানিকটা গুড় গালে ফেলে দিয়ে কি ব'লে কথাটার মোড় ঘোরাব ভাবছি, উনিই আরম্ভ করলেন—"হরেক দিন হিনৃকা কহৈছি, বোলা লে আ তোরে হেট্ মাষ্টার, হম্ রা লেকে স্যা বিভুতিয়ে থিক্—শুনলা উত্তর, বিনা ঐনে ওকরা উপায় নৈ ছৈক্।...ত, হামরা ডর হৈয়্যা, তো লাজ হয়্যা।...আই কালিক নেন্না, খারাব কাজমে তরপৈৎ যেতা, নিক কোনও কাম কহু ত, শরম..." (রোজ একে বলছি, ডেকে নিয়ে আয়, তোরই হেডমাষ্টার, আমার কাছে সেই বিভূতি। তা, আমার ভয় হয়, লজ্জা করে। আজকালকার ছেলে। দুষ্টুমির কিছু হোক্ না, লাফাতে লাফাতে যাবে। একটা ভালো কাজ বলো—অমনি আমার ভয় করে, লজ্জা করে)।

চলল বকর বকর যতক্ষণ না শেষ হোল। শেষ করতেও হোল নিঃশেষ ক'রেই থালা রেকাবি পরিষ্কার ক'রে। পাড়ার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে বাড়ির কোণে-কোণে জড় হয়েছে। আহারের পরও একটু এদিক ওদিক গল্প ক'রে প্রণাম ক'রে উঠতে মাথায় হাত চেপে "দুরুখ্যি" পর্যন্ত সঙ্গে এসে বললেন—"অবৈৎ রহবে যব ফুরসৎ রহতৌ। অপন্ ঘর অছৈৎ কোনা বাহর পড়ল ছ্যা সেহোত নৈই বুঝ্ পড়ৈছেই।" (ফুরসৎ পেলেই আসতে থাকবি। নিজের বাড়ি থাকতে বাইরে প'ড়ে আছিস কেন তাও তো ভেবে পাইনা)।

ও অভাবটুকুও থাকতে দিলনা পাণ্ডুল। পূরণ যে ক'রে দিল তা প্রাপ্যের চেয়ে আরও বেশি ক'রেই। ...বড় ছেলে, মা আর কবে কাছে

ব'সে তাকে পিঠে হাত দিয়ে ছেলেবেলার মতো গল্প ব'লে ব'লে খাইয়েছে? একটি মাতৃহৃদয়ে আমার জন্যে এ-অমৃতটুকুও লুকিয়ে রেখেছিল পাগুল।

ফনীন্দ্রবাবুর ছেলে শশিনাথ বাড়ি ছিলনা। পরের দিন সকালে চ্যাঙারি ক'রে কিছু চিঁড়ে, 'পাগল' মাখানা আর কয়েক রকম আচার এনে অনেকক্ষণ গল্প সল্প ক'রে চ'লে গেল। যাওয়া-আসায় নিমন্ত্রণে বাড়িটার সঙ্গে একটা যোগসূত্র দাঁড়িয়ে গিয়ে জীবনটা আরও সহজ হ'য়ে এল।

এদিকে স্কুলের কাজ ভালোরকমই চলছে। স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য লেখাপড়া চলছিল, একদিন নিতান্তই অসতর্ক অবস্থায় এক কাণ্ড হ'য়ে বসল।

আমি ক্লাসে পড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ স্কুলের সামনে একটা মোটর—বোধহয় জীপ গাড়িই—এসে দাঁড়াল এবং আমরা কিছু বুঝে ওঠবার আগেই স্যুটপরা একটি ভদ্রলোক নেমে এসে আমার আফিসে উঠে গিয়ে বারান্দায় যে দু'জন শিক্ষক বসেছিলেন তাঁদের প্রশ্ন করলেন—"আপনাদের হেডমাষ্টার কোথায়?" আমিও এসেছি উঠে। অভিবাদন ক'রে বললাম—"আমিই হেডমাষ্টার, আসুন।"

ভেতরে গিয়ে আমার চেয়ারে বসিয়ে, পাশের একটা চেয়ারে ব'সে ওঁর দিকে চাইতে বললেন,—"আমি ডিভিশনল্ ইন্‌স্‌পেক্টার অব স্কুলস্। আপনার স্কুলটা দেখতে এলাম। এই আমার কার্ড। আপনারা তো এফিলিয়েশন্ চাইছেন।"

পরিচয়টা আগেই টের পেয়েছিলাম, চাপরাশির চাপরাশে নজর প'ড়ে গিয়ে।

সারপ্রাইজ ভিজিট অর্থাৎ অতর্কিতে পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে আসা। ইংরাজিতে বরাবর কথাবার্তা হ'চ্ছে। আমি বললাম—"আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা এফিলিয়েশনের খানিকটা যোগ্যতা অর্জন করেছি ব'লেই মনে হয়, এখন আপনাদের অনুগ্রহ এবং আনুকূল্য হ'লেই হয়। হাইস্কুলের একটা বিশেষ দরকার এ অঞ্চলে, মধুবানীর পর আর কাছে পিঠে স্কুল নেই।"

আর্দালিকে একটা ফাইল আনতে বললেন গাড়ি থেকে। সে এনে দিলে উল্‌টে উল্‌টে একটা পাতায় একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রইলেন। আমাদের শিক্ষকদের নাম ও শিক্ষাগত পরিচয়। মুখ তুলে বললেন—"আপনি এর আগেও হেডমাষ্টারি করেছেন?"

বললাম—"হ্যাঁ, দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুলে।"

একবার চোখ নামিয়ে কাগজটা দেখে নিয়ে উঠে প'ড়ে বললেন—"চলুন, একবার আপনাদের ক্লাসগুলো দেখে আসি।"

ক্লাসে ঢুকে দু'একজন শিক্ষকের পড়ানো একটু ক'রে শুনে নিয়ে বেরিয়ে আসতে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে ওঁকে অনুরোধ ক'রে স্কুলের জন্যে, হোষ্টেলের জন্যে রাজ থেকে প্রতিশ্রুত জমি, ফুটবলের মাঠ সব দেখিয়ে আনলাম। সঙ্গে সঙ্গে গল্পও হ'চ্ছে—কোথাও দাঁড়িয়ে, কোথাও চলতে চলতেই—রাজের প্রতিশ্রুতি কতটা নির্ভরযোগ্য—জনসাধারণের মনোভাব কি ?—কতটা সাহায্য করতে তারা প্রস্তুত—ত্রিহুত সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র, ইংরাজি শিক্ষার জন্য এঁদের মন কতটা প্রস্তুত।...

কথাবার্তায় মনে হোল খানিকটা যেন মন ভিজুতে পেরেছি। বেশ কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে আমরা যখন আফিসে ফিরে এলাম, তাঁর চেহারা তখন বদলে গেছে। ইসারা ক'রে গিয়েছিলাম ; তহশীলদারের বাসা থেকে ভালো টেবিল-ক্লথ আর প্লেট আনিয়ে, পাওুলে যতটা ভালো খাবার পাওয়া যায় সাজিয়ে ঠিক ক'রে রাখা হয়েছে। কায়দামতো টী-পট, কাপ, ডিশ্। আমার বাসায় কেট্লিতে জল গরম হচ্ছিল। আমরা গিয়ে বসতে একটি ছেলে নিয়ে এল।

আমি খাবার জন্যে অনুরোধ করতে উনি ধন্যবাদ দিয়ে আমাকেও টেনে নিলেন।

ওঁর সম্বন্ধে জানা ছিল খানিকটা। ডক্টর গোরখ্প্রসাদ। ছাত্র হিসাবে বেশ ভালো রেকর্ড। অর্থনীতিতে এখানে এম-এ'তে প্রথম স্থান পেয়ে, বিলাত গিয়ে ডক্টরেট্ ক'রে আসেন এইরকম কতকটা শোনা ছিল। এসে দিনকতক বোধহয় পাটনা কলেজে প্রফেসারি ক'রে কিছুদিন হোল বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক হ'য়ে এসেছেন মজঃফরপুরে। শোনা যায় গভর্ণমেন্টের ওঁকে আরও ওপরের দিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা আছে। বেশ স্মার্ট, সুপুরুষ, বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যেই মনে হোল। কথাবার্তায় গাম্ভীর্যের পাশে পাশে একটু লঘু চাপল্যের ভাব এসে পড়ে এক এক সময়।

একবার খেতে খেতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—"তা, মিষ্টার মুখার্জি, এঁরা স্কুলটা এ্যাফিলিয়েটেড্ করিয়ে নিয়ে আপনাকে সসম্মানে বিদায় দেওয়ার সদিচ্ছা পোষণ করেন না তো। মাফ করবেন, অনেক ক্ষেত্রেই এরকম হ'তে দেখেছি ব'লেই প্রশ্ন করছি।"

বললাম, একটু হেসেই—"তেমন কোনও দুরভিসন্ধি থাকলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন ব'লে মনে হয়না। আমি এখানকারই ছেলে, এটা আমার জন্মভূমি।"

"তাই নাকি!"—চা' পান করছিলেন, থেমে গিয়ে বিস্মিত হ'য়ে আমার দিকে চাইলেন,—বললেন, "কিন্তু আপনি তো বাঙ্গালী।"

তখনই, আমি কিছু বলবার আগেই, নিজের মন্তব্যের অসঙ্গতিটা বুঝতে পেরে বললেন—"তাও তো বটে, তাতে এখানে জন্ম হ'তে কি বাধা থাকতে পারে? আপনার পিতা বোধহয় চাকরি-সূত্রে ছিলেন এখানে।"

"আমার ঠাকুরদাদা। সতেরো বছর বয়সে আসেন তিনি। হ্যাঁ, চাকরির জন্যেই। তখন এখানে নীলকুঠি ছিল।"

"তাই নাকি?"—ব'লে যেন সময়টার একটা আন্দাজ ক'রে নেওয়ার জন্যেই আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটু হেসে বললেন—"তাহ'লে অবশ্য আপনাকে গোড়া থেকে টেনে তোলা এঁদের পক্ষে কঠিন হবে।" (It will be a hard job for them to uproot you)।

রসিকতাটুকুর একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল সে সময়, জানিনা অবশ্য সেটা মনে রেখে উনি বলেছিলেন কিনা। নূতন আলাদা প্রদেশ গঠনের পর থেকে যে ডমিসাইল্ রুল (Domicile rule) প্রবর্তিত হয় সেটা তখনও বলবৎ রয়েছে। তাতে এই দেশের লোক, এই দেশে বাড়ি আছে, এ-সব দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে প্রমাণ করতে না পারলে কোনও সরকারি বা সরকার-সংশ্লিষ্ট কোনও স্থানে চাকরি পাওয়ার উপায় ছিলনা। ইংরাজ আমলের কথা। এতদ্দেশীয়দের স্বপক্ষে। সুতরাং সাধারণ মানুষে এতে খুশিই ছিল। তবু একথাও ঠিক যে, এমন বিবেচনাশীল লোকেরও অভাব ছিলনা যাঁরা বিদেশী সরকারের এই অন্যায় ভেদনীতি ভারতীয় এক-জাতিত্বের পরিপন্থী এবং সেই উদ্দেশ্যে রচিত ব'লে মনে করতেন। পরবর্তী অভিজ্ঞতায় ডক্টর গোরখ্‌নাথকে উন্নতচেতা ব'লে মনে করবা কারণ আমার হয়েছে। তাতে উনি যদি সরকারি পলিসি এবং তদনুযায়ী সাধারণ লোকের মনোবৃত্তিকে কটাক্ষ ক'রেই ব'লে থাকেন তো সেও আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়। স্বাধীনতা লাভের পর অবশ্য এ আইন তুলে দেওয়া হয়। তবে, বিধিবদ্ধ আইন হিসাবে মৃত্যু ঘটলেও এর ভূতটা নানা আকারেই ক্ষতিসাধন করতে থাকে, করছেও। আমায় যখন এঁরা ডেকে নিয়ে এসেছেন তখন আমার চেয়ার নিরাপদই ছিল নিশ্চয়। তবু, কথাটা যখন উনি নিজে হ'তে তুললেন, আমিও খানিকটা এগিয়ে দেওয়ার সুযোগটা ছাড়লাম না। একটু কারণও যে একেবারে না ছিল এমন নয়। এখানেও যিনি সেক্রেটারি তিনি একজন ভূমিহার মোক্তার। তাঁরও মজঃফরপুরের সেক্রেটারির মতো গূঢ় "পঞ্চবার্ষিক" নীতি ছিল কিনা জানিনা; তবে

তিনি যে আমায় বেশ সুনজরে দেখতেন না, এটার আঁচ পেয়েছিলাম। দু' একবার কমিটী-মিটিঙে একটু কথা কাটাকাটিও হ'য়ে যায়।

যাই হোক, একটা কথা আপনা থেকেই উঠে একটা বিশেষ তাৎপর্য নিয়েই শেষ হোল। ভালোই হোল।

একেবারে আকস্মিক ভিজিট, স্কুলের এই অবস্থা, আপাততঃ একরকম ভালোভাবেই কেটে যেতে শুধু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচা নয়, বেশ একটু আত্মতৃপ্তিই অনুভব করলাম। পাণ্ডুল স্কুলের পক্ষে একটা স্মরণীয় ঘটনাই। উনি চ'লে গেলে সব শিক্ষকেরা আমার ঘরে এসে একত্রিত হ'য়ে ঐ আলোচনাই করতে লাগলেন। সবার মুখেই তৃপ্তি। ললনবাবু একটু ইংরাজি বলতে ভালোবাসতেন বিশেষ বিশেষ অবসরে। বললেন—"You have created a good impression, Sir (আপনি ওঁর মনে চমৎকার একটা ছাপ দিতে পেরেছেন)। আমার ক্লাশ ছিলনা, আমি বারান্দা থেকে সব শুনলাম কিনা।"

সেটা ঠিকই, ওঁর ব্যবহার বেশ মুক্তই ছিল বলা যায়। যেটাকে বলা যায় কেতাদুরস্ত আর অফিসারসুলভ আড়ষ্টতা (Formal official stiffness)—তা আদৌ ছিলনা। ভালোই বৈকি, কিন্তু তার জন্যেই যে আমায় খানিকটা অস্বস্তিতে প'ড়ে যেতে হবে তা কে ভাবতে পেরেছিল?

উনি উঠেছিলেন সাকরির ডাকবাংলোয়। রাত কাটিয়ে পরদিন দুপুরে বেরিয়ে যাবেন।

আমি সকালে গিয়ে দেখা করলাম। সৌজন্য হিসাবেই; তাছাড়া একটু উদ্দেশ্যও ছিল। স্কুলে থাকতে কিছু প্রশ্ন করা সম্ভব ছিলনা। ওখানে গিয়ে স্কুলের স্বীকৃতি সম্বন্ধে মনোভাবটা কি যদি কথাবার্তার মধ্যে আন্দাজ পাওয়া যায়।

ভদ্রভাবেই ডেকে নিলেন কার্ড পাঠিয়ে দিতে। তারপর চেয়ারে বসতেই প্রথম কথা—"আপনি এসেছেন, ভালোই হয়েছে।...এক কাজ করতে পারবেন? আমি যাচ্ছি দ্বারভাঙ্গায় রাজস্কুল ভিজিট্ করতে, সঙ্গে যেতে পারবেন আমার?...তাহ'লে কিন্তু যেমন এসেছেন এইরকমই যেতে হয়, আমি একটু পরেই বেরিয়ে যাব।"

অবশ্য অস্বীকার করা চলত না, তবে, আমি যে রাজি হ'লাম তা একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে। এখানে তাড়া-হুড়ার মধ্যে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছেনা, যেতে যেতে পাওয়ার বেশ একটা সম্ভাবনা রয়েছে। বারো মাইল পথ। তারপর আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই রাস্তা, নেমে পড়লেই হবে। একটা ক্ষীণ আশাও রইল, এখানে কিছু বলা হোলনা

ব'লেই আমায় টেনে নিচ্ছেন। হোলও কিছু বলা যেতে যেতে। যা বললেন তার মোটামুটি তাৎপর্য, ব্যাংক ব্যালেন্স আর কিছু বাড়ানো, আর দ্বারভাঙ্গা রাজ যে জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার সম্বন্ধে পাকা দলিল—এ দু'টো হ'লেই ওঁদের আপত্তি থাকবেনা।

ও বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা করতে ইচ্ছুক ন'ন দেখে, ধন্যবাদ দিয়ে ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চ'লে এলাম।

দ্বারভাঙ্গা বাজারের মধ্যে থেকে একটা রাস্তা বাঁদিকে আমাদের বাড়ির দিকে চ'লে গেছে। কাছাকাছি এসে পড়তে বললাম—"ড্রাইভারকে যদি একটু থামাতে বলেন, আমি নেমে যাই, একটু গিয়েই আমার বাড়ি।"

একটু কৌতুকের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"বাঃ, বেশ হোল তো, আমি আপনাকে খানিকটা খাটিয়ে কাজ আদায় ক'রে নেওয়াব জন্যে নিয়ে এলাম, আপনি আমার ওপর দিয়ে উল্‌টে কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন,...আমার ইন্সপেকশনে একটু সাহায্য করবেন, চলুন না।"

একেবারে অপ্রত্যাশিত আর অদ্ভুত প্রস্তাব। আমাদের মতো নন-এফিলিয়েটেড্ স্কুল হ'লেও কথা ছিল। রাজস্কুলের এক আলাদাই মর্যাদা। আমি যখন ছিলাম একটা অস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে ছিল, কিছুদিন হোল তার নিজের পাকা বাড়িতে চ'লে গেছে। হেডমাষ্টারও বেশ নাম করা, আমার চেয়ে সিনিয়রও; নাম বৈদ্যনাথ ঠাকুর। একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওঁর দিকে চেয়েছি, খানিকটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে বললেন—"তাতে কি হয়েছে? আপনি আমার অনুরোধে যাচ্ছেন। ...চলুন। আমার গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।"

এখানে নোটিস্ দেওয়াই ছিল। ওঁরা অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। আমরা দু'জনে গিয়ে আফিসে উঠলাম। হেডমাষ্টারমশাই আমাকেও একটু হেসেই অভ্যর্থনা করলেন। তবে স্পষ্টতঃই একটু কাষ্ঠ হাসিই।

আমি এটুকু আসতে আসতে মনটাকে যথাসাধ্য গুছিয়ে নিয়ে একটা সমাধান ভেবে রেখেছি। তখন বয়স্কদের সাক্ষরতা-অভিযানের নূতন ঢেউ উঠেছে। ব'সে উনি আমায় পরিচিত করিয়ে দিলেন হেডমাষ্টারের কাছে। হেডমাষ্টার কিছু বলবার আগেই আমি বললাম—"আমার পক্ষে সুবিধা, যদি এই সাক্ষর অভিযানের কাজটা ওঁরা কি লাইনে চালাচ্ছেন দেখতে পাই। আমি আমার স্কুলেও চালাতে চাই এবার ওটা।"

ব্যাপারটা যে একটা খুব সূক্ষ্ম মানসিক স্তরে চলছে, আমি যে ভেতরে ভেতরে একটু বিব্রতই বোধ করছি, সে-দিকটা উনি অত খেয়াল করেননি, সেটা একটু স্পষ্ট হোল ওঁর কাছে। সেকেণ্ড খানেক আমার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে একটু হেসে বললেন—"বিভূতিবাবুর স্বভাবই খানিকটা নিজের কাজ গুছিয়ে নেওয়া।...তা বেশ, আপনি ঐ দিকটাই দেখে আমার একটা রিপোর্ট দেবেন।"

নোটিস দিয়ে ভিজিট্ করা। স্কুলের পিয়ন, তার বুড়ো বাবা আরও কয়েকজন এদিক-ওদিক থেকে জুটিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, যারা কিছু কিছু জানে। ইন্সপেকশনের জন্য জিয়ানোও থাকে সব জায়গায়। রিপোর্ট লিখে দিতে অসুবিধা হোলনা বিশেষ। শুধু, পিয়ন জোখ্নার বুড়োবাবা, স্কুলের পানিপাঁড়ে, উঠে হাতজোড় ক'রে বলল—"হুজুর, আমি এবার কোথায় 'পিন্সিল্' (পেনসন্) পাব, আমায় এ-জুলুম-বাজি কেন? আমার নাম খারিজ ক'রে দেওয়া হোক্।"

জোখ্না আমার সময়ের আগে থেকেই আফিসের পিয়ন, ওর বাপ তারও আগে থেকে স্কুলের জল জুগিয়ে আসছে। রিপোর্ট আদ্যোপান্ত প্রশংসায় ভরা না হ'লেই ভালো। জোখনের ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো বাপের ওপর জুলুম ক'রে 'অ, আ, ক, খ' শেখানোর চেষ্টা করাটা উৎসাহশীল শিক্ষকদের শক্তির অপব্যবহার ব'লে মন্তব্য করার সুযোগ হোল আমার।

সে-দিনের ইন্সপেকশন প্রসঙ্গ শেষ করার আগে ডাঃ গোরখ-নাথের সম্বন্ধে আর দু'টো কথা ব'লে রাখলে সমস্ত ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার হয়। উনি ছিলেন আয়েসী আর সৌখীন প্রকৃতির মানুষ; বিলাত-ফেরত, বড় স্কলার, সব মিলে ওঁর একটা আত্মনিষ্ঠ ঢিলেঢালা ভাব ছিল। আগে যেমন বলেছি, কেতাদুরস্ত, Formal নয়। ...চলুক না, কাজটা হ'লেই হোল। ভাবটা যেন এইরকম।

স্কুলের পক্ষে বড় ভালো হোল। ইন্সপেক্শনটা বেশ ভালো হয়েছে, এর ওপর আমায় নিয়ে গিয়ে রাজস্কুলে ইন্সপেকশন্ করানোর ব্যাপারটা লোকমুখে অতিরঞ্জিত হ'য়ে স্কুলের স্বীকৃতির জন্য উদ্যমটা একেবারে কয়েকগুণ গেল বেড়ে। আমরা বছর শেষ হ'তে সামনের চার মাসেও যা ক'রে উঠতে পারতাম না, একমাসেই শেষ ক'রে নূতন বছরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কাজটা আপন বেগেই চলতে লাগল। যাতে শিক্ষার দিক দিয়েও আমরা যোগ্যতা দেখিয়ে স্বীকৃতিলাভের ব্যাপারটা পাকা ক'রে নিতে

পারি। তারজন্য ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছেলে ক'টিকে নিয়ে উঠে প'ড়ে লাগলাম সবাই।

এরপর ঘটনাচক্র কয়েকটা দ্রুত পাক দিয়ে, একটা জায়গায় এসে, তেমনি হঠাৎ যেন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক তার ফলেই নয়, তবে, তার কিছুদিন পরেই আমার নিজের জীবনেও এমন নিতান্তই অপ্রত্যাশিত একটা দিক-পরিবর্তন হোল যে পাঙুলের জীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। আমার জন্মভূমির সেবা শেষ হোল। এবার কিন্তু কোনও খেদ নয়, মনস্তাপ নয়; হাসি মুখেই বিদায় নেওয়া। তাই, যদি বলি, এটা ছিল আমার অক্ষম সেবার জন্য তাঁর যোগ্যাতীত আশীর্বাদ, তো ভুল হয়না।

গোড়ার কথায় আসা যাক।

কিছুদিন পরেই খবর পাওয়া গেল, গোরখবাবু ডি. পি. আই. (Director of Public Instruction) হ'য়ে পাটনায় চ'লে গেছেন। একটা মস্ত বড় সুযোগ। তাঁর ইন্সপেকশনের রিপোর্ট অনুকূলই ছিল, উন্নতি হ'য়ে গৌরবের পদে গেছেন, সুবর্ণ সুযোগ, একেবারে সেইখানে গিয়ে দেখা করতে হবে। বড়দিনের ছুটির আগেই। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষাদি তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে, ম্যাট্রিক ছাত্রদের টেষ্ট নিয়ে, সেণ্ট আপ (Sent up) ক'রে স্কুল বন্ধ হওয়ার আগেই আমি বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে অবশ্য আর অত সহজ নয়। বড় আফিসের নানা গলি, নানা অলিন্দ। একটা সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার জোগাড় ক'রে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি সংক্ষিপ্ত দু'টি মিনিটের মধ্যে একেবারে সব ওলোট-পালোট। উনিশশ' চৌত্রিশ সালের বিহারব্যাপী ভূমিকম্প!

সে এক সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা জীবনে।

আমি পাটনায় গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছি; বিনয় কর, যিনি আমার মহারাজের একান্তসচিব থাকাকালে ঐ আফিসেই তাঁর স্টেনোগ্রাফার ছিলেন এবং যে সময়ের কথা, বিহার বিধানসভার রিপোর্টারের কাজ নিয়ে গর্দানীবাগে রয়েছেন।...খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা ভেতরেই ব'সে গল্প-সল্প করছি, বেলা আন্দাজ সোওয়া-দু'টো, হঠাৎ মচ-মচাৎ ক'রে একটা শব্দের সঙ্গে বাড়িটা একটু কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই কিছু বুঝে ওঠবার আগেই এক প্রবল ঝাঁকুনি। বেরিয়ে এসেছি সবাই দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়েই। এদিকে—"ভূকম্প! ভূমিকম্প! কেয়ামৎ!" চারিদিক থেকেই এই ধরণের আতঙ্কিত কলরব মাটি ভেদ ক'রে ওঠা একটা চাপা গুম্ গুম্ শব্দের সঙ্গে মিশে আকাশ

পথে ছুটেছে। কাঁপন চলেছেই—সবাই বাড়ি ছেড়ে বাইরে। একেবারে দিশেহারা। মিনিট ২।৩ পরে ঝাঁকুনিটা গেল কেটে। ঘরে ঢোকার প্রশ্নই আসেনা, বাইরে পা বাড়াতেও যেন সাহস হয়না। এ প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে তো সামনের মাটিও ফেটে যেতে পারে, ধ্বসে যেতে পারে। ...আওয়াজটাও আর শুধু, "ভূকম্প—ভূমিকম্প! জলজলা! কেয়ামৎ!" নয়—পৃথিবীর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে মানুষ হঠাৎ অতিরিক্ত বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছে—ভগবান!—মা দুর্গে! আল্লা!...বাঁচাও! বাঁচাও!

ওরকম সবার একমুখী আর্তস্বর কখনও কানে যায়নি এর আগে। তবু, গর্দানীবাগে এ অঞ্চলটায় ছাড়া ছাড়া নীচু একতলা বাড়ি, শুধু আতঙ্কের ওপর দিয়েই কেটেছে। সময় যতই এগুতে লাগল রিপোর্ট এসে পৌঁছাতে লাগল। পুরানো সহরে বাড়ি ঘরদোর প'ড়ে, জমি ধ্ব'সে গিয়ে জল উঠে প্রলয় কাণ্ড হ'য়ে গেছে।...অবিশ্বাস হয়না।...পাটনায় সবচেয়ে উঁচু সেক্রেটারিয়েট্ ক্লকটাওয়ার।...ঐ দিকেই লোকে হনহনিয়ে চলেছে। ছুটেছে—তার অবস্থা কি? একটু এগিয়েই বড় সড়ক, পাটনা-দানাপুর রোডের ওপর থেকে দেখা যায়। ভিড়ও জমেছে। গিয়ে দেখি, ঐ দু'মিনিটের দোলা খেয়ে মাথাটা চৌচির হ'য়ে হেলে পড়েছে টাওয়ারটা। লোহার ফ্রেমে যতদূর শক্ত হ'তে হয়, ততদূর শক্ত ক'রে গাঁথা।...জলের কল শুষ্ক, রাত্রি নিষ্প্রদীপ, রেল স্তব্ধ, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন বধির—কোন এক অদৃশ্য যাদুকর তার যাদুকাঠি বুলিয়ে এক মুহূর্তে সহরটাকে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ক'রে দিয়েছে।

সমস্তদিন একের পর এক রিপোর্ট—দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট আর নেই, গঙ্গারও স্থানে স্থানে নাকি ফাটল ধ'রে জল ভেতরে চ'লে গিয়ে শুক্‌নো হ'য়ে গেছে...তেমনি প্রচণ্ড শীত। এতদিনের আশ্রয় ঘর আজ সম্পূর্ণ পর। বিশ্বাস করা যায় না।...

কতকগুলো স্মৃতি আজও খুব স্পষ্ট। কি ক'রে জানিনা, একটা তাঁবু জোগাড় হয়েছিল। বাইরে, বাড়িটাকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে সেটা খোলা ময়দানে খাটিয়ে, তার নীচে রাত কাটাই। তার অভিনব কৌশলটাও বেশ মনে আছে। কিছু বিচালি-খড় যোগাড় হয়েছিল। চৌকির ওপর তাই বিছিয়ে বিছানা ক'রে বিনয়বাবুর স্ত্রী আর বাচ্চারা। বাড়ির ছাতের মতো ভেঙে চাপা পড়ার ভয় নেই ব'লে আমরা সেই চৌকির নীচে পোয়াল আর কম্বলের শয্যায়।

কাঁপন মাঝে মাঝে চলছেই। সমস্তদিনই—দু' সেকেণ্ড, এক সেকেণ্ড। নির্দয়া প্রকৃতি সদয়াও—কেউ ভেতরে এসোনা—হুঁসিয়ারী দিয়ে যাচ্ছে

থেকে থেকে। সম্পত্তি? গৃহীহীন গৃহ। চোর—তস্করের এই তো "পৌষমাস", কিন্তু প্রাণের চেয়ে তো বড় সম্পত্তি নেই।

খোকা (ছোটভাই বিনয়) পাটনাতেই, বি.এন. কলেজে আই-এসসি'র ছাত্র। দোতলা হোস্টেলে থেকে পড়ছে। ছটফট করছে মন, কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই। পাঁচ-ছয় মাইল দূরে, যানবাহন একেবারে নেই। তবে, খবর পাওয়া গেল, ওদিকটা বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এইরকম দুর্যোগে নিরুপায় মন দৈবের ওপর ছেড়ে দেয় সব। বিশ্বাসের একটা হঠাৎ জোয়ার এসে যায়—তিনি যা করেন। পরের দিন—কি উপায়ে ঠিক মনে নেই, হয়তো টমটম একটু আধটু চালু হয়ে থাকবে—গিয়ে দেখি, বাড়িটা অক্ষতই, ছেলেরা বেরিয়ে এসে, লনে তাঁবু খাটিয়ে তার মধ্যে জমাট আড্ডা বসিয়েছে, ভূমিকম্পকে তুড়িতে উড়িয়ে দিয়েই। গতকাল থেকে এই প্রথম নির্ভীক, মুক্তজীবনের স্পর্শ। সে যে কতখানি স্বস্তি, কী একটা ভরাবুকের হাঁফ ছেড়ে বাঁচা!

পরের দিন রিপোর্ট অনেকটা স্বচ্ছ। না, পাটনা সিটি-দানাপুরে খুব বেশি ক্ষতি হয়নি, তবে বাইরের খবর নাকি খুবই ভয়াবহ। ট্রেনের আওয়াজ কাল সেই দু'টো থেকে বন্ধ। স্টেশনের সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে মোকামায়। দক্ষিণ বিহারে মুঙের নাকি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে।...দিন এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে খবর জমে জমে উঠছে—পরদিন আরও, তার পরদিন আরও। গাড়ি সর্বত্র বন্ধ। উত্তর বিহারেই নাকি আরও বেশি ক্ষতি।...ভূমিকম্পের কেন্দ্র হিমালয়ের কোথাও। নেপালের রাজধানী কাট্‌মুণ্ডু সমস্ত উপত্যকা সুদ্ধ ভূগর্ভে। ট্রেন বন্ধ, টেলিগ্রাম বন্ধ, আপিসে জমা হ'য়ে হ'য়ে এখন নেওয়াই বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। চিঠির তো কোনও কথাই নেই।

এরই মধ্যে একটা গুজব ভেসে এসে শরীরের সমস্ত রক্ত হিম ক'রে দিচ্ছে। মজঃফরপুর তো আধাআধি চূর্ণ বিচূর্ণ। মৃতের সংখ্যা নিরূপিত করা সম্ভব হয়নি এখনও। দ্বারভাঙ্গাও নাকি খুব খারাপ ভাবেই বিধ্বস্ত।...

কাজ নেই, কর্ম নেই, কোনও রকমে নাকে-মুখে দু'টো গুঁজে খবরের সন্ধানে বেরুনো। দিনের পর দিন। একদিন একটু যেন পাওয়া গেল। কিন্তু তাও যে ভাবে, তাতে শুনেই মুখটা আরও শুকিয়ে গেল।

তখন এরোপ্লেন-হেলিকপ্টারের এত হট্ হয়নি। শোনা গেল, মহারাজ একটা প্লেন চার্টার করেন, তাতে কয়েকজন লোক ওঁর কলকাতার বাড়ি দেখে পাটনা ছুঁয়ে ফিরে যায়। নেবেছিল কি বিহঙ্গ-দৃষ্টি বুলিয়ে ওপরে-ওপরেই চ'লে গেছে সেটা কেউ বলতে পারল না।

সব বড় বড় বিপর্যয়ে কতকগুলো হুজুগ-প্রিয় মানুষ গজিয়ে ওঠে, যারা তিলকে তাল ক'রে হুজুগের খোরাকে পুষ্ট হয়। এক ধরণের এরোপ্লেন নেমেছিল, তারা দেখেছিল স্বচক্ষে—খবর নিয়েছে, খবর দিয়েছে—এ ধরণের আত্ম-গৌরব করবার লোকও ছিল। পরে যেমন দেখা গেল নেপালের খবরে। ওরই মধ্যে ভগবানের আশীর্বাদ এদের কারুর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

সপ্তাহ কেটে গেল। দশ দিন, বারো দিন। তারপর পাওয়া গেল দ্বারভাঙ্গার কিছুটা খবর, প্রত্যক্ষদ্রষ্টার মুখেই। তবে, তাও যেভাবে পাওয়া তাতে, মনটা, এতদিনে খানিকটা অসাড় হ'য়ে গিয়ে যে একটা দৈব-নির্ভর নিশ্চিন্ততায় একরকম ক'রে কাটাচ্ছিল, সেটা তিরোহিত হ'য়ে গিয়ে, সুনিশ্চিত বিপর্যয়ের সামনা-সামনি হ'য়ে দাঁড়াল।

হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃজয়সৃওয়াল দ্বারভাঙ্গায় গিয়েছিলেন। রাজেরই কোন কাজে তাঁকে প্লেন পাঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, প্লেনে ফিরে এসেছেন। সেখানে সহরে রাজের মোটরে কিছু ঘোরাঘুরি করেন। কিছু কিছু খবর পাওয়া যাচ্ছে।

হন্ত-দন্ত হ'য়ে ছুটলাম। জমাট ভিড়। ঠেলে কোনরকমে সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। গোলমাল। একের প্রশ্নের ওপর অন্যের প্রশ্ন এসে পড়ছে। তার মধ্যে কোনরকমে একেবারে যতটা পারলাম এক নিঃশ্বাসে ব'লে গেলাম। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে,—কি শুনতে হবে, ধড়াস-ধড়াস করছে বুকটা—"আচ্ছা শুনুন—স্টেশনের কাছে প্রকাণ্ড পুকুরটার সামনে দিয়ে বড় রাস্তা—যেটা বাজারের দিকে গেছে—কাঁটালবাড়ি বাজার—তার ওপর দোতলা বাড়ি—অনেকগুলো নারকেল গাছ—বাড়িটা কি ?" হাত তুলে আর সবার প্রশ্ন থামিয়ে একটু চোখ তুলে ভেবে নিয়ে বললেন—"হ্যাঁ, দেখেছি...বাড়িটা দাঁড়িয়েই আছে মনে পড়ছে··· ।"

"আর কিছু খবর ?...খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয়েছিল ?—তাহ'লে দয়া ক'রে···"

"বাড়ির মালিক কোর্টে কাজ করেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ...জজেস্ কোর্টের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্...."

"না, সেফ্ (Safe)···সে-বাড়ি দাঁড়িয়েই আছে।"

এর পরই আবার সবাইকে পরের দিন আসতে ব'লে ভেতরে চ'লে গেলেন। শুনলাম, আজ থার চারেক সাক্ষাৎ দিয়েছেন, বিশ্রাম পাননি।

আমার সঙ্গে কথার পরই হঠাৎ চ'লে যাওয়া একটু যেন আগ্রহ নিয়েই প্রশ্ন করা—প্রশ্নোত্তরের সময়ও একটু অন্যভাব,—সব মিলিয়ে মনটা

যেন আরও বিচলিতই হ'য়ে পড়ল। মনে হোল যেন এক মিথ্যা স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখার ভাব। ঠিক দেওয়ার মত খবর না হ'লে যা প্রত্যেকেই ক'রে থাকে।

অশান্তি বেড়েই গেল উল্‌টে।

পরদিনের খবর খানিকটা আশাপ্রদ। মোকামা পর্যন্ত ট্রেন যাবে। তাহ'লে স্টীমারও ওপারে নিয়ে যাবে। তারপরে কি, কেউই বলতে পারছেনা।

জয়সৃওয়াল সাহেবের মুখে শোনা থেকে আশায় উদ্বেগে মনটা যেন তোলপাড় ক'রে দিচ্ছে। ঠিক করলাম, আর দেরি নয়। যতটা পারি এগিয়ে তো যাই, তারপর যা অদৃষ্টে আছে।

পনেরো দিনের দিন সকালে স্টেশনে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

কয়েকটা স্টেশন কিছু কিছু ক'রে খাবলে গেছে। তবে মোকামা জংশনটা সত্যই যেন ঝুঁটি ধ'রে নাড়া দিয়ে গেছে। গঙ্গা পেরুলাম। বোধহয় আগের দিন থেকে সমস্তিপুর পর্যন্ত ট্রেন চালু হয়েছে। কয়েকখানা মাত্র বগি নিয়ে একটা হালকা ট্রেন দুপুরের পর ছাড়ল। উত্তর বিহারের ক্ষতিটাই বেশি। একেবারে যে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে, এমন অবশ্য নয়, তবে যা হয়েছে তাও অচিন্তনীয়ই। একটা সাধারণ দৃশ্য, রেলের দু'ধারে যতদূর দৃষ্টি যায়, ক্ষেতের জমি মাঝে মাঝে ফেটে গেছে, আর যেখানেই অল্পবিস্তর খাদ বা নাবাল জমি সেখানেই একটা-দু'টো-চারটে ক'রে গর্ত হ'য়ে গিয়ে তার ভেতর থেকে জল, বালি, বেরিয়ে এসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আকারটা দাঁড়িয়েছে ছোট ছোট আগ্নেয়গিরির মতো। কোন কোনটা বন্ধ হ'য়ে গেছে, কোন কোনটা এখনও উদ্‌গার ক'রেই চলেছে। এছাড়া কয়েক জায়গায় জমিটা এমন উঁচু নীচু হ'য়ে গেছে, যেন ঢেউ খেলে গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে পড়েছে।

রেললাইনের প্রচুর ক্ষতি ক'রে গেছে। রাউণ্ড-দ্য-ক্লক্ অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা দিবারাত্র কাজ চালিয়ে লাইন ঠিক ক'রে এতদিনে পরীক্ষা হিসাবেই চালু করবার সাহস হয়েছে। ধ্বস ভ'রে পাইল-ব্রিজ অর্থাৎ কাঠের উপর কাঠ সাজিয়ে পুল ক'রে, কোথাও বা তাও সম্ভব না হ'লে, লাইনের পাশ কাটিয়ে নীচে দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আবার ওপরে তুলে—এই দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা। ট্রেন চলেছে সভয়ে পা টিপে টিপে। লাইন যেমন অনিশ্চিত, তেমনি ওদিকে সেই হুঁসিয়ারির কাঁপনও একেবারে বন্ধ হয়নি। কমতে কমতে দিনে বার দুই তিন—এক-আধ সেকেণ্ডেরই, কিন্তু বাসুকী যে একেবারে শান্ত হ'য়ে যায়নি, এক কণা

থেকে অন্য ফণায় তুলে নেওয়ার কাজ যে চলছেই, এতে তো আর ভুল নেই।

পঞ্চাশটা মাইল, ঘণ্টা তিনেকের পথ। ঘণ্টা সাতেক প্রাণটা হাতে ক'রে কাটিয়ে গাড়ি যখন সমস্তিপুরে পৌঁছাল, শীতকালের বেলা তখন রীতিমতো রাত্রি হ'য়ে গেছে। স্টেশন জনশূন্য। শোনা গেল, এক্কা আর গোটা দুই ট্যাক্সিও যাচ্ছে দ্বারভাঙ্গার দিকে। তবে দিনের বেলায়। পথে রাহাজানিও হ'চ্ছে ব'লে সন্ধ্যার পর পুলিশ থেকে মানা। প্রচণ্ড শীত, থাকবার জায়গা নেই, বিশেষ ক'রে বাড়ির এত কাছে এসে বাড়ির চিন্তাটাই সমস্ত দেহমন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। পাগলের মতো হ'য়ে গেছি। একটা মোট রয়েছে, মনে হচ্ছে, ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি খালি হাতে। ছুটাছুটি করতে করতে একটা এক্কা পাওয়া গেল। যাবে, তবে চতুর্গুণ ভাড়া হাঁকড়াল। আর একটা লোকও পাওয়া গেল, মাঝরাস্তা পর্যন্ত যাবে। ভয়ও রয়েছে বৈ কি; কে জানে আমার আয়ু মাঝরাস্তা পর্যন্ত ওদেরই হাতে কিনা। পুলিশের মানা, লুকিয়ে যাওয়া, কেউ টেরও পাবেনা। সেই একটা রাত্রি গেছে জীবনের ওপর দিয়ে। তেইশ মাইল একেবারে নির্জন পথ। কি তিথিটা মনে পড়ছেনা, তবে ফুটফুটে জ্যোৎস্না দিগন্তব্যাপী কুয়াশার সঙ্গে মিশে যেন কি একটা বিরাট রহস্যকে আবৃত ক'রে ফেলবার চেষ্টা করছে। পথটার মাঝামাঝি এসে প্রায় তেরো-চৌদ্দ মাইল বন্যা-অধ্যুষিত ব'লে গ্রাম একরকম নেই বললেই চলে, এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত। বন্যা অধ্যুষিত ব'লেই জমিও নরম। কুয়াশার জন্য দু'দিকেই রাস্তা থেকে বিশ-পঁচিশ হাত পরে আর সব অস্পষ্ট। এইখানে এসেই সে এক অস্বস্তিকর দৃশ্য—ইংরাজিতে যাকে বলা যায় Uncanny! অত দীর্ঘ ফাটল তখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি। বন্যা-অঞ্চল ব'লেই রাস্তাটা এখানে খুব উঁচু, বাঁধের কাজ করার মতো। সেইটুকু রাস্তার দু'ধারে হাত তিন চার থেকে আরও বেশি চওড়া ফাটল, আমাদের সঙ্গে চলেছে তো চলেছেই। সেই নির্জন পথে অসহায় অবস্থায় মনে হ'তেই হয়, এ-দু'টো অধরোষ্ঠের মতোই হ'য়ে যে কোনও মুহূর্তেই আমাদের এই মাঝের পথটুকু গ্রাস ক'রে ফেলবে।

সে-রাত্রের অনেক নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা ছিল প্রচণ্ড শীত। সে রকম শীতের কবলে আর কখনও পড়েছি ব'লে মনে পড়েনা। উঁচু রাস্তা। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে পশ্চিমে হাওয়া হু হু ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে। শরীর অসাড় হ'য়ে আসছে, যা সম্বল ছিল সব জড়িয়ে, কোনও রকমে একটা হাত বের ক'রে এক্কার একটা খুঁটি ধ'রে ব'সে আছি।

কামিজ, সোয়েটার, কোট, ওভারকোট—সব কিছুর ওপর একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে, খালি চোখের কাছটা একটু খুলে রেখে চুপ ক'রে ব'সে আছি। সে রকম শীতে চিন্তাশক্তিটাও যেন জমাট বেঁধে যায়। কিছু ভাবতে পারছিনা ব'লেই নিশ্চুপ হ'য়ে আছি ব'সে।

এক জায়গায় নামতে হোল। একটা প্রায় দশ-বারো গজের লোহার পুল দুমড়ে বাংলার 'দ' অক্ষরটার মতো ক'রে দিয়েছে। পাশ কাটিয়ে নামিয়ে একটা অস্থায়ী রাস্তা তৈরী ক'রে দিয়েছে। নেমে ওদিকে উঠলাম। গাড়োয়ান সন্তর্পণে একাটা নিয়ে এল। ঘোড়াটাকে একটু জিরেন দিতে হোল। গরম হ'য়ে গেছে, গা থেকে ভাপ উঠছে। উল্টো দিক থেকে একটা জীপ এল তিন চারজন যাত্রী নিয়ে। কিছু জিজ্ঞাসা-বাদ। আমাদের সামনে তখনও অনেকগুলি পুল।...না, এভাবে কোনটা বিধ্বস্ত হয়নি। একটু-আধটু যা ক্ষতি, জোড়া তালি দিয়ে কাজ চালানোর মতো ক'রে দেওয়া হয়েছে।

আমরা অর্ধেকের বেশি এসেছি। রাত্রি প্রায় আড়াইটে। দ্বিতীয় যাত্রী পুলের কিছুটা আগে নেমে গেছে। সেইভাবে মুড়ি সুড়ি দিয়ে উঠে বসলাম। গাড়োয়ান এবার ঘোড়াটার গতিবেগ একটু বাড়িয়ে দিল।

সেই বন্যা-অঞ্চলটা ছাড়িয়েও এসেছি। কিছু কিছু বাড়ি ঘর চোখে পড়ে, তবে, চাঁদ নেমে গিয়ে জ্যোৎস্না মলিন হ'য়ে এসেছে, স্পষ্ট দেখা যায় না। এতক্ষণে একটু ঘুমের ভাব এসেছে, কি ক'রে যে এসেছিল, এখনও আশ্চর্য লাগে সে-রাত্রির চেহারা মনে প'ড়ে গিয়ে। বেশ একটু তন্দ্রা, তারপর হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে এক্কা থেকে একেবারে রাস্তায়!

ঘোড়াটা, হয়তো গতিবেগ বাড়াবার জন্যই সর্দিগর্মি হ'য়ে গেছে। মুখ থুবড়ে প'ড়ে, পিঠের ওপর এক্কাটাকে নিয়ে।

লাগেনি, জামায়-র‍্যাপারে একটা পুঁটুলি হ'য়ে রয়েছি ব'লেই, কিম্বা, অদৃশ্য কেউ অলক্ষ্যে থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করেন ব'লেই? কেননা, আর হাত দুয়েক পাশে পড়লেই কি হোত কিছুই বলা যায়না। রাস্তাটা এখানে খুব উঁচু, প্রায় সাত আট হাত।

রাত্রি সাড়ে চারটের সময় আমরা দ্বারভাঙ্গা কোর্ট-টাউন লাহেরিয়া সরাইয়ে পৌঁছে, কোথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচব, না, আর এক নূতন ধরণের বিপদের মধ্যে প'ড়ে গেলাম। ঢুকতেই একটা চৌমাথা। বেশ ভালো ক'রে দোলের নেড়াপোড়ার মতো ধুনি জ্বেলে কয়েকজন আগুন পোয়াচ্ছে। আমরাও নেমে শরীরটা তাতিয়ে নিচ্ছি, নানা রকম প্রশ্নোত্তরের মধ্যে

একজন পুলিশ এসে উপস্থিত। এসেই গাড়োয়ানটার ওপর তম্বি—"তুই কেন বাবুকে এই বিপদের মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসেছিস? ফাঁড়িতে চল।"...পরে আমাকেও—"আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক হ'য়ে কি ক'রে এলেন? জানেন আপনারও জবাবদিহি রয়েছে ফাঁড়িতে?" অনেক ঝুলোঝুলি, শুনতে চায় না। তারপরে হঠাৎ দাদার নামটা মনে প'ড়ে গেল। বললাম—"আমি হচ্ছি জজেস্ কোর্টের সেরেস্তাদার শশীবাবুর ভাই। পাটনায় পনের দিন আটক থাকার পর আজ আসছি। মনের অবস্থা বুঝতেই পার। এ-লোকটা আসতেই চাইছিল না, আমার জিদেই এসেছে। ছেড়ে দাও ওকে।"

দাদার নামেই কাজ হোল। একটু মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল—"আপনি তাঁর ভাই?...কিন্তু আমি ছেড়ে দিলেও তো আপনি যেতে পারবেন না। সহরে কড়া গুর্খা পাহারা, সন্দেহ হ'লেই গুলি করবার হুকুম..."

বললাম—"আমি ঝুঁকিটা নিচ্ছি। সহরের বাইরে রেলের ধারের রাস্তাটা ধ'রে চ'লে যাবো। আপত্তি কোরনা। আর তো রাত্রিও নেই।"

আমাদের পাড়া কাঁটালবাড়ি মাইল আড়াইয়ের মধ্যে। ভোর হ'য়ে এসেছে। যত কাছে আসছি, বুকের ধড়ফড়ানিটা যাচ্ছে বেড়ে। স্টেশনের কাছ থেকে এক ফার্লং দূরে আমাদের বাড়িটা দেখা যায়। দোতলাই। না, দাঁড়িয়েই আছে।

গেটের সামনে নামতে যেন পা কেঁপে যাচ্ছে। একেবারে নিঝুম বাড়ি, একার আওয়াজেই পাশ থেকে কে যেন বেরিয়ে এল।..."মেজদা এসে গেছ!!...আমরা এখানে...ওদিকে যেওনা।"

রাস্তার ধারেই আমাদের বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আমাদের গোরুর ভূষি-বিচালি রাখবার একটা একটানা নীচু ঘর। খড়ের ছাউনি।

আমি সে বারের ভূমিকম্পের আমাদের পরিবারের সবচেয়ে যা বড় ট্রাজেডি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাদা মার কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিলেন, আমায় দেখে কেঁদে উঠলেন—"দেখ বিভূতি, কী অবস্থায় পড়েছি!"

জজেস্ কোর্টটা দোতলা। প্রকাণ্ড বাড়ি, ভরাদিনে পুরোদমে কাজ চলছে। নাড়া পড়তেই সবাই সব ছেড়েছুড়ে নীচের দিকে ছুটেছে। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে জনস্রোত নেমেছে। একেবারে নীচে এসে দাদা শেষ ধাপে প'ড়ে যান। মাড়িয়ে চলেছে উন্মত্ত মানুষের চাপ!

সেদিনকার ত্রানকর্তা হ'য়ে এসেছিলেন বাংলা স্কুলের হেডমাষ্টার সুধীরবাবু, তখন রাজে কাজ করছেন। কোর্টে এসে সামনের বার-

লাইব্রেরীতে ছিলেন। বেরিয়ে আসতেই দাদা আর আমার পঞ্চম ভাই অরবিন্দর ওপর নজর পড়ল। সেও কোর্টে এপ্রেন্টিস্। দাদাকে ঐ অবস্থায় দেখে—শেষ হ'য়ে গেছেন ভেবে, আছড়ে পড়েছে তাঁর ওপর।

অসীম শক্তি গায়ে, বিপদের মুখে দ্বিগুণ হ'য়ে গেছে, ছুটে গিয়ে ছ'জনকে টেনে রাস্তায় নামিয়ে ফেলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে দোতলা ছাতের আলসের তিনকোণা প্যারাপেটটা ধ্বসে নেমে এল ঠিক সেই জায়গাটায়।

দাদার বাঁ হাতটা তার আগে মানুষের পায়ের চাপে গেছে ভেঙ্গে; অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন।

পরে বিহারের ছ'টো শহর মুঙ্গেরে আর মজঃফরপুরের যা অবস্থা দেখেছি, সে-তুলনায় দ্বারভাঙ্গার ক্ষতি বেশি হয়নি। আমাদের বাড়ির দোতলায় একটা খুব সরু চিড খেয়ে যায়। তাও খুঁজে বের করা শক্ত। কাঁটালবাড়ি পাড়াটার এদিকটায় বেশি ক্ষতি করেনি, বেশি হয়েছিল বড়বাজারে ঘিঞ্জি সরু রাস্তাটার ছ'ধারে, আর নয়াবাজারের ব্যারাকে। কিছু লোকও ঐ দিকেই মারা যায়। এইরকম বড় বড় ছুর্যোগে দৈবের যুগ্মমূর্তি একসঙ্গে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে; রুদ্রের ভ্রূকুটি আর স্মিতানন পাশাপাশি দেখা যায়। অনেক কিছু অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছে, অনেক মানুষও, তার পাশেই ধ্বংসলীলা, মৃত্যু। রাজের সবচেয়ে উঁচু প্রাসাদ আনন্দবাগটা প্রায় অক্ষতই, শুধু মাঝখানের ক্লক্‌টাওয়ারটা প্যাটনার সেক্রেটারিয়েটের টাওয়ারের মতো ফেটে গেছে।

রাজের সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে অন্যত্র, তাতেই বুঝতে পারা যায়, স্বল্প ছ'টি মিনিটের মধ্যে কি বিরাট ধ্বংস শক্তি নিহিত ছিল।

মহারাজ রামেশ্বর সিং বহুপূর্বেই মারা গেছেন। পুত্র কামেশ্বর গদিতে এসে অনেক নূতন পরিকল্পনার সঙ্গে একটা খুব বড় প্রাসাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সে-কালের চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। একেবারে আধুনিক বিলাতী প্ল্যানে; স্টেজ-প্রেক্ষাগার শুদ্ধ সব কিছুই থাকবে প্রাসাদের মধ্যে। নীচে সমস্তটাই পাথরের গাঁথুনি। একতলা পর্যন্ত উঠেওছিল; সমস্তটা একেবারে তছনছ হ'য়ে যায়। খেলাচ্ছলে কে যেন আঙুলের টোকা মেরে একটা তাসের ঘর নামিয়ে দিয়েছে।

—ভ্রূকুটি আর স্মিতানন একসঙ্গে, পাশাপাশি।

ভবিষ্যৎ কি? আমাদের ও-বাড়িতে আর যাওয়া যাবে কখনও?

আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গনটা বড়। রাস্তা থেকে আরও ভেতরের দিকে গিয়ে টানা কয়েকখানা ঘর আর বারান্দা ক'রে নিতে হোল, ছ্যাঁচা-

বেড়ার দেওয়াল, মাটির লেপাই, ওপরে নীচু খোলার চাল, সামনে টানা বারান্দা। এখনও রয়েছে কতকটা, ভেঙ্গে পাকা করবার ভয়েই। লিখছি, তারই একটা ঘরে ব'সে। কাঁপন চলেছে। প্রথমে তো প্রতিদিনই—ছ'পাঁচবার ক'রে। তারপর কমতে কমতে মাসে ঐ রকম, তারপর বছরে। তারপর আরও দীর্ঘ ব্যবধান। কয়েক বছর পরে এই সেদিন একটা নাড়া দিয়ে গেল। উনিশশ' ছিয়াত্তরের কথা বলছি। বিয়াল্লিশ বছর পরে। ভূতত্ত্ব বলছে, পৃথিবীর স্তরগুলো আবার নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছে। বলিহারি যাই মানুষকে। দৈবের কাছে দিব্যি করেছিল আর ইটের দিকে যাবনা। ক'টা দিনই বা গেল? শুরু করলেন মহারাজা। সহরের প্রায় অর্দ্ধেকটা কিনে নিয়ে বা বাড়ির পরিবর্তে জায়গা আর মাল-মসলা দিয়ে। নূতন ক'রে শহর পত্তন করলেন—রাস্তাঘাট, বাড়ি, বাজার, বাজারের মাঝখানে ক্লক্ টাওয়ার, মন্দির, পার্ক, নূতন প্ল্যানে, নূতন ক'রে সাজিয়ে। তাঁর পরে আরও সবাই। ক্রমে এমন অবস্থা যে ইটের দাপটে সহরে আর এক ইঞ্চি জায়গা খালি পাওয়া দুষ্কর। কি বলা যায়? পাব্‌লিক মেমারি ইজ্‌ শর্ট (Public memory is short)—মানুষ বড় ভুলে যায়, না, পরাজয়ের কথাটা ভুলতে পারেনা ব'লেই আবার নূতন শক্তি, নূতন সাহস সঞ্চয় ক'রে নিয়ে সেই পথেই পা বাড়ায়?

সবই অনিশ্চিত, বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল, পাণ্ডুলে যেতে আমার বেশ কয়েকদিন লেগে গেল। পাঁড়াগা জায়গা, প্রায় সবই মেটে বাড়ি, খড়ের ছাউনি, বিশেষ ক্ষতি হয়নি। রাজের আফিসের পাকা বাড়িগুলোয় অল্পবিস্তর চিহ্ন রেখে গেছে। আর এখানে-ওখানে কিছু কিছু ফাটল আর ধ্বস। একটা বড় ধ্বস দেখলাম সাকরি স্টেশন থেকে পাণ্ডুলে যেতে। রাস্তার মাঝামাঝি প্রায় এক মাইল নিয়ে জমিটা প্রায় হাত-খানেক নেমে গেছে। এক্কা ক'রেই পার হ'লাম, গোড়ায় আর শেষে, এই বার দুই নেমেই।

ছ্যাচাবেড়ার স্কুলটাকে ছেড়ে দিয়েছে ভূমিকম্প, অবজ্ঞা ক'রেই হোক বা করুণা ক'রেই হোক। শিক্ষক আর ছেলেদেরও কারুর কোনও ক্ষতি হয়নি। স্কুলের নূতন সেসন্‌স্ (Sessions) শুরু করলাম।

বোধহয় মাস দুই পরের কথা, কেননা, আমি সব নিয়ে পাণ্ডুলে মাত্র নয়-দশ মাস বোধহয় ছিলাম। একদিন স্কুল থেকে এসে বারান্দায় ব'সে আছি, বাবা একটা এক্কা থেকে নেমে এলেন। প্রণাম-আশীর্বাদের পরই প্রথম কথা—"মহারাজ তোমায় ডেকেছেন…কাজের জন্য, যাবে?"

বাবা আশীর্বাদ করতেন সমস্ত করতলটা মাথায় চেপে; মনে হোল যেন একটু কেঁপে গিয়েছিল, কণ্ঠস্বরও বেশ মসৃণ নয়।

খুবই হতভম্ব হ'য়ে গেছি; এইভাবে হঠাৎ আসা, খবরটা আর প্রশ্নও নূতন ধরণের, তার পর বলার এই ভঙ্গি। চেয়ার ছেড়ে উঠেছি, উনিও দাঁড়িয়ে আছেন, চাকর আর একটি চেয়ার এনে দিতে, আমারটায় ব'সে বললেন—"বোস···তামাক বোধহয়···" বললাম—"যামিনীবাবু খান, আনিয়ে দিচ্ছি।" পাচকটাকে পাঠিয়ে ব'সে, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইতে বললেন—"গোষ্ঠ আজ আফিস থেকে এসে বললে। সামনেই ট্রেনটা ছিল, চ'লে এলাম।...ওঁর ভাগ্নেটি—ঐতো একটিই—দুষ্টু হ'য়ে উঠেছে—চিন্তিত হ'য়ে উঠেছেন মহারাজা—ওদের তো বিগড়ুতেও দেরি হয়না—গোষ্ঠকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন—বিভূতি কি চার্জ নেবে?' তাহ'লে খোঁজ নিয়ে জানাতে···তা তুমি কি···?"

'হ্যাঁ—না'র মাঝখানে এসে থেমে গেলেন। বিচলিত হবার কারণ রয়েছে বৈকি, এ-ছেলের মতিগতির ওপর আস্থা থাকবার তো কথাও নয়। আমি ওঁর আশঙ্কাটা ধ'রেই বললাম—"যাব বৈকি বাবা। নিজে থেকে কাজ ছেড়ে দিলে ওঁরা ভেতরে ভেতরে চ'টেই থাকেন; সে সব ভুলে উনি যখন একটা উদারতা দেখিয়েছেন..."

"একটা বিপদে পড়েই......"

—ছেলের মতিগতি পাছে আবার বিগড়োয়···সেই জন্যেই যেন 'উদারতার'র যশটা তাকেও খানিকটা ভাগ ক'রে দিলেন বাবা, বললেন—"আমি গোষ্ঠকে তাই বললাম—তিনি ডেকে দিচ্ছেন, 'না' বলতেই পারেনা বিভূতি। তবু ভাবলাম অন্য কাউকে না পাঠিয়ে নিজেই একবার চ'লে যাই; এই তো একটুখানি পথ। আমি তা'হলে এই সন্ধ্যের গাড়িতেই চ'লে যাই। তুমি যতটা শীগ্গির পারো চার্জ দিয়ে চ'লে এসো।"

পাচক তামাক সেজেই এনেছে। নিজেই তাকে শুধু হালুয়া লুচি আর দু'টো ভাজা তাড়াতাড়ি ক'রে দিতে বলে তামাক খেতে খেতে গল্প করতে লাগলেন। বেশির ভাগ মহারাজেরই গল্প—মনটা খুব বড় —দ্বারভাঙ্গার ওপর খুব টান—রাজনগর থেকে তো সব তুলেই নিয়ে এসেছিলেন—এখন দ্বারভাঙ্গাকে নূতন ক'রে গড়বার প্ল্যান চলছে—একেবারে নেটিভ স্টেটের ঢঙে—অনেক চেষ্টা ক'রে একটা "দ্বারভাঙ্গা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট"—আইন ক'রে পাস করিয়ে নিয়েছেন—সহজে তো হয়না এসব—ট্রাষ্টে নিজে ন'লক্ষ টাকা দিয়েছেন—ঘিঞ্জি বড়বাজারটা ভেঙ্গে নূতন ঢঙে গোলবাজার হবে, পার্ক, একটা বড় ক্লক-টাওয়ার...

ছেলের প্রতি উদারতায় বাবা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছেন। যতক্ষণ রইলেন, মহারাজের গল্পই শুধু হোল একরকম।

আলাপ-সালাপ করবার জন্যে পুরনো কাউকে-কাউকে ডেকে দোব কিনা জিজ্ঞেস করতে বললেন—"না, থাক। আর, ফণীন্দ্রটাও গেল—না হ'লে যেতাম তার বাড়ি নিজেই।"

হয়তো থেকে গিয়ে আমায় সমস্ত রাত ধ'রে বোঝাতে হবে আশঙ্কা ছিল ব'লে এক্কাটাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নূতন এক্কা ডেকে আনাতে হোল।

যাবার সময় তাঁর নিজের প্রথায় যখন আশীর্বাদ করছেন, তখনও হাতটা একটু একটু কাঁপছে। তবে ছেলেও বাবাকে চেনে, এ কাঁপুনির ধারা অন্যরকম। অনেকদিন পরে বাবাকে খুশি করতে পেরেছে।

দ্বারভাঙ্গা রাজে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হোল আমার।

রাঘোপুরে রঘুনন্দনবাবুর ছেলের শিক্ষকতার মতোই অনেকটা, তবে, সেখানে ছিলাম মাত্র গৃহশিক্ষক, এখানে গার্জেন-টিউটার, অর্থাৎ একাধারে শিক্ষক ও অভিভাবক। দায়িত্ব ঢের বেশি। মেজদাদা গোষ্ঠ-বিহারীও এঁদের কুমার অবস্থায় গৃহশিক্ষক বা প্রাইভেট টিউটরা ছিলেন। বাঁধা রুটিন মতো দু'বেলা পড়িয়ে এসে বাড়িতে বসতেন। আমার কাজ, লেখাপড়ার সঙ্গে ছেলের চাল-চলনের ওপরও কড়া নজর রাখা। বরং প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টার দিকেই বেশি।

পাশাপাশি আমাদের দু'টি বাড়ি নির্ধারিত হোল। ছাত্রের নাম কানহৈয়াজী। বিরাট এবং জটিল অন্দরমহল, যেখানে অভিভাবিকা মাতামহী আর মা। মাতামহীর প্রশ্রয় আর আদরের সামনে মা আমল পাননা, তাই এই ব্যবস্থা হয়েছে, অন্দরমহলের আবহাওয়া থেকে ছেলেকে সরিয়ে নেওয়া। রাজপরিবারে সদর-অন্দর আলাদাই। মহারাজের আলাদা প্রাসাদ, কুমার সাহেবের আলাদা। ভাগ্নেরও আলাদা ব্যবস্থা হোল।

অবশ্য, প্রাসাদজাতীয় কিছু নয়। চার-পাঁচটি ছোটবড় ঘর নিয়ে একটি মাঝারি আকারের বাংলো। একজন পাচক, একজন খিদ্‌মত্‌গার অর্থাৎ নানা প্রয়োজনের চাকর। বাড়িটা একটা প্রকাণ্ড দীঘির ধারে, তার উল্টো দিকে রাজের সবচেয়ে বড় প্রাসাদ 'আনন্দবাগ'।

আমার বাসা আলাদা, আরও ছোট, একজন পাচক একজন চাকর। আমি আমার পাণ্ডুলের পাচকটাকে আনিয়ে নিলাম, খানিকটা কাজের মতো হ'য়ে উঠেছিল।

পড়াবার সময় রাঘোপুরের মতো রাখলাম, সকাল আর বিকাল।

রাত্রিতে ব'সে পড়াতাম না। কি পড়ছে না-পড়ছে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতাম।

কাজ শুরু করবার আগে মহারাজের সঙ্গে যে দেখা করি তাতে ব'লে দেন, আমার নূতন ছাত্র অত্যন্ত দুষ্টু, ফাঁকিবাজ, বেশ কড়া শাসনে রাখতে হবে; দরকার পড়লে বেত ব্যবহার করতেও যেন কোন দ্বিধা না করি। সবচেয়ে দরকার ওকে দেউড়ির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। ঠাকুরমার কাছে বড় বেশি প্রশ্রয় পায়। নানারকম ছুতোনাত ক'রে স'রে পড়বার চেষ্টা করবে। সেদিকে মাথা ওর খুব খেলে। কয়েকদিন ওকে দেখে শুনে আমায় একটা রিপোর্ট দিতে বললেন।

মহারাজের প্রকৃতিতে একটা লঘু-কৌতুক-প্রিয়তার মিশ্রণ ছিল। একরকম অল্প বয়সেই গদি পান, রাজকীয় গাম্ভীর্যে সেটাকে একেবারে সরাতে পারেনি। এদিকে পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত স্নেহ-প্রবণ ছিলেন, আমি যে বেত ধরতে পারব না এটা জেনেই আমায় ততদূর পর্যন্ত স্বাধীনতা দেন, তবে, দেউড়িতে ওর ঠাকুরমার কাছে আমার সাজা দেওয়ার পদ্ধতি বেতের চেয়ে আরও অনেক ভয়াবহ আকারে প্রচার ক'রে থাকবেন। একে কড়া হেডমাষ্টার বিভূতিবাবু আসছেন, এইতেই বেশ একটা সাড়া প'ড়ে গিয়ে থাকবে, তার ওপর মহারাজের বিবরণে আরও ঘোরালো হ'য়ে উঠে থাকবে সেটা।

খবরটা আমাকে আমার ছাত্র কানহৈয়াজীই দিল। কিশোরই, বয়স তেরো-চৌদ্দর মধ্যে, কিন্তু বেশ চন্‌মনে, সপ্রতিভ। আর, মামার মতো একটু রঙ্গপ্রিয়, তার সঙ্গে আদুরে নাতির ছেলেমানুষীও আছে। অপরদিকে রাঘোপুরের ছাত্র কলাধারীর মতো গল্পে টানবার একটা চেষ্টা। দিন দুই পরে পড়তে পড়তে একটু বিরতি দিয়ে বলল—"মাষ্টার সাহেব, তৈরী থাকবেন আপনি, এবার যে-কোনওদিন আপনার ডাক পড়বে রাজমাতার।"

বলবার ভঙ্গিটাও বেশ নাটকীয়। বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম—"আমায় ডাকবেন? কেন?"

"সে আপনি তাঁর কাছেই শুনবেন। মামা কি সব বলেছেন—প্রায় আহার-নিদ্রা ছেড়ে দিয়েছেন…"

একেবারে অচেনা নয়। কেটে দিয়ে বললাম,—"বেশ, তুমি এখন পড়ো।"

"আমি পড়বো বৈকি। তা না হ'লেই তো…"

চোখের কোণ তুলে একটু হেসে আবার বইয়ে মন দিল।

পরের দিনই দেউড়ির একটা আর্দালি এসে জানাল—রাজমাতা তলব করেছেন, বিকালে পড়াবার পর গিয়ে দেখা করতে।

একটু ফাঁপরেই প'ড়ে যেতে হোল। দেউড়ির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার জন্যে আমায় রাখা, বিশেষ ক'রে রাজমাতার প্রভাব; এদিকে তাঁরই ডাক। সাত পাঁচ ভেবে কিন্তু যাওয়াই ঠিক করলাম।

এই প্রথম আমার ওদিক মাড়ানো। ছেলের মাতামহী রাজমাতাকেও এই প্রথম দেখা।

ঠিক দেখা বললে অবশ্যই ভুলই বলা হয়।

প্রকাণ্ড অন্দরমহলের বাইরের দিকে একটা মাঝারি সাইজের ঘর, যেন অল্প একটু আলাদাই। সামনেটা হাত চার-পাঁচ খোলা, একটা সবুজ রঙের পাতলা-কাপড় বসানো চিক্ ফেলা। নিতান্ত আভাসে বোঝা যায় তার ওদিকে একটু স্থূলাঙ্গী একজন স্ত্রীলোক ব'সে আছেন আসন-পিঁড়ি হ'য়ে। সাদাসিধে বেশেই। রাজমাতাই যে, তাতে সন্দেহ থাকেনা। আমার জন্যে রাঘোপুরের বাবুসাহেবের এজলাসের মতোই কয়েক-পাট-করা একটা সাদা জাজিম চিকের বাইরে পাতা। সেই আর্দালিই যে আমায় নিয়ে গিয়েছিল, এত্তালা দিল—মাষ্টার সাহেব এসে গেছেন। ভেতর থেকে নির্দেশ এল—"বসতে বলো।" আমি নীচু হ'য়ে করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে ব'সে পড়লাম।

একটু চুপচাপ গেল। তারপর চিক্‌টা অল্প একটু উঠে গিয়ে ডান-হাতটা অল্প একটু বেরিয়ে এল রাজমাতার। একমুঠো আস্ত সুপুরি। সঙ্গে একটু আদেশ, বা, অনুরোধ—"লেথুন্।" অর্থাৎ আমি যেন গ্রহণ করি।

এটা আমার জানা ছিল। সুপুরি মিথিলার একটা বড় মাঙ্গলিক। আশীর্বাদ। আমি আর একটা প্রণাম জানিয়ে সেগুলি পকেটে ভ'রে নিলাম। আবার একটু চুপচাপ। তারপর আরম্ভ করলেন—আমি মস্ত বড় পণ্ডিত, সাধু মানুষ; আমাকে ঐটুকু আশীর্বাদী ছাড়া তাঁর আর দেওয়ার কি ক্ষমতা আছে? 'নেন্নাকে' (খোকাকে, কানহৈয়াজীকে) পড়াবার জন্য আমার রাখা হয়েছে, 'বড়া বাচ্চার' মুখে শোনা অবধি ওঁর যে কী আনন্দ হয়েছে ব'লে বোঝাতে পারেন না। একজনকে হারিয়ে ওঁর অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছি। গেলেই হয়, শুধু নাতিটিকে নিয়ে বেঁচে থাকা। 'বড়কা বাচ্চা' বলে, আমি নাকি বড্ড কড়া লোক। তা কড়া হ'তে হবে বৈকি, নৈলে ছেলে মানুষ হয়? তবে, মাষ্টার, বড়্কা বাচ্চা যেমন বলছে, সে রকম কড়া হ'য়ে ওর যদি ভালোমন্দ কিছু হ'য়ে যায়···

গলাটা ধ'রে যেতে চুপ ক'রে গেলেন। দেখলাম চিকের ওদিকে ছায়ার মতো আঁচল-শুদ্ধ হাতটা চোখে উঠে গেল।

বুঝলাম, মহারাজের রঙ্গপ্রিয়তা চরমে গিয়ে উঠেছে।

বললাম—সেদিক দিয়ে রাজমাতার একেবারে যেন কোনও আশঙ্কা না থাকে। আমি চণ্ডাল নয় তো যে ঐ দুধের বাছার গায়ে হাত দোব। ছেলে মানুষ করতে হ'লে একটু শাসন দরকার হ'য়েই পড়ে। কিন্তু কানহৈয়াজীকে যেমন দেখছি, তাতে মনে হয় কিছুরই দরকার হবে না। মহারাজের হুকুম তো দুষ্টুমি করলে, বা, পড়ায় মন না দিলে, তখন শাসনের কথা ভাবা—তাতে না হয় ওঁর ভাগনে ব'লে খাতির না রাখতেই বলেছেন—কিন্তু আমিও তো অনেক ছেলে মানুষ করেছি ব'লেই ডেকে রেখেছেন আমায়—দুষ্টু-লক্ষ্মী অনেক দেখেছি, তবে এখন পর্যন্ত ওঁর নাতিকে যেমন দেখছি—এত শান্ত প্রকৃতির ছেলে দেখেছি ব'লে, কৈ, মনে পড়ে না তো! রাজমাতা নিশ্চিন্ত থাকুন...

মানিয়ে-সানিয়ে ব'লে গেলাম, অবশ্য তার মধ্যে যতটুকু পারলাম হাতে রেখেও।

চুপ ক'রে শুনে নিয়ে বললেন—"আমিও তাই বলি, অমন শান্ত শিষ্ট মানুষটি, তিনি একেবারে চণ্ডাল হ'তে পারেন না, যতই দুষ্টু হোকনা, ছেলে, ছেলেই তো।...তুমি মাষ্টর একটা মিনতি আমার রেখো, ছেলেটাকে রোজ একবার আমায় দেখিয়ে নিয়ে যেও, না হয় নিজে সঙ্গে করেই, নৈলে আমি বাঁচব না। কি নিয়ে আর বাঁচব, তুমিই বলোনা মাষ্টর?"

ওদিকেও হাতে রেখে বলা—"চণ্ডাল তো নয়।" তারপর একবার দেখিয়ে আনা—অর্থাৎ আস্ত রেখেছি কিনা।

একটা রিপোর্ট দিতে বলেছিলেন মহারাজা, সেটা লিখে একটা সাক্ষাৎকার চেয়ে নিয়ে দু'দিন পরে দেখা করলাম। রাজমাতার তলব-এর কথাটা বলা দরকার ছিল, আর, একবার ক'রে দেখিয়ে আনা কানহৈয়াজীকে।

মহারাজা একটু গম্ভীর হ'য়েই বসেছিলেন। তবে চেনা মানুষ ব'লেই বুঝলাম, একটা কৌতুক অনুভূতিকেই কোন রকমে যেন চেপে। তারপর রিপোর্ট দিয়ে দেউড়ির কথাটা তুলতেই আর সামলাতে না পেরে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন—মোটা ঢিলাঢালা শরীর, হাসলে দুলে দুলে উঠতেন—বললেন—"সব শুনেছি মার কাছে, আপনি, যাকে বলা যায় প্রহ্লাদকে ধ্রুব দাঁড় করিয়েছেন মার কাছে।...না, সাবধানে

থাকবেন, ও ভয়ঙ্কর দুষ্টু। ওই যদি মার মন ভিজিয়ে আপনাকে তলব করিয়ে থাকে তো আশ্চর্য হবনা।"

দেখিয়ে আনা সম্বন্ধে ঠিক হোল, পড়ার পর একঘণ্টা দেউড়ি; ও সময়টা উনিও প্রায় থাকেন সেখানে। কোনদিন একঘণ্টা অতীত হ'য়ে গেলে, জরিমানা হিসাবে, তিনদিন বন্ধ।

ছেলের সঙ্গে আমিও 'নজরবন্দী' একরকম। ছুটি ব'লতে আমারও ঐ একটি ঘণ্টা। সে সময়টুকু সাইকেল ক'রে বাড়ি চ'লে আসতাম। দূরে নয়, যেতে আসতে মিনিট পনেরো লাগত, বাকিটুকু একটু গল্প-গুজব। দেউড়ির পর্ব-টা কিছু থাকলে রাজমাতা ব'লে পাঠাতেন, ছাত্রের ছুটির মেয়াদের সঙ্গে আমারটুকু যেত বেড়ে। যত কমই হোক, রাঘোপুরের তুলনায় বাড়ির সঙ্গে এই যোগাযোগটুকু থাকতই।

রাজমাতা সম্বন্ধে একটু ব'লে নিই। রাণী হ'য়ে থাকার অবস্থায় তাঁকে দেখবার—বোঝবার—সুযোগ হয়নি, তবে, কানহৈয়াজীর দৌলতে রাজমাতা-অবস্থায় দেখবার সুযোগ খানিকটা হয়েছিল। সামান্য গৃহস্থের কন্যা, রাজরাণী হ'য়ে এলেও অত্যন্ত সাদাসিধা মানুষই থেকে গিয়েছিলেন। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, আর খানিকটা ভীরু প্রকৃতির। ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনীদের পক্ষীশাবকের মতোই যেন ডানার মধ্যে আগলে রাখতে পারলেই নিশ্চিন্ত থাকতেন। এ নিয়ে কতকগুলি কৌতুকজনক ব্যাপার ছিল। সে সময়ের ত্রিহুতে ডাইন-যোগিনী তুক-তাকের ব্যাপারটা খুব বেশী ছিল। অন্ততঃ একটি স্ত্রীলোকের কথা জানি—শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণই, তবে গরীব—এঁর ডাইনবিদ্যা জানা ছিল ব'লে বদনাম থাকায় রাজমাতার কাছে মোটারকম মাসোহারা বাঁধা ছিল যাতে সন্তানদের কাউকে কিছু ক'রে না দেন। শুধু মাসোহারা নয়, দেউড়িতে তাঁর গতিবিধিও ছিল, এলে ভয়ে-ভক্তিতে যে অভ্যর্থনা হোত তার গল্পও শুনেছি কুমারদ্বয়ের কাছে, যখন তাঁরা মেজদাদার ছাত্র।

চলল আমার নূতন চাকরি। একটু একঘেঁয়ে তো বটেই, যা অল্প নূতনত্ব ছিল, সেটা কেটে যেতে আরও একঘেঁয়েই হ'য়ে পড়ল; তবে, বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগটুকু থেকে যাওয়ায় ঠিক রাঘোপুরের মতো অবস্থা কখনও দাঁড়াতে পায়নি।

এছাড়া আর একটা ব্যাপার ছিল যাতে একঘেঁয়েমিটা কেটে গিয়ে উপভোগ্যই হ'য়ে উঠত সবটুকু। মহারাজ পিতা রামেশ্বর সিঙের মতো অত 'ট্যুর' করতেন না, তবে একটা ট্যুর যেমন পিতার আমলে তেমনি ওঁর আমলেও ছিল বাঁধা; বড়দিন উপলক্ষে কলকাতা। আগে-পিছে বেশ কিছুদিন নিয়ে, প্রায় মাসখানেকের কাছাকাছি।

তখনকার কলকাতা—কুইন্ অব্ দি ইষ্ট (Queen of the East)—শীতকালে আরও অপরূপ হ'য়ে উঠত। বিশেষ ক'রে আমরা যেখানে থাকতাম, সেটা তো 'কুইনের' মুকুট বললেই হয়। সেকালের চৌরঙ্গীর মাঝখানে এক নং মিড্লটন্ ষ্ট্রীট। এই ট্যুরটা হোত দেউড়ি পর্যন্ত নিয়ে। রাজমাতা, রাণী, ছোটছেলে কুমার সাহেবের পরিবার, মেয়ে 'দাইজী' অর্থাৎ কানহৈয়াজীর মা। এর অতিরিক্ত রাজমাতা যাকে যাকে বাছেন। একটা কথা ব'লে রাখা দরকার; স্বামী বিগত হওয়ার পর যতদিন বেঁচেছিলেন রাজমাতা, তিনিই সর্বকর্ত্রী হ'য়ে ছিলেন। এখানে অল্প বয়সে বিবাহের নিয়ম, কিন্তু দেখেছি, এরা বড় হ'য়ে উঠলেও উনি যতদিন বেঁচেছিলেন, কারুর আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার ক্ষমতা ছিলনা। সামান্য ঘরের কন্যা, শিক্ষা বলতে বিশেষ কিছু নেই, সরল, ডাইনের ভয়ে সন্ত্রস্ত, তবে অসাধারণ বুদ্ধিমতী আর ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী। একটি অ-সহজবোধ্য 'চরিত্র' ছিলেন রাজমাতা।

মিড্লটন ষ্ট্রীটের বাড়ি বিশেষ সুরম্য ছিলনা। আসল বাড়িটা একটা অনুচ্চ ক্লক-টাওয়ার-সমন্বিত ছোট বাড়ি। তাইতেই কেউ এলে দেখাশোনার ব্যবস্থা, প্রাইভেট্ সেক্রেটারি থাকাকালে তাইতেই ছিল আমার আফিস। পাশেই একটা দোতলা বাড়িতে দেউড়ি। বাড়ি কোনটা বড় না হ'লেও দেওয়ালে-ঘেরা বেশ বড় কম্পাউণ্ড। বেশ খানিকটা লন (Lawn), একটু বাগান। কম্পাউণ্ডের পূবে একেবারে শেষ দিকে ছিল আমার আর কানহৈয়াজীর আস্তানা। একটা নিতান্ত একহারা নীচু দোতলা বাড়ি। নীচে ওঁর চাকর। ট্যুরে রান্নার ব্যবস্থা দেউড়িতে। আমার নিজের আলাদা। রুটিন দ্বারভাঙ্গার মতোই মোটা-মুটি। তবে খাওয়ার ব্যবস্থাটা দেউড়িতে হওয়ার জন্য ওদিকের কড়া-কড়ি খানিকটা ঢিলেই হ'য়ে পড়েছিল।

খাওয়ার কথাতে আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। কানহৈয়াজীকে নিয়ে থাকাকালে আমারও দিনকতক একটা সুযোগ ঘ'টে যায় দেউড়ির রান্না খাওয়ার; শুধু দেউড়ি বললেই সবটা বলা হয়না, স্বয়ং রাজমাতার হাতের। সেটা যদি ভুলে যাই তো নিশ্চয় অকৃতজ্ঞতাই হবে যদিও খানিকটা আতঙ্কের আকারেই আছে মনে।

আমি প্রায় বছর তিনেক ছিলাম কানহৈয়াজীর সঙ্গে। তার মধ্যে বার তিনেক বড় দিনে কলকাতা ছাড়া একবার প্রায় সপ্তাহ তিনেকের জন্য আমরা পুরীতে গিয়ে থাকি। শুধু আমরা অর্থাৎ কানহৈয়াজীকে নিয়ে দেউড়ির সবাই, যারা রাজমাতার সাঙ্গো-পাঙ্গো হ'য়ে কলকাতায়

আসত। পরিচালনার ভার থাকত দেউড়ি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব'লে একজন সিনিয়ার কর্মচারীর হাতে, আর বাইরের দিকে কিছু চাকর বাকর। আমরা বাসা পাই সহর থেকে উত্তরে 'স্বর্গদ্বার' অঞ্চলে কোন জমিদার বা ছোট রাজার খালি বাড়িতে। সদর আর অন্দর আলাদা আলাদা। আমরা ছিলাল সদরটাতে। একটা একহারা দোতলা বাড়ি। দু'টো বাড়ির মধ্যে যাতায়াতের জন্য ওপর-তলায় একটা রেলিং দেওয়া পুল। কায়েমী ভাবেই বন্ধ।

আমি পুরীতে বার দুই যাই। একবার বোধহয় আমার কলেজী জীবনে। সহরের মধ্যে আমার এক ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে কয়েকদিন কাটাই। বেশ লেগেছিল, এমন কি মাঝে মাঝে গিয়ে সাগর দর্শন, বেলা পর্যটন পর্যন্ত। কিছু কিছু সমুদ্রস্নানও। এবার ছিলাম প্রায় সপ্তাহ তিনেক। রাজকীয় পরিবেশে।

প্রথম কয়েকদিন মন্দ লাগেনি, তারপর সেই নির্জন সৈকতে একলাই সমুদ্রের ঢেউ গোনা আর একটানা ঝোড়ো হাওয়ার সন্‌সনানি কাণে নিয়ে ব'সে থাকা। এর ওপর ভিজে লোনা হাওয়ায় সর্বাঙ্গে একটা চট্‌চটে ভাব। স্বর্গের কাছাকাছি গিয়ে এই অবস্থার মধ্যে আটকে প'ড়ে থাকা নিশ্চয় বেশ সুখকর হয়নি।

সে যাক্, আমি বলছিলাম রাজমাতার হাতের রান্নার খাওয়া। রাজমাতার রান্নার শখ ছিল। দ্বারভাঙ্গায় বিরাট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা প্রজাবহুল নিজের দেউড়ি—রাজ্যটি ছিল বাইরের দ্বারভাঙ্গা রাজের মতন সমস্যা-সমাকুল, রন্ধনশিল্পের পরীক্ষা করবার খুব বেশি সুযোগ পেতেন না নিশ্চয়। এখানে এসে শিল্প সাধনা ভিন্ন তেমন কাজই বেশি ছিলনা, প্রচুর অবসর দিতে পারতেন। উপকরণেও সম্পূর্ণ অভিনবত্ব এবং বৈচিত্র্য অন্দর-বাহির সবার হিসাব নিয়ে নানাজাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য কেনা হোত এবং রাজমাতার নির্দেশে প্রস্তুত হ'য়ে সবার মধ্যে বিলি হোত।

একদিন খেতে বসেছি, পাচকঠাকুর একটা মাঝারি আকারের জামবাটি এনে রেখে দিল, বলল—"দেউড়ি থেকে, রাজমাতা পাঠিয়েছেন।"

চাকা-চাকা বিচিত্র আকারের কয়েকটা সামুদ্রিক মাছের গন্ধের সঙ্গে কয়েকরকম উগ্র মসলার গন্ধ মিলে একটা যে যোগফল দাঁড়িয়েছে, তার মধ্যে খাঁটি কাবুলী হিঙের গন্ধটা প্রবল। বাটিটি কানায় কানায় ভরা। প্রথমটা বিমূঢ়ই হ'য়ে গেলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম—"তোর জন্যেও পাঠিয়েছেন?"

বলল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটা সবার জন্যে রাঁধা। সরকারি হেঁসেলে। এটা রাজমাতা নিজের হাতে রেঁধেছেন আমলাদের কয়েকজনের জন্যে। আলাদা ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

একটু হেসে বললাম—"কেন? যেটা ভালো জিনিস সেটা তোদের খেতে নেই? আমি এই দু'টো রাখছি, বাকিটা নিয়ে যা, তবে কাউকে ব'লে কাজ নেই। অন্যরকম ভাবতে পারে।"

নিয়ে যাচ্ছিল, বললাম—"আর শোন্, সবাই যখন ব'সে জটলা করবি, হিঙের ঢেকুর তুলিসনি।...আর কিছু নয়, মুখে মুখে কথাটা দেউড়িতে পৌঁছে গেলে তোর ও ভাগবসানোটা রাজমাতার নাও পছন্দ হ'তে পারে। হয়তো ভাববেন, ভালো জিনিস দেখে চুরি ক'রেই খেয়েছিস।...যা।"

এইসব ছোট ছোট কূটচাল তখন একরকম অঙ্গই হ'য়ে গিয়েছিল জীবনের, না হ'লে উপায় ছিলনা। নির্দোষ ব'লে খানিকটা সান্ত্বনা থাকত এই যা। এটুকুতে যদি তাঁর স্নেহের মর্যাদা রক্ষা করা যায় তো ক্ষতিটা কি?

বিকালে পড়ার সময় কানহৈয়াজী জিজ্ঞেস করল—"আজ নানী নিজের হাতের রান্না সী-ফিস (Sea fish) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাষ্টার সাহেব, কি রকম লাগল জিজ্ঞেস করতে ব'লে দিলেন।"

"তোমার কেমন লাগল?"—প্রশ্নটা একরকম বেরিয়েই গেল মুখ দিয়ে।

একটু নাকটা সিঁটকুল। বলল—"কিন্তু সে-কথা বলবার জো আছে?"

বললাম—"খারাপ লাগলে বলব না কেন? মিছে স্তোক তিনি পছন্দই বা করবেন কেন?"

কানহৈয়াজী একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চোখের কোণে চাইল, প্রশ্ন করল—"আপনার ভালো লেগেছে?"

বললাম—"সী-ফিশ্‌টাই এক নূতন জিনিস। তারপর ওঁর রান্নার হাতের প্রশংসা করতে হয় বৈ কি। বিশেষ ক'রে ওঁর যেমন পজিশন (Position).।"

মনে হোল ঠোঁটের কোণের হাসিটা লুকিয়ে ফেলবার জন্যেই কান্‌হৈয়াজী মাথাটা নামিয়ে অঙ্কে মন দিল।

সন্ধ্যায় কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হোল। তলব এল, রাজমাতা ডেকে পাঠিয়েছেন। সেই দ্বারভাঙ্গার মতো ব্যবস্থা; মাঝখানে একটা সবুজ কাপড়-বসানো চিক্। ওদিকে উনি, এদিকে

আমি। দু'একটা একথা-সেকথার পর বললেন—"হ্যাঁ, ভালোকথা মনে প'ড়ে গেল—আজ একটু মাছ রেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। নিশ্চয় ভালো লাগেনি 'মাষ্টরের', নর্দমাতেই গেছে ?"

বললাম—"কি যে বলেন সরকার! আমার তো মনে হচ্ছিল—স্বর্গদ্বারে ব'সে অমৃত খাচ্ছি। যতই ভালো হোক—জগন্নাথের প্রসাদ রোজ রোজ খেয়ে ... আমরা আবার শাক্ত তো।"

একটু প্রসন্ন চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে এল চিকের ওদিক থেকে। তার সঙ্গে যেন পাশের কাকে সাক্ষী মেনে—"শোনগো তোমরা! মাষ্টর আবার কেতাব লেখেন তো!...আমি নাকি আবার অমৃত রেঁধে দিয়েছি।..."

সেদিন একটু বেশি গল্প করলেন টেনে টেনে।

মাছ প্রায়ই আসতে লাগল। নানারকমের পরীক্ষা। বাটীর সংখ্যাও একটি দু'টি ক'রে বাড়তে লাগল। যখন পাঁচটিতে পৌঁছেচে, মহারাজার চিঠি এল, কলকাতায় ফিরে যেতে হবে।

ট্যুরের এই মাস দেড়েক কাজ খুব হালকা থাকত আমার। আগে কোথাও ব'লে থাকব, মামাদের মতো কানহৈয়াজীরও পড়াশোনার কোনও বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছিলনা। যাকে বলা যায় জেনারল্ এডুকেশন (General education) তাই, এ্যাকাডেমিক (Academic) নয়। ইংরাজির ওপর জোর, তার সঙ্গে কিছু অঙ্ক ইতিহাস, ভূগোল। সংস্কৃতর জন্য একজন পণ্ডিত ছিলেন, এসে পড়িয়ে চ'লে যেতেন। দুই ভাইয়ের শিক্ষাপদ্ধতি আমার দেখাই ছিল, মনটাকে সব-কিছুর কিছু কিছু দিয়ে যতটা সম্ভব জীবনের জন্য প্রস্তুত করে, ওঁরা যে স্তরের মানুষ তার উপযোগী ক'রে দেওয়া। কতকটা সাম্‌থিং অব এভরিথিং (Something of everything), যাতে ওঁদের সমাজে বেমানান না হন। খানিকটা সাহিত্যজ্ঞান, খানিকটা শিল্প চেতনার সঙ্গে সৌন্দর্য-জ্ঞান। খানিকটা পুরুষোচিত ক্রীড়াকলাপ, নিজে না খেললেও বোঝা, উপভোগ করা।

কলকাতার ট্যুরটা আমি এইদিক দিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতাম।

বিকালের দিকে আমি ছাত্রকে নিয়ে প্রায়ই যেতাম বেরিয়ে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ভালো ভালো বাগান, পার্ক। তখনও নয়নাভিরাম অনেকগুলিই সজীব রয়েছে। শীতের মরসুমে ফুল চিনিয়ে, গাছ চিনিয়ে; ইডেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন হ'য়ে ঝিলের সঙ্গে উচ্চাবচ ভূখণ্ড, কৃত্রিম অরণ্য প্রভৃতি চিনিয়ে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে উদ্যান সৃষ্টি,

তা থেকে কলেজী জীবনে একদিন যে আনন্দ পেয়েছি—ছাত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করতাম। ওর মনটা যে সাড়া দিত, সে এক অপূর্ব আনন্দ। মিউজিয়ম্ ছিল, জ্যু ছিল হু'খানি সুবৃহৎ গ্রন্থই। যতটা তার জানি, তারপর ছাত্রের জন্যও শিখতে, জানার প্রয়োজন হোত।

এই সময় আর একটা জিনিস হোত যা কলকাতার নিজস্ব শিল্পকলার ঐতিহ্যটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আর্ট একাডেমির চিত্র-ভাস্কর্য-প্রদর্শনী। আরও নানা ধরণের জিনিস—সার্কাস, ভালো ভালো ইংরাজি সিনেমা, তখনও ছাত্রের সঙ্গে পাশাপাশি ব'সে না দেখবার মতো হয়নি—বড় বড় নির্বাক সিরিয়েল (Serial)—লা মিজারেবল, টেল অব্ টু-সিটিজ—এক একটা ছবিতে মন কোন উর্দ্ধলোকে চ'লে যায়। ভালো ভালো পার্ক। শীত তখনও কলকাতার সিজন্ (Season)। রাজধানী উঠে গেলেও বড়লাট এই সময়েই কলকাতায় এসে থাকেন। তার মানেই সব ছোট-বড় সামন্ত রাজাদের সমাবেশ—জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, বরোদা, ইন্দোর। এই সময় একটা খুব বড় খেলা নিয়ে চৌরঙ্গী-গড়েরমাঠ গুলজার থাকত—'ভাইসরয়জ্ কাপ' উপলক্ষ ক'রে পোলোখেলা। এই শৌর্যপূর্ণ, পুরুষালি খেলাটা একেবারেই অবলুপ্ত হ'য়ে গেল। সে সময় অভিজাত শ্রেণীর এইটেই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল। দ্বারভাঙ্গার বিশেষ আকর্ষণ ছিল এদিকে। হু'ভাই-ই খেলতেন; তারমধ্যে ছোটভাই তো বিহারের শ্রেষ্ঠ, এমন কি সবার মধ্যেই একজন বিশিষ্ট ব'লে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

অনেক ছোটবড় সম্মেলনও হোত, কংগ্রেস, প্রভিন্সিয়ল্ কংগ্রেস, ওরিয়েনটল্ কনফারেন্স্, একটা-না-একটা থাকতই মনীষী সমাবেশ। সব না বুঝলেও দেশের যা শ্রেষ্ঠ তার আবহাওয়ায় খানিকটা কাটতো। মনের প্রসার বৃদ্ধিতে নিজের দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে যতটুকুই হোক শ্রদ্ধান্বিত ওয়াকিবহাল হওয়া আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হ'তে শেখা।

সে সব দিনে শীতের কলকাতা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সমারোহে, ক্রীড়াবিনোদনে বহু বিচিত্রিত একখানি খোলা গ্রন্থের মতো থাকত প'ড়ে। পাতা উল্টে উল্টে দেখে যাওয়া। আর কিছু না হোক্, জীবন যে কতবড়, জীবন যে কত বহুবিস্মৃত তার একটা আভাস যেত পাওয়া।

এই কলকাতা—প্রবাস আমার সাহিত্যজীবনের একটা খুব বড় স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। মজঃফরপুরের দ্বিতীয় পর্যায়ে, পরে পাণ্ডুলের হেডমাষ্টারির সময়, তারও পরে কানহৈয়াজীকে পড়াবার

সময় আমার লেখা কিছু কিছু বেরিয়েই গেছে। 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা, 'বঙ্গশ্রী'র আড্ডা, অল্পবিস্তর সভাসমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে কিছু কিছু পরিচয়ও হয়েছে। সেই সঙ্গে স্বল্প একটু স্বীকৃতি বা রেকগ্‌নিশন্‌ও (Recognition)। একদিন 'প্রবাসী' আফিসে গেছি, ব্রজেনবাবু একথা-সেকথার পর বললেন—"বিভূতিবাবু, আপনার তো গল্প অনেক জমে থাকবে। বই বের করতে চান? তাহ'লে সজনীবাবুর সঙ্গে দেখা করুন, উনি বলছিলেন।"

যে-ধরণের সাহিত্যচর্চা আমার, কোনও প্ল্যান নেই, খেয়াল মাফিক মাঝে মাঝে এক-আধটা গল্প লিখে যাওয়া, তাতে বইয়ের স্বপ্ন কখনও দেখিনি। তার ওপর সজনীবাবুর মতো মানুষ চেয়ে নিচ্ছেন, ভেতরে ভেতরে উল্লসিতই হ'য়ে থাকব, উঠতি লেখকোচিত ঔদাসীন্যের সঙ্গেই বললাম—"উনি নিলে কেন রাজি হব না?"

সেবার বোধহয় দ্বিতীয়বার কলকাতা ট্যুরে এসেছি কানহৈয়াজীর সঙ্গে। ্যরে বাঁধা-ধরা তেমন রুটিন না থাকলেও, নানা কারণেই ছাত্রের কাছছাড়া হওয়ার উপায় ছিল না। শুধু খাওয়া-দাওয়ার পর সে যখন নিদ্রা দিত, সেই সময়টুকু ছিল নিজস্ব। মাত্র দু'ঘণ্টা। সেই দু'ঘণ্টার মধ্যে "আর্মি-নেভি"র পাশে ১নং মিড্‌ল্‌টন ষ্ট্রীট থেকে আপার সারকুলার রোডের প্রায় শেষ প্রান্তে ২৫ নং মোহনবাগান রো-তে গিয়ে সজনীবাবুর সঙ্গে টার্মস্‌ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কওয়া, চুক্তি করা,—বেশ খানিকটা অসুবিধাজনকই ছিল। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার, তারিখটা মনে নেই। তখন বাসের আমদানিই হয়নি, ট্রাম, তাতে অন্তুতঃ দু'টো চেঞ্জ।

যেতে, হাতে যা সময়, তার বেশির ভাগ গেল কেটে।

তবে সর্তাদি নিয়ে সময়ের অপব্যয়ের কোন কারণই ঘটতে দিলেন না সজনীবাবু। একখানা নিতান্তই সাদাসিধা, বোধহয় একটা রেভেনিউ স্ট্যাম্প মাত্র বসানো কাগজ সামনে রেখে দিয়ে বললেন—"তারাশঙ্কর-বাবু এই একখানা বই দিয়েছেন। পড়ে দেখুন, কোন আপত্তি আছে কিনা।"

আটটি গল্প নিয়ে আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশনের কথা পাকা হোল। মূল্য পঞ্চাশটি রৌপ্যমুদ্রা, কায়েমী স্বত্বের কপিরাইট, কি, একটা সংস্করণ; এই আটটি গল্প, কি যত আছে সব, মাত্র বইয়ের, ক, সিনেমা অনুবাদাদি সব কিছুর—সে সব খুঁটিয়ে দেখা—তখন এত জানতাম না, জানলেও তারাশঙ্করের চুক্তিতে তার পথ বন্ধ।

ওদিকে কানহৈয়াজি উঠে পড়তে পারে। আমায় না দেখতে পেলেই দেউড়িতে ঢুকে পড়বে। সে দুর্গ থেকে বের করা খুব দুষ্করই।

স্বাক্ষর বসিয়ে দিয়ে মুদ্রাকয়টি নিয়ে চ'লে এলাম। সেদিনকার ভ্রান্ত হঠকারিতায় আমার সাহিত্যপ্রচেষ্টার প্রথম ফল—পঞ্চাশটি গল্প হাত থেকে বেরিয়ে গেল। রাণুর প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ, কথামালা। কটা সংস্করণ বা পুনঃমুদ্রণ হ'য়ে কত ছাপা হয়েছিল কিছু জানতে পারার উপায় ছিল না। আমি চারখানা বইয়ে মাত্র দু'শোটি টাকা পাই।

আরও পেয়েছিলাম; সেটা স্বীকার না করলে অধর্ম হবে। 'শনিবারের চিঠি' আর শনিবারের প্রেসের তখন খুব বোলবোলাও। সেটা বিজ্ঞাপনের যুগ ছিল না, তবে সজনীবাবুর বাজার সৃষ্টি করার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। টাকা পেলাম না, তবে বইগুলো যে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠছে, সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচয় বাড়ছে, কাগজে গল্প চাইছে—'প্রবাসী', 'বঙ্গশ্রী', 'বিচিত্রা'—দিয়ে উঠতে পারছি না—সৃষ্টির এ আনন্দটা পেয়ে যাচ্ছি। যে আশাই করেনি—আশার হদিস না জানার জন্যই হোক, বা, মনের সে রকম গঠনের অভাবেই হোক—বঞ্চনা তাকে খুব ব্যথিত করতে পারেনা। আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। দূরে থাকি, বইয়ের বাজারের সব পরিচয় নেই—"শস্যংচ গৃহমাগতম্"—যেটুকু আসে আসুক—মনের ভাবটা ছিল এইরকম। একটা রোজগারও বরাবরই থেকে গিয়েছিল, তাতেও বঞ্চনার হুলটা বেশি করে বিঁধতে পারেনি।

আর একটা ব্যাপার নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই হোল। অর্থের দিকেও সাহিত্যের যে একটা সম্ভাবনা আছে এই বঞ্চনালব্ধ অভিজ্ঞতাটা সতর্কও ক'রে দিল। এইখানে সাহিত্যজীবনে আমার অকৃত্রিম বন্ধু ৺বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথা এসে পড়ে।

বুদ্ধদেববাবু ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের বোটানির প্রফেসর। বিজ্ঞানের অধ্যাপক হ'লেও, সাহিত্যই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, মূলমন্ত্র। নিজে লিখতেন না, ত'বে অনন্যসাধারণ একজন সাহিত্য-রসিক পুরুষ ছিলেন। তাঁর দোতলার ঘরটি ছিল সাহিত্যের একটি বড় আড্ডা, যদিও তাঁর মনের মতো গুটিকতক বাছা লোক নিয়েই। বাইরে শরৎচন্দ্রের কাছে একসময় নিয়মিত যাওয়া আসা ছিল। শরৎ বাবুর অনেক গল্পই শুনেছি তাঁর কাছে। আর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ছিল বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিভূতিবাবু প্রায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ পর্যন্ত বেশি রকমই যাযাবর প্রকৃতির ছিলেন। একসময় ঘুরে ফিরে

এসে দিনের পর দিন এঁর কাছেই কাটাতেন শুনেছি, তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আমার বুদ্ধদেববাবুর কাছেই শোনা।

আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয়ের সূত্রপাত কি নিয়ে ঠিক মনে পড়ছেনা, তবে এটা ঠিক যে ওঁর মতো অন্তরঙ্গতা আমার আর কোন সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গেই হয়নি জীবনে, আর এত নিঃস্বার্থ সখ্য-প্রীতি আর কারো কাছে লাভ করেছি, এত নিঃস্বার্থভাবে আর কারো কাছে উপকৃত হয়েছি ব'লে মনে তো পড়েনা। প্রায় ৭।৮ বছর ধ'রে, তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমি কলকাতায় এলেই ওঁর সঙ্গেই থাকতাম, ছুটি-ছাটা থাকলে, যেমন, যখন স্কুলে রয়েছি, সমস্ত ছুটিটাই ওখানে কেটেছে, এমনও হয়েছে।

জীবনেও আমাদের একটা বড় সাদৃশ্য ছিল। বুদ্ধদেববাবুও ছিলেন অকৃতদার। খুব বড় পণ্ডিত বংশের সন্তানও ছিলেন উনি। ওঁর প্রপিতামহ গিরিশ বিদ্যারত্ন ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু, সহকর্মী, বাড়িটা তাঁরই নামের রাস্তার ওপর। ওঁর পিতা যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক, অসাধারণ পণ্ডিত, সংস্কৃতে কিছু বইও আছে। বধিরতার জন্য অকালে অবসরগ্রহণ করতে হয়। বুদ্ধদেবের বংশগত বিদ্যা সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান ছিল।

বাড়িটা ছোট। ওপরে দু'খানা ঘর, একটাতে ওঁর বাবা থাকতেন, একটাতে আমরা। নীচে ওঁর মা থাকতেন। তিনিই রান্না করতেন; প্রস্তুত হ'লে কাছে বসে আমাদের দু'জনকে খাওয়াতেন। অত্যন্ত স্নেহময়ী বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ছিলেন। যতদিন থাকতাম মনে হোত না বাড়ির বাইরে আছি।

এই ছোট, দ্বিতল গৃহটিতে আমার গ্রন্থপ্রকাশের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হোল।

বুদ্ধদেব বাবু ছিলেন দীর্ঘকায় মানুষ, এদিকে বেশ স্থূল, প্রায় শুয়েই কাটাতেন। উনি একটা নীচু তক্তপোষের ওপর মাদুর বিছিয়ে বুকে একটা বালিস দিয়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে থাকতেন, আমি নীচে একটা মাদুরে ব'সে, মুখোমুখি হ'য়ে গল্প করতাম।

সজনীবাবুর হাতে ও'ভাবে চ'লে যাওয়ায় আমার চেয়ে ওঁকেই বেশি পীড়িত করত। মাঝে মাঝেই তুলতেন প্রসঙ্গটা। একদিন ঐভাবে মুখোমুখি হ'য়ে গল্প করার মধ্যে বললেন—"সজনীবাবু আপনার বইগুলো থেকে এ পর্যন্ত কত পেয়ে থাকতে পারেন, হিসেব ক'রে দেখেছেন?"

একটু হেসে বললাম—"ফল তো নেই। আমি পেয়েছি দু'শ, এইটিই আমার কাছে সত্যি।"

বললেন—"আমি হিসেব করেছি।"

—একটা সংখ্যা বললেন, সেযুগের পক্ষে বেশ মোটাই।

প্রশ্ন করলেন—"সব গল্পই দিয়ে দিয়েছেন ?"

বললাম—"কথামালা পর্যন্ত সব দেওয়া আছে। গুটি পঞ্চাশেক।"

"ইস্ !"—ক'রে একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—"আরও তো প্রায় একটা বইয়ের যুগ্যি আছে। আর দেবেন না ওরকম ক'রে আঙ্গুল কেটে।"

বললাম—"বইগুলো বেরিয়ে যাচ্ছিল এক রকম ক'রে...কি আর এমন রাজা-উজীর হব ?"

বললেন—"রাজা-উজীর হওয়া আপনার কর্মও নয়, সেটা বুঝতেই পারা গেছে। তবু, পেয়াদার মতন আপনার প্রাপ্যটা তো আদায় ক'রে নিতে পারেন। আমি এক জায়গায় কথা কইছি। সে আপনার সব বই-ই একে একে ছাপতে রাজি আছে। নিজের প্রেসে, এতদিন শুধু বাইরের কাজ নিচ্ছিল। এবার তাকে নিজের পাবলিকেশনের কাজে Interested করেছি। আপনি রাজি হ'লেই হয়।"

ছদিন পরেই সুরেশবাবুকে সন্ধ্যার পর নিয়ে এলেন।

পরিচয়ে জানলাম সুরেশবাবু (সুরেশ দাস) ওঁর এম্.এস্‌সি. ক্লাসের বন্ধু। ঢাকার মানুষ, পাস করার পর থেকেই ব্যবসার দিকে গেছেন ...ওঁর প্রেসটা ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীটে।

ঠিক হোল প্রথমে আমি ঋতুগুলির নাম দিয়ে এক একখানি ক'রে ছ'টি বই বের করব, প্রথম গল্পটি ঋতুর নামেই থাকবে। 'বর্ষায়' বইটি বের করলেন সুরেশবাবু।

এরকম সাধ মিটিয়ে পছন্দমতো ক'রে বই বের করার সুযোগ আর খুব বেশি হয়নি। আমরা চারজনে ব'সে গল্প বাছাই করতাম—আমি, বুদ্ধদেব বাবু, সুরেশবাবু আর চিত্রশিল্পী বিনয় বোস। এঁর হাতে গল্পগুলি দিয়ে দেওয়া হোত। উনি এঁকে নিয়ে আসতেন। আমাদের কিছু পরিবর্তন করার থাকলে ক'রে নিয়ে আসতেন। হিউমারের গল্প চিত্রিত হ'লে তার মূল্য অনেক বেড়ে যায়। পরেও আমার গল্প চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু বিনয়বাবুর মতো অমন সূক্ষ্ম তুলির টান, রেখা-বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে হিউমারকে অমন প্রাণবন্ত ক'রে তোলা আমি কম দেখেছি। একখান বই বের করা, সবদিকেই সাধ্যমতো নিখুঁত ক'রে, এটা ছিল যেন আমাদের একটা ধর্মানুষ্ঠান। আর, একটা একআনার রেভেনিউ স্ট্যাম্পে মারা, কাঁচা চিরকুটেও নয়। কানুন-সম্মত কোর্টের রেভেনিউ পেপারে। উভয় পক্ষের স্বত্ব লিপিবদ্ধ ক'রে। রয়েলটি লেখকের মর্যাদা

রেখে। সে সময় কয়েকজন নূতন কোম্পানী এসে পুস্তক প্রকাশনের একটি নবযুগ এনেছেন, বেঙ্গল, মিত্র-ঘোষ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্। লেখক-প্রকাশকের মধ্যে একটি সুস্থ সম্পর্ক এনে দিয়ে। জেনারেল প্রিণ্টার্স সামিল হ'লেন। একটার পর একটা বই বেরিয়ে যেতে লাগল। কিছু কিছু পুনর্মুদ্রণও নিয়ে—'বর্ষায়' অক্টোবর ১৯৪০; 'বসন্তে' জুলাই '৪১; 'শারদীয়া' অক্টোবর '৪১; 'বরযাত্রী' মার্চ '৪২; এরমধ্যে 'বর্ষায়' পুনর্মুদ্রিত হোল, সজনীবাবুর কাছে দেওয়া বাকী গল্প নিয়ে 'রানুর কথামালা' বেরিয়ে গেল ওদিকে। 'নীলাঙ্গুরীয়'—পূর্ব পর্যন্ত গ্রন্থ প্রকাশের কথা এই পর্যন্ত ব'লে নিয়ে আমি আমার কর্মজীবনের দিকে ফিরে যাই।

আমার চাকুরিজীবনে আড়াই থেকে তিন বৎসরটা ছকে বাঁধা। কানহৈয়াজীর সঙ্গে ঐরকম একটা সময় কাটাবার পর একদিন চীফ্‌ম্যানেজার মিষ্টার ড্যানবির দস্তখতে হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম—মহারাজের আদেশমতো আমায় রাজপ্রেসের ম্যানেজারের পোষ্ট দেওয়া হয়েছে। অমুক তারিখ থেকে যেন কার্যভার গ্রহণ করি।

দ্বারভাঙ্গা রাজে এধরণের পোষ্টিং নূতন কথা নয়। জানো-বা না জানো, এবার থেকে তোমার এই কাজ, গিয়ে লেগে যাও। পূর্বতন চীফ-ম্যানেজার প্রিয়বাবু তামাসা ক'রে বলতেন—"এবার কোনদিন অর্ডার পাব—'তুমি হাসপাতালের লেডি ডাক্তারের কাজ করো গিয়ে।'

যাইহোক, আমার পক্ষে এই পরিবর্তনটা ভালো হোল। স্কুল নয়, কলেজ নয়, একটিমাত্র ছেলের ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ যে কি ক'রে নষ্ট করেছিলাম, এতদিনে স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলাম। একটা যেন নিশ্চিন্ত মোহাবিষ্ট অবস্থা। অল্প পরিসরের মধ্যে।

এর নজির আমি অন্যত্র পেয়েছি, আমার মজঃফরপুরের বন্ধু প্রকাশের জীবনে। আমার সঙ্গেই মুখার্জি সেমিনারীতে শিক্ষকতা শুরু করে। তীক্ষ্ণধী, স্বাস্থ্যবান, তেমনি কর্মঠ আর চরিত্রবান, তার জীবনে অনেক কিছু করবার কথা। একটা বড় আদর্শ নিয়েই শিক্ষকতার দিকে আসে। মুখার্জি সেমিনারী থেকে বেরুবার পর পাড়াগাঁয়ের দিকে একটা ভালো স্কুলে হেডমাষ্টারি পেয়ে চ'লে যায়। প্রোপ্রাইটার একজন নামকরা পলিটিক্যাল লীডার, নিজে হ'তে ডেকে নেন। পরে তিনি একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকাশের পথ খোলাই ছিল। বহুদিন পরে শুনলাম, প্রকাশ একজন নেপালী রাণার ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক হ'য়ে সপরিবারে কাঠ্‌মাণ্ডুতে চ'লে গেছে।

যথেষ্ট খাতির, দেওয়া-নেওয়াও খুব খারাপ নয়। কিন্তু প্রকাশ ঐ পর্যন্ত উঠেই শেষ হ'য়ে গেল। তার সর্বনাশটা হোল এইজন্য যে, সে আবার আমার চেয়েও আদর-অভ্যর্থনার মধ্যে ছিল। প্রকাশের একেবারে শেষ পরিণামটা জানতে পারিনি। তবে, তাকে অনেকটা অকালেই হারাতে হয়।

অবশ্য আমার ক্ষেত্রে ঠিক এধরণের আশঙ্কা নানা কারণেই ছিল না। তবে, এভাবে হঠাৎ বেরিয়ে না এলে, ক্ষতিটা কি ভাবে কতটা হচ্ছিল বুঝতে পারতাম না। ধরা যাক্ কানহৈয়াজীর গার্জেন-টিউটার ক'রে বাইরে কোথাও আমায় পাঠিয়ে দিলেন মহারাজ; দেউড়ির প্রভাব থেকে আরও মুক্ত ক'রে। আরও জীবনের এই অমূল্য সময়টার ক'টা বছর গেল; দু'বছর; চার বছর ...

ভগবান যেন ফিরিয়ে দিলেন আমায়, আমার কাছে। প্রেসের কাজ কিছু বুঝিনা, তবে ধরাবাঁধা যান্ত্রিক কাজ, বুঝে নিতে দেরি হোল না। কাজটাও বড়। দ্বারভাঙ্গা স্টেটের কুড়িটা সার্কেল উত্তর বিহারের চারটে জেলায় ছড়িয়ে আছে। বাংলাতেও; বাঁকুড়া, আরও এদিক-ওদিক। এসবের সংবৎসরেব যত জমিদারী কাগজপত্র—সব এই প্রেসে ছাপা হ'য়ে চালান হয়। দু'তলা বাড়ী, নীচের তলায় কয়েকটা ভালো ভালো প্রেস, ওপরতলার এক অংশে আমার আফিস। পাশেই রাজ থেকে প্রচারিত মৈথিলী সাপ্তাহিক পত্রিকা "মিথিলা-মিহির"। এই প্রেসেই ছাপা হ'য়ে বিতরিত হয়।

এই প্রেসের অফিসার ব'লে নিজেকে অনুভব করা যে এক নূতন ধরণের অনুভূতি, এ-কথা অস্বীকার করি কি ক'রে? দশটা পাঁচটা আফিস। বাঁধাধরা কাজ, সেই কবে থেকে এমন বিধিবদ্ধভাবে চ'লে আসছে যে, ছন্দপতনের কোন সম্ভাবনাই নেই। আফিসের চিন্তা বাড়িতে নিয়ে আসতে হয়না। ফল এই হোল যে, বাড়ির সময়টা আমি পুরোপুরি সাহিত্যে নিয়োজিত করতে পারলাম। একটা মাত্র অসুবিধা, কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ খানিকটা ব্যাহত হোল, কেননা প্রেসের ছুটিছাটা কম, রাজ অফিসের সঙ্গে বাঁধা। বিশেষ ক'রে এমন ছুটি কম যাতে কলকাতায় গিয়ে দু'দিন থেকে কিছু কাজ সেরে ফিরে আসা যায়। তবে পরিচয়টা বেড়েছে, 'শনিরঞ্জন' প্রেসের পর 'জেনারেল প্রিণ্টার্সের' কাজ একরকম আপনিই চ'লে যাচ্ছে, বাকিটুকু চিঠিপত্রেও চ'লে যায়। নূতন কিছু হ'লে কোন সুযোগে একবার গিয়ে ঠিক ক'রে আসা, বিশেষ আটকাচ্ছে না।

এ-হোল বই প্রকাশের কাজ। পত্রিকায় লেখা প্রকাশের ব্যাপারে

আমি গোড়া থেকেই একটা সুযোগ পেয়ে গেছি—কোন এডিটর—সাব-এডিটরের দ্বারস্থ হ'তে হয়নি আমায়। লিখি অল্পই আমি, লিখতে সময়ও লাগে বেশি আমার। তবে, বোধহয় রাজস্কুলের দ্বিতীয় পর্যায়ে থেকে রাজ প্রেসের যুগ পর্যন্ত আমি এতগুলি কাগজে গল্প দিয়ে গেছি —'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'বঙ্গশ্রী', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'বর্তমান' 'কল্লোল' ও 'বিচিত্রা'। এর মধ্যে কোনটাতে মাত্র দু' একটাই, তবে, চাহিদাটা থেকে গেছে ওদিক থেকে। কোন্ গল্প, কবে, কোথায় বলতে পারব না ; তবে স্রোতটা অব্যাহতই থেকে গেছে। অবশ্য মাত্র গল্পই। সবচেয়ে বেশি তাগাদা থাকত 'বঙ্গশ্রী'র কিরণ রায়ের কাছ থেকে। রসিক লোক ছিলেন, তাঁর পত্রিকার লেটার হেড দেওয়া পোষ্টকার্ডের চিঠিগুলি অল্প পরিসর হলেও বেশ সরস হোত।

এইভাবে তাগাদা দিয়ে গল্প নেওয়ার কথা বলা একটু দরকার হ'য়ে পড়েছিল ব'লেই বলছি। আমায় যদি সম্পাদকদের দরবার ক'রে লেখা দিতে হোত, বা, মন্তব্য নিয়ে কোনও লেখা ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকত, তাহ'লে কলকাতা থেকে অতদূরে থেকে এত বহুবিচিত্র কাজের মধ্যে থেকে সাহিত্যচর্চা সম্ভবই হোতনা আমার পক্ষে। আমার নিজের ধারণা, সংখ্যায় গল্প বোধহয় আমার সবচেয়ে বেশি। অন্ততঃ, সংখ্যায় প্রথম সারিতে আমারও স্থান আছে একটা। এটা হয়েছে, দ্রুত হোক্, স্তিমিত হোক্, বরাবরই একটা স্রোত গেছে ব'য়ে।

কবি শৈলেন লাহা (প্রবাসী) একটি মাত্র গল্প ও কিছু সম্পাদকীয় মন্তব্য দিয়ে দিন কতক সপ্তাহে সপ্তাহে (?) একটি পত্রিকা চালান। তাতেও একটা বা দু'টো গল্প দিয়েছি।

সংখ্যাধিক্যের আর একটা কারণ, সবাই গল্পই চেয়ে গেছেন। নভেল লেখার তাগিদ আমি নিজে কখনও অনুভব করিনি। কেউ চাইলে কি করতাম বলতে পারি না। নভেল লেখার আইডিয়াটা আমার মাথায় সেঁদুল নিতান্তই আকস্মিকভাবে। সে কথা পরে বলছি।

এইখানে সন্ত সন্ত একটা ভুল শুধরে নিই।

কোন সম্পাদকের দপ্তর থেকে লেখা আমার কখনও ফিরে না আসায়, স্তিমিত-ত্বরিত যাই হোক, স্রোতটা অব্যাহত থেকে গেছে। কিন্তু একবার এসেইছিল ফিরে এবং তার লজ্জা আর নৈরাশ্য নিয়ে ঘটনাটুকু এখনও স্পষ্ট মনে আছে। 'প্রবাসী'তে আমার প্রথম দু'টি গল্প 'অবিচার' আর 'ভৈরবে' প্রকাশিত হওয়ার পর—অনেক পরে পরে অবশ্য,—আমি 'মানসী ও মর্মবাণী'তে একটি গল্প পাঠাই এবং সেটি

ছাপাও হয়। তখন 'মানসী ও মর্মবাণী'র সম্পাদক প্রভাত মুখোপাধ্যায়। গল্পটির নাম ছিল—'দাদা'।

উৎসাহ পেয়ে আমি আর একটি গল্প পাঠাই। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। এটি ফেরৎ আসে—প্রভাতবাবুর স্বাক্ষরেই। তবে, হেলা-ফেলা ক'রে 'না' বা 'দুঃখিত' মন্তব্য নিয়ে নয়। তখনকার সম্পাদনার একটা দায়িত্ববোধ ছিল, খানিকটা সৌজন্যও। প্রভাতবাবু লিখলেন—তাঁর মনে হয়েছে, নায়ক নায়িকার মধ্যে যেখানে প্রেমের চিত্র ফোটান হয়েছে সেখানটা খানিকটা অস্বাভাবিক হ'য়ে গেছে। তার সঙ্গে লেখা—"আমরা কিন্তু 'দাদা'র লেখকের আশা ছাড়তে পারিনা।"

লেখাটি পরে যেন প্রবাসীতেই পাঠিয়ে দিই ব'লে মনে হচ্ছে। যেখানেই হোক, ছাপা যে হয়েছিল এবং একটা স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজেই এটা বেশ মনে আছে।

এখানে আর একটা কথা ব'লে রাখা দরকার মনে করি, তাতে আর কিছু না হোক, এই যে নিজের দইকে টক না-বলার একটা ভাব এসে পড়ছে—যতই অনিচ্ছাকৃত হোক, সেটা কেটে যায়। তখনকার লেখার মান তেমন উঁচু ছিল না, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য, নূতন নূতন টেক্‌নিক, নূতন আদর্শ প্রভৃতিতে আজ যেমন হয়েছে। একথা অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার করতে হয়, আমার একেবারে প্রথম দিকের কয়েকটি গল্প, এবং বোধহয় আমার সহযাত্রীদেরও কয়েকটি, আজকের কোনও স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজে পাত পেত না। এর কারণটা ঐতিহাসিক। আমাদের সময় গল্পের ক্ষেত্রটা সবে প্রস্তুত হচ্ছে বলা যায়। প্রভাতবাবু, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন মাঝে মাঝে লিখছেন, রবীন্দ্রনাথের গল্পগ্রন্থ একে একে এসে আসর জমাচ্ছে। প্রকাশনার মাধ্যম 'প্রবাসী', 'সাধনা', 'ভারতী' আর মাত্র কয়েকটা কাগজ; হাতে গোনা যায়—তাও অল্প প্রয়াস, বা অনায়াস-লভ্য নয়। এই অল্প মালমসলা আমাদের সম্বল; এই থেকে নিজেদের রুচি, প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতামতো আদর্শ বেছে নিতে হোত, Inspiration বা অনুপ্রেরণা সঞ্চয় ক'রে নিতে হোত। যখন একেবারেই নভিস্ (Novice) তখন এই অল্প পরিসরের অল্প দৃষ্টান্ত সামনে রেখে, দিকে দিকে চিন্তার দিগন্তপ্রসারী পথের সন্ধান না পেয়ে, গোড়া থেকেই উচ্চ মান নিয়ে দাঁড়াতাম কি ক'রে? তবু, একটা বিস্ময়কর যুগ এগিয়ে আসছিলই। প্রতিভা একটা প্রাথমিক অনুপ্রেরণা চায়, সে-অর্থে Genius is imitative, কিন্তু খানিকটা এগিয়েই সে নিজের নিজস্বতা ধ'রে ফেলে, আবিষ্কার ক'রে ফেলে নিজেকে, তখনই সে মৌলিক

সৃষ্টির অধিকারী মনে করে নিজেকে। বাংলা সাহিত্যে তাই হোল—একে একে আসর গেল ভ'রে—রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র, সঙ্গেসঙ্গেই—তারশঙ্কর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার, সুমথনাথ ঘোষ, বিমল মিত্র, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'পরশুরাম' (রাজশেখর), মনোজ বসু, প্রমথ বিশী, গজেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি।

আমি এখানে গল্প-সাহিত্যের কথাই বলছি। নিজেকেও ধ'রে, নিচ্ছি, বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে দলের মধ্যে বাদ দিতে গেলে নিজেকে বিশি ক'রেই তোলা হয়, সেটাকে বলা চলে কনসৃপিকুয়াস এ্যাব্‌সেন্স (Conspicuous by absence)। কিছু স্বীকৃতি আমিও পেয়েছি বৈকি। ঠিক আমাদের পরেই এসেছেন—নারায়ণ, জ্যোতিরিন্দ্র, সমরেশ, নরেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। এর পরেই তাঁদের কথা, যাঁরা এই দেড়শত বৎসরের বহু বিচিত্র বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী।

এইখানে একটা প্রশ্ন এসে পড়ছে, যেটা হয়তো আমার মতো অনেকের মনকেই সংশয়াকুল করেছে। পদক্ষেপ অনেকেরই শুনছি, কিন্তু যেন মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, আসরে এসে স্থায়ী আসন কেউ নিতে পারছেন কৈ? দু'খানা চারখানা বইও বেশ আলোড়ন জাগিয়ে তুলছে, তারপর যেন আর সাড়াশব্দ নেই।

আমায় না আবার ভুল বোঝা হয়। রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের কথা বাদ দিতে হয়, তবে, আরও অনেক আসনই তো খালি হ'য়ে গেল অনেক হওয়ার মুখে। একেবারে শূন্য না হোক, যদি বাংলার আসরের মর্যাদা না থাকে, স্বল্লায়ু, পল্লবগ্রাহীর লীলাস্থল হ'য়ে পড়ে তো, সে দুঃখ কে বুঝবে?

একটা আশঙ্কা। একদিন অত অল্প পরিমাণের ওপর ওরকম বিরাট সৃষ্টি, আজ পরিমাণ এত বিরাট হওয়া সত্ত্বেও এ দৈন্য কেন? স্থায়িত্বের শীলমোহর কই?

কিন্তু আশঙ্কা যে ভিত্তিহীন তাই বা আশা করব না কেন? আমার দূরদৃষ্টি কতটুকুই বা? আজ তো আরও ক্ষীণ। শক্তিও তো আরও দুর্বল। কে আসছে না আসছে, কার পদধ্বনি জাগ্রতই রয়েছে, কি ক'রে পাব টের? সুতরাং আশা হারাবার যদি থাকেই অধিকার তো, ভবিষ্যৎবানী করবার অধিকার কোথায়? ইতিহাসের কথা বলেছি, অপরদিকে—History repeats itself—এ কথাও তো নিকষিত সত্য। সেই কোন্ চর্যাসাহিত্যের যুগ থেকে বাংলা সাহিত্যের ওঠানামা চলেছে। গল্পসাহিত্যের কথা

বললাম, কিন্তু সর্বস্তরেই। প্রতিভার স্পন্দন রয়েছে, শুধু যা অল্পস্থায়ী কালাশ্রিত, তার কালজয়ী হওয়ার প্রশ্ন। সে-আশা এমন কি দুরাশা?

যখন প্রেসের কাজ শুরু করলাম, আনুমানিক ১৯৩৯-৪০ সাল, তখন পর্যন্ত এক এক ক'রে শুরু হ'য়ে আমার গল্পসংখ্যা ত্রিশ-বত্রিশে এসে ঠেকেছে। একেবারে গোড়ার দিকে আমায় ভাবালুতায় পেয়ে বসে। প্রথম 'অবিচার' তো সাধ্যমতো একটা করুণ ট্রাজেডি করবারই চেষ্টা ছিল আমার। তারপর আমি কৌতুকরসের দিকে ধীরে ধীরে চ'লে যাই। যার মধ্যে আমি উইট, হিউমার, স্যাটায়ার, ফান—মৃদু-গুরু সব কিছু ধ'রে নিচ্ছি। এই পরিবর্তনটা যেন আমার অজ্ঞাতসারেই হ'য়ে গেছে। তবে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে আমার সাহিত্যে মানসিক গঠনের দু'টি দিকই গেছে থেকে; মাত্র তিনচার খানি উপন্যাসের আগাগোড়াই একটা কৌতুকরস রেখে যাওয়ার চেষ্টা আছে পরিকল্পনায় এবং গঠনে, বাকি সব উপন্যাসই সিরিয়াস (Serious)। জীবনের সমস্যার নানা দিক নিয়ে; যখন যেটা মনের ওপর চেপে বসে সেই অবস্থার সৃষ্টি করেছে যেটাকে বলা যায় অপ্রকাশের বেদনা, যেটাকে নিজের মনের মতো একটা রূপ না দিলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়না।

এর উল্টো দিকে আঙ্গুলে গোনা যায় এইরকম গোটা কতক করুণ রসের গল্প বাদ দিলে বাকি সবই কৌতুকরসাশ্রিত। এ যেন নিজে হ'তেই হ'য়ে যায়। নিজের সমালোচক হ'য়ে এর হদিশ পাইনি। কোন সমালোচকের কাছে এর রহস্য যদি ধরা পড়ে। আমি গোটা সূত্র ধ'রে এইটুকুই বলতে পারি, নিত্যদিনের জীবনই যখন হাসি-কান্নায়, লঘু-গুরুতে ওতঃপ্রোত, তখন লেখায় তা এসে পড়বে না কেন? কিন্তু এ-সমাধান যেন অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়ছে। বন্ধুবর পরিমল গোস্বামী একবার আমার কোন সিরিয়াস অঙ্গের উপন্যাস প'ড়েই আমায় চিঠি লেখেন—"আপনি স্বধর্ম-ভ্রষ্ট হচ্ছেন" কথাটা আমার মনকে সে-সময় খানিকটা বিচলিত করেছিল—তাহ'লে কোতুকরসই কি ছিল আমাব স্বধর্ম? তাহ'লে গোডার সেই ভাবালুতা ছেডে আমি এদিকে এলামই বা কি ক'রে? সেটাই কি স্বধর্মভ্রষ্ট হওযা নয়?

১৯৩৪-এর ভূমিকম্পের পর রাজে ফিরে আসা থেকে ১৯৩৯-এর কাছাকাছি পর্যন্ত আমি ছয়টা বছরের কিছু বেশি একটানা দ্বারভাঙ্গাতেই থেকে যাই। কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর এটাই আমার অবিচ্ছিন্নভাবে থাকা এক জায়গায়। কিন্তু একসঙ্গে এতখানি হ'লেও এই সময়টায়

নিরবচ্ছিন্নভাবেই। প্রকাশকদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠার পর, সাহিত্যে একটা সার্থকতা এসে প'ড়ে আস্তে আস্তে দানা বাঁধছে আমার সাহিত্যে। একটা যেন মিশন খুঁজে পাচ্ছি আমার জীবনে আত্মপ্রকাশের এই মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে।

জীবন আর একটা দিকে সার্থকতা খুঁজছে। দেশের বেদনায় বেদনা অনুভব করেছি, কিন্তু কিছু করা তো হোল না। অথচ যে-ধরণের জীবন বেছে নিলাম তাতে কিছু করা তো উচিত ছিল। বড় কিছু না হোক, যে অবসরটা রয়েছে ছোট পরিসরের মধ্যেই সেটা কাজে খাটাবার চেষ্টায় লেগে গেলাম, দ্বারভাঙ্গার বাঙ্গালী সমাজের স্বার্থে। দাদা এই সব কাজে ছিলেন অগ্রণী তাঁর নিজের বন্ধুবান্ধব নিয়ে—ক্লাব, ইস্কুল, কোথাও বিপদ হ'লে গিয়ে বুক দিয়ে দাঁড়ানো ; আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। ভূমিকম্পের জন্য কাজ কিছু বেড়েই গিয়েছিল, আমাদের তৎপরতাটুকুও বেড়ে গেল। এসব গলা উঁচু ক'রে বলবার মতো কিছু নয়, তবে, আমার সে-সময়ের নিস্তরঙ্গ জীবনটাকে একটা পূর্ণতা দিয়েছিল ব'লেই উল্লেখ করলাম।

তারপর একদিন হঠাৎ সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত মহলে একটা ঝড় উঠে তার একটা ঝাপটা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই আমার ওপর এসে প'ড়ে সব খানিকটা ওলট-পালট ক'রে দিল।

রাজস্কুলে কয়েকবছর থেকে একজন বাঙ্গালী হেডমাষ্টার ছিলেন। ঝরিয়া রাজস্কুল থেকে এখানে আসেন। এম.এ. ভালো শিক্ষক, উন্নতি ক'রে দেন দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুলের। যদিও বলতে গেলে, শুধু সংখ্যার দিক দিয়েই। নূতন হাওয়ায় ছাত্রদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য এসে গেছে, সংখ্যার দিক দেখতে গিয়ে ডিসিপ্লিন খানিকটা ক্ষুন্নই হ'য়ে যায়, যেমন মুখার্জী সেমিনারীতে এক সময় দেখেছিলাম। এই সময় হেডমাষ্টার (নামটা ঠিক মনে পড়ছেনা) ঝরিয়া রাজের ডাকে এখানে ইস্তফা দিয়ে চ'লে গেলেন।

কমিটিতে বাঙ্গালী পছন্দ না করবারও লোক ছিল, বিজ্ঞাপনে ভালো বিহারী প্রার্থী পাওয়া গেলনা। এদিক ছেড়ে দিয়ে কমিটি একেবারে

উত্তর প্রদেশের দিকে নজর ফেরালেন। পাওয়াও গেল বেশ একজন ভালো প্রার্থী। ট্রিপ্‌ল অর্থাৎ তিনটি বিষয়ে এম্.এ., এলাহাবাদের একটা সেকেণ্ড গ্রেড্ কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল। ডেকে নেওয়া হোল।

দেখা গেল, বেশ ভালো শিক্ষকও। যাঁরা নির্বাচিত করেছিলেন, নিজেদের সফলতায় উৎফুল্লই হ'য়ে উঠলেন। মাস কয়েক কাটল। তারপর একদিন দেখা গেল ভদ্রলোক বদ্ধ পাগল। রোগটা একটানা নয় ব'লে আগে বোঝা যায়নি, তারপর হঠাৎ একদিন প্রকাশ হ'য়ে পড়ল। বোধহয় পড়াতেন কলেজের ভঙ্গিতে, লেকচারের মতো ক'রে। পাণ্ডিত্য ছিল, উচ্ছ্বাসের মুখে পাঠ্যবিষয় ছেড়ে বাইরেও চ'লে যেতেন। ভালোই লাগত, অন্তত ভালো ছাত্রদের। একদিন ঘোষণা ক'রে বসলেন—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। অনেকদিনের রুদ্ধ বেগ, বাঁধ একবার ভাঙ্গতে হু-হু ক'রে স্রোত নামল। পরদিন সকালে ছেলেদের হোষ্টেলে হঠাৎ উপস্থিত হ'য়ে নাটকীয় ভঙ্গিতেই একটি ছেলেকে রাধা ব'লে বেছে নিয়ে বাকি সবাইকে তার সহচরী হ'য়ে জলকেলির জন্য আহ্বান করলেন। স্কুলের সামনেই 'মাখনাহি' ব'লে একটা পুকুর, সেটা যমুনা ব'লে ধ'রে নিতে অসুবিধা হোলনা।

সহরে হৈ হৈ পড়ে গেল। ভদ্রলোক একাই রাজের গেষ্টহাউসে একটা ঘর নিয়ে থাকতেন। ছেলেরা হামলা করল। ওঁর ঘরের শার্সি জানালা ভেঙ্গে দিয়ে, দৈহিক নির্যাতনেরও কাছাকাছি পৌঁছে যায়। গেষ্টহাউসের লোকেরা কোনওরকমে সামলে নেয়।

সহরে মহারাজা আর চীফ ম্যানেজার ড্যান্‌বী সাহেব নেই, বাকি সবাই একরকম হতভম্ব। দিন তিনেক বোধহয় ছিল ব্যাপারটা। দুষ্টু ছেলেরা জাগিয়েই রাখবার চেষ্টা করছে হুজুগটা। হেডমাষ্টারকে ঘরের মধ্যে কড়া পাহারায় রেখে কোনওরকমে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে এসে পৌঁছালেন ড্যান্‌বী সাহেব।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা ক'রে পুলিস পাহারায় ভদ্রলোককে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করালেন।

এখানে একটু পাদটীকা দিয়ে রাখলে ব্যাপারটা বোধহয় আর একটু পরিষ্কার হয়। ড্যান্‌বী সাহেব এসে যে ব্যবস্থা করলেন, একটা পাগল মানুষের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে না নিয়ে, সেইটেই নিশ্চয় সমীচীন ছিল। এটা বোঝবার মত অফিসারও ছিলেন, ড্যান্‌বী বাইরে গেলে যাঁকে চার্জ দিয়ে যেতেন, তাঁর নিকটতম সহকারী। কিন্তু তিনি এরকম একটি মৌলিক সমস্যার দায়িত্ব নিতে

চাইলেন না, এতো দৈনন্দিন কাগজপত্রের ওপর চীফ ম্যানেজারের প্রতিভূ হ'য়ে শুধু দস্তখৎ মারা নয়।

তাহ'লে আরও একটু টীকা দিতে হয়—

তখনও "লাল মুখের" দাপট চলছেই। ড্যান্‌বী আবার এক সময় ছিলেন নীলকর, নিজের দাপট কি ক'রে বজায় রাখতে হয় ভালো রকমই জানতেন। সহকারী, কোনও মৌলিক বিষয়ের ওপর অর্ডার দিলে উনি ফিরে এসে, কোনও একটা ছুতা ক'রে নাকচ ক'রে দিতেন। সহকারী একজন এম·এ., বি.এল., প্র্যাকটিশে নামও হচ্ছিল, মহারাজা স্টেটে ডেকে নেন। কিন্তু তিনিও এ-সব বিষয়ে "মাঝের পথ" ধ'রে থাকাই পছন্দ করতেন। চোখ বুজেই থাকতেন। দু'তিনটে এরকম ব্যাপার হ'য়ে যাওয়ার পর সহকারীও নিজের মান বাঁচিয়ে রাখাই নিরাপদ মনে করতেন।

নিজের দাপট অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহেবদের স্পর্ধা যে কতদূর এগিয়ে যেত তার আরও দৃষ্টান্ত আছে, এবং তার মধ্যে একটি চমৎকার কৌতুক-কাহিনীরূপেই সে-সময় প্রচলিত ছিল—

মিষ্টার কিং নামে একজন সাহেব রাজের সার্কেল অফিসার ছিলেন। খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি ; ড্যানবীর মতো নীলকুঠিয়াল নন। জেলা সহরের সিভিলিয়ানদের মধ্যেও তাঁর খাতির ছিল। শেষ মহারাজা কামেশ্বর সিঙের পিতা রামেশ্বর সিঙের আমলের লোক। জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মীশ্বর সিঙের সময় থেকেই তাঁর চাকরি। রামেশ্বর সিং রাজগদিতে বসবার আগে ছিলেন একজন স্ট্যাটুটারি ম্যাজিস্ট্রেট (Statutary magistrate)। কর্মচারী দেশিই হোন বা বিদেশিই হোন, স্টেটের সার্বভৌম কর্তা যে তিনিই একথা যেন কেউ না ভোলে এই রকম একটা সবল মনোভাব নিয়ে শাসনের বল্গা হাতে নেন।

কিছুদিন যাওয়ার পর জমিদারি-পরিচালনা সম্পর্কিত কিং সাহেবের বড় একটা সিদ্ধান্ত নামঞ্জুর ক'রে সব ম্যানেজারদের পরিচালনার অবগতির জন্য একটা "আম্ ফতোয়া" জারি করলেন—বিষয় যতই জরুরী হোক, বা, গুরুতর হোক, পূর্বে মহারাজার অনুমতি না নিয়ে কেউ কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না।

এর কিছুদিন পরে কিং সাহেবের সার্কেলে রাজের একটা গুদামে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড! খবর পেয়ে সাহেব ঘোড়ায় ক'রে ছুটে এসে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম জারি করলেন, সদর থেকে মহারাজের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যে আগুন নেভাতে যাবে সে তাঁর গুলির ঘায়ে মরবে।

ঘোড়সওয়ার ছুটিয়ে দিয়ে বন্দুক হাতেই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণত্বের দাবি নিয়ে হেডমাষ্টার চ'লে যাওয়ার কয়েকদিন পরে মহারাজও এসে উপস্থিত হলেন। তার দু'দিন পরেই অফিসে ব'সে কাজ করছি, হেড অফিসের এক পিয়ন এসে সেলাম ক'রে পিয়ন-বুকটা সামনে মেলে ধরল। দস্তখৎ দিয়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে প'ড়ে দেখে একটু স্থিরভাবে কিছুক্ষণ চেয়েই থাকতে হোল সেটার দিকে। মহারাজের নির্দেশে চীফ ম্যানেজার জানাচ্ছেন, আমায় প্রেসের চার্জ সহকারীকে দিয়ে সদ্য সদ্য স্কুলে হেডমাষ্টারির চার্জ নিতে হবে।

আমার বৈচিত্র্যময় চাকরি জীবনে নানা ধরণের দুঃখ-বেদনা পেয়েছি, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান থেকে অন্যায় অবিচার, নিজের হঠকারিতায় বিদেশ ভুঁইয়ে একটা ভালো কাজ ছেড়ে দেওয়া!—নানা রকমই সইতে হয়েছে, কিন্তু সে দিনের মতো আঘাতটা আর কিছুতেই দিতে পারেনি। তার কারণ, সব দিক দিয়ে এতগুলির মধ্যে, প্রেসের কাজটাই যেন সব চেয়ে মনে ধরেছিল। এর সুনিয়ন্ত্রিত অবসরবহুল দিনগুলি, এর শান্তি, এর সাফল্য। বছর দু'য়েকের অল্পদিনই বেশি ছিলাম, কিন্তু এর মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে অনেক কিছু করেওছিলাম যাতে রুটিনবাঁধা কাজ সেরে রাজের কিছু আমদানিও হয়। সর্বোপরি, এই অভঙ্গ শান্তির মধ্যে আমার লেখার কাজটা বেশ মসৃনগতিতে চলছিল। নীচের বিরাট হলে প্রেস, ওপরে আমার অফিস, নিরিবিলিও একরকম। মাঝে মাঝে নীচে একটা রোঁদ দিয়ে এসে বসা। সামনে উন্মুক্ত হরিৎ প্রাঙ্গণ। কাজ না থাকলে নিজের চিন্তাকে মুক্তি দিয়ে সামনে চেয়ে থাকা। মাঝখানে একটা সরু করিডোর, তার ওদিকে "মিথিলা-মিহিরে"র সম্পাদক সুরেন্দ্র ঝা-র ঘর। পণ্ডিত, সাহিত্যরসিক মানুষ,.তাঁর অবসর থাকলে ডেকে নিয়ে সাহিত্য-আলোচনা করা,—সংস্কৃত, মৈথিলী, কালিদাস, বিদ্যাপতি...

সামনের পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমার লেখার খোরাকও সঞ্চয় করেছি। একদিন নীচের ঘনসবুজ পরিবেশের মধ্যে একটি রেশমী-শাড়ি-পরা ছোট মেয়েকে বোধহয় তার মায়ের সঙ্গে চ'লে যেতে দেখে, আমি আমার 'গোলাপী রেশম' গল্পের প্লটটি সদ্যসদ্যই এঁকে নিলাম। এইভাবে পরিবেশ আর নিশ্চিন্ত অবসর আরও লেখা হাতে তুলে দিয়ে থাক্‌বে।

সব মিলিয়ে প্রেসটা কি ক'রে আমার মনের সঙ্গে যেন খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল। সবটা এক মুহূর্তেই মনে প'ড়ে আমার অস্তিত্বটাকে যেন শূন্য ক'রে দিল।

জরুরি অর্ডার, আমি পরদিনই চার্জ দিয়ে, তার পরের দিনই গিয়ে রাজস্কুলের চার্জ নিলাম।

মন বসাতে পারছিনা কাজে কিছুতেই। নৌকা নয়, বিপুলকায় শিথিলগ্রন্থি একটা ভাউলে, স্রোতের বিরুদ্ধে গুণ টেনে নিয়ে যাওয়া। অথচ নিজের এতটুকু শিথিলতার উপায় নেই। জরুরি অর্ডার। মহারাজের একেবারে দৃষ্টির নীচে কাজ ক'রে যাওয়া।

স্কুলটা আসলে বিগড়েছিল অনেক পূর্বেই। সংখ্যাস্ফীতির একটা বাহ্যিক চাকচিক্যের নীচে অনেকগুলি দোষই চাপা ছিল। অনেক বাজে ছেলে ঢুকে প'ড়ে ডিসিপ্লিনের কাঠামোটা আলগা হ'য়ে তো গিয়েছিলই, তার সঙ্গে শিক্ষকদের মধ্যেও পলিটিক্স, অনেক সময় ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে। ছুটি নেওয়াটা খুব বেড়ে গিয়েছিল, অনেক সময় দরখাস্ত না দিয়েই, এক একদিন খালি ক্লাসে শিক্ষক যোগানো সমস্যাই হয়ে উঠত, নিতান্ত হট্টগোলের ভয়ে দু'টো ক্লাস এক ক'রে নিয়ে চালাতে হোত।

মাস তিন-চার লাগল এসব খানিকটা শুধ্‌রে নিয়ে কাঠামোটা কিছু ঠিক ক'রে নিতে। কিন্তু দেহমন কোনটাই যেন সায় দিলেনা। আরামভোগী শিক্ষকদের আয়ত্তে আন্‌তে কয়েকজন কুটিল প্রবৃত্তির শিক্ষক তলে তলে আমার চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে আমায় অপদস্থ করবার চেষ্টা করতে লাগল। একটা বিদ্যালয়ের এরকম অবস্থা দেখে একটা অনীহা জমা হ'য়ে উঠতে লাগল।...কাজে তাহ'লে ইস্তফাই দিয়ে দিই?

সেটা আর চলেনা। তারপর একদিন একটা উপায় ঠাওরালাম—মহারাজেরই দ্বারস্থ হই।

একটা সাক্ষাৎকারের অনুমতি চেয়ে নিয়ে দেখা করলাম। বললাম, আর কিছু নয়, যে আবহাওয়ার মধ্যে একদিন তাঁর স্কুলেই কাজ করেছি, সেটা একেবারে বদলে গেছে...খাপ খাওয়ানো বেশ শক্ত হ'য়ে পড়েছে···ইত্যাদি। বেশ বুঝলাম, ঠিক ক'রে বলা হোলনা। আসল যা কথা, ক্লান্তি, তজ্জনিত অনীহা—এ সব কথা তো বলাও যায় না। মহারাজ বললেন—"আপনি শুধ্‌রে আনবার জন্যে যা দরকার মনে করেন, যতই কড়া হোন, তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।...আমি খবর পেয়েও যাচ্ছি।"

এর ওপর আর কিছু আপত্তি চলেনা। "আমার যথাসাধ্য চেষ্টা থাকবেই হুজুর"—ব'লে নমস্কার ক'রে চ'লে এলাম।

একেবারে নিরুপায় হ'য়ে পড়াও শক্তির একটা বড় উৎস। মহারাজের

প্রতিশ্রুতি নয়, সেটা কাজে লাগানও চলেনা, নিজের মনটাকেই ভালো ক'রে গুছিয়ে নিয়ে নূতন উদ্যমে আবার কাজে লেগে গেলাম। আস্তে আস্তে খোঁচ-খাঁচ যা ছিল, মিলিয়ে আসতে লাগল। পরের বৎসরে নূতন বাইরের ছেলে ভর্তি করায় খুব কড়াকড়ি করলাম। পরীক্ষা শক্ত ক'রে প্রমোশন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কিছু ছেলে আপনিই বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় বৎসরের পর স্কুলটা অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

সবই হোল, কিন্তু কি একটা হ'য়ে গেছে মাঝখানে, শিক্ষকতায় সে শান্তি, সে আনন্দ আর যেন ফিরে পেলাম না। সাধারণভাবে শিক্ষার সে আবহাওয়াটাই গেছে পালটে। শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে পূর্বের সে সম্বন্ধটা হ'য়ে এসেছে ঢিলা, দেওয়া-নেওয়ার স্থূল সম্পর্ক; তাছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে রীতি-পদ্ধতি, যেটাকে রেড্‌টেপিজম্ (Redtapism) বলা যায়, এত জটিল হ'য়ে গেছে যে, একজন হেডমাষ্টার, অফিসের একজন হেডক্লার্কের চেয়ে আর বেশি কিছু নয়।

ফলে, যতই দিন যাচ্ছে, যতই আর সবদিক দিয়ে কেতা-দুরস্ত হ'য়ে আসছে, ততই আমার মনটা আসছে তা থেকে স'রে।

এ-ও ঐ আড়াই-তিন বৎসরের মাঝামাঝি একটা দিনের কথা। উপলক্ষটা ঠিক মনে পড়ছেনা। কিসের একটা মিটিং ছিল, শেষ হ'লে সাহেবকে তাঁর মোটরে তুলে দিতে যাচ্ছি, একাই। ঘাসে ঢাকা বেশ খানিকটা পথ, কথাটা বললাম ওঁকে—"Sir, I suppose, it is now time to take me off from the school. (মনে হয় এবার আমায় স্কুল থেকে সরিয়ে নেবার সময় হয়েছে।)

একটু বিস্মিত হ'য়েই ঘুরে চাইলেন। প্রশ্ন করলেন—"Why ? don't you like the job ?" (কেন কাজটা তোমার পছন্দ নয় ?)

সতর্কভাবে এগুতে হচ্ছে। বললাম—"Not exactly that. It is in my line and it is a trust that His Highness has reposed on me. But things have changed so much since I last left—the school-atmosphere and everything else too. All the same I have tried and I think I have put the school on the right track...For myself, I do feel I am a misfit under the changed conditions."

(ঠিক সেকথা নয়, কাজটা আমার বৃত্তিসম্মতই আর বিশ্বাস ক'রেই আমায় দিয়েছেন মহারাজা। কিন্তু আমি গতবার স্কুলের পরিমণ্ডল ছাড়ার পর সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তবু আমি চেষ্টা

করেছি আর মনে হয় স্কুলটা ঠিক পথে তুলে দিতে পেরেছি।...নিজের দিক দিয়ে ভাবতে গেলে কিন্তু আমার মনে হয়, আমি এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে বেশ খাপ খাওয়াতে পারছিনা নিজেকে।)

সতর্কভাবে, আর কোন প্রশ্ন করবার সময় না দেওয়ার জন্যে এক নিঃশ্বাসে সমস্তটা ব'লে গেলাম মোটরের কাছে না আসা পর্যন্ত। লম্বা মানুষ, ঘাড়টা একদিকে একটু ঝুঁকিয়ে শুনছিলেন। উঠেপ'ড়ে বারদুই ওয়েল, ওয়েল (Well, well) ক'রে বললেন—"I will remember it, Babu." (কথাটা মনে রাখব, বাবু।)

নিজেই ড্রাইভ করতেন, বেরিয়ে গেলেন।

বিপুল দ্বারভাঙ্গারাজ, নিয়তই রদবদল আর নূতন নিয়োগের অর্ডার বেরুচ্ছে, প্রতীক্ষায়-প্রতীক্ষায় মন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে, তাগাদাও দেওয়া যায়না। মাস দুই তিন বেরিয়ে গেল, তারপর একদিন এসে গেল চিঠিটা—আমায় পাটনায় মহারাজার ইংরাজি দৈনিক কাগজ "ইণ্ডিয়ান নেশন"-এর ম্যানেজারির কাজ দেওয়া হচ্ছে, যথাসম্ভব শীঘ্র গিয়ে যেন চার্জ নিই।

কি জানি, কেমন ক'রে মনটা স্কুল থেকে উঠে গিয়েছিল, নৈলে রাজস্কুলের এই দ্বিতীয় পর্বটা আমার সাহিত্য জীবনের পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল। তার প্রধান কারণ, স্কুল জীবনের ঢালা অবসর। নিত্য ছুটি, তার মধ্যে বড় বড় ক'টা—গ্রীষ্মাবকাশ, পূজার ছুটি, বড়দিন। কানাইয়াজীর সঙ্গে থাকতে, এবং প্রেসে থাকার সময়ও কিছু কলকাতার সঙ্গে যে যোগাযোগটা ঘটে, স্কুল পর্বে সেটা আরও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে, বিস্তারলাভও করে। পত্রিকা আর প্রকাশকদের অফিসে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর একটা জিনিসের প্রচুর সুযোগ পাই এই সময়টায়। প্রথম কৈশোরের চাতরায় সেই অবাধ, যথেচ্ছা পর্যটনবৃত্তিটা থেকেই গিয়েছিল, মাঝে মাঝে কলকাতা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম। ট্রেনে ক'রে একটা স্টেশন লক্ষ্য ক'রে বেরিয়ে পড়া, নেমে খানিকটা দূর অনির্দ্দিষ্টভাবে দেখেশুনে ফিরে এসে, আবার একটা গাড়ি ধ'রে বাড়ি। একদিনের বিহার ব'লে, আহারের পর বিশ্রাম না নিয়েই। পড়তামই বেরিয়ে, শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, সে গ্রীষ্ম যতই প্রখর হোক। শিবপুর থেকে হ'লে হাওড়া, মার্টিনের তখনকার স্টেশন 'হাওড়া ময়দান'। শিয়ালদহ হ'লে কালীঘাট-ফলতা, লাইনের 'মাঝের-হাট' স্টেশন। শিবপুরের বাড়ি থেকে দশ-বারো মাইল দূর ; কিন্তু কি যে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ, কি যে একটা নিজের থেকে নিজের মুক্তির আনন্দ, মাত্র নিজেকেই সঙ্গী ক'রে নিয়ে, পথের ক্লান্তি গায়েই লাগত

না। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বেরুনো নয়, তবু এই প্রবৃত্তি একরকম অজ্ঞাতসারে আমার সাহিত্যে একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছে আমার 'রম্য রচনা' গুলির। একবার ছোট লাইন ফলতা-কালিঘাট স্টেশনের উত্তপ্ত টিনের ছাতের নীচে ব'সে মনে হোল—যত অকিঞ্চিৎকরই হোক, এগুলোও সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাবেনা কেন? বার কয়েক যাওয়া-আসা ক'রে মনে হোল যেন একটা ছাপ পড়েছে। আরও কয়েকবার গিয়ে-এসে সেটাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার "দুয়ার হতে অদূরে" বইখানা বেরুল। বাসও চালু হয়েছে। যদি শিয়ালদহ থেকে ট্রেণে না গেলাম তো বাসেই সোজা ডায়মণ্ডহারবার রোড ধ'রে ডায়মণ্ড-হারবার ঘুরে ফিরে চ'লে এলাম। আর, দক্ষিণের দিকে অপর একটা আনন্দ ছিল ক্যানিং। এদিকে ডায়মণ্ডহারবারের দু'কূলব্যাপী গঙ্গা, ওদিকে মাতলা। ঘুরে ফিরে তীরে থাকতাম ব'সে। শিবপুরের বাড়ি ৩০।৪০ মাইল দূরে প'ড়ে। ফিরতে হবে। শেষ ট্রেণ বা বাসের মধ্যে যতটুকু সময় পাওয়া যায়। বাড়ি ফিরতে ন'টা, কোনও কোনও দিন তার বেশিও হ'য়ে যেত। সাহিত্য যদি নিজের মনের অহেতুক আনন্দ আর পাঁচজনের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়া হয় তো কতটুকুই পেরেছি দিতে তার?

উত্তর-পূর্ব-পশ্চিমেও এইরকম কতকটা সীমা বাঁধা ছিল। প্রায় একটা নদীই। পূর্বে রাণাঘাট-চূর্ণী পর্যন্ত গেছি, পশ্চিমে রূপনারায়ণ। একদিন রূপনারায়ণের ধারে ধারে বহুদূর পর্যন্ত চ'লে গেলাম বাঁধের ওপর দিয়ে। বাঁধের নীচেই নদীর দিকে বিস্তীর্ণ একটা চড়া, কি একটা কচি ফসলে সবুজ হ'য়ে আছে, তার পরেই দিগন্ত-বিস্তৃত রূপনারায়ণ।

বাঁধের ভেতরের দিকে একটা ভালো খাবারের দোকান। জলযোগ ক'রে স্টেশনে ফিরে এলাম।

এই সময় কলকাতায় এলে আমার থাকবার জায়গা ছিল তিনটি। মামার বাড়ি, ওঁরা আমার 'আই.এ.' পড়বার সময়কার হেম ব্যানার্জি লেনের ৭নং সেই ছোট বাড়িটা অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়ে নিজেদের বাড়ি কিনেছেন কাছাকাছি দে-পাড়া লেনে। এখানে এসে কখনও কখনও থাকতাম, কখনও আমার ভগ্নীর বাড়িতে, যেখানে আজকাল বেশি থাকি; তবে বেশির ভাগ থাকতে আরম্ভ করেছিলাম বুদ্ধদেববাবুর বাড়িতে। এই সময়েরই কিছু এদিক-ওদিক কলকাতায় আমার থাকবার আর একটি জায়গা হ'য়ে গেল এবং কলকাতার একটি বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গে হঠাৎই পরিচয় হ'য়ে অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে উপস্থিত আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছে।

এটি আমার জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা।

একদিন বুদ্ধদেববাবুর উপর তলায় কয়েকজন ব'সে আছি, নীচের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হোল। আমিই নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে দেখি একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক আর সতেরো-আঠারো বছরের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কি দরকার জানতে চাইলে ছেলেটিই প্রশ্ন করল—"এখানে বিভূতিবাবু থাকেন?—বিভূতি মুখোপাধ্যায়?"

বললাম—"আমিই বিভূতি মুখোপাধ্যায়। কি দরকার?" ছেলেটি সঙ্গীর দিকে চাইল। তিনি বললেন—"এমন বিশেষ কিছু দরকার নেই। আপনার বই পড়েছে, পরিচয় করতে চায়।"

বললাম—"আসুন।" ছেলেটির দিকে চেয়ে বললাম—"এসো।" ওপরে নিয়ে এলাম।

ছেলেটি শ্যামবর্ণ, একহারা গড়ন, চোখে মুখে বুদ্ধির বেশ একটি দীপ্তি আছে, চৌকির ওপর চুপ ক'রে ব'সেই রইল, দৃষ্টিতে একটি শান্ত কৌতূহল নিয়ে। সঙ্গের ভদ্রলোক তার গৃহশিক্ষক ব'লে নিজের পরিচয় দিয়ে ওরও পরিচয় দিলেন। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের স্বত্বাধিকারী গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তীর ছেলে। তাঁরই চার্জ—নাম দুর্গা প্রসাদ। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি·এসসি·র ছাত্র। পাঠ্য বইয়ের অতিরিক্ত বইয়ের দিকেও আগ্রহ আছে, জানবার দিকে, পরিচয় করবার দিকে; উনিও সেটাকে পুষ্ট করতে চান। একদিন আমার কথা বলতে উনি বললেন—একদিন নিয়ে আসবেন আমার কাছে। সন্ধান নিতে গিয়ে জানতে পারলেন আমি এখানে থাকিনা। স্কুলেরই শিক্ষক, ছুটি ছাটায় যখন আসি, এখানেই উঠি। নিয়ে এসেছেন। ছেলেটি একটু অপ্রতিভ হ'য়েই হয়েই শুনছিল, বোধহয় বুদ্ধদেববাবুই আমার কি কি বই পড়েছে প্রশ্ন করতে দু'একখানার নাম করল।

"কেমন লাগে"—প্রশ্ন করলেন উনি।

"ভালোই।"—সলজ্জ সংক্ষিপ্ত উত্তরটা দিয়ে চকিতে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে নিল, যেন লেখকের সঙ্গে তার লেখার মিল বা গরমিলটা আবিষ্কার করবার জন্যেই।

আরও কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক আলাপের পর ভদ্রলোক ওকে নিয়ে উঠে পড়লেন, নীচে পর্যন্ত গিয়ে বিদায় দিয়ে এলাম।

এই ক্ষীণ সূত্রপাত, এরকম কত হয়েছে জীবনে, মিলিয়েও গেছে, কিন্তু দুর্গার মধ্যে কি একটা ছিল, এই ক্ষীণ সূত্র ধ'রে আমরা ক্রমেই কাছে, আরও কাছে এসে পড়েছি, অনাত্মীয়তার ব্যবধান কবে, কি ক'রে মিটে গেছে, বুঝতেই পারিনি।

দুর্গার ক্ষেত্রে অবশ্য আর একটা বড় কারণ ছিল। ওদের একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার পাঁচ ভাই; বোন। গিরিজাবাবু, দুর্গার মা তখনও বেঁচে, কি ভাবে কবে থেকে শুরু হোল ঠিক মনে পড়ছেনা, ওদের বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা শুরু হ'য়ে গেছে। ওর বাবা, মা উভয়ে বড় উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ওঁরা যে অত বড় সেটা ওঁদের চেহারাতেই ছিল লেখা, মনের কোথাও একেবারে যেন তার কোন ইঙ্গিতও ছিল না। গিরিজাবাবু ছিলেন দীর্ঘচ্ছন্দ, গৌরকান্তি সুপুরুষ মানুষ, দুর্গার মারও ছিল এই সুবৃহৎ, সমৃদ্ধ পরিবারের অধিশ্বরীর উপযোগী মহিমময়ী মূর্তিখানি। বাঙ্গালী মহিলা হিসাবে দীর্ঘচ্ছন্দই, গৌরকান্তি, একটু স্থূল। গিরিজাবাবুর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাতের সুযোগ কমই হোত, তবে গেলেই যে দুর্গার মাকে পাইনি, এমন দিন তো মনে পড়েনা। কলকাতায় গেলে অবস্থান হিসাবে অন্ততঃ বার দুই তিন যেতে হোতই, না পারলে সেটা অনুযোগের কারণ হ'য়ে উঠত। প্রথম দু-একবার খবর পেয়ে দুর্গা নিয়ে গেছে, তারপর থেকেই আপনা হ'তেই গেছি। ওঁরা তখন বৌবাজার স্ট্রীটের ১৬০ নম্বর দোতলা বাড়িটাতে বাসা ক'রে রয়েছেন। আগেকার আমলের বাড়ি, একটা লম্বা প্রশস্ত হলঘরের দু'দিকে অনেকগুলি ঘর। ওপরে ওঠার সিঁড়িটা কাঠের, বেশ চওড়া, পাশাপাশি ৩।৪ জন লোক ওঠা-নামা করতে পারে। নীচেও অনেকগুলি ঘর, কোনটা গুদাম, কোনটায় কর্মচারী থাকে। শিয়ালদার দিক থেকে এসে ডানদিকে একটা গলি, তাইতে ঢুকে কয়েক পা গেলে ১৬০ নং বাড়ির বড় গেট। ভেতর দিকে অনেকখানি খালি জায়গা, কয়েকটা ভালো ভালো গরু বাঁধা। বাড়িতে দু'খানা মোটর; কোন একটা থাকতই গ্যারেজে।

আমি গেলে বাড়িতে যাঁরা থাকতেন, অবসর মতো হলঘরের টেবিলটার চারদিকে পাতা চেয়ার সোফায় এসে বসতেন। ওর মা প্রায় থাকতেনই। তা ছাড়া ভাই, ভ্রাতৃবধূ, তাদের ছেলেমেয়েরা। দুর্গাপ্রসাদ ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। বড়দের যাঁরা কলকাতায় থাকতেন বা কর্মব্যপদেশে আসতেন, বাড়িতে থাকলে ব'সে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে যেতেন। ওঁদের কুষ্টিয়ার মিল তখন চালুই, তবে মনে হয় বেলেঘাটার মিলটার তোড়জোড় হচ্ছে। দু'টো জায়গাতেই ওঁদের যাওয়া-আসা, কর্মব্যস্ততা চলছে। গিরিজাবাবুকে কয়েকবার দেখেছি—ব্যস্তই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে বেরিয়ে গেছেন বা বাইরে থেকে এসে ঘরে চ'লে গেছেন—এই রকমই মনে পড়ে। সহজ সৌজন্যপূর্ণ আলাপ। সমস্ত পরিবারটির সম্বন্ধে ঐ একটি মন্তব্যই খাটে—ওঁরা যে

অত বড় সেটা ওঁদের চেহারাতেই ছিল লেখা, আচরণে তার কোন ইঙ্গিতই ছিলনা। ছোটর দিকে চেহারা-সাজগোজেও নয়। দুর্গাকে বাড়ির বাইরে কোন বড় ঘরের ছেলে ব'লে চেনবার উপায় ছিলনা।

নিতান্ত সহজ গতিবিধির মধ্যে দিয়ে আমি যেন এক হ'য়ে যাচ্ছি পরিবারের সঙ্গে। দুর্গাই বন্ধন-সূত্র। একদিকে স্নেহ-প্রীতি, অন্যদিকে শ্রদ্ধা-ভালবাসা। বয়সের অন্যূন ত্রিশটা বৎসরের ব্যবধান মিটিয়ে যেন একটা নূতন ধরণের সখ্য গ'ড়ে উঠছে। সখ্যই বলতে হয়, কেননা উত্তরজীবনে আমি তার অভিজ্ঞতা আর মার্জিত বুদ্ধির যা পরিচয় পেয়েছি, উপকৃত হয়েছি যে ভাবে, তাতে মনে হ'তেই হয়, একজন সমবয়সী বন্ধুই এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে।

ছাড়া ছাড়া এইধরণের মেলামেশার দীর্ঘকালের স্মৃতির পরে যে চিত্র বেশি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, সেটা এই যে—আমি গিয়ে ওদের বাড়িতে রয়েছি, বাড়ির একজনের মতো হ'য়ে।

দুর্গা মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি গিয়ে থাকতে বলত। সেটা নানা কারণেই হ'য়ে উঠতনা। শেষে একবার গিয়ে উঠলাম। এটা ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বেশ কয়েকবছর পরের কথা। কেননা চিত্রটিকে যা পূর্ণ ক'রে তুলছে তা পরিচয়ের অল্পদিন পরে ঘটার কথা নয়। আমি থেকে থাকব মাত্র চার-পাঁচ দিন ক'রে। তাতে দেখছি, আমার জলযোগের আয়োজনটা একটি মেয়ের হাতে গিয়ে পড়েছে। দুর্গার নববিবাহিতা স্ত্রী মণিকার। দোতলায় মূল বাড়ি থেকে বাঁদিকে একটা অপ্রশস্ত অংশ খানিকটা এগিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বাহুর মতো। খান দুই ছোট ছোট ঘর ; সামনে লোহার শিকের রেলিং দেওয়া একফালি বারান্দা। সকালে আমি প্রস্তুত হ'লে মণিকা হাতে রেকাবি-গেলাস নিয়ে এসে আমাকে ব'সে খাইয়ে যেত। দুর্গা বাড়িতে থাকলে সেও এসে বসত। তার অবর্তমানে মণিকা গোড়ায় গোড়ায় বাড়ির কোন ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসত ; পরে একলাও এসে বসেছে। ভাবটা এই যে, দুর্গার অতিথি, সুতরাং তারই স্ত্রীকে এসে দেখাশুনা করতে হবে। অতবড় বাড়ির এই ডিসিপ্লিনের মধ্যে যে কি একটা মাধুর্য ছিল, ব'লে শেষ করা যায়না। আমার এখনও পর্যন্ত খুবই আশ্চর্য লাগে।

দুর্গার বিবাহটা আমি দ্বারভাঙ্গায় থাকতেই নিশ্চয় হ'য়ে যায় কোনও সময়। চিঠি নিশ্চয় পেয়ে থাকব, কুষ্টিয়াতেই হয়, কিন্তু গিয়ে পড়তে পারিনি।

তবে, এর পরে একবার গেছি কুষ্টিয়ায় এবং সেবারে ওদের অর্থ-

সম্পদের যে পরিচয় পেয়েছি তাতে ওদের প্রতিদিনের অনাড়ম্বর জীবন আরও মহিমময় ব'লে প্রতিভাত হয়েছে আমার কাছে।

উপলক্ষটা ছিল দুর্গার প্রথম সন্তান প্রবীরের অন্নপ্রাশন। সাল ১৯৪৪। খুবই যে একটা বড় উপলক্ষ এমন নয়। কিন্তু তাইতেই যে উৎসবটা হোল, সেটা সাধারণ বড়লোকের বাড়িতে একটা বিবাহেও সব সময় হ'তে দেখা যায়না।

আমায় বাড়ির সংলগ্ন, অথচ বাইরের দিকে নিরিবিলি একটা আলাদা জায়গাই দেওয়া হয়েছিল। দিন দু'য়েক ছিলাম। প্রথম দিনই বিকালে মণিকা তার শিশুটি কোলে নিয়ে বাড়ির একজন সমবয়সী আত্মীয়াকে সঙ্গে নিয়ে আশীর্বাদ নিতে এল।

দ্বিতীয় দিন একটা মোটরে ক'রে ওদের কাপড়ের কল আর কুষ্টিয়া সহরটা দেখে এলাম। কিছুদিন পরে দ্বারভাঙ্গায় থাকতে দুর্গার কাছ থেকে একটা পার্শেল পেলাম। খুলে দেখি আমার সম্পূর্ণ নামের কালো পাড়-বসানো একজোড়া ধুতি। বহুদিন ধ'রে যত্ন ক'রে পরেছিলাম।

দুর্গাদের বাড়ির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার এই দ্বিতীয় স্টেজ। পরে আরও বাকি আছে। যথা সময়ে এসে পড়বে।

আমি এবার চাকরির জীবনটায় ফিরে আসি। শেষও হ'য়ে আসছে।

'ইণ্ডিয়ান নেশন'—ইংরাজি দৈনিকের ম্যানেজারির ভার নিয়ে আমি পাটনায় এলাম। বাসাটা কদমকুঁয়া মহল্লার জনক রোডে একটি বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে। একতলা অনেকগুলি ঘর। একজনের পক্ষে সবটা গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখা একটু শক্তও। তবে কাজটা এমন যে, গৃহস্থালী কতটা ছিমছাম রয়েছে সেটা দেখবার ফুরসৎই ছিলনা। দৈনিক কাগজ, অনেকগুলি বিভাগ—বিজ্ঞাপন, প্রচার; কাগজ সময়ে বের ক'রে দিয়ে সারা বিহারে ট্রেনে, ষ্টীমারে পাঠিয়ে দিতে হবে। ডিপার্টমেন্টের নিজ কর্মচারী আছে, এজেন্ট আছে, কিন্তু পূর্ববর্তী ম্যানেজারের ঢিলেপনার জন্য নানারকম দোষ ঢুকে গেছে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে। একটা বড় সমস্যা ছিল, কাগজ সময়ে প্রেস থেকে বের ক'রে দেওয়া। পাশেই অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিড়লার "সার্চলাইট"।

প্রথম-প্রথম একেবারে কুল পেতে দেয়নি। এমনও মনে হয়েছে, একেবারেই অনভিজ্ঞ আমি, ভালো ক'রে না বুঝে সুজে দায়িত্বটা নেওয়াই ভুল হয়েছে। কিন্তু কাজটার একটা মোহ ছিল, রাজধানীতে এমন একটা বড় বাহন যার প্রচুর ভবিষ্যৎ রয়েছে। ধৈর্য ধ'রে রইলাম লেগে। খানিকটা সময় যেতে ভেতরে প্রবেশ করতে মনে হোল যেন

গলদটা কোথায় ধ'রে ফেলেছি। আমার পূর্ববর্তী ম্যানেজার ছিলেন অত্যন্ত আয়েসী মানুষ। আয়েসী অফিসার কর্মচারীদের দুর্লভ ধন, অনেক তপস্যায় মেলে। তাঁর আয়েসে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে ঠাট্টা বাইরে বাইরে বজায় রেখে গেলে তাদের আয়েসও বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা থাকেনা। উপরন্তু আয়েসের সঙ্গে কিছু আমদানিরও পথটা খোলা থেকে যায়। আমি এইখানে মস্তবড় একটা প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। সবচেয়ে অসুবিধা হতে লাগল, সময়ে কাগজ বের করা। বাসায় ফোন্ রয়েছে। দশটা-পাঁচটা আফিস ক'রে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সোচ্চার হ'য়ে উঠত।

"সাহেব আছেন?"

"কি কাজ?—আমিই কথা বলছি।" খুট খুট ক'রে টেলিফোন রিসিভার রেখে দেওয়ার শব্দ।

শুধুই অকারণ পুলক, লোকটা এসে পর্যন্ত জ্বালাচ্ছে। আমার আবাস-আয়েসে ব্যাঘাত ঘটিয়ে যতটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। সময় নেই, অসময় নেই, প্রেসের নানা রকম কাজের 'কল' এর মধ্যে এরকম দু-পাঁচটা 'কল' আমার অবশ্য ক্ষতি করত না, তার মধ্যে কিছু ভুল 'কল'ও থাকতই, তবে কানের কাছে ফোন্ রেখে প্রেসের ম্যানেজারি যে কি দুর্ভোগ সে-অভিজ্ঞতাও ভালোরকম হয়েছে আমার। সমস্তদিন খেটে খুটে নিদ্রা দিচ্ছি, গভীর রাতে ফোন বেজে উঠল। হন্ত-দন্ত হ'য়ে পাশের ঘরে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম।

"কি ব্যাপার?"

"মেসিন্ কাজ করছেনা।"

"তা, আমি কি ক'রতে পারি?"

"সকালে কাগজ বের করা যাবেনা।"

"মেসিনম্যান কোথায়?"

"মেসিনঘরেই রয়েছে...ঠোকাঠুকি করছে।"

"ডেকে দাও তাকে।...থাক্, আমিই আসছি।"

বাসা থেকে বেশ খানিকটা দূরেই। শার্ট গায়ে তাড়াতাড়ি ট্রাউজারটা প'রে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মেসিনম্যান একজন এংলো ইণ্ডিয়ান যুবক। মদ খেতো, বাড়াবাড়ি হ'লেই মাঝে মাঝে এইরকম অবস্থা দাঁড় করাতো, তবে আমার সময়ে এই প্রথম।

একটা ভাঁওতা দিতে হোল। এর আগে প্রেসে কাজ করেছি—তবে, এ প্রেসটা অন্যরকমের, জটিলও। তবু আনাড়ি নয়, বুঝি, এই রকম

একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব নিয়ে এগিয়ে গেলাম। ও ঠোকাঠুকিই করছিল। পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম—"Where is the trouble now?" (কোথায় আটকাচ্ছে?)

একটা খিস্তি গালাগালের সঙ্গে মেসিনটার চারিদিকে গিয়ে একবার এখানে একবার ওখানে ঠোকাঠুকি করছে, আমিও ঝুঁকে দু'একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ক'রে যাচ্ছি, একটা জায়গায় একটা পিন্ ঠুকে দিয়ে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। বলল—"The devil take it! Old rotten machine!" (জাহান্নমে যাক, পচা পুরনো কল একটা)

বললাম—"Look here, its your drink, nothing else. Next time, I find you in the machine room in this plight, you get the sack." (শোন, এ তোমার নেশা ছাড়া আর কিছু নয়। এর পর যদি তোমায় মেশিনঘরে এ অবস্থায় দেখি, তো তোমায় বিদায় নিতে হবে।)

এ অবস্থায় আর দেখিনি, এমন নয়।...বিদায়ও দেওয়া হয়নি। তবে, ভাঁওতাটা কাজ করেছিল, এ রকম ঘটনা আর মাত্র দিন দু'য়েকই হ'য়ে থাকবে।

একটা অন্য কারণও ছিল এবং সেটাই প্রধান। এ প্রেসটা সত্যই পুরনো আর কাজের অযোগ্য হ'য়ে আসায়, কিছুদিন আগে একটা ছোট নূতন ধরণের রোটারি প্রেসের অর্ডার দেওয়া হয় জার্মানীতে। আমি যাওয়ার কিছুদিন পরে এসে পৌঁছায়, এবং কোম্পানীর লোক সেটা বসিয়ে দিয়ে যাওয়ার পর কাগজ সময়ে বের করার দিকে একরকম নিশ্চিন্তও হ'য়ে যাওয়া যায়।

সময়ে অন্যদিক দিয়েও শৃঙ্খলা এসে প'ড়ে প্রেস আপনার গতিতে একরকম চ'লে যেতে লাগল। তবে, দৈনিক কাগজ, তীব্র গতিবেগ, তাল রেখে যাওয়া শক্তই। কিন্তু অন্যদিকে এর সমান্তরালে আমার জীবনে আর একটা দিক পুষ্ট হ'য়ে আসছিল। কাজের চাপে একরকম লুপ্ত হ'য়ে যাওয়ার মুখেই। গতিবেগটা অভ্যাসেই সয়ে আসার সঙ্গে এটা এসে প'ড়ে আমার মনের ব্যালেন্স বা ভারসাম্যটা রক্ষা ক'রে চলল।

আমি পাটনায় আগেও ছিলাম, বি. এ. পাস এখান থেকেই করি; কিন্তু সে চৌদ্দ থেকে ষোলো সালে, এ সময় থেকে প্রায় তেইশ চব্বিশ বছর আগেকার কথা। সে-সময়ের অনেক কিছু বদলে গেছে। তবে এই দীর্ঘকালে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে, যত অল্পই হোক, আমার একটু পরিচয় হয়েছেই। আমি এখানে আসার পর থেকেই একটু খোঁজ হয়েছে আমার। ওদিকে অবসরের অভাবের জন্যই স'রে থাকতে বাধ্য

হয়েছিলাম। ওদিকটা সহজ হ'য়ে আসতে অনেকের সঙ্গে নূতন ক'রে পরিচয় ঝালিয়ে নিলাম। কয়েকটি নূতন প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূতও হ'য়ে পড়লাম।

এর মধ্যে বি.এন. কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল এবং স্বর্ণাসনের শরদিন্দু গুপ্তের কথা আমি পূর্বেই ব'লে রেখেছি, তাঁদের প্রসঙ্গ তোলার সময়। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছোটখাট কয়েকটি বাদ দিয়ে দু'টির কথা আমার বেশি ক'রে মনে পড়ছে।

পাটনায় "কিশোর দলের" সংগঠক রন্‌জিৎ সিং (দলপতি নাম 'রঞ্জিৎভাই') এখন পাটনার একজন পরিচিত নাগরিক। তখন যুবক মাত্র। একদিন আমায় এসে ধরলেন তাঁর এই নবগঠিত কিশোর-সংঘটির উদ্‌ঘাটন করতে হবে গর্দানিবাগে গিয়ে। সেখানে আমার সম্মতি-অসম্মতির অপেক্ষা না রেখে সর্বসম্মতিক্রমে আমায় স্থায়ী সভাপতি ক'রে নেওয়া হল। বোধহয় আজও আছি।

রনজিৎ এর মধ্যে বৃত্তি পেয়ে আমেরিকা থেকে একটা ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন।

এগুলি সাহিত্যিক জীবনে অনেক এসে পড়ে, কতকটা "নামকা ওয়াস্তে" ব্যাপার। আমি যাতে উপকৃত হয়েছি বা যাতে কাজের চাপে আমার লুপ্তপ্রায় একটা প্রেরণা পুনর্জীবন পেয়েছে বলাও যায়—তা হোল, এখানকার একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সংস্পর্শ।

প্রধানদের মধ্যে নাম মনে পড়ছে—মনীন্দ্র সমাদ্দার, দীপেন সরকার (মণ্ট)।

একদিন ওঁরা এসে বললেন—'বেহারে অনেক প্রতিষ্ঠাবান বাংলার লেখক, অথচ একটা কাগজ নেই, কয়েকজন উদীয়মান লেখকও রয়েছেন, তারা কলকাতায় পাত না পাওয়ায় তাঁদের প্রতিভা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। ওঁরা ঠিক করেছেন 'প্রভাতী' নাম দিয়ে একটা মাসিক পত্র বের করবেন মনীন্দ্র সমাদ্দারের সম্পাদকতায়। আমায় সাহায্য করতে হবে।

কাগজটি বেশ ভালোই দাঁড় করালেন ওঁরা। যতদূর মনে পড়ছে, আমি সময়ের অভাব সত্ত্বেও দু'টি একাঙ্কিকা দিয়েছিলাম। নূতন 'ট্যালেণ্টস্'দের মধ্যে বোধহয় নবেন্দু ঘোষের 'প্রভাতী'তেই শুভারম্ভ। বেহারে তখন বলাইবাবু (বনফুল), কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী। কার কার লেখা বেরিয়েছিল ঠিক মনে পড়ছেনা। তবে মনীন্দ্র খুব বিচক্ষণ সম্পাদক ছিলেন, নাছোড়-বান্দাও, অনেকের কাছেই গিয়ে থাকবেন। তারাশঙ্করের মাতুলালয়

পাটনায়, তখন যেতেনও মাঝে মাঝে, তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কবি' "প্রভাতী"তেই বেরোয়, পরে কয়েক সংখ্যার পর সজনীবাবু এটা "শনিবারের চিঠি"তে টেনে নেন। এই 'বঞ্চনা'টা তখন অনেকেরই বড় খারাপ লেগেছিল। কলকাতা পর্যন্ত "প্রভাতী"র সমাদর হয়। রাস্তাটা ধরেছিল "প্রবাসী"র। পরে অকালমৃত্যুই ঘটল। আমার "ইণ্ডিয়ান নেশন"-এর চাকরিরও মেয়াদও আড়াই তিন বছরের মাঝামাঝি। 'প্রভাতী'র অবলুপ্তির ইতিহাসটা আমি ঠিক মতো জানিনা।

আমার ব্যক্তিগত উপকারের কথা যা বলতে যাচ্ছিলাম—পাটনায় তখনও আমার গল্প সাহিত্যের যুগ চলেছে। তারও মাত্র দু'টি লেখবার সময় পাই, 'বসন্তে'—বইটার নাম-গল্প আর একটা কি ঠিক মনে পড়ছেনা। তবু এটা খুবই সত্য যে এই পাটনাতেই আমার সাহিত্য-জীবন পুরোপুরি আরম্ভ হয়। এখানে থাকা কালেই আমার প্রথম উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়' আরম্ভ করি, শেষও করি, "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হ'য়ে বড় লেখার একটা আত্মবিশ্বাসও পেয়ে যাই আমি।

অবশ্য "লিখলে হয়, চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়"—কেদারবাবু যেটাকে বলেছেন "মনের মধ্যে ফুট কাটা" সেটা অনেকদিন থেকেই হচ্ছিল, তবে বড় ছক্ এঁকে, বড় খাতা নিয়ে বসবার অবসরই হচ্ছিল না।

তাহ'লে আরও একটু এগিয়ে যাই, তাতে বোঝা যাবে, কি ক'রে অনেক সময় সামান্য একটা ব্যাপারে জীবনের একটা বড় কাজ হ'য়ে যেতে পারে, একটা বড় তোরণ খুলে যেতে পারে।

অবশ্য, উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ, অন্ততঃ আমার নিজের স্বার্থে, একটা যে বড় তোরণ-অতিক্রমই, এটা মেনে নিতে কারুর আপত্তি না থাকে।

আমার এক আত্মীয় ছিলেন, দ্বারভাঙ্গা কোর্টের উকীল আমার চেয়ে কিছু ছোটই। সম্বন্ধটা আমার এক নিকট জ্ঞাতি, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সুবাদে ছিল শ্যালক-ভগ্নিপতির। লঘুভাবে কথাবার্তা চলত।

সেকালের প্রায় অনেকের মতোই তাঁর বই পড়ার অভ্যাস ছিল—ইংরাজি-বাংলা যা পেতেন গো-গ্রাসে গিলতেন। খুব দ্রুত পাঠকও ছিলেন। একদিন আমার একটা ছোট গল্পের বই শেষ ক'রে, বইটা মুড়ে কি ভাবছেন। কি রকম লাগল প্রশ্ন করাতে বললেন—"দ্যুৎ, একপাতা দু'পাতায় শেষ, তার আবার মতামত দিতে হবে! এমন কিছু লেখো দিকিন যাতে প'ড়ে মেহনৎ হয়, গা ঘামে।"

ধরল সেই 'ফুট কাটার' অশান্তি। এটা বোধহয় দ্বারভাঙ্গা রাজ-স্কুলের শেষের দিকের কথা।

অনেকদিন ঐ অবস্থাতেই ছিল। পাটনার নূতন আবহাওয়ার মধ্যে আবার বাড়ল আলোড়নটুকু।

বেশ মনে আছে। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। আহার সেরে যেন কতকটা হঠাৎই প্রেরণায় আমি 'নীলাঙ্গুরীয়' নিয়ে ব'সে গেলাম।

সাধারণতঃ আমি আহারের পর লেখা বা পড়া কিছুই করিনা।

এদিকে কাজ খুব বেড়ে গেছে। রোটারি আসার পর কর্তারা একটা বড় কাজ হাতে নিয়েছেন, "আর্যাবর্ত" নাম দিয়ে একটা হিন্দী দৈনিক কাগজের প্রকাশন। ছাপা, প্রচার, বিজ্ঞাপন নিয়ে কাজ হ'য়ে গেছে দ্বিগুণ, এর ওপর একটা নূতন কাগজের ক্ষেত্র তৈয়ারী করবার ঝামেলা আছে। কিন্তু জীবনে দেখেছি, কাজ যখন বেশি তখনই কাজ করাও যায় বেশি ক'রে। কাজই হ'য়ে ওঠে কাজের টনিক (Tonic)। 'নীলাঙ্গুরীয়' একটা যেন উদ্দেশ্য এনে দিল আমার সাহিত্যচর্চায়, আর হালকাভাবে—যখন কেউ লেখা চেয়ে পাঠালেন, বা, মাথায় একটা 'আইডিয়া' এসে গেল শুধু তখনই ব'সে যাওয়া নয়। একটা নির্দিষ্ট সময় ক'রে নিলাম সন্ধ্যার পর। ব'সে যেতাম। বাইরে যাওয়া-আসা কমিয়ে দিলাম। এক ঝোঁকে খানিকটা লিখে ফেলে 'প্রবাসী' তে সুরু ক'রে দিয়েছিলাম, যোগান্ দিয়ে যেতে হবে। অন্ততঃ একটা আনন্দ পেতে লাগলাম, যা ছোটগল্পের স্বল্প-পরিসরের মধ্যে পাওয়া যায়না। উপন্যাস যেন একটা লতা, চারিদিকে তন্তু দিয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে মুক্ত আনন্দে এগিয়ে চলে। দিনকতক আগে পর্যন্ত আমার মনটা "ইণ্ডিয়ান নেশন" নিয়ে প'ড়ে থাকত। এখন কাজ বাড়লেও সবটা একরকম সুনিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া, অস্বীকার করব না, 'নীলাঙ্গুরীয়' আমার জীবন-দর্শনও অনেকটা দিয়েছে বদলে। আমি কাজে কখনও গাফিলতি করিনি, আমার বিবেক সেদিক দিয়ে নিষ্কলঙ্কই। থাকবেও, সে-দৃঢ়তাও আছে আমার মনে। কিন্তু একটা প্রশ্ন উদয় হ'তে আরম্ভ হয়েছে মনের এককোণে—রুজি উপার্জনের জন্য যে কাজ সে তো একটা চুক্তি-মাত্র, জীবনে এমন কিছু থাকতে পারে না যেটাই আসল, অথচ দৈনন্দিন প্রয়োজনের ধূলি-ধূমে আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে? একে ধূলি-ধূমে সমাধিস্থ হ'তে দিলে জীবন মার্জনা করবে?

এ প্রশ্নে আমার জীবনের ধারাটাই গেল বদলে। আমার কর্মজীবনটা রুটিনবদ্ধ হ'য়ে প'ড়ে—সাহিত্যজীবনটা যেন নূতন ক'রে মুক্তিলাভ করল।

এ-ভাবটা-যে পূর্বে মাঝে মাঝে মনে উঁকি মারেনি, এমন নয়।

একবার সজনীবাবুর সঙ্গে প্রথম গল্পগুলির চুক্তি করার সময় হয়েছিল। চুক্তিটায় অনুতাপের খাদ থেকে গেলেও, পরে জেনারেল প্রিন্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগের সময় আর একটু আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উদয় হয়। দাদাও একবার এই আত্মপ্রত্যয় জাগাবার জন্যেই বলেন—"কি রাজের কাজ নিয়ে প'ড়ে আছিস, ছেড়ে দিয়ে লেখার দিকেই চ'লে আয়না।"

কিন্তু কাজের মধ্যে কি একটা মোহ ছিলই। তা-ছাড়া রাজে দ্বিতীয়বার আসা থেকে নিজের যোগ্যতার মাপে বরাবর ভালো কাজই পেয়ে গেছি—আর সমাদরের সঙ্গেই। এদিকটা পরীক্ষা ক'রে দেখবার কথা ভালো ক'রে মনে হয়নি। জীবনের মূল্য নির্ণয় করা ভালো ক'রে হ'য়ে ওঠেনি।

আমি ছুটি-ছাটা খুব কমই নিয়ে এসেছি। বইটা শেষ ক'রে ফেলবার জন্য মাঝে মাঝে ছুটিও নিতে লাগলাম এ সময়। সুযোগও ঘটিয়ে দেন ভগবান। এই সময় আমার সহকারী, আসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার হিসাবে একজনকে পেয়ে গেলাম, প্রথমবারে রাজস্কুলে থাকাকালে আমার একটি প্রিয় মৈথিল ছাত্রকে। অনেকদিন গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে রাজেই কাজ করছিল। তার হাতে চার্জ দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত থাকতাম।

ছুটির একটা আলাদা আকর্ষণ হয়েছে কিছুদিন থেকে। সব মিলিয়ে এ সময়ের স্মৃতিটুকু বড় মধুর।

আমার সপ্তম ভ্রাতা অবনী, যার সঙ্গে আমি বহুপূর্বে জামতাড়ায় কয়েকবার কাটাই, কিছুদিন পূর্বে পাটনার মহকুমা জাহানাবাদে বদলি হ'য়ে এসেছে। জায়গাটা পাটনা-গয়া লাইনের মাঝামাঝি, ···একটা নদীর তীরে। অনেকখানি কম্পাউণ্ডের মধ্যে বেশ নিরিবিলি জায়গাটি, সহর একটু তফাতেও।

আকর্ষণের মধ্যে একটা বড় আকর্ষণ ছিল অবনীর প্রথম সন্তান, তার কন্যাটি। তখনও কোলেরটিই, তবে তার বাচালতা আর অকাল-গৃহিনীপনার জন্যে কোলে ঠিক এঁটে উঠছেনা। এটা যেন আমাদের বাড়ীর শিশুদের একটা ঐতিহ্যও। ওরা আমার কাছে এসেছে কয়েকবার কাজের চাপের মধ্যে এক-আধবার গেছি। এবার যাওয়ার জন্যই মাঝে মাঝে ছুটি নিতে লাগলাম। উপলক্ষ 'রুনু' আর 'নীলাঙ্গুরীয়'।

বাসা থেকে নেমে কয়েক পা গিয়েই পাশাপাশি দু'টি নিমগাছ, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া, অল্প বয়স। ঘন-পল্লবিত, তায় ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য তাদের শাখা প্রশাখা ওপরে জড়াজড়ি ক'রে থাকায় নীচেয় একটি নিশ্চিদ্র ছায়া বিস্তার করেছে। জল ছিটিয়ে, পরিষ্কার ক'রে নিয়ে একটি চেয়ার আর একটি টেবিল পাতা থাকত। আমি আমার

তখনকার রুটিন মতো সকাল সকাল স্নান ক'রে জলযোগ সেরে বসতাম খাতা নিয়ে। একটু বেশি কবিত্বপূর্ণ হ'য়ে গেলেও পরিবেশটুকুর প্রতি সুবিচারের জন্যই বলি—নূতন গরম পড়েছে, নিমফুলের গন্ধের সঙ্গে মৌমাছিদের মৃদু গুঞ্জন, একটা দু'টো ক'রে ঝ'রে পড়ছে ফুল, আমার মনের রোমান্সের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত নিঙড়ে বের করবার চেষ্টা করতে কসুর করেনি জাহানাবাদ।

প্রায় সকাল আটটায় বসতাম, উঠতাম অবনীর আফিস থেকে এসে খাওয়ার সময় হ'লে; প্রায় দুপুর একটা। আমি একটানা, এক-দেড়ঘণ্টার বেশি কলম চালিয়ে যাওয়ার ধৈর্য ধ'রে রাখতে পারিনা, খুব বেশি তো ঘণ্টা দুই। মাঝে মাঝের বিরতিটুকু রুণু জুগিয়ে যেত।

কেবল সাহিত্যই নয়, "প্রভাতী" গোষ্ঠীই নয়, জীবন সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাসা, সেটা কৈশোরে ছিল চাতরার দুটি-তিনটি বৎসরে, যৌবনে শিবপুরের ছাত্রজীবনে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ ক'রে দিয়ে, যেটা নাকি এদিকে অনবসর কর্মব্যস্ততার মধ্যে ম্রিয়মানই হ'য়ে আসছিল, আবার এল ফিরে। বয়সের জন্য এবার খানিকটা নূতন রূপে।

পাটনার বৃহৎ বাঙ্গালী সমাজ, কলেজযুগের খানিকটা পরিচয় ছিলই, তবে পট বদলেছে, আবার নূতন আগ্রহে পরিচয় করতে লাগলাম। যুব-চিত্তের নব-জাগরণের ওপরেও এখানে একটা বড়রকম বিদ্বৎ-সমাবেশ রয়েছে—কয়েকজন ডাক্তার, প্রফেসার, উদীয়মান আইনজীবী নিয়ে—রঙ্গিন হালদার, বিমানবিহারী মজুমদার, যোগীন বোস, শম্ভুবাবু, রমেশ রায়, ব্যারিষ্টার শচীনবাবু, ডাঃ শরদিন্দু ঘোষাল। এর মধ্যে সর্বজনমান্য, সবার 'শচীনদা' একাধারে শিক্ষক, ভাষাবিৎ, ভিষক, ব্যারিষ্টার, আরও যে কতকিছু ব'লে শেষ করা যায়না।

কিছু কিছু পরিচয় ছিল, যেচে গিয়ে মিশলাম ভালো ক'রে। আমি যেন কোথায় ছিলাম, বেরিয়ে এসে পাটনার বাঙ্গালীদের 'একজন' হ'য়ে গেলাম। সাড়া পাচ্ছেন ব'লে ডাকও দিচ্ছেন সবাই নিজেদের আনন্দ-উৎসবে—সবজীবাগের 'আখড়া', আর হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর বাৎসরিক অনুষ্ঠান, কোনও প্রতিষ্ঠান কীর্তনের দল আনিয়েছেন বাইরে থেকে—ডাক পড়ে।

একদিন বি.এন. কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে ওঁরা ডাকলেন। আয়োজনটা করলেন ওখানকার প্রফেসার বন্ধুবর রঙ্গিনবাবু। একদিন পাটনা সায়েন্স কলেজ থেকে ডাক পড়তে আমি অনেকদিনের পুরনো একটা বায়না মিটিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলাম। কথাটা আগেও বোধহয় একবার ব'লে থাকব।

যতদূর মনে পড়ছে, উপলক্ষটা ছিল সায়েন্স কলেজের বাংলা সমিতির পক্ষ থেকে আমায় ছোটখাট একটা সম্বর্ধনা দেওয়া। আমি ওঁদের অনুরোধ করলাম, সভাপতি হিসাবে বি.এন. কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডি.এন. সেনকে যেন আমন্ত্রিত করা হয়। সেই উনিশ শ' দশ-পনেরো সালে বি.এন. কলেজে নাম লেখানোর পর থেকে প্রিন্সিপাল সেনের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধা-স্নেহের নিবিড় সম্পর্কের কথা পূর্বে বলেছি। "ইণ্ডিয়ান নেশনে" আসার পর তাঁকে প্রায়ই দেখতে যাই, তাঁর কয়েকটি লেখা "ইণ্ডিয়ান নেশন"-এর সাপ্তাহিক সংখ্যায় ছাপাবার ব্যবস্থাও করেছি। যথেষ্ট স্থবিরত্ব এসে গিয়েছে, তাঁকে বোধহয় ধ'রেই তুলে বসাতে হয়েছিল সভাপতির আসনে। কিন্তু তাঁর স্থূল দেহ আর শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত প্রশান্ত মুখমণ্ডলে সভার যে একটি মহিমময়রূপ এনে দিয়েছিল তা এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে। আমার বক্তব্য, আমি আমার প্রতি তাঁর অশেষ স্নেহ-করুণার কথা উল্লেখ ক'রেই আরম্ভ করি। ওঁর আশীর্বাদ পাই। পাটনায় আমি এইজন্যই আসিনি নিশ্চয়, কল্পনার বাইরেই ছিল এ-যোগাযোগ, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল, যেন সেই দিনটাই আমার পাটনায় আসাটা সব চেয়ে বেশি সার্থক ক'রে তুলেছে।

ঋষি-ঋণ ব'লে একটা কথা আছে। সেটা শোধ করা যায়না জীবনে, এই স্বীকৃতি দিয়ে যতটুকু হালকা হওয়া যায়, তৃপ্তি পাওয়া যায়।

এই ছিল আমার পাটনা-জীবনের সামাজিক পটভূমিকা। সামনে আমার কর্মজীবন। আমার ব্যক্তিগত জীবন। এর নেপথ্যে সবকিছুকে আবৃত ক'রে ছিল নবজাগত জাতির সর্বব্যাপী বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক জীবন। নেপথ্যে বলতে হোল, আমার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোনও যোগ ছিলনা ব'লেই। একথা পূর্বেও বলেছি।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই শুরু হ'য়ে, কখনও স্তিমিত, কখনও উদ্দাম হ'য়ে উঠে উনিশশ' বিয়াল্লিশ পর্যন্ত এসে বিক্ষোভের বাষ্প একেবারে ফেটে বেরিয়ে এল। নেহরু-প্যাটেলকে সঙ্গে নিয়ে মহাত্মাগান্ধী তোষণ-নীতির চূড়ান্ত করলেন, সুভাষের আই.এন.এ.'র বিরোধিতা পর্যন্ত ক'রে, কিন্তু তিনিও হার মেনে 'কুইট ইণ্ডিয়া'—'ভারত ছাড়ো—' শ্লোগান তুলে দিলেন দেশের মুখে। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল দেশে।

পাটনাতেও সে-বিক্ষোভের একটা ঢেউ এসে অনেক কিছুই ছারখার ক'রে দিল। আরম্ভ হোল সেক্রেটারিয়েটের সুরক্ষিত কম্পাউণ্ডের মধ্যে বিধানসভার সৌধ থেকে। কি করে সাতজন যুবক প্রহরীদের চোখে ধূলি দিয়ে সৌধচূড়ায় গিয়ে ব্রিটিশ ফ্লাগ নামিয়ে তার জায়গায়

কংগ্রেসের তিরঙ্গা পতাকা বসিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গুলি। সাতটি দেহ নিষ্প্রাণ হ'য়ে নীচে লুটিয়ে পড়ল। ঐ কেন্দ্র থেকে বিরাট জনসমাবেশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ধ্বংসের বাণী মুখে ক'রে।

ঘটনাটা সুরু হয় সেক্রেটারিয়েটেই, তারপর স্টেশন-পোষ্টাফিস আক্রমণ, শ্লোগান আউড়ে কলেজ স্কুল খালি করানো, কোর্টের কম্পাউণ্ডে গিয়ে হামলা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের তার কাটা—বিক্ষুব্ধ জনতা সবরকমভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে করতে সহরের হাওয়া গরম ক'রে তুলল।... মুখের বুলি—'কুইট ইণ্ডিয়া' !! ভারত ছাড় !!! ...দীর্ঘতর নির্দেশনাও—"দূর হটোরে দুনিয়াবালে—হিন্দুস্থান হামারা হ্যায় !!"

পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে লাঠিচার্জ, গুলি। একদিকে হাসপাতাল একদিকে জেল ভ'রে উঠছে।

বেলা আন্দাজ তিনটা হবে। একটা থমথমে পরিবেশের মধ্যে আফিসে কাজ ক'রে যাচ্ছি। ওদিকে সম্পাদকীয় বিভাগ, এদিকে ম্যানেজারি ফোনের শব্দ প্রায় অবিচ্ছিন্ন। দৈনিক পত্রিকার অফিস, যত খবর কেন্দ্রীভূত হওয়ার কথা তো সেখানেই, বাধ্য হ'য়ে রিসিভার মাঝে মাঝে নামিয়ে রাখতে হচ্ছে—সব আলোচনা বন্ধ করিয়ে একটা নিরাপত্তার শান্তভাব বজায় রাখবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছি—গুপ্তচরে চারিদিক তো ভ'রেই আসছে,—হঠাৎ বাইরে একটা তুমুল কোলাহল উঠতে বেরিয়ে এসে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ালাম। ওদিক থেকে সম্পাদকও কয়েকজন সহকারীর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন, কোলাহল আরও উত্তাল হ'য়ে উঠতে দুই আফিসের আরও অনেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় ভিড় ক'রে দাঁড়াল। ওদিকে বিক্ষুব্ধ জনতা তার ছিঁড়তে ছিঁড়তে সামনের রাস্তায় জড় হ'য়ে শ্লোগান আউড়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য, আমাদের আফিসের সামনে রাস্তার ও-প্রান্তে জেলখানা।

কারণটা ক্রমে প্রকাশ পেল। জেলখানায় কে একজন বড় লীডার ছিলেন, তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে বাইরে কোনও জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। জনতা সেটা চায়না, খবর পেয়ে এসে জুটেছে বাধা দেওয়ার জন্যে। জেলের ভেতর থেকে শ্লোগানের উত্তরে শ্লোগান আসছে ভেসে।

একটা গুর্খাসৈন্য ভরা পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়াল, এবং তারা রাইফেল নিয়ে নেমে দাঁড়াতে—সঙ্গে সঙ্গে একটা রূপান্তর ঘ'টে গেল। যেমন জনতার একটা অংশ মরিয়া হ'য়ে উঠতে গুর্খারা প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, জনতার অন্য একটা অংশ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ল ; বড়টাই।

এতে হঠাৎ আমরাও ব্যাপারটাতে পড়লাম জড়িয়ে। রাস্তার ধারেই

নীচু দেওয়াল। গেট বন্ধ, ছত্রভঙ্গ জনতা দেওয়াল টপ্‌কে বাগান পেরিয়ে আফিসের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে পিছনের দেওয়াল টপ্‌কে পালাতে লাগল।

এডিটার সি. ভি. রাও একজন মাদ্রাজী, প্রায় আমারই সমবয়সী। পলায়নপর জনতাকে বাধা দেওয়ার উপায় নেই, আমরা ছ'জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। রাও শুষ্ককণ্ঠে বলল "আমরাও জড়িয়ে পড়তে পারি, কি করা যায়"— বললাম—"এগিয়ে গিয়ে জানিয়ে দেওয়া দরকার, ওরা আমাদের লোক নয়।"

শ্লোগান বেড়েই চলেছে, পলায়নপর জনতার একটা অংশ আফিস-বারান্দার নিরাপত্তা থেকেও শ্লোগান নিক্ষেপ ক'রে যাচ্ছে—বিদ্যুতে ভরা ঝোড়ো মেঘ, যে-কোনও মুহূর্তে বজ্রপাতের আশঙ্কা।

রাও বলল—"তাহ'লে আর দেরী করা নয়, চলো।"

হাতের ইসারায় পেছনে শ্লোগান চালানো বন্ধ ক'রতে ব'লে আমরা এগুলাম।

মৃত্যুর একেবারে প্রায় কবলস্থ হ'য়ে পড়া যে কি, আমি জীবনে এ পর্যন্ত দু'বার দু'ভাবে উপলব্ধি করেছি। একবার একট দীর্ঘ, কঠিন ব্যাধির মধ্যে। সবাই একটু বাইরে গেছে, হঠাৎ একটা অতিরিক্ত দুর্বলতা এসে প'ড়ে সমস্ত বন্ধন শিথিল হ'য়ে পড়ে। সব স্মৃতি মুছে গিয়ে সে এক অনাস্বাদিতপূর্ব মুক্তির অবস্থা! একান্ত ক্ষণিক। জীবনের অমোঘ আকর্ষণেই ওরই মধ্যে কোনও অবচেতন, অর্ধস্ফুট শব্দ ক'রে থাকব, সবাই এসে প'ড়ে ফিরিয়ে নিল আমায়।

দ্বিতীয়বার এই "ইণ্ডিয়ান নেশন"-এর কম্পাউণ্ডে।

আমরা প্রায় কম্পাউণ্ডের মাঝামাঝি গেছি, হঠাৎ কি একটা হ'য়ে প'ড়ে শ্লোগানটা একেবারে চতুর্গুণ হ'য়ে উঠে চারিদিকে ফেটে পড়ল, এবার আমাদের বারান্দা থেকেও, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে। সামনের জনতা একটা হামলা করবার জন্যে ইটপাটকেল তুলে নিয়েছে, গুর্খার দল—প্রায় জন বারো, সারবন্দী হ'য়ে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মিলিটারি ভঙ্গিতে, পেছন থেকে অর্ডার পেয়ে একযোগে আমাদের আফিসের দিকে তাগ ক'রে দাঁড়াল। আমরা ঘুরলাম। সে যে কি ভয়াবহ অবস্থা, পর মুহূর্তের অর্ডার 'ফায়ার'-এর সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়া, পৃষ্ঠে গুলিবদ্ধ হ'য়ে, সে কয়েক মুহূর্তের বিভীষিকা কখনও যাবেনা ভোলা। এর সঙ্গে আর একটা অনুভূতি,— লজ্জা, সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

পা উঠছেনা। কোনও রকমে টেনে টেনে গাড়ি-বারান্দায় থামের

আড়ালে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। এই ক'টা মুহূর্ত নিজের জগৎ আমার কাছে যেন লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, গুর্খা সৈন্য এর মধ্যে কখন ভ্যানে উঠে প'ড়ে চ'লেও যাচ্ছে। জনতা ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটেছে পেছনে পেছনে। অল্প সময়ের মধ্যেই স্লোগান ক'মে আসতে আসতে জায়গাটা নিস্তব্ধও হ'য়ে এল।

কারণটা প্রকাশ হ'য়ে পড়তেও দেরি হোলনা। গভর্ণমেণ্ট এ-চালটায় জিতেছে। গুর্খা সৈন্যদের একটা ভুয়ো পাহারা সামনে দাঁড় করিয়ে জনতার মন এদিকে আটকে রেখে অন্য পথে কয়েদীকে আগেই জীপে চালান্ ক'রে দিয়েছে।

একটা সঙ্কট ভালোয় ভালোয় কেটে গেল, কিন্তু সমস্যাটা আরও ঘোরালই হ'য়ে উঠল। প্রশ্ন দাঁড়াল—"ইণ্ডিয়ান নেশন" কোন পথ ধরবে? মহারাজের কাগজ সরকারের বিরোধিতা করতে পারেনা, এমন কি চুপচাপ 'নিরপেক্ষ' নীতিও প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা ব'লেই গণ্য হবে। অন্যদিকে, স্বাধীনতা প্রায় যখন করায়ত্ত, দিকচক্রে তার আলোকসম্পাত একরকম সংশয়াতীতই, সে-সময় দেশ যে পত্র-পত্রিকার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত থাকবে, তার ভবিষ্যৎ ব'লে কিছু থাকবেনা।

আমরা ঠিক করলাম সরজমিনের ওয়াকিবহাল অফিসার হিসাবে এ অবস্থায় কাগজ দু'টি সাস্‌পেণ্ড (Suspend) অর্থাৎ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখবার পরামর্শ দেওয়াই আমাদের দায়িত্বে খালাস হওয়া হবে।

দ্বারভাঙ্গায় লোক দিয়ে চিঠি পাঠালাম। আমাদের ডেকে পাঠানো হোক্। চারিদিকেই বিপর্যয়—তার ছেঁড়া,, রেল ওপড়ানো, স্টেশন আক্রমণ। রেল চলাচল বিঘ্নিত, তারই মধ্যে খোঁজ খবর নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা দিন স্থির ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লাম; যতদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া যায়।

সেইটি আমার "ইণ্ডিয়ান নেশনের" শেষ দিন হ'য়ে রইল, চাকরি জীবনেরও শেষ দিন।

সামনে সমস্ত দিনটা পাওয়ার জন্য আমরা সকালের স্টীমারেই বেরিয়ে পড়ি। শ্রাবণ-ভাদ্রের ভরা গঙ্গার স্রোত ঠেলে স্টীমার মন্থর গতিতে এগুচ্ছে। একটা পাতলা মেঘের আস্তরণ ছিলই আকাশে, একবার বাইরে নজর পড়তে দেখি একটা নিবিড়কৃষ্ণ মেঘ উত্তর-পশ্চিম দিকের সমস্তটা ঢেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। দূরের জন্যেই গতিবেগটা বোঝা যায়না, অল্প সময়ের মধ্যেই ওপরের বাতাসে সমস্ত আকাশটা ছেয়ে প্রবল বেগে বৃষ্টি নামল। সে-বৃষ্টি থামবার নয়; তারই মধ্যে

আমরা স্টীমার ছেড়ে গাড়িতে উঠলাম। ঠিকুতে ঠিকুতে গাড়ি যখন সমস্তিপুরে পৌঁছাল তখন খানিকটা রাত হ'য়ে গেছে—আটটা-ন'টার মধ্যে। রাত্রে গাড়ি আর এগুবে না। স্টেশনে থাকা-খাওয়ার অনিশ্চয়-তার জন্যে আগের দিন একজন কর্মচারীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমস্তিপুরে বাড়ি, তিনিই সব ব্যবস্থা ক'রে রাখবেন। গিয়ে শুনলাম সব ব্যবস্থা ঠিক আছে, তবে খানিকটা যেতে হবে; তার জন্যে তিনি একটা প্রাইভেট ঘোড়ার গাড়ি ঠিক ক'রে রেখেছেন। ট্রেনেই আমাদের সিক্ত কাপড়-চোপড় পাল্টে অর্ধসিক্ত এক সেট প'রে নিয়ে-ছিলাম। বৃষ্টি সেই যে গঙ্গার ওপর শুরু হয়েছিল, সমানে প'ড়ে যাচ্ছে, ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ির ছাতও এখানে-ওখানে ভেদ ক'রেই। সমস্তিপুরে ওরই মধ্যে একটু বিরতি পেয়ে আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি আহারপর্ব সেরে অল্প একটু এসেছি, আবার আকাশ ভেঙে পড়ল। বর্ষার সে বকম উগ্র প্রকোপের মধ্যে আর কখনও পড়েছি ব'লে মনে পড়েনা। এবাব বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল হাওয়া, একটা যে ঢাকা গাডির মধ্যে রয়েছি, মাথার ওপর একটা ছাত আছে, বোঝাই যায় না। সমস্ত পথটা এক মিনিট বিরাম নেই। শীতে দু'জনে কাঁপতে কাঁপতে চলেছি।

ভোরের দিকেই আমাদের ট্রেনটা ছেড়েছিল। ঘণ্টা দু'য়েকের পথ প্রায় চার ঘণ্টায় অতিক্রম ক'রে যখন দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছালাম, তখন শরীরে আর সাড়া নেই। বৃষ্টি তখনও একভাবেই চলেছে। সেই বৃষ্টি মাথায় ক'রে পথটুকু কাটিযে যখন দু'জনে বাড়ি গিয়ে উঠলাম তখন বেলা আটটা। পৌঁছেই রাজ আফিসে খবরটা পাঠিয়ে দিই। রাওয়ের সব ব্যবস্থা হ'য়ে গিয়ে সে অপেক্ষাই করছিল, বেলা বারোটা আন্দাজ রাজের স্টেব্‌ল থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে তাকে নিয়ে গেল। আমি তখন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। তাবই মধ্যে কোনও রকমে একটু মাথা তুলে তাকে বিদায় দিলাম। ব'লে দিলাম কি হয়-না হয় যেন জানতে পাই। রাও-ও দিন তিনেক ভুগল। পাঁচদিন পরে এসে ব'লে গেল আমাদের সুপারিশটাই নেওয়া হয়েছে। কাগজ প্রেস অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রইল। পাবলিকের কাছে একটা অজুহাত দেখানোর দরকার মনে হ'লে হাঙ্গামার সময় প্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মেরামত প্রয়োজন ব'লে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দেওয়া হবে।

আমায় মাসখানেক ভুগতে হোল, বুকে সর্দি ব'সে দিনকতক রীতি-মতো যমে-মানুষে টানাটানির অবস্থা যায়। পাটনা থেকে কোনও খবর পাচ্ছিনা, দ্বারভাঙ্গা আফিস থেকে কোন খবর সংগ্রহ করা যাচ্ছেনা,

তারই মধ্যে একদিন টের পেলাম—"ইণ্ডিয়ান নেশন" আবার চালু হ'তে চলেছে। গোলমেলে অস্পষ্ট খবরটার ধরণ একটু অদ্ভুত, নাকি নূতন ব্যবস্থা হ'য়ে চালু হবে প্রেস।

তা হোক, কিন্তু আমি তো তার খবর পাব। কোনও খবরই নেই। তখনও শরীর খুব দুর্বল। রাজের এই সব পুরানো অব্যবস্থার কথা জানাই, মনটা দিনকতক ঝিমিয়েই রইল। চীফ ম্যানেজার বছরে মাস দুই ছুটি নিয়ে বিলাত চ'লে যেতেন, তিনি বাইরেই। আর আফিসের দিকে না গিয়ে মহারাজেরই সঙ্গে দেখা করা ঠিক করলাম।

ও-জিনিসটা সম্প্রতি একটু কেতা-দুরস্ত হ'য়ে পড়েছে। প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ব'লে একটা সময় ঠিক ক'রে নিয়ে দেখা করতে হবে। দু'দিন তাঁর আফিসে গেলাম। কাগজপত্র নিয়ে ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন—"মহারাজ আজ একটু ব্যস্ত আছেন।"

পরদিনও ঐ কথা।

কেমন যেন ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল গা'টা। মন একটু সন্দিগ্ধও হ'য়ে উঠতে লাগল, হয় তো আমার উপস্থিতির কথাটা মহারাজের কাণে উঠছেই না আদৌ।

সন্দেহটার একটা কারণ ছিল। আমি আর যাইনিই। এরপর একদিন মেজদাদা গোষ্ঠবিহারীর মুখে একটা কথা শুনে বুঝলাম আমার আন্দাজ মোটেই ভুল হয়নি। মেজদাদা তখন রাজাবাহাদুরের অর্থাৎ মহারাজের ছোটভাইয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি। একদিন কি কথার ওপর বললেন—"প্রাইভেট সেক্রেটারি তোর ইণ্টারভিউ করাবে কি, ওর কথাতেই তো তোকে আর ডাকা হোলনা। যখন নূতন ব্যবস্থার কথা ওঠে, ওই বলে, বিভূতিবাবু আর ওখানে কাজ করতে চাননা।"

এবার এর গোড়ার কথা ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ ক'রে দিই।

বেশ একটু কৌতুকজনক।

তখন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি কুমার গঙ্গানন্দ সিং, পূর্ণিয়ার রাজবনৈলীর এক শাখার সন্তান। জমি সংক্রান্ত মামলায় হেরে দ্বারভাঙ্গার কাছে স্টেট বাঁধা পড়ে যাওয়ার পর মহারাজা তাঁকে একটা মোটা মাসহারা দিয়ে নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারি ক'রে রাখেন। অধিকন্তু অন্য দু-একটা কাজের সঙ্গে "ইণ্ডিয়ান নেশন"-এর Adviser বা পরামর্শদাতাও ক'রে দেন। বেশ শিক্ষিত মানুষ; চারিদিকে মাথা বেশ খেলেও, যাকে বলা যায়—ম্যান অফ আইডিয়াজ্ (Man of ideas), তাঁর সঙ্গে কাজ করায় আনন্দ আছে। রোটারিটা এসে পড়লে

তাঁরই পরামর্শে হিন্দী দৈনিক "আর্যাবর্ত"টা আরম্ভ করা হয়। এখন সেটা সবচেয়ে জনপ্রিয় হিন্দী কাগজ।

কুমার গঙ্গানন্দের ইংরাজি সাহিত্যে বেশ অনুরাগ ছিল। সেই সূত্রে আমার সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল। সবই ভালো, কিন্তু "আর্যাবর্ত" বেরুবার পর এমন একটা ব্যাপার এসে পড়ল যেটাকে আমি ঠিক কি নাম দোব বুঝতে পারছিনা। ওরই কথায় কাগজের সম্পাদক হিসাবে কাশীর বিখ্যাত "আজ" নামক হিন্দী কাগজের একজন মৈথিল সহযোগী-সম্পাদককে মোটা মাইনে দিয়ে রাখা হোল। তিনি পাটনায় থেকে কিছুদিন কাজ বেশ করলেন, পরে কাশী থেকে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। শোনা গেল নাকি দু' নৌকায় পা রেখে চালাচ্ছেন। তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্য মাঝে মাঝে বাদ গিয়ে মাঝে মাঝে ডাকে আসতে লাগল। তার কিছুদিন পর থেকেই উনি কাশীতেই, এদিকে সম্পাদকীয় অনিশ্চিতভাবে এসে অনিয়মিত ভাবে ছাপা হ'য়ে যাচ্ছে। সম্পাদকীয় সম্বন্ধে অবশ্য আমার কোন দায়িত্ব নেই। যদিও কাগজের বিক্রয় ব্যাহত হয়ই, কিন্তু ওঁর মাসহারা দেওয়ার ব্যাপারে অসুবিধা হ'তে লাগল। ছুটি নেই, বাইরে থেকে সম্পাদনা করার কোনও লিখিত 'অর্ডার' নেই, বিল প্রস্তুত করায় অসুবিধা হ'তে লাগল। কুমার গঙ্গানন্দ কালে-ভদ্রে পাটনায় আসতেন, ব'লতে বলেন—ব'লে দেবেন তিনি, ঠিক হ'য়ে যাবে। ঠিক হওয়া দূরের কথা, অবস্থার অবনতিই ঘটতে লাগল। ক্রমে বুঝতে পারলাম, সম্বন্ধটা দূর বা কাছের হোক, অন্ততঃ যাকে 'পেটোয়া' বলা হয়, কোন অজ্ঞাত কারণে সম্পাদক ভদ্রলোক বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি, ওদিকেও নিশ্চয় ব'লে যাচ্ছেন—চালিয়ে যাও, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

মাঝে প'ড়ে আমি যেন কণ্টক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছি। অনুভব করছি, ধীরে ধীরে সেই সহজ প্রীতির ভাবটা স'রে গিয়ে একটা ব্যবধান এসে পড়ছে কুমারজীর সঙ্গে।

হাঙ্গামাটা না এসে পড়লে কর্তব্যের খাতিরে আমায় সোজাসুজি বিরোধিতা করতেই হোত। ভদ্রলোক এইভাবে একটা গূঢ় চাপ দিয়ে নিষ্কণ্টক হলেন।...জমিদারি মেজাজ, 'হ্যাঁ'-তে-'হ্যাঁ' মেলাতে না পারলে তুমি হ'লে অবাঞ্ছিত। আমি আর চেষ্টা করা একেবারে ছেড়েই দিলাম।

চাকরি তার মোহ নিয়ে আমার পথেরও কণ্টকই হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে এটা আমিও তখন উপলব্ধি করতে পারছি।

আমার বয়স তখন আটচল্লিশ বৎসর পূর্ণ হ'তে মাত্র ক'টা দিন বাকি।

চাকরিতে ঘুরপাক খেতে হোল অনেক—মাড়োয়ারী স্কুল, মুখার্জি সেমিনারী, রাজস্কুল প্রথম পর্যায়, মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি, রাঘোপুর, মজঃফরপুরে দ্বিতীয় পর্যায়ে বি· বি· কলেজিয়েট স্কুল, পাণ্ডুল, কানহৈয়াজী, রাজপ্রেস, রাজস্কুল দ্বিতীয় পর্যায়, "ইণ্ডিয়ান নেশন"। মোট এগারো দফা। শিশুকালে সেজপিসিমা ত্রিনয়নী দেবীর সেই ভবিষ্যৎবাণী যে একেবারে ফল্‌ল না তা কি ক'রে বলি? ঘোরাঘুরি বাউণ্ডুলে বৃত্তির দিকে এই। অন্য দিকে, এমন একটা বেখাপ্পা বয়সে এনে ছেড়ে দিল যে, বিবাহ ক'রে সংসারে স্থিতু হ'তে চাইলেও কোন মেয়ের বাবা ভালো মনে দিতে চাইবেনা।

কিন্তু আমি বেশই আছি, এবং তার জন্যে সবাইকে ছেড়ে তাঁর স্বর্গত আত্মাকেই আগে প্রণাম জানাই। শুনেছি তিনিই কোন্নগরের বিশালাক্ষী দেবীর ফুল আনিয়ে কবচ ক'রে এঁটে দিয়ে আমার বিরূপ দৈবের সঙ্গে এই রকম মাঝামাঝি একটা রফার ব্যবস্থা করেন।

তাঁকে প্রণাম করি তাঁর এই সুপরিকল্পিত মধ্যস্থতার জন্যে। জীবনকে একেবারে পরিহার করবার জন্য যে জন্ম, তার সার্থকতা তো আমি খুঁজে পাইনি। জীবনই তো এক তীর্থ—সুখ-দুঃখের সুকোমল-সুকঠোরতায় সুনিশ্চিত বিরাট, বিচিত্র। তার মধ্যেই তো সর্বকালের সর্বলোকের মহাতীর্থপতি স্বয়ং অধিষ্ঠান ক'রে রয়েছেন। আবার তীর্থে অনিশ্চিতের সন্ধানে কেন ঘুরে ঘুরে আয়ুক্ষয় করতে হবে?

তবু বলব, এই রফা, এই মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা—এই হয়েছে ভালো। পিসিমার কবচ পুরোপুরি কাজ করলে, সংসারে একেবারে লিপ্ত হ'য়ে জড়িয়ে পড়লে, সে আবার কোথায় তলিয়ে যেতাম কে জানে?

আজ পর্যন্ত অনেক কিছু যে করলাম, অনেক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে, অথচ কিছু আমায় একান্তভাবে বেঁধে রাখতে পারল না, এর জন্যে কার কাছে নতি জানাই?

তাঁকেই বলি—হে দেব, এবার আমার একেবারেই মুক্ত তীর্থবাস। এবার আমায় যা দেবে, যা না-দেবে—সব প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মধ্যেই আমি যেন আরও মুক্ত, আরও নির্লিপ্ত রেখে যেতে পারি নিজেকে। সামনের মহামুক্তিকেই আমি যেন জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে রাখতে পারি।

আমাদের সংসারটি এখন নিটোল হ'য়ে পরিপূর্ণ।

আট ভাইয়ের মধ্যে দু'জন বিবাহ করলাম না। আমি আর আমার

সবচেয়ে ছোট ভাই, বিনয়। মেডিকেল পাস্ ক'রে মহারাজের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হ'য়ে কখনও দ্বারভাঙ্গা, কখনও তাঁর সঙ্গে ট্যুর ক'রে বেড়াচ্ছিল, কয়েক বছর ঘুরে বাড়িতেই নিজের ক্লিনিক ক'রে বসেছে। ভালোই করছে। আর সব ভাইও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত। ভাইপো ভাইঝিদের স্কুলের যুগ চলেছে। সবচেয়ে বড় ভাইপোটি পাটনায় আমার কাছে থেকেই ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, ওকেও মেডিকেলে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। সেদিক দিয়ে দ্বারভাঙ্গা সহরটাও অনেক এগিয়ে গেছে। এখন মহারাজ রামেশ্বর সিংহ-এর বদান্যতায় বিহারে পাটনার পর দ্বিতীয় চিকিৎসায়তন দ্বারভাঙ্গাতেই।

এবার সংসার।

ঠাকুরমা বহুদিনই গত হয়েছেন। বাবা-মা জীবিত। বাড়িটী বৃদ্ধ থেকে নিয়ে শিশু পর্যন্ত নানা কণ্ঠে নিত্যমুখরিত। প্রয়োজন মতো বাড়ান হ'য়েছে ওপরে ঘর তুলে। দুই বোনের একে একে বিবাহ বহুদিন পূর্বেই হয়ে গেছে। পুজা-উৎসবাদিতে তাদের সংসার নিয়ে এলে স্থানসংকুলান কঠিন হ'য়ে পড়ে।

আমরা কন্যা পার করার দ্বিতীয় স্তরে এখন। কন্যা (এবং সর্বজ্যেষ্ঠা সন্তান) রাণুর বিবাহ হ'য়ে গেল। তারপরের গুটি কয়েকেরও। সব ভাইয়ের মিলিয়ে গণনাতেও অনেকগুলি। বাকিও আছে। উপস্থিত এ-চিন্তা থেকে রেহাই নেই।

চায়ই বা কে মনে প্রাণে ? এই চিন্তাই তো সংসার, তাই না তারে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে সবাই।

আমার কথাই বলতে বসেছি ; একটা মস্তবড় রূপান্তর ঘ'টে গেল আমার জীবনে। এত দিন দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া ভাবেই কাটিয়েছি, এখন এতবড় সংসারটার মধ্যে আমিই একমাত্র "বেকার", বড় থেকে একেবারে ক্ষুদ্রটি পর্যন্ত সবাই আমায় টানতে লাগল—কেউ আদেশে, কেউ নির্দেশে, কেউ আবদারে, কেউ অভিমানে ; নবাগতদের দিকে হাসি-অশ্রুর মায়ায়।

নিটোল, পরিপূর্ণ সংসার, মুক্ত জীবনের নিটোল পরিপূর্ণ অবসর, আমার "স্বর্গাদপি গরীয়সী" রচনার যুগ এসে গেল। এমন পরিপূর্ণতার মধ্যে কে ভাবতে পারে সামনেই একটা বিরাট শূন্যতা নিজেকে প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে ?

৺পূজার দিন তিন চার আগেকার কথা। বাইরে থেকে বাড়িতে কি একটা কাজে এসে প্রবেশ করেছি, দেখি মা বারান্দায় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গরদের চওড়া লালপাড় শাড়িটা পরা, হাতে একটা ছোট বই, গীতা কিংবা চণ্ডী, বেশ বোঝা যায় ওপরে পূজার ঘরে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন।

অথচ ভরা বাড়ির স্বাভাবিক হৈ-চৈ, সবার কাজে-অকাজে ব্যস্ততা প্রশ্ন-উত্তর, ফরমাস—এ ছাড়া কিছু নেই। কিছু তেমন দেখতে না পেয়েই আমি প্রবেশ ক'রেই প্রশ্ন করলাম…"কি গা মা ? কি দেখছ ?"

মা হঠাৎ একটু অপ্রতিভ হ'য়েই ব'লে উঠলেন—"কৈ, কিছু না তো।" —ব'লেই তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন ওপরে। আমিও একটু থমকে দাঁড়িয়ে থেকেই, কি কাজে এসেছিলাম চ'লে গেলাম। একটু যেন কি রকম হ'য়ে গিয়েই।

এদিকে কিছুদিন থেকে মার এই ভাবটা লক্ষ্য ক'রে আসছি আমি, এইরকম একটু প্রাণ-চঞ্চলতা বাড়িতে দেখলেই কাজের মধ্যে অন্যমনস্ক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ছাখেন। মুখে একটি অদ্ভুত হাসি লেগে থাকে। কারুর নজর পড়লেই হাসিটুকু মিলিয়ে গিয়ে অপ্রতিভ হ'য়ে পড়েন।

আমার বেশ ভালো মনে হয়না। আমার মনে হয়, মার স্বভাবগত প্রসন্নতার পেছনে একটা আতঙ্ক জমে উঠছে ভেতরে ভেতরে। তাই থেকেই একটা বৈরাগ্য।

আমি যখন পাটনায় "ইণ্ডিয়ান নেশন" অফিসে, সে-সময় বাবা হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়েন, অবস্থা সঙ্কটাপন্নই হ'য়ে ওঠে। তখন এ রোগের আজকালকার মতো উন্নত চিকিৎসা ছিলনা। বাবা কিন্তু সেরে ওঠেন।

রাজস্কুলের ড্রিল-ও-ড্রয়িং-এর শিক্ষক ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের বাড়ির একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল খুব বেশি রকমই। দেশ থেকে পরিবারবর্গ নিয়ে আসার আগে তিনি আমাদের বাড়িতে থেকে আমাদের পড়াতেন। পরে বাবার মহম্মদপুরে থাকা কালে অনেকদিন ছিলেন বাড়িতে আমাদের অভিভাবক হ'য়ে।

বাবার প্রায় সমবয়সীই। খুব হৃদ্যতা ছিল ছু'জনের মধ্যে।

আমি বড় হ'য়ে চাকরি করছি, উনিও অনেকদিন রিটায়ার ক'রে পৌরোহিত্য, চিত্রাঙ্কন, ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন, ছেলেরাও উপযুক্ত হ'য়ে উঠছে, সেই সময়ের কথা।

একদিন, কি প্রসঙ্গে মনে পড়ছেনা, আমায় বললেন—"জানো

বিভূতি, তোমার বাবা একদিন আমায় কথাটা বলেন। স্ত্রী-পুরুষে থাকা না-থাকা, কে আগে যাবে, কে পরে এইসব নিয়ে নানারকম কথা হয়ই হালকাভাবে; আগেকার বিবাহে বয়সের পার্থক্যটাও একটু বেশি ছিল, তোমার বাবা ঠাট্টা ক'রেই আগে চ'লে যাওয়ার কথা বলেন। তাতে তোমার মা হাতের শাঁখা আর কপালের সিঁদুর দেখিয়ে জাঁক ক'রেই বলেন—"কারুর সাধ্যি নেই এ ছু'টো ঘোচাবার, আমিই সঙ্গে ক'রে আগে যাব, দেখে নিও।"...তা, দ্যাখো, অতবড় কঠিন রোগ, কয়েকবারই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় গেল, সাবিয়ে-সুরিয়ে দু'দিনের অসুখে স'রে পড়লেন তোমাদের মা। সেকালের মেয়েছেলের তেজ, আশ্চর্য লাগে এখন।"

পরে শোনা, কিন্তু মিলিয়ে দেখলাম, আমারও একটা অত্যন্ত সহজ ধারণা ছিল, মা রয়েছেন, বাবার সম্বন্ধে কিছু ভাবনা নেই। এদিকে এসে মার এই ভাবান্তরটা লক্ষ্য করছি। মিলিয়ে দেখছি, এটা যেন শুরুও হয়েছে বাবার অসুখটার পর থেকেই। মা যেন বাবাকে আর বিশ্বাস করেন না, যেন বাইরে-বাইরে অমন স্বাস্থ্য, কিন্তু যে-কোন সময় যে-কোন কাণ্ড ক'রে বসতে পারেন।

যা বোধহয় স্বাভাবিক, এই থেকেই সমস্ত সংসারের ওপব ধীরে ধীরে একটা বৈরাগ্য—এত সুস্থ, এত পূর্ণ, কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না, লোভ করা উচিত নয়।

মা যেন যা চেয়েছিলেন পাওয়া হ'য়ে গেছে। এবার মুখের হাসিটি বজায় রেখে স'রে পড়তে চান।

পরে যেমন টের পাওয়া গেল, ষষ্ঠী-সপ্তমীর দিন থেকেই শরীরটা একটু খারাপ হয়, চেপে যান, হট্টগোলের মধ্যে অসুবিধা হোলনা চেপে যেতে। অষ্টমীতে মেয়ে-বৌমাদের নিয়ে 'কালীয়াস্থানে' গিয়ে বাগমতী নদীতে স্নান ক'রে পুজো দিয়ে আরও দু'তিন জায়গায় ঠাকুর দেখে ফিরলেন। রাত্রে আরতি পর্যন্ত চাপাচুপি দিয়েই চলল; ফিরে এসে কিন্তু শয্যা নিতে হোল। ডাক্তার ডাকতে হোল, চিকিৎসা চলল।

পরে সবাই ভেবে আশ্চর্য হয়েছি, সবাই দেখছি মার এবার একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে, কিন্তু মা যে এত শীঘ্র যাবেন কারুরই মনে একবারও উদয় হয়নি। হয়েছে অসুখ, সহরের সেরা ডাক্তার দেখেছেন, ভালো হ'য়ে গেছেন।

দিনকতক জ্বের টেনে গেলেন মা। বিজয়া দশমীর দিন পিঠে বালিসের চাড়া দিয়ে একটু তুলে রাখা হোল, সেই অবস্থাতেই সকার

প্রণাম নিলেন। "কেমন আছো ?"—জিজ্ঞেস করলে সেই এক কথায় একই উত্তর—"ভালো।"

ত্রয়োদশীর দিনও ঐ উত্তর, তবে কণ্ঠস্বরটি অতি ক্ষীণ। শুধু এই দিনটা শেষের দিকে ৺পূজার ভাবটা লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে বাড়িটা থমথমে হ'য়ে রইল। সন্ধ্যার পরই মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাও কিন্তু হঠাৎই। কোথায় যেন শেষ পর্যন্ত সবাইকে নিশ্চিন্ত রাখবার জীবন-ভোরের চেষ্টাটা তখনও রয়েছে।

প্রথম দশ-বারোটা দিন একরকম ক'রে কেটে গেল। তার জন্যে নতশিরে প্রণাম করি শাস্ত্রকারদের, যাঁরা দিব্যদৃষ্টিতে জীবন-মৃত্যুকে এক পরিপূর্ণ সত্য জেনে তাঁদের বিধান দিয়ে গেছেন। বিদায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ীর পারলৌকিক কল্যাণের চিন্তা যথাযোগ্য সমারোহের সঙ্গেই। শোক করার, নিজের কথা ভাববার সময় কোথায় ?

কেটে গেল কটা দিন, সদ্য আঘাতের বেদনাটা একরকম ভুলে যেতেই।

তারপর, সে এক অদ্ভুত শূন্যতা, একটা সর্বব্যাপী অনীহা। জানি, জীবন আমার তার সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার বহু বিচিত্র উপাদান দিয়ে সে-শূন্যতা পূর্ণ ক'রে দেবে, কিন্তু সে দিন কত দূরে ?

বাড়ি অসহ্য হ'য়ে উঠল। যারা এসেছিল, একে একে চ'লে যাচ্ছে, আর যেন নিঃশ্বাস ফেলা যায় না বাড়িতে।

শিবপুর, কদমতলা থেকে বোনেরা এসেছিল পুজোয় আনন্দ করতে, আমিও তাদের সঙ্গে পড়লাম বেড়িয়ে।

প্রথমেই শান্তিনিকেতনের কথা মনে পড়ল।

স্মৃতির পথ আসলে এলোমেলো স্মৃতি-বিস্মৃতির পথ। এলোমেলো এইজন্য বলছি, যে-কথাটা যথাসময়ে যথাস্থানে আসা উচিত ছিল, লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে হঠাৎ অসময়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার বহুদিন থেকেই একটা যোগাযোগ থেকে গিয়েছিল। স্মৃতি-বিস্মৃতির গোলমালেই পূর্বে বলা হয়নি, প্রসঙ্গ ছেড়ে আগে সে-কথা ব'লে নিই।

শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা বরাবরই ছিল, কিন্তু দূরত্ব প্রভৃতি কারণেই হ'য়ে উঠছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন দ্বারভাঙ্গায় ব'সেই একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলাম।

খুব সম্ভব আমি তখন রাজস্কুলে দ্বিতীয়বার হেডমাষ্টারি করছি, হঠাৎ কি ক'রে খবর পেলাম শান্তিনিকেতন থেকে আচার্য বিধুশেখর ভট্টাচার্য রাজ ধর্মশালার দ্বিতলে মাননীয় অতিথিদের জন্য নির্ধারিত ঘরটিতে এসে রয়েছেন। ধর্মশালাটি আমাদের বাড়ির কাছেই, গিয়ে দেখা করলাম। সদাপ্রসন্ন অমন অমায়িক মানুষ আমি জীবনে কম দেখেছি। তাঁর কাছেই জানতে পারলাম, কবি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় ভারতে সদলবলে ভ্রমণে যাচ্ছেন, আচার্যমশাই অর্থ-সংক্রান্ত দৌত্যে মহারাজের কাছে এসেছেন। বোধহয় ছ'দিন ছিলেন। ওঁর বিপুল পাণ্ডিত্য আমাদের দু'জনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করলেও ওঁর মধুর সান্নিধ্যের জন্যে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা করেছি। একটি প্রতিশ্রুতি আদায় হয়েছে, গেলে উনি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পথ সুগম ক'রে দেবেন। পথ যে নিতান্ত দুর্গম নয়, এটাও তাঁর সান্নিধ্যে এসেই অনুমান ক'রে নিতে পারলাম।

তবু লক্ষ্যে যে পৌঁছুতে পারিনি তার ইঙ্গিত আগেই কোথাও দিয়ে থাকব।

অনেকগুলি ভুল ক'রে বসলাম। প্রথম ভুল, বিলম্ব। গ্রীষ্মের ছুটি সামনে, সেইটিই কাজে লাগিয়ে শান্তিনিকেতন হ'য়ে কলকাতায় চলে যাব। দ্বিতীয় ভুল, আচার্য মশাইকে একটা চিঠি লিখে উত্তর আনিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, সেটা করা হোলনা; কেন তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। তবে দেখেছি, এই রকম প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে কেমন ক'রে এই ফাঁকগুলো যেন থেকেই যায়। একটি চিত্রই কল্পনায় নিরন্তর চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে—শান্তিনিকেতনে গিয়েছি, আচার্য মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে তিনি কবির কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর চেয়ারে অর্ধশায়িত, যেমন ছবিতে প্রায় দেখা যায়—আমরা দু'জনে নীচে বসে, আলাপ আলোচনা চলছে···

এর মধ্যে আদ্যোপান্ত কত যে ফাঁক থেকে গেল নজরেই পড়েনা।

কল্পনা ছেড়ে এবার বাস্তবটায় আসা যাক—

প্রায় দুপুর এগারোটার সময় আমি গিয়ে বোলপুরে নামলাম। প্রথম ধাক্কা, শান্তিনিকেতন এখানে নয়, আরও তিন মাইল দূরে। মাথার ওপর ভরা গ্রীষ্মের রোদ, নীচে বীরভূমের কাঁকুরে জমি তেতে উঠেছে, সদ্য সদ্য একটা যে কোনও আশ্রয় না পেলে মারা যাব। কুলি, স্টেশনের বাইরে খানিকটা দূরে একটা হোটেলের কথা বলল।

সে-রকম নোংরা, মাছি-ভন ভন জায়গা যে হোটেলের নামে চ'লে

যেতে পারে ধারণা ছিলনা। প্রচণ্ড গরম, এদিকে গাড়ির ভিড়ের মধ্যে ঘুম হয়নি, দাঁড়াতে পারছিনা। কি ক'রে গামলার তোলা জলে স্নান সেরে, কি ক'রে বোক্‌ড়া চালের ভাত, তদনুরূপ ডাল-তরকারি কোনও রকমে নাকে মুখে গুঁজে, হোল্ডলটা পেতে শুয়ে পড়েছি ঘরের একটা কোণে, কোন হুঁস নেই। যখন ঘুম ভাঙ্গল, বিকাল হয়ে এসেছে। রোদে একটু একটু রং ধরেছে। হোটেলওয়ালা একটা ছৈওলা বলদ-গাড়ি ডেকে দিতে, তার প্রাপ্য চুকিয়ে যাত্রা করলাম।

এরপর চিত্রগুলি ছাড়াছাড়া অস্পষ্ট। অতিথিশালার ওপরে একটি ঘরে মোটঘাট রেখে একটা রাস্তা ধ'রে এগিয়ে যাচ্ছি। লোকজন খুবই কম। শান্তিনিকেতন শান্ত নিরিবিলি জায়গা ব'লে শোনা ছিল, কিন্তু এত নিরিবিলি হওয়ার কথা কি?...একটি যুবকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। পরিচয়ে জানলাম, এখানকার ছাত্র, জাতিতে মাদ্রাজী। বেশ বাংলা বলেন, তাঁরই কাছ থেকে সব খবর পেলাম। শান্তিনিকেতনের গ্রীষ্মের ছুটি হ'য়ে গেছে। আচার্যরা প্রায় সবাই চ'লে গেছেন। কয়েক-জন আছেন। অল্প কিছু ছাত্রও। আচার্য বিধুশেখর নেই। কবিও জোড়াসাঁকোয়, তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ আছেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করা যেতে পারে।

বড় ভালো লাগছে যুবককে। শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধে যেমন শোনা আছে তার যেন প্রতিমূর্তি, তার মধ্যে একটা লক্ষণ, এই মাদ্রাজী হ'য়ে চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। এদিকে বিনয়ী, মিষ্টভাষী। আর একটা জিনিস যা ভালো লাগল, যার দ্বারা উপকৃতজ্ঞ হ'লাম, আর যেটাকে তখন শান্তিনিকেতন-স্পিরিট ব'লে মনে হয়েছিল, তা হোল তাঁর দরদ আর সহানুভূতি। "তাঁদের" শান্তিনিকেতনে এসে কবির সঙ্গেই দেখা হোলনা, বাইরেও শান্তিনিকেতনের পূর্ণরূপটি দেখে যেতে পেলাম না, এতে আমার চেয়ে তিনি যেন কম ব্যথিত নন। সব বন্ধ, তবু সঙ্গে নিয়ে খানিকটা ঘোরাঘুরি ক'রে যতটুকু পারলেন দেখিয়ে আমায় দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে গেলেন।

কোন্ জায়গাটা তা একেবারেই মনে নেই, তবে চিত্রটি খুব স্পষ্ট। সন্ধ্যা হয় হয়, একটি আরাম কেদারায় 'কবির' মতোই গা এলিয়ে, তাঁর মতোই দীর্ঘচ্ছন্দ অবয়বে কেদারাটি পূর্ণ ক'রে অর্ধশয়ান হ'য়ে একাই রয়েছেন কবিভ্রাতা, শ্মশ্রুমণ্ডিত, সুগৌর মুখমণ্ডল, প্রথম দর্শনে কবির সঙ্গে কোন প্রভেদই লক্ষিত হয়না। গিয়ে চরণ স্পর্শ ক'রে আমরা দু'জনে পায়ের কাছে, ঘাসের ওপর বসলাম। সঙ্গী পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অনেকক্ষণ ধ'রে আলাপ হোল। তার খুঁটিনাটি মনে নেই, তবে আলাপের ধারাটা মনে আছে। ওঁর মতো একজন মানুষকে প্রথম পরিচয়েই অতটা দরদ, অন্তরঙ্গতা, আর সৌজন্যের সঙ্গে আলাপ করতে দেখার সৌভাগ্য আর কখনও হয়েছে কিনা জানিনা। তার মধ্যে ছিল আমার নিজের কথা, সাহিত্যচর্চা করি ব'লেই, দ্বারভাঙ্গারাজের সঙ্গে যুক্ত রাজবাড়ির কথা, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও সব কথা এসে পড়ছে। সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসতে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম। মনটা ভ'রে রয়েছে। পথে উঠে এসে যুবককে বললাম—"তবু অনেক কিছু হোল। সাক্ষাৎ কবিকে না পেলেও, ঠাকুরবাড়ির অনেকখানিই পাওয়া গেল।"

বললেন—"হাঁ, ঐ রকম শিশুর সারল্য। এদিকে অদ্ভুত রকমের জ্ঞান-পিপাসু। এবার দর্শন কিংবা গণিতের কোনও সমস্যা নিয়ে ঐরকম ব'সেই থাকবেন। না তুলে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত।"

পরদিন সকালেও যুবকটি সঙ্গে নিয়ে খানিকটা ঘুরলেন। যে গাড়িটাতে আগের দিন আসি সেই গাড়িতেই কলকাতা চ'লে গেলাম।

এর বেশ কয়েক বৎসর পরে হোল দেখা। তবে সে লিখে রাখবার মতো কিছু নয়। খবর দিয়েই যাই, তবে খবরটাই ছিল অসম্পূর্ণ। কবি শান্তিনিকেতনেই আছেন, তবে, সদ্য একটা বড় রকম অসুখ থেকে উঠে ডাক্তারের পরামর্শে সাক্ষাৎকার খুবই নিয়ন্ত্রিত। তবু পাওয়া গেল। অমিয়বাবু বোধহয় তখন একান্ত সচিব। সেদিনে দ্বিজেন্দ্রনাথের মতোই বাইরের একটা জায়গায় আরাম চেয়ারে অর্ধ-শয়ান হ'য়ে বসেছিলেন। প্রণাম ক'রে পাশে বসলাম। ক্লান্তই রয়েছেন, যার জন্যে আমার উপস্থিতিই আমায় যেন পীড়া দিতে লাগল, অনেকটা সঙ্কুচিতই ক'রে রাখল। ক্লান্তস্বরেই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারপর একটু যেন অবসাদটা কেটে গিয়ে কণ্ঠস্বর সহজ হ'য়ে এসেছে, অমিয়বাবু এসে একজন এমেরিকান কি ঐরকম বিদেশীর নাম ক'রে বললেন—দেখা হওয়া সম্ভব কিনা, জিজ্ঞেস ক'রে পাঠিয়েছেন।

কবি কপালে একবার হাতটা বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"নিয়ে এসো।" ...আমি প্রণাম ক'রে উঠে পড়লাম। Penalty of greatness (পেনালটি অব্ গ্রেটনেস্)—ওঁদের অব্যাহতি কোথায়? অতিথির গেষ্ট হাউস থেকে এসে পৌঁছাবার মধ্যে যতটুকু বিশ্রাম পান।

এরপর আমি শান্তিনিকেতনে বহুবার গেছি; থেকেছিও, যদিও ঠিক শান্তিনিকেতনে নয়, সুরুলে, শ্রীনিকেতনে প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। তাঁর সঙ্গে আমার কোন সভাসমিতিতে আলাপ হয়, তারপর

তাঁর চারিত্রিক গুণে এমন একটা আত্মীয়তা এসে পড়ে, যে-রকম বোধহয় বাইরের আর কারুর সঙ্গে হয়নি। উনি নিজে কবি, কর্মী হিসাবে গান্ধীজীর একান্ত অনুগত, তাঁর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের হাঙ্গামার ভেতরে গিয়ে থাকবেন বোধহয়। তাঁর কবিতাগুলি তাঁর কর্মজীবন এবং কারাজীবনের মধ্যেই লেখা। বেশিরভাগই "প্রবাসী"তে বেরিয়েছে; দীর্ঘ, মর্মস্পর্শী, আত্মবিশ্বাসে ভরা। বড় চিত্রশিল্পীও প্রভাতবাবু। তাঁর অনেকগুলি চিত্র বিদগ্ধ মহলে সমাদর পেয়েছে। একখানি বড় চিত্র পাটনার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পি. আর. দাস ক্রয় ক'রে কোন প্রতিষ্ঠানকে দান করেন।

প্রভাতমোহন কবিরও প্রিয়পাত্র ছিলেন। উনি বহুদিন পর্যন্ত কবি প্রবর্তিত 'বঙ্গভাষা প্রচার সমিতি'র অধ্যক্ষ ছিলেন ভালো বেতনেই। তিনি থাকাকালীন আমিও দ্বারভাঙ্গায় একটি কেন্দ্র খুলি।

প্রভাতবাবু অত্যন্ত দৃঢ়, অনমনীয় প্রকৃতির মানুষ। কয়েক বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনের একটি ব্যাপারে তৎকালীন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় উনি পদত্যাগ করেন। আর ফিরে যাননি।

প্রচারবিমুখ মানুষ, এ রকম কর্মী, এত গুণের অধিকারী হ'য়েও প্রভাতবাবু জনজীবন থেকে আস্তে আস্তে অবলুপ্তই হ'য়ে গেলেন।

সংসারটি ছোট, পরিচ্ছন্ন। আমি গোড়ার দিকে যখন গেছি, থেকেছি, তখন ওঁর শ্রীনিকেতনের বাসাতেই উঠেছি। একেরারে শুরুতে, উনি, ওঁর স্ত্রী ইন্দ্রানী, শিশুকন্যা রুচিরা। সে আমায় তার তদানীন্তন পুতুলের-সংসারে টেনে নিয়ে শাশুড়ী-জামাতার সম্বন্ধ পাতিয়েছিল। ইন্দ্রানীর গুণপনা ব'লে শেষ করা যায়না। কর্মজীবন থেকে নিয়ে গৃহস্থালী পর্যন্ত সর্বস্তরে অমন জীবনসঙ্গিনী পাওয়া এক দুর্লভ সৌভাগ্য।

আমার সৌভাগ্যের মধ্যে দুর্ভাগ্য; প্রভাতবাবুর সঙ্গে পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ, তখন শান্তিনিকেতন কবি-হীন। এইটুকু বাদ দিয়ে শান্তি-নিকেতনে যা কিছু পেয়েছি তা প্রভাতবাবুর মাধ্যমেই। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, আচার্য নন্দলাল বসু, আরও অনেকের সঙ্গে উনি ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত করিয়ে দেন। দেখবার যা কিছু আছে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে নন্দলাল বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার আমার জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনাই বলতে পারি। নন্দলাল ছিলেন দ্বারভাঙ্গার ছেলে। ওঁর ছেলেবেলায় পাঠারম্ভ আমার মতো দ্বারভাঙ্গার বাংলা স্কুলেই হয়। এরপর আমাদের সময় ওঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র বোস বাংলা স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। উনি ছিলেন দ্বারভাঙ্গারাজের ইঞ্জিনিয়ার।

রাজের একটা এক ঘোড়ার পাল্কি গাড়িতে ক'রে আমাদের স্কুলের সামনে দিয়েই অফিসে যাওয়া আসা করতেন।

নন্দলাল বাবুর কোয়ার্টার্সটি একতলা। সামনের জায়গাটুকুতে ছোট ছোট কতকটা রুক্ষই মল্লিকার ঝাড়। তাতে অজস্র ফুল; যেকটা বা পাতা আছে ফুলেই ঢাকা। সামনের ঘরটিতে নীচে একটা জলচৌকির সামনে ব'সে কি করছিলেন, আমরা গিয়ে বসলাম। আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রভাতবাবু।

সামনা-সামনি হ'য়ে বসেছি, মাঝখানে দ্বারভাঙ্গা তার পুরাতন আর নূতন কাহিনী নিয়ে। অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প হোল। উনি স্মৃতির মঞ্জুষা খুলে সে সব দিনের কথা ব'লে যাচ্ছেন অসীম আগ্রহে, আমি আজকের কথা ব'লে যাচ্ছি ওঁর প্রশ্নের উত্তরে। নূতন-পুরাতনে দ্বারভাঙ্গার একটা নবতর রূপ ফুটে ফুটে উঠছে। বড় অপূর্ব লাগছে।

সন্ধ্যা হ'য়ে যেতে উঠলাম। সুরুল বেশ অনেকখানি পথ, রাস্তায় আলো নেই। উনি উঠে এসে বিদায় দিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে মল্লিকা ফুলগুলি ঝক ঝক করছে, নিশ্চয় ইতিমধ্যে আরও ফুটে থাকবে। সুবাসে হাওয়াটা আরও যেন মন্থর।

আরও গেছি, আরও পেয়েছি, পরিচিত হয়েছি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে। একবার আমায় পরিচিত করবার জন্যেই প্রভাতবাবু একটা সভার ব্যবস্থা করলেন। বেশ খানিকটা মেলামেশা হোল।

একবার গেছি, শুনলাম সুনীতি চট্টোপাধ্যায় রাশিয়া থেকে ফিরে এসে তাঁর সেখানকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ভাষণ দেওয়ার জন্যে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন। খোলা জায়গায় বিরাট সভা। ইংরাজিতে তাঁর ভাষণ সেই প্রথম শুনলাম।

শান্তিনিকেতন তখনও কবি না থেকেও আছেন।

আজও আছেন কি?

বলেছি, মার যাওয়ার পর আমার মনটা নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই শান্তিনিকেতনে প্রথমে গিয়ে পড়েছিল। বোনেরা ওদিক দিয়ে হাওড়ায় চ'লে গেল। আমি ধরলাম শান্তিনিকেতনের পথ। সুরুলে বন্ধুবর প্রভাতমোহনের বাসা। ভুলই করলাম। সেখানেও তখন শোকের ছায়া। মনটা অস্থির হ'য়ে রয়েছে। শিবপুরেই চ'লে গেলাম। আবার ভুলই। শোকটা ভাগ ক'রে লঘু করার জিনিস নয়। সহোদরা বোন, পরস্পরের সান্নিধ্যে সেটা যেন দ্বিগুণ হ'য়ে উঠতে লাগল। দু'টো দিন থেকে বুদ্ধদেববাবুর কাছে চ'লে গেলাম।

উনি খবর পেয়েছিলেন। অমন দরদী মন তো হয়না। যেন প্রস্তুতই ছিলেন, বললেন—"বিভূতি বাবু, ক'বারই তো বলেছেন আমাদের দেশ রাজপুরে যাবেন, এই সময় আমার ছুটিটাও রয়েছে, চলুন হ'য়ে আসি।"

ওঁর বোন মাঝে মাঝে এসে থাকতেন ছেলেমেয়ে নিয়ে। আনিয়ে নিলেন, বাবাকে দেখবেন। রাজপুরের বাড়ি তালাবন্ধ। মাকে পাঠিয়ে দিলেন। দু'দিন পরে আমরা গেলাম।

চতুর ভিষক, প্রলেপটা কি, কি পরিবেশে দিতে হবে জানতেন। অন্ততঃ তখন-তখন ভালো ক'রেই ঘুরিয়ে দিলেন মনটা।

বাংলার একটা গড়পড়তা পল্লীগ্রামের মধ্যে যে এতটা শান্তি লুকানো থাকে আমি সেই প্রথম জানলাম। রাজপুর আদি গঙ্গার তীরের একটা পুরণো গ্রাম। আদিগঙ্গা অবশ্য মজে গিয়ে এখন "ঘোষের গঙ্গা," "বোসের গঙ্গায়" নিরুদ্ধ, তবু এ-অঞ্চলটা এখনও জীবন্ত; পুরণো-পুরণো আম-কাঁঠাল-নারকেল গাছে অনেকগুলি ছায়াচ্ছন্ন পুরণো গ্রাম নিয়ে। সোনারপুর রেলস্টেশন থেকে সড়কটা মজা আদি গঙ্গার ধারে ধারে কলকাতার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। বাড়িটা তার কাছাকাছি। সমস্ত গ্রামটাই বিরল-বসতি হ'য়ে গেছে, অনেকটা নিথর নিস্তব্ধ, তার মধ্যে এখানটা আরও নিরিবিলি।

এসব গ্রাম ডেলিপ্যাসেন্‌জারদের গ্রাম ব'লে দুপুর থেকে সন্ধ্যার খানিকটা পর্যন্ত আরও নিস্তব্ধ হ'য়ে যায়। পুরাতন আমগাছের নীচে ছোট বাড়িটিতে আমরা তিনজন। মা ভেতরে এটা ওটা কাজ নিয়ে, বা পাশের কোন আত্মীয় বা প্রতিবেশীর বাড়ি, আমরা দু'জনে শুয়ে ব'সে আলাপ্ করছি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়ে প'ড়ে। বেশির ভাগই সাহিত্য নিয়ে, তার মধ্যেও বেশির ভাগ শরৎবাবুর কথা নিয়ে। আমার কথা তুলতে দিতেন না। একদিন কি ক'রে আমার দিক থেকে এসে পড়তে বললেন—"থাক্‌না ওঁদের কথা। ঐতো এঁকেও দেখছেন, খাওয়াচ্ছেন-দাওয়াচ্ছেন, কতই আদর যত্ন, তারপর কোনও একদিন হঠাৎ চোখ বুজে বসবেন।...ছেলে মেয়ে আমাদের কপালই ঐ।"

বিকালে দু'জনে বেড়াতে যেতাম কলকাতার সড়ক ধ'রে।

প্রায়ই গিয়ে রাস্তার ধারে একটা বড় পুকুরের প্রশস্ত বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসতাম। "ঘোষের গঙ্গা" কি "বোসের গঙ্গা" এই রকম নাম। আরও কিছু কিছু লোক এসে বসত এই সময়।

সমস্তদিনের শান্তি এইখানে এসে একেবারে নিরেট হ'য়ে উঠত। এর পরেও একটা জিনিস ছিল যার জন্যে আমি সমস্ত দিনটা মনে মনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকতাম—শঙ্খধ্বনি। এর জন্যেই সন্ধ্যার

আগেই উঠে পড়তাম। গ্রামে প্রবেশ করতে-না-করতেই দূরে, কাছে, এখানে-ওখানে একের পর এক শঙ্খধ্বনি। তার সঙ্গে দূরের কোন মন্দিরের কাঁসরঘণ্টার শব্দ মিশে গিয়ে, সে যেন এক অ-পার্থিব ব্যাপার।

এইখানে একটা কথা ব'লে রাখা যায়; সন্ধ্যায় শঙ্খবাদন বাঙ্গালী গার্হস্থ্যেরই একটা মাঙ্গলিক নিত্য অনুষ্ঠান, অন্য কোথাও দেখিনা। আজকাল অবশ্য ধীরে ধীরে অনেক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই উঠে যাচ্ছে।

রাজপুরের ক'টা দিনের স্মৃতি অক্ষয় হ'য়ে আছে আমার মনে। থাকবেও, তার মধ্যে সেই নিরবচ্ছিন্ন শঙ্খধ্বনি আরও বেশি ক'রেই।

আরও বেশ কিছুদিন ওদিকেই কাটিয়ে দ্বারভাঙ্গায় ফিরে এলাম। পা ওঠেনা ফিরতে। তবু তো জীবনকে, জীবনের ব্রতকে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে। "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বইখানা শুরু করেছিলাম, সাধ ছিল মাকে শোনাবার, হোল না। দেখি, যদি বাবাকে শোনানো সম্ভব হয়।

এ-'যদি' টুকুর একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। বাবার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। এটা জানাই; ওঁদের দাম্পত্য জীবনটা এত উচ্চ সুরে বাঁধা ছিল, একজন গেলে অপরজনকে বেশিদিন যে ধ'রে রাখা যাবেনা এটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট ছিল সবার কাছে। এর ওপর দু'টো বড় বড় ধাক্কা খাওয়া ছিল। আমি যখন "ইণ্ডিয়ান নেশনে", বছর দু'য়েক আগে বাবার হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়া, দ্বিতীয় ধাক্কা আমার "ইণ্ডিয়ান নেশনের"র চাকরিটা যাওয়া। পূর্বেই বলেছি, এটা আপাত-দৃষ্টিতে একটা দুর্ঘটনা হ'লেও পরিণামে আমার সাহিত্যজীবনে সুফল-প্রসূই হয়েছে। কিন্তু হয়তো দাদা তাঁর দূরদৃষ্টি নিয়ে এ-সম্ভাবনাটা আন্দাজ করলেও বাবা মার পক্ষে সেটা সম্ভবই ছিলনা। বাবা খুব শক্ত ধাতের মানুষ, সবার মুখ চেয়ে বাইরে বাইরে নিজের মুখের প্রসন্নতাটুকু ধরে রাখবারই চেষ্টা করেন, কিন্তু ভেতরে যে ধ্বস নেমেছে এটা লুকানো থাকেনা।

আসলে একটা কথা চলিত আছে, মহাগুরুপাতের বৎসরটা দারুণ দুর্বৎসর হ'য়ে দেখা দেয়, আমাদের ক্ষেত্রে যেন চল্লিশের সমস্ত দশকটাই নিদারুণ হ'য়ে দেখা দিল। গোড়াতেই বাবার ঐ সঙ্কট ব্যাধি, সেটা কাটিয়ে উঠে আমারও প্রায় মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত গিয়ে রিক্ত অবস্থায় ফিরে আসা। মা গেলেন, একটু-আধটু কিছু না কিছু লেগেই রইল; প্রথম দিকটায় একটু বেশিই। তারপর সে ভাবটা কমেও আসতে লাগল। একটা বছর কেটে গেল। দ্বিতীয় বছরেরও কয়েকটা মাস।

তারপর এ-রোগের যা অনিয়মের নিয়ম, একদিন প্রায় বিনা কোন সূচনাতেই ওঁকেও গেল নিয়ে। চুয়াল্লিশের আষাঢ়, গুরু পূর্ণিমার দিন, মা যাওয়ার ঠিক একবছর আটমাস পঁচিশ দিন পরে।

অভিশপ্ত দশক। এরপরে ডাকটা এল তিনবছর ছ'মাস পরে। দাদা গেলেন ১৮ই জানুয়ারী ১৯৪৭।

পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের বাড়ির সমস্ত কাঠামোটাই গেল বদলে। একটা যুগই গেল বিচ্ছিন্ন হ'য়ে।

চাকরি জীবন থেকে স'রে এসে প্রথম অসুবিধা যা কিছুদিন ভোগ করতে হোল তা অর্থাভাব। একটা বাঁধা মাইনে ছিল, সেটা গেল। তবে প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠে এটা সয়ে যেতেও দেরি হোলনা; কেননা ধাক্কাটাই সেরকম রূঢ় হ'য়ে লাগতে পারেনি। তার কারণ, আমার একটা দুর্ভাগ্যই এই সময় সৌভাগ্যের আকারে এসে সহায়তা করল।।

দ্বারভাঙ্গা রাজের মাইনেটা ছিল বড় কম। অতবড় স্টেটের চীফ ম্যানেজারের মাইনেই ছিল পাঁচশত; সেই অনুপাতে আর সবার। আমার অবস্থাটা দাঁড়াল কতকটা অর্ধ পেনসন-ভোগী, অবসর-প্রাপ্ত কর্মচারীর মতো। তখন, অল্প হ'লেও, বই থেকে একটা আয় দাঁড়িয়ে গেছে; সেটা হাতে থেকে আরেকটা যেন পেনসনেরই মতো হোল। ক্রমে অবসর আর অন্যবিধ কয়েকটা কারণে লেখার সংখ্যা বাড়তে লাগল—ছোট গল্প, তার সঙ্গে মন্থর গতিতে উপন্যাসও। চাকরি ছেড়ে যে লোকসানটা হোল, সেটা পুষিয়ে নিতে বেশি দেরি হোলনা। এই-খানে উপন্যাস প্রকাশনার ব্যাপারে দু'টি নূতন প্রতিষ্ঠানের নাম করতে হয়, হয়তো আগে একটু উল্লেখও ক'রে থাকব। এ-দু'টি হোল "বেঙ্গল পাবলিশার্স" আর "মিত্র এণ্ড ঘোষ"। দুটিতেই লেখক অংশীদার রয়েছেন; বেঙ্গল-এ মনোজ বসু এবং মিত্র-ঘোষ-এ গজেন মিত্র এবং সুমথ ঘোষ। লেখকদের মন-মেজাজ, অভাব-অভিযোগ বোঝেন, বেশ একটা নূতন লাইন নিয়েই নামলেন। এঁদের অব্যবহিত পরেই এলেন "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স"। এঁরা সকলেই ছাপার উৎকর্ষে, ভালো আর্টিষ্ট দিয়ে বইয়ের অঙ্গসৌষ্ঠবে একটা নূতন ধারা প্রবর্তন তো করলেনই, অধিকন্তু লেন-দেনের ব্যাপারে, এবং সাধারণ সৌজন্যে লেখক প্রকাশকের মধ্যে সুস্থ সম্বন্ধ গ'ড়ে তুলে সমস্ত প্রকাশন ব্যবসাটায় একটা নূতন মর্যাদা এনে দিলেন। ঠিক এই জিনিসটা আজ

পর্যন্ত একভাবে চ'লে এসেছে, একথা বলা যায় না। ইতিমধ্যে সাহিত্য প্রকাশনে অনেক জটিলতা এসে গেছে। প্রকাশকরা এই টোন্‌টা ধ'রে রাখতে পারেননি, ফলে সাহিত্যিকদের ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়েছে। এটা কিন্তু অনেক পরের কথা। আমার বক্তব্য, সেই নূতন হাওয়া, সেই সন্ধিক্ষণে আমার খুব উপকারে লেগেছিল। এ ঝোঁকটা সামলে গিয়ে, অন্ততঃ আর চাকরির দিকে না গিয়ে, ভালো করেছি কি মন্দ করেছি, এ দ্বিধায় আর পড়তে হয়নি।

এই সামলে যাওয়ার দু'টো দিক আছে, একটা হোল, লেখার পরিমাণ ও সেই সঙ্গে পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আয়ের দিকটা। চ'লে গেছে একরকম ক'রে। অন্য-দিক হোল, যে পথটা বেছে নিলাম, তার মুক্তি, তার আনন্দ ॥

আমার নির্ভেজাল সাহিত্যজীবন আরম্ভ হোল। বোধহয় স্বাধীন স্বনিষ্ঠ বলা-ই ঠিক হবে। যদি নির্ভেজাল অর্থে ধরা হয়, আর সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, মনের গুহা আশ্রয় ক'রে অতন্দ্র তপস্যায় মগ্ন থাকা, তাহ'লে তাতে আর যে-ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ হোক্, সাহিত্যে হয়না। সাহিত্যে মুক্তি সবার মধ্যে মুক্তি, সব কিছুর মধ্যে মুক্তি। চাকরি থেকে মুক্ত হ'য়ে এবার আমি আমার সত্তাকে আরও বৃহত্তর পরিধির মধ্যে ছেড়ে দিলাম—আরও ঘোরা, আরও দেখা, আরও শোনা, আরও চিন্তা-মননকে সহায় ক'রে নিয়ে। প্রথম কাজ হোল উপন্যাসের দিকে যাওয়া। "নীলাঙ্গুরীয়"-তে একটা আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল, এরপর বহুদিনের সাধ থাকলেও যাতে সাধ্য নেই, আমার সময় নেই ব'লে মনে হয়েছিল, সেটা হাতে নিয়ে বসলাম; আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ, "স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

চাকরি থেকে স'রে এসে বর্ধিত অবসরের অনুপাতে আমার লেখার ভল্যুম্ বেড়ে আমার গ্রন্থের সংখ্যা যে খুব বৃদ্ধি পেয়েছে এ কথা বলতে পারি না। আজ আমার গ্রন্থের সংখ্যা পঁচাশি-ছিয়াশির মধ্যে। শ্রেষ্ঠ-গল্প-জাতীয় এবং একই ধরণের গল্প বেছে (যেমন 'রেলরঙ্গ', 'প্রণয় বিচিত্রা' প্রভৃতি) বাদ দিয়ে, একেবারে মৌলিক গ্রন্থ থাকে আশি-একাশি। প্রথম গ্রন্থ "রাণুর প্রথম ভাগ" প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে, এই সময় থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে আমার দশখানি গ্রন্থ বের হয়। বয়স হিসাবে দেখতে গেলে মোটামুটি বাইশ থেকে (প্রথম গল্প 'অবিচার', "প্রবাসী") বিয়াল্লিশ, এই কুড়ি বৎসরে দশখানি বইএর যোগ। রচনা; গল্প, উপন্যাসে। তার মধ্যে উপন্যাস মাত্র একটি।

এই গেল আমার ছাত্র ও চাকরি জীবনের সাহিত্যকর্ম ; তার মধ্যে ছাত্রজীবনে মাত্র একটি গল্প।

এবারে চাকরি-মুক্ত জীবনে আসা যাক। ১৯৪২ থেকে ১৯৭৭ এই ৩৫ বৎসরে আমার গ্রন্থের সংখ্যা ৭৪। প্রথম স্তরে মোটামুটি পঁচিশ বৎসর কলম চালাবার ফলশ্রুতি দশখানি বই, তার জায়গায় দ্বিতীয় স্তরে চুয়াত্তরখানা (সঙ্কলনাদি বাদ দিয়ে প্রায় ৬৮।৬৯ খানা), তুলনায় জাঁক করার মতো সংখ্যা বলা যায় বৈকি। কিন্তু সেজন্য নয়, আমি এই তুলনামূলক অনুপাতটা দিচ্ছি এইটুকু দেখাবার জন্যে যে চাকরি নিয়ে থাকলে এদিক দিয়ে আমার সাহিত্যজীবনে আরও কী ক্ষতিটা হ'তে পারত। আরও বিশেষ এই জন্যে যে, লেখক হিসাবে আমি খুবই মন্থরগতি। তা ছাড়া এক জায়গায় ব'সে, সময় বেঁধে নিয়ে দিনের পর দিন লিখেই যাওয়া আমার দ্বারা হয়না। আহারের পর ব'সে গভীর রাত্রি পর্যন্ত লেখা—নিদ্রাদেবীকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে—সেটা বহু লেখকেরই দুর্লভ ক্ষমতা এবং রচনা প্রাচুর্যের জন্য দায়ীও—আমি সে ক্ষমতা থেকেও বঞ্চিত। এতগুলি অ-লেখকোচিত দোষ নিয়ে এ ক'খানি বইও যে লিখতে পেরেছি তার জন্য আমি "পনেরোই আগষ্ট উনিশ বিয়াল্লিশ"-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

তাহ'লে আর একটু আত্মবিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক।

এর মধ্যে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সাধনায় অক্ষমতার জন্য হয়তো আমি নিজে দায়ী, অনুতাপও হয় সেজন্য ; কিন্তু একজায়গায় ব'সে দিনের পর দিন একটানা লিখে যেতে না পারার জন্যে দায়ী আমার সেই কোষ্ঠী, যা শৈশব থেকেই আমার শুভার্থীদের বিচলিত্ ক'রে তুলেছিল।

আমি শুধু একটা কথাই বলব— এ অক্ষমতার জন্য কিন্তু আমি একদিনের জন্যও অনুতপ্ত নই। যদি কিছু থাকেই অনুতাপ তো, তা এই জন্যে যে, কাজের দিকে ভালো ক'রে ফলল না কেন আমার এই কোষ্ঠী ?

আর একটু স্পষ্ট করি কথাটা,—সাহিত্য আমার জীবনে যত বড়ই হোক, জীবন তার চেয়ে তো বহুগুণই বড়। সাহিত্য জীবনের একটা খণ্ডিত অংশ মাত্রই তো। সে-জীবনকে আমি কতটুকু পেলাম? অন্য দিক দিয়ে বলতে গেলে, যে বিরাট-বিচিত্র বিশ্বনিয়ন্তার অসীম করুণায় আমার জীবন-কণিকা স্থান পেল, কতটুকু পেলাম আমি তার ? কতটুকু দেখতে-শুনতে-জানতে পারলাম ? কতটুকুই বা হবে প্রতিফলিত এই অতি-সীমিত জীবন বুদ্‌বুদে ? একস্থানে, এক সুখে, এক দুঃখে নিগড়িত হ'য়ে থাকলে যা পাব তা আরও কতটুকু ? সুতরাং "চরৈবতি,

চরৈবেতি”—সুতরাং আমার আশৈশবের কোষ্ঠীকে প্রণাম; আমার রুদ্ধ যাযাবরত্বের পথ খুলে দেওয়ার জন্যে বিয়াল্লিশের আগষ্টকে প্রণাম।

তবু মনোমত হল কৈ? আমার কোন একখানা বইয়ে আমি সে-কথার একটু উল্লেখ করেছি। ভারতের বাইরে যাওয়ার অদৃষ্ট তো হোলনা। ভারতেও পাঁচজনের মধ্যে ব'সে দেমাক করবার মতো দ্রষ্টব্য দেখে নেওয়া হ'য়ে ওঠেনি আমার। কাশ্মীর দেখা হয়নি, ভাবতেও লজ্জা করে; আরও মাথা হেঁট হয়ে থাকে, যখন ঘরের কাছের দার্জিলিংয়ের গল্প অপরের মুখে শুনতে হয়। হিমালয়ের মহাপ্রস্থানের তীর্থগুলি আমায়, আমার মহাপ্রস্থানের জন্যেই রেখে দিতে হয়েছে।

কারণ অনেকগুলি আছে, সুযোগও অনেকগুলি নষ্ট হয়েছে ব'লে অনুতাপও হয়, তবু বলব, অল্প যেটুকু হয়েছে তার মধ্যে, কবির ভাষায় "একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু"র মহিমা দেখতে পাওয়ার সান্ত্বনাটুকু আমায় দিয়ে গেছেন আমার বিধাতা তাঁর অসীম অনুকম্পায়।

এই অল্পের মধ্যেই যতটুকু পারি দেখে নেওয়ার মনোভাব নিয়েই আমার দুই ভাইয়ের চাকরি-জীবনের যতটা পেরেছি সুযোগ নিয়েছি। আর, দু'টি ভাইপোরও। এদের চারজনেরই দু'বছর-তিনবছর অন্তর বদলি হ'য়ে বেড়াবার চাকরি, ভাইয়েরা এখন অবসরপ্রাপ্ত, ভাইপোরা চাকরিতেই। আমি অল্প পরিসরের মধ্যে বাংলাকে দেখা—তার ভঙ্গী এবং পরিধির কথা বলেছি, সাহিত্যে কিছু ধ'রে রাখবার চেষ্টা করেছি, ভাই আর ভাইপোদের সঙ্গে সঙ্গে আমার খানিকটা দেখা হ'য়ে গেছে যেখানে জন্মেছি, জীবন কেটে গেল, সেই বিহারকে—তার নানা জাতি-উপজাতি, তার বিস্তীর্ণ সমতল, হিল্লোলিত উপত্যকা-অধিত্যকা, তার পর্বত-অরণ্য, তার নদী-নির্ঝরের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যে।

দুই ভাইয়ের চাকরির গোড়া থেকেই শুরু হয়ে গেছে, আমারও তখন চাকরির জীবনই চলছে। তার ফাঁকে ফাঁকে, বিশেষ ক'রে স্কুলের চাকরির সময় দীর্ঘ ছুটিগুলোয় আমি বেরিয়ে পড়তাম। বড় বড় সহর থেকে নিয়ে বিহার-উত্তরপ্রদেশের সীমান্তে সুদূর গোপালগঞ্জ পর্যন্ত দেখা হ'য়ে গেল; থাকা, মেলা-মেশা, পরিচয়, পর্যটন, কিছু সভা-সমিতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—বেশ আনন্দে কেটে যেত দিনগুলি। যত জায়গায় এইভাবে ঘুরেছি প্রত্যেকটির সম্বন্ধে বলা সম্ভব নয়, তবে দু'একটার ছাপ মনের মধ্যে বেশি ক'রে থেকে গেছে—তার স্মৃতিচারণে একটু যেন বিশেষ রকম আনন্দ আছে।

অনেকগুলি চাকরি-জীবনের, দূর অতীতের কুহেলীর মধ্যে দিয়ে টেনে আনতে হয় ব'লে আরও স্বপ্নময়। অনেকগুলি ভাইপোদের চাকরিস্থলের সঙ্গে জড়িত, সাম্প্রতিক স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করছে।

আমার ষষ্ঠ ভ্রাতা মণি নূতন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ পেয়ে তখন ছাপরার মহকুমা গোপালগঞ্জে, বোধহয় দ্বিতীয় বদলি তার। আমি তখন বোধ হয় পাণ্ডুল স্কুলে কাজ করছি, গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে গেলাম।

গোপালগঞ্জের স্মৃতিটা আরও মিষ্ট হ'য়ে রয়েছে এইজন্যে যে জায়গাটা আমার দু'টো ভুল ভাঙ্গিয়ে যেন দু'হাত বাড়িয়ে ডেকে নিল।

প্রথম ভুল বা ভুল আশঙ্কা, জায়গাটা নিয়েই।

উত্তর বিহারের ভূ-ভাগ ধীরে ধীরে বাংলার নিবিড় শ্যামলতা হারালেও মিথিলা পর্যন্ত সুশ্যামলই বলতে হয়, মোটামুটি পশ্চিম দ্বারবঙ্গ জেলা পর্যন্ত। আমি এই প্রাকৃতিক সাম্যের জন্যই প্রচলিত দ্বারভাঙ্গা না ব'লে, দ্বারবঙ্গ কথাটাই ব্যবহারও করলাম এখানে। এরপর থেকেই ভূমির শ্যামলতা কমতে কমতে উত্তর প্রদেশের রুক্ষতা এসে পড়েছে। গোপালগঞ্জ একেবারে শেষপ্রান্তে, তায় যাচ্ছিও মাঝ-গ্রীষ্মে, মনে বেশ একটি আশঙ্কা নিয়ে বের হই, বুঝি উত্তরাখণ্ডের লু-বোলানো গরমের মধ্যে গিয়ে পড়ছি। গিয়ে দেখলাম, মাঝখানে খানিকটা রুক্ষতা এসে পড়লেও, আবার যেন 'মিথিলা'ই। শুধু গাছপালা আর মাটির সরসতাতেই নয়, আবহাওয়াতেও। ঋতু হিসাবে স্নিগ্ধ নয় নিশ্চয়, তবে অসহনীয়ও নয়। আমার এই স্বস্তির আর একটু কারণ হোল যে পরিবেশের মধ্যে গিয়ে উঠলাম অনেকটা তার জন্যেও। মণি বাড়িটা পেয়েছিল, একটা লম্বা, প্রশস্ত, পুরনো আমলের বাংলোর এক অংশে। হয়তো নীল চাষ আমলের কোন সাহেবদেরই। কমতে কমতে এদিকেও কিছু ছড়ানো ছিল তাদের সংখ্যা।

ঘরগুলা বড় বড়, খুব উঁচু দেওয়াল; ওপরে, ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে মোটা খড়ের ছাউনির ওপর খাপরা বিছানো। কুঠিয়ালদেরই স্টাইল। সমস্ত বাড়িটাই বড় বড় গোটা দুই গাছের ছায়ায়; বোধহয় পুরনো অশ্বত্থ। সামনে সদর রাস্তা; তার পরেই বিস্তীর্ণ আমবাগান সমস্ত জায়গাটাকে ছায়াছন্ন ক'রে রেখেছে। সমস্তটুকু মিলিয়ে এখন সে নিদাঘের উত্তাপকে একটু মাথা নীচু ক'রে নিতেই হবে। ঠিক এতটা না হ'লেও সমস্তটুকু কমবেশ ক'রে এই রকম স্নিগ্ধ শ্যামল। ছোট, মহকুমা সদর। বিহারের ছাপরা আর আরা জেলার কমনীয় ব'লে সুনাম নেই বড় একটা। গোপালগঞ্জে—অন্ততঃ তখনকার গোপালগঞ্জে মনে হয়েছিল পরুষবপু বাপের বুকে তার আদরের শ্যামাঙ্গী ছোট মেয়েটি।

আমার আর একটা আশঙ্কা ছিল, নিশ্চয় সঙ্গীর অভাবে প'ড়ে যাব। মণি তো তার আফিসে, নূতন চাকরি, বাড়িতেও ফাইলের গাদা নিয়ে বসবে; একলা ব'সে করা কি? একঘেঁয়েমির মধ্যে লেখা খোলেনা আমার, তখন লেখাটাকে এভাবে নেওয়াও হয়নি।

গিয়ে দেখলাম, সঙ্গীর অভাব গোপালগঞ্জ এমন ক'রে মিটিয়ে রেখেছে যে, কলমের পাট বন্ধ রাখলেই ভালো। সেই দিনই সন্ধ্যার পর দেখা করতে এলেন—স্থানীয় স্কুলের দু'জন শিক্ষক, ওখানকার প্রবীণ এবং প্রধান উকিল বেনীবাবুর দুই ছেলে 'ভন' এবং রাধু। এর মধ্যে ভন বাবার জুনিয়ার হ'য়ে কোর্টে ঢুকেছেন। এঁরা চারজনেই আমার চেয়ে কিছু ছোট। গল্প বেশ জমে উঠেছে, একটু রাতও হয়েছে, হরিবাবু এলেন, হরি ঘোষ বোধ হয়। বয়স হয়েছে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, শরীরে একটু স্থূল, চুলে বেশ পাক ধরেছে, এখানকার প্রথম সারির উকিলের মধ্যে একজন। পরিচয়টা গল্প প্রসঙ্গে আগেই পেয়েছি, আসতে একটু সমীহ ক'রেই দাঁড়িয়ে উঠে, 'আসুন' বলে অভ্যর্থনা করব, একটু মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চেয়ে বললেন—"তা আসছি; কিন্তু এত দেশ থাকতে আপনাকে কে এই আঘাটায় এসে উঠতে বলেছিল?…লেখক মানুষ, একটু রস কস থাকবার কথা…"

সবাই হেসে উঠল। মণি বলল—"আরম্ভ হোল, হরিদার!"

এসে বসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের বাতাসটা আরও হাল্কা ক'রে তুললেন।

ঠিক এই ধরণের মানুষ এক শুধু রাজস্কুলের হেডমাষ্টার বগলা-বাবুকেই দেখেছি, যাঁর কথা পূর্বে বলেছিও আমি। সুরসিক, এক নম্বরের আড্ডাবাজ, বয়সে প্রবীণ হ'লেও যুবকের চেয়েও যুবা। হরিবাবুর মাথার প্রায় সব চুল পাকা ব'লে তাঁকে দেখে মনে হোত গ্রীণ ওল্ড এজ্ (Green old age) কথাটা যেন তাঁকে পেয়ে সার্থক হ'য়ে উঠেছে। এদিকে দু'জনেই নিজের নিজের বৃত্তি বা পেশায় শীর্ষে। দু'জনে গল্প করতে করতে হঠাৎ এক-একবার শালীনতার বাঁধ বরাবর গিয়ে পড়তেও দেখেছি।

বগলাবাবু ছিলেন সংস্কৃতয় এম.এ., সেই সূত্র ধ'রে রীতিমতো শাস্ত্রাভিজ্ঞ। হরিবাবুও একদিন বেড়াতে বেড়াতে কি প্রসঙ্গে যোগ সম্বন্ধে বেশ খানিকটা ব'লে ব'লে গেলেন। পরে টের পেলাম, চর্চাও ছিল। অথচ দু'জনেই ছিলেন অন্তঃ প্রকৃতিতে শিশুর মতো সরল। সব মিলিয়ে দু'জনে ওই সঙ্গে সম্ভ্রম, সখ্য এমন কি শিশুর মতোই স্নেহ-বাৎসল্য আদায় ক'রে নেওয়ার মানুষ।

পরদিন আরও দু'জনের সঙ্গে পরিচয় হোল। স্কুলের হেডমাষ্টার,

পাঠকমশাই, নামটা ভুলে যাচ্ছি। মালদহ, কি মুর্শিদাবাদ জেলার মৈথিল ব্রাহ্মণ। আচার-ব্যবহার ষোলআনা বাঙ্গালী। বয়সে আমার চেয়ে বড়ই, তবে হরিবাবুর চেয়ে বেশ কিছু ছোট। অসুস্থ ছিলেন, বিকেলে মণির সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম।

সেই দিনই রাত্রে কালো এসেই "মেজকাকা? এসে গেছেন?" ব'লে প্রণাম ক'রে পুলক-বিস্ময় জাগিয়ে দিল মনে। ও কলকাতায় ভেটার-নারি কলেজ থেকে আমার ষষ্ঠ ভ্রাতা অবনীর সঙ্গে হোষ্টেলে থেকে একই বছরে পাস করেছে। নামটা গায়ের রং থেকেই পাওয়া; এদিকে বেশ সুঠাম দেহযষ্টি, সবচেয়ে বিশিষ্ট ওর টানা টানা চোখ দু'টি, আর তাদের উজ্জ্বল, খানিকটা কৌতুক-চাপল দৃষ্টি। পূর্ণতর পরিচয়ে টের পেলাম, কালো হচ্ছে 'হরিদার' সঙ্গে দলের দ্বিতীয় উইট (Wit) বিশেষ ক'রে কারুর কোনো মুদ্রাদোষ বা দুর্বলতা নকল করায়ও ছিল অদ্বিতীয়। ওর আসল নাম সুধাংশু।

গোপালগঞ্জে আর তিন জনের কথাই বেশি ক'রে মনে পড়ে।

গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালের বড় ডাক্তার অমরবাবু আর ষ্টেশন মাষ্টার। গোপালগঞ্জের তখনকার বাঙ্গালী সমাজ এইখানেই শেষ হ'য়ে গেল। এখনকার গোপালগঞ্জ মহকুমার পরিচয় ঘুচিয়ে নিজেই একটি সদর জেলা স্তরে। বাঙ্গালীদের সংখ্যা বেড়েই থাকবে।

কাজ, আহার নিদ্রা, বিকালে দল বেঁধে টহল দিয়ে বেড়ানো।

বেড়াবার পরিধি ছোট্ট সহরটুকুই; তার মধ্যে মাঝে মাঝে ষ্টেশন। গোপাপগঞ্জের রেলস্টেশন হরখুয়া। গোপালগঞ্জ থেকে মাইল দু' আড়াই পথ। ব্রাঞ্চ লাইন, গাড়ির আসা যাওয়া কমই। চওড়া প্ল্যাটফরমে চেয়ার বিছিয়ে আমাদের আড্ডা চলত। উঁচু প্ল্যাটফর্মে ফুরফুরে হাওয়া, চারিদিকে নীরব-নিস্তব্ধ। জ্যোৎস্না থাকলে গা তুলে ফিরে আসতে মন চাইত না।

তখন আমার পুরোদমে ফুটবল খেলা চলছে। মণি রয়েছে, আর একজন উৎসাহী উদ্যোক্তা ছিলেন কোর্টের সেকেণ্ড অফিসার, বিহারী, মণিরই প্রায় সমবয়সী। বেশ মিশুকে। স্কুলের মাঠে মাঝে মাঝে বাইরের দল ডেকে ম্যাচ বা নিজেদের মধ্যেই। কয়েক মাইল দূরেই হাথোয়া, সেখানকার টীমের সঙ্গেও কয়েকটা ম্যাচ হ'য়ে গেল, ডেকে আর পাল্টা ভিজিট দিয়ে।

মাস দেড়েকের ছুটি; দিনগুলো যেন পালকে ভর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল।

গোপালগঞ্জের স্মৃতিটা আরও সতেজ হ'য়ে রয়েছে অন্য এক কারণে। এখানে থাকতে আমার একটা বড় কাজ হ'য়ে গেল আমার জীবনের, একদিন সদলবলে গিয়ে বুদ্ধদেবের সমাধিস্থান কাশেয়া, বা, কুশীনগর দেখে এলাম।

একদিন গল্প প্রসঙ্গেই কথাটা উঠল। গোরক্ষপুর জেলার ওদিকটা বুদ্ধদেবের স্মৃতি-জড়িত। তার মধ্যে জন্মস্থান লুম্বিনী আর মহানির্বাণ-স্থান কুশীনগর দু'টি প্রধান তীর্থভূমি। লুম্বিনী অনেক দূরে। বর্ষা এসে পড়ছে, ক'জন শিক্ষকই, ছুটি ফুরিয়ে আসছে, লুম্বিনী হবে না, এবার কুশীনগরটা সেরে রাখা স্থির হোল।

সহরের ভেতরে হ'লে আমাদের বৈকালিক আড্ডাটা একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দোকানে বসত; একধারে ডিস্‌পেন্‌সারি, আর ভেরাইটি স্টোর্স্‌ (Variety stores)—মনিহারী দ্রব্য থেকে নিয়ে ফ্রক, পেনি, গেঞ্জি, বাংলার তাঁতের শাড়ি, চা, বিস্কুট পাউরুটি, ডিম—সব কিছু। সে-সময়কার কলকাতার বিখ্যাত ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সের নামানুযায়ী নাম পড়েছিল গোপালগঞ্জের 'আর্মি-নেভি' স্টোর্স।

খুব উৎসাহের সঙ্গে প্ল্যান হচ্ছে, দোকানী ভদ্রলোক একটা টাইম-টেবিল বের করেছেন, এরও খানকতক কপি রাখতেন বিক্রীর জন্যে—হরিদা' এসে উপস্থিত হ'লেন। সিঁড়ির একটা ধাপে পা দিয়ে বললেন—"আজ নরক যেন বেশি গুলজার মনে হচ্ছে!"

সবাই হৈচৈ ক'রে উঠল—"আসুন, আসুন হরিদা', আপনাকেই খুঁজছি।...আমরা কুশীনগরে যাওয়ার প্ল্যান আঁটছি!..."

"তা যাও; বাঁচব, নরক দু'টো দিন ঠাণ্ডা থাকবে।"

"বাঃ! আপনাকেও যেতে হবে!...আপনি না হ'লে চলবে কি ক'রে! ...যজ্ঞেশ্বর হরি বিনে যজ্ঞ!..."

সবাই জড়াজড়ি করে ব'লে উঠল।

কালো একটু মুখ বাড়িয়ে বলল—"আপনার তো আরও যাওয়ার কথা, হরিদা, মহানির্বাণের পথ, মহাপ্রস্থানের চেয়েও সিওর (Sure)।"

"আর তোমরা কাঁধকাঠ হ'য়ে সঙ্গে যাবে?"—উঠে এসে বসতে বসতে বললেন হরিদা; আমার দিকে চেয়ে বললেন—"একবার আস্পর্ধাটা দেখলেন বিভূতিবাবু! আপনি আবার এদের প্রশংসা ক'রে স্বর্গে তুলে দিয়ে এসেছেন। কর্তা বলছিলেন আমায়।"

কর্তা, অর্থাৎ বেণীবাবু। একদিন দেখা ক'রে অনেক গল্পসল্প ক'রে এসেছি। ওঁর কাছেই হরিদা'র আরও পরিচয় পেয়েছি। বিশেষ ক'রে কোর্টের দিকটা...ওঁর আইনজ্ঞান, বাগ্মিতা, ব্যবসায়ে সততা।

ভন্ বললেন—"আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন কাকাবাবু? তিনি মহানির্বাণের পর পুনর্জন্মের কথাও তো ব'লে গেছেন। জাতকের..."

"ক্ষ্যামা দাও বাপু!" শিউরে উঠে ঘুরে বসলেন হরিদা'—"ঘুরেফিরে আবার হয়তো এই আঘাটায়!...তোর বাবার সঙ্গে কেস নিয়ে আজ আবার তর্কাতর্কি হ'য়ে গেল। নমস্য মানুষ, কি ভাবেন। মনটা এত খারাপ হ'য়ে আছে!"

হেডমাষ্টার পাঠকমশাই বললেন—"নিন্ মশাই! উকিলে-উকিলে কোর্টের কথা কাটাকাটি। 'দাম্পত্যে কলহে চৈব'-র চেয়েও অসার বস্তু..."

—কথার কথায় হাসি উচ্চকিত হ'য়ে উঠছেই। যাবেনই। কথাবার্তা সেইদিকেই এগিয়ে আনছেন হরিদা, একসময় বললেন—"সবাই জিদ ধ'রে ব'সে আছ, বিভূতিবাবুও মনে করবেন, মানুষটা কিরকম একগুঁয়ে—যেতে পারি, তবে, (নিজের বড়ছেলের নাম ক'রে)—মার কানে কথাটা কেউ ওভাবে—মানে, নির্বানটির্বান দিয়ে তুলবে না।"

—ভয়ের অভিনয় ক'রেই।

আমি বললাম—"সেদিকে আমার মনে হয়, আপনি নিশ্চিন্দি থাকতে পারেন হরিদা। আপনার যাত্রা-ফল মহানির্বাণ হোল, কি, পুনর্জন্ম হোল, সে অনেক পরের কথা—কেউ দেখতেও যাচ্ছে না। কিন্তু ঠানদিদিকে যে একথা শোনাতে যাবে, তার কপালে তো নগদ বিদায়, ঝাঁটা। কেউ সাহসই করবে না।"

হাসি-হুল্লোড়ের মধ্যে যাওয়াই সাব্যস্ত হোল।

আমাদের কুশীনগরের যাত্রাটা ঘটে বাংলা ১৩৪১ সালের আষাঢ় মাসের কোনদিন, ইংরাজী ১৯৩৪-এর জুন-জুলাইয়ে। ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা, স্মৃতি স্বভাবতঃই খানিকটা আবছা হ'য়ে গেছেই। ফিরে এসে কয়েকদিন পরে আমি "কাশেয়ার যাত্রী" নাম দিয়ে একটা লেখা "প্রবাসী"তে পাঠিয়ে দিই এবং ১৩৪১-এর ভাদ্র সংখ্যায় সেটা ছাপা হয়। আমি সমস্ত লেখাটাই এখানে যথাযথ তুলে দিলাম, যাতে দূর অতীতের কোনরকম অস্পষ্টতা না এসে যায়—

কাশেয়ার যাত্রী

[প্রবাসী : ভাদ্র ১৩৪১]

ছাপরা জেলার নগণ্য মহকুমা গোপালগঞ্জ নগরীটি যেন পৃথিবীর শেষপ্রান্তে পড়িয়া আছে। বি. এন. ডব্লিউ. আর-এর, মেন লাইন

হইতে বহুদূরে—যে-কোন একটা বড় শহর হইতেও বহুদূরে এই জায়গাটি সভ্যতার আঁচ থেকে অতি সন্তর্পণে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এক-একবার একটু অস্বস্তি হয় বটে;—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন মারা গেলেন, চারদিনের পরে খবর পাওয়া গেল; কিন্তু আবার এও মনে হয়,—মন্দ কি, তাঁহাকে চারদিন বেশী পাওয়া গেল, আমরাই লাভে রহিলাম।

আট-দশ ঘর বাঙালী, বেশ মিল—সম্ভবতঃ বারোয়ারির দুর্গাকালী এবং পাঁঠাবলির অভাবেই এখনও পর্য্যন্ত বজায় রহিয়াছে। একটি রা উঠিলেই সমস্বরে সাড়া ওঠে, ছোট বড় ভেদ নাই। সব কাজেই—"কুছ পরোয়া নেই, লেগে পড়"—ভাবটা এই রকম। প্রথমবার ডাক্তারবাবুর মোটরে ঘুরিয়া আসিয়া যখন কাশেয়ার মহাপরিনির্বাণ স্তূপের কথা বলিলাম, একধার থেকে সব মাতিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, আর দেরী করা নয়। সামনের রবিবারটিকে সবাই কাজকর্ম্ম ছাঁটিয়া-ছুঁটিয়া পরিস্কার করিতে লাগিয়া গেলেন।

টিকিট হিসাবে সাড়ে-এগারোজনের একটি দল হইল। এগারোজন গোটা মদ্দ। একটি আদ্ধা চাকর, সে আমাদের সামলাইবে। চিন্তার কথা হইল খাওয়া-দাওয়ার কি করা যাইবে। নানারকম প্রস্তাব উঠিল। কেহ বলিল—লুচি তৈয়ার করিয়া লইয়া যাওয়া হোক, কেহ বলিল—কিছু পাউরুটি, বিস্কুট, ফলমূল। ভোলাবাবু বলিলেন—"তারচেয়ে ডেকচি খন্তিটন্তি নিয়ে চল, আর একটা ষ্টোভ, দুটি চাল ফুটিয়ে নেওয়া যাবে 'খন, দুটি ভাত না হ'লে বড় কষ্ট হবে,—কথায় বলে—অন্নগত-প্রাণ বাঙালী।"

সুধাংশু তাহার গলার জোরে এবং হাত পা-নাড়ার চোটে সব ছিন্নভিন্ন করিয়া আসর দখল করে। বলিল—"ভগবান বুদ্ধ একদিন সারা রাজ্যটা ত্যাগ ক'রে নেংটি প'রে বেরিয়ে গিয়েছিলেন; পিঠে একটা তৈরি হোটেল কি আস্ত রান্নাঘর বেঁধে তাঁর নির্বাণস্তূপ দেখতে যেতে লজ্জা করবে না?"

সুধাংশুর ভয়েই হোক্ কিম্বা বুদ্ধদেবের খাতিরেই হোক্, সবার যেন একটু লজ্জা করিল। ঠিক হইল কিছুই লওয়া হইবে না; যেখানে যা জোটে। খালি, বসিবার জন্য খানছয়েক সতরঞ্চি যাইবে।

উদ্যোগপর্ব্বটা নিরুদ্বেগ হইল।

কাশেয়া (পুরাতন কুশীনগর) যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার একটি ছোট্ট মহকুমা। বি.এন. ডব্লিউ-র মেন লাইন হইয়া গেলে তহশিল দেউড়িয়ায় নামিতে হয়, সেখান হইতে ২০ মাইল মোটর

সার্ভিস আছে। আরও একটি রাস্তা আছে। মেন্ লাইনের সেওয়ান স্টেশন হইতে একটি ব্রাঞ্চ নেপাল তরাইয়ের কোল ঘেঁষিয়া গিয়া আবার গোরক্ষপুরে মেন্ লাইনে গিয়া যুক্ত হইয়াছে; এই লাইনের পাড্রাওনা স্টেশন হইতে নামিয়াও যাওয়া চলে। কাছে পড়ে এইদিক হইতেই। এগারো-বারো মাইল পথ; তবে মোটরের ভাড়া একই রকম। শুনিলাম, তাহার কারণ ওদিককার পথটা বরাবরই নাকি ভাল। পাড্রাওনা হইতে রোড্-বোর্ডের রাস্তাটি খানিকটা ভাল হইলেও অধিকাংশ শোচনীয়, বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে। আগাগোড়া নানারকম এক্সপেরিমেণ্টের ধাক্কায় সমস্ত রাস্তাটি কাবু করিয়া ফেলিয়াছে।

আমাদের স্টেশন হারখুয়া হইতে ভোর ৪৷৷৹ টার সময় গাড়ী। এদিকে প্রায় মাসাবধি বৃষ্টির নামগন্ধ ছিল না, কিন্তু দিন বুঝিয়া সেদিন চারিদিক অন্ধকার করিয়া উপপ্রান্তে বৃষ্টি নামিয়া 'প্রভাতের মেঘডম্বর' শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করিয়া এমন ফ্যাসাদ বাধাইবে কেহ ভাবিতেই পারে নাই। বাদলের শৈত্যে সবার উৎসাহের তাপ কমিয়া আসিতে লাগিল। কতদূর কি হইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় বরাবর গাড়ীটা সবেগে স্টেশনে আসিয়া প্রবেশ করায় আমাদের সবার মনেও একটা গতিশীলতার ছোঁয়াচ লাগিল। আর অগ্রপশ্চাৎ না-ভাবিয়া হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়া গেল।

চাকর বিভ্রাট! গাড়ী ছাড়িলে টের পাওয়া গেল ত্রিবেনিয়া নিরুদ্দেশ! অথচ তাহার কাছে যে সতরঞ্চির পোঁটলাটা ছিল তাহা সামনেই বেঞ্চির তলায় রহিয়াছে।

পরের স্টেশনে গাড়ী বদলি; কুলির মাথা হইতে সতরঞ্চিসমেত ত্রিবেনিয়া নামিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে প্রশ্ন করিল—"কৌনাই স্টিশন বা?"

"হারামজাদাকে আজ খুন করব"—বলিয়া সুধাংশু অগ্রসর হইতেই সকলে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। হরিবাবু বলিলেন—"থাক্।···দেখত, সাতটা সতরঞ্চিই ঠিক জড়িয়েছিল ত গায়ে? গাড়ী ছাড়ে এইবেলা গুণে দেখ। খুঁজে পেতে খুব সামলাবার লোক বার ক'রেচ, সুধাংশু।"

গাড়ী ছাড়িল। আমাদের সহযাত্রী মেঘটা পঞ্চম কি ষষ্ঠ স্টেশন পর্য্যন্ত আমাদের সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিয়া নিরস্ত হইল। তাহার পরে দেখিলাম হাল্কা হাল্কা খণ্ড মেঘ, দু-ধারের দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ক্ষেতের উপর রোদ ও ছায়ার যুগললীলা চলিয়াছে। আমরা যুক্ত-প্রদেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। বেহারের ছাপরা জেলার তুলনায়

জমির উর্ব্বরতা কম ; কিন্তু তাহা হইলেও মাঝবর্ষায় আর সেটা চোখে পড়ে না। নানারকম শস্যে, সবুজে সবুজে সমস্ত জমিটা ঢাকা ; যদি এতটুকু কোথাও সাদা জমি থাকে ত তাহাও চষা—মই দেওয়া, তকতকে ঝকঝকে—বেশ বোঝা যায় শস্যসম্ভবা, দু-দিন পরেই শিশুশস্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আখের চাষটা এদিকে খুব বেশী। ষাট—পঁয়ষট্টি মাইলের মধ্যেই ছাপরা জেলা লইয়া গোটা-ছয়েক চিনির কল। বেহার যুক্তপ্রদেশে আধাআধি করিয়া ধরিলে গড়ে প্রতি দশ মাইলে একটা কল পড়ে। আরও গোটা দুই উঠিবে, সরঞ্জাম হাজির। অনেকে বলিতেছেন একটা হুজুগ আসিয়াছে,—স্পেকুলেশন—সাগরের এই উদ্ধ্ দগুলা আপোষের মধ্যেই ধাক্কাধাক্কি করিয়া মরিবে। থাক, ওসব বড় কথা বুঝি না। শান্ত, শ্যামল ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে লোকের অর্থাকাঙ্ক্ষার প্রতীক এইসব অনুষ্ঠানগুলা দেখিলে মনে হয় লোকগুলা কর্মের মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবে বাঁচিয়া আছে, লাভ-লোকসানের ঢেউ খাইতে খাইতে। বাংলা কোথায় ?

চারখানি থার্ডক্লাস গাড়ি লইয়া আমাদের ট্রেনখানা ; ইঞ্জিনটা লঘুতার আনন্দে যেন উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছে। আটটা কুড়িতে আমরা পাড্‌রাওনায় আসিয়া নামিলাম।

জায়গাটি আবার একটি রাজধানী, স্টেশন থেকে প্রায় মাইল-দেড়েকের মধ্যে রাজবাটি ; শহরটা ছোট্ট, আর অত্যন্ত নোংরা, যেন একটা বড় শহরের ন্যায়সঙ্গত ময়লা এইটুকু চৌহদ্দির মধ্যে কোন-রকমে গাদাগাদি করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া আছে। রাজা, প্রাসাদের বিজলী-বাতি শহর পর্য্যন্ত চারাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহ নিশ্চয়ই ; কিন্তু না হইলে লোকেরা দিনের দৃশ্যগুলা রাতে ভুলিয়া থাকিতে পারিত। এ সুখের চেয়ে সে স্বস্তি বোধহয় ছিল ভাল।

মোটর-বাসে প্রায় পৌনে ন'টার সময় পাড্‌রাওনা ছাড়িয়া আমরা এগারো-বারো মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সাড়ে ন'টার কাছাকাছি কাশেয়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম। শহর বলা মোটেই চলে না। আমরা যে-রাস্তাটা হইয়া আসিলাম, এবং যেটা সোজা তহশিল-দেউড়িয়া গিয়াছে, তাহারই উপর শ'দেড়েক ঘরের বস্তি। চোখে ঠেকে আদালত বাড়ীটা, মুন্সেফ আর ডেপুটি বাবুদের কোয়ার্টার্স, দু-একঘর উকিল-মোক্তারের বাড়ী, একটা ইনস্পেকশন বাংলো, থানা, ব্যাস। আরও আগাইয়া গিয়া একটি হাসপাতাল ও একটি পশু-চিকিৎসালয় আছে শোনা গেল। রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে। আদালত বাড়ীর কাছ দিয়া একটা রাস্তা পূর্বে-পশ্চিমে এই রাস্তাটি ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে,—

ছাপরা-গোরক্ষপুরের যোজক। পশ্চিমে মোড় থেকে প্রায় তুই মাইল দূরে, একটা মহাপরিনির্ব্বাণ-স্তূপ, এই রাস্তা দিয়াই যাইতে হইবে। স্থানটিকে এখানে মাতাকুঁয়ার বলে।

মোড় ফিরিয়া গাছের ছায়ায় আমাদের বাসটি দাঁড় করান হইল। এইখানে আহারাদির একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে, কারণ, মাতাকুঁয়ারে কিছু পাওয়া যায় না। রোদ বেশ চড়চড়ে হইয়া উঠিয়াছে, মোটরেও কেহ বেশ আরামে আসে নাই। পুরীর (স্থানীয় লুচি) কথা মনে হইলেই জ্বর আসে। রবিবার, আদালত-প্রাঙ্গনে লোক বিরল, তবুও মোটর ঘিরিয়া কয়েকজন দাঁড়াইল। গাড়ীতে বসিয়াই জিজ্ঞাসাবাদ চলিতেছে—তুটি ভাত পাইবার কোনও উপায় হইতে পারে কিনা। এদিককার রান্না তরকারি ত মুখে দেওয়া যাইবে না; যদি ফিরিয়া আসিয়া একটু মাছ কিংবা মাংসের ঝোল হয় ত তবুও কোনরকমে বুড়া আঙ্গুলের ঠেলা দিয়া তুমুঠো ভাত পেটে চালান দেওয়া যায়। আমি বললাম—"তা কি রকম ক'রে হবে? রাধু এরা মাংস খায়ই না, এদিকে হরিবাবু ত একেবারে উগ্র বৈষ্ণব, মাছ মাংস শুনেছি বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে আনলে খুন পর্য্যন্ত করতে..."

এমন সময়—"হাঁ! কালিয়া মিলতা হ্যায়! কোন চিজকা কালিয়া?" ইত্যাকার নিরতিশয় আগ্রহপূর্ণ প্রশ্ন বাহিরে শোনা গেল, মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম—একটি ছোটখাটো ভীড়ের মাঝখানে হরিবাবু, কখন নামিয়া গেছেন টেরও পাই নাই। আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ওহে, এরা বলছে মাংসের কালিয়াও দিতে পারে, তবে আর ভাবনাটা কি?"

আমি নূতন লোক, বিমূঢ়ভাবে একবার যোগেশবাবুর দিকে চাহিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"জানেন না বুঝি? ঐ ত্রিসীমানার বাইরে হরি বাঁশী ছেড়ে অসি ধরেন—একেবারে ঘোর শাক্ত।"

কাণ্ডকারখানা দেখিয়া খুব একচোট হাসি চলিল। হরিবাবু গোপালগঞ্জের 'হরিদা', গোপালগঞ্জের বারোআনা জীবন তাঁহাকে লইয়া,—শ্রদ্ধায়, প্রীতিতে, রহস্যে তাহা প্রতিনিয়তই প্রকাশ পায়। সুধাংশু বলিল—"এইবার গিয়ে বৌদিদিকে বলব,—দোহাই অন্ততঃ সপ্তায় একদিন ক'রে হরিদার জন্যে মাছ-মাংস বরাদ্দ কর, নইলে তাঁকে নিয়ে তীর্থ-ধর্ম্ম করা দিনদিন বিড়ম্বনা হ'য়ে দাঁড়াচ্চে।"

জন-তুয়েক হোটেলের সন্ধানে বাজারের দিকে চলিলাম। পাছে কালিয়া বাদ দিয়া আসি, বোধহয় এই ভয়ে হরিবাবুও সঙ্গ লইলেন। সরেজমিনে গিয়া দেখা গেল—হোটেল বলিয়া কোন বস্তু নাই। একটি

ছোট্ট খোলার ঘরের নোংরা বারান্দায় তে-বাসটে একখানি কাপড় পরিয়া নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন একটি লোক রান্না করিতেছে। এগারোজন বাঙালী খদ্দের পাইয়া সে সব রকম, কষ্ট এবং অসুবিধাই স্বীকার করিতে রাজী হইল,—বারান্দা, উনান পরিষ্কার করিতে, রাঁধিবার তৈজসপত্র মাজিয়া লইতে, কাপড় ছাড়িতে, এমন কি নিজের বরাঙ্গের উপর একবার ভিজা গামছাটা বুলাইয়া লইতেও।

হরিবাবু বলিলেন—"বলিস কি! গায়ে গামছা ছোঁয়াবি?...আহা, বুদ্ধদেবের নির্বাণভূমি, ত্যাগধর্ম ওদের একচেটে।"

রাঁধিয়া দিবে ভাত, কলাইয়ের ডাল, একটা তরকারি, পটলভাজা ও কালিয়া। কথায় কথায় বোঝা গেল এখানে 'কালিয়া' মানেই মাংস, রান্নার একটা বিশেষ বিধির নাম নয়। ফিরিলাম। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, একটু জল আনাইলে হইত। চাকরটাকে উঠাইতে দুই-তিনবার গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া যাইতে হরিবাবু বলিলেন—"শরীরে যা সামান্য একটু জল পুঁজি আছে, তাও খুইয়ে আর কাজ নেই, এইটুকু চ'লে যাবে।...সুধাংশু এই এনডিওরেন্স স্লীপার (Endurance sleeper)-টাকে ঘুমের জন্যে কত ক'রে মাসহারা গুণতে হয় হ্যা!"

সুধাংশু দাঁতে দাঁত দিয়া চাকরটার ঘুমন্ত চোখ দুটার পানে চাহিয়া বলিল,—"চল বেটা বাড়ি তুই, দেখ্‌বো..."

হরিবাবু বলিলেন—"আগে যাতে বাড়ি গিয়ে পৌঁছোয় সেইটে দেখো।...কোথায় একটা কাপড়ের পুঁটুলির মত পড়ে থাকবে, কেউ দেখলেও বলবে না, ভাববে—বাবুরা যাক, আস্তে আস্তে সিন্দুকে তুলে থোব।"

মোটর ছুটিল। এই রাস্তাটুকু অতি চমৎকার, একটুও হ্যাঁচকানি লাগেনা। হ্যাঁচকানির অভাবে, কে কবে কোথায় হাড়ভাঙ্গা হ্যাঁচকানি খাইয়াছে সেই গল্প সুরু হইল, এবং এই লইয়া অভিজ্ঞেরা ভালরকম তাতিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই কয়েকজনের মুখে সমস্বরে একটা আনন্দ-কলরব উঠিল—"ঐ দেখা দিয়েচে!"

দূরে, বামদিকে বর্ষাপুষ্ট শ্যামবৃক্ষরাজি ভেদ করিয়া মহাপরিনির্ব্বাণ-স্তূপের স্বর্ণাভ বিশাল গম্বুজ; শীর্ষে উপর্য্যুপরি তিনটি স্বর্ণছত্র, যেন একটা বিরাট নিরঞ্জন অগ্নিশিখা। এক অপূর্ব দৃশ্য। সবার মাথা সম্ভ্রমে নুইয়া আসিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা যথাস্থানে আসিয়া পড়িলাম। বেলা তখন সাড়ে-দশটা।

স্তূপের এবং তৎসংলগ্ন বিহারের ভগ্নাবশেষের পাশেই একটি ধর্ম্মশালা। আমরা পাশেই একটি আম বাগানে নামিলাম। সুধাংশু

চাকরটাকে নামাইয়া দাঁড় করাইয়া দিল। দু-একজন খানিকক্ষণ ধরিয়া রহিল। তাহার ঢুলুনিটা একটু কাটিলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাড়িটি একতলা। তিনদিকে প্রায় খানদশেক ঘর। প্রশস্ত উঠানের মাঝখানে একটি কূপ, আশে পাশে কলা আর কিছু কিছু ফুলের গাছ। যাত্রীদের সুবিধার জন্য থী-জা-রী নামে আরাকাননিবাসী কোন এক ধনকুবের বাড়িটি পনেরো হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার একটি প্রতিকৃতি বারান্দায় টাঙ্গান। বাড়িটির নির্ম্মাণের তারিখ সংবৎ ১৯৯৮।

আমরা যে-সময় গেলাম সে-সময় চার-পাঁচজন ভিক্ষু বর্ত্তমান ছিলেন; একজন সিংহলী, বাকী সব বর্ম্মী। অধ্যক্ষ যিনি তাঁহার বয়স হইয়াছে, অতি অমায়িক এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত লোক। আমাদের সহিত অনেকক্ষণ নানাবিষয়ে আলোচনা করলেন। ইহার পূর্বে যখন আসিয়াছিলাম, বুদ্ধের মৃত্যু-সম্পর্কে শূকর-মাংসের কথাটা পাড়িয়াছিলাম। বলিলেন—"হ্যাঁ; কথা একটা ঐরকম চলিয়া আসিতেছে বটে, তবে মতভেদ আছে এ-বিষয়ে, আর তিনি যে শূকর-মাংস খাইয়াছিলেন এ-কথা বিশ্বাস করাও যায় না। কথাটা হইতেছে 'শূকর অথবা সুকর মর্দ্যব'। যদি দন্ত্য-সকার ধরা যায় তাহা হইলে 'সু' অর্থাৎ কল্যাণ করে এমন কোন মৃদু দ্রব্য (মৃদুর ভাব ইতি মর্দ্যব) তাঁহাকে তাঁহার ভক্ত সেবন করিতে দিয়া থাকিবে। এইটাই সম্ভব; কারণ তাহার পূর্ব্বে তিনি বৈশালীতে প্রিয় শিষ্য আনন্দকে এই বলিয়া কুশীনগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নির্ব্বাণ সন্নিকট। সেজন্য ভক্ত যে উৎকণ্ঠার বশে কোন আরোগ্যজনক রসায়ণ বা ঐ জাতীয় কোন দ্রব্য দিবে তাহাই যুক্তিসঙ্গত।"

তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া আমরা উঠিলাম। মহাপরিনির্ব্বাণ স্তূপটিকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বিঘার উপর শ্রমণদিগের জন্য বিহার-গৃহ ছিল। বর্ত্তমানে সবগুলিরই উপরকার ছাত পড়িয়া গিয়াছে, শুধু জায়গায় জায়গায় কোন কোন গৃহের আদলটা বজায় আছে। ঠিক স্তূপের সামনেই যেটা, সেটা সবচেয়ে বড় এবং প্রায় বুক পর্য্যন্ত দেওয়ালে তাহার আদলটা বজায় আছেও সবচেয়ে বেশী। বাড়িটা চতুষ্কোণ, চারিদিকে ছোট ছোট প্রায় আটাশটি ঘর ছিল বলিয়া বোধ হয়। ঘরগুলার সামনে ভিতরদিকে বারান্দা, মাঝখানটিতে একটি প্রশস্ত উঠান। দেওয়ালগুলা উপরে প্রায় চার-পাঁচ ফুট করিয়া চওড়া। ইঁটগুলো আজকালকার ইঁটের চেয়ে ছোট, কিন্তু বেশ সুগঠিত। যে-চত্বরটির উপর মহাপরিনির্ব্বাণ-

স্তূপ দাঁড়াইয়া—তাহার কার্ণিসে অনেকগুলি নানারকম কাজ করা সুদৃশ্য ইঁট। গাঁথুনিও বেশ চমৎকার, জায়গায় জায়গায় ইঁটগুলা যেন মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে,—কি মশলা দিয়া গাঁথা ধরা যায় না। জমি হইতে গাঁথুনি লক্ষ্য করিয়া আসিলে দুই-তিনটি যুগের নিশানা পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ পুনর্গঠন এই প্রথম নয়, এর পূর্ব্বেও কয়েকবার হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে এক-একটা কূপ, প্রায়ই বুজিয়া গিয়াছে, এ-ছাড়া মাঝে মাঝে শ্রমণদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধি-স্তূপও বর্ত্তমান।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কীর্ত্তির মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া আমরা মাঝে মাঝে অতীতের মধ্যে নিজেদের হারাইয়া ফেলিতেছিলাম। বিশ্বের হিতে সমস্ত জীবন ব্যয়িত করিয়া জরা-কবলিত রোগাক্লিষ্ট তথাগত মল্ল-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যা। ঐ স্তূপটি যেখানে তাহার সামনে, দুইটি শালবৃক্ষের মাঝখানে, শোক-কম্পিত হস্তে শিষ্যবৃন্দ শয়ন করাইল। তাহার পর মহানির্ব্বাণ! পৃথিবী যেন মুহূর্ত্তেই নিষ্প্রভ হইয়া গেল।···মহাকালের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বহিয়াই চলিয়াছে। ক্রমে এই মহাশ্মশান আশ্রয় করিয়া যুগের পর যুগ ব্যাপিয়া বিরাট ভাবের উচ্ছ্বাস স্তূপে, চৈত্যে, বিহারে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। কত মহাপ্রাণতার অলিখিত কাহিনী যে হেথায় বিদ্যমান, কে বলিবে?

মাথার উপর সেই সব মহিমময় কীর্তির শাশ্বত সাক্ষী সূর্য্যদেব, পায়ের নীচে ধ্বংসাবশেষ আর চারিদিকের দৃশ্যের বিরাট শূন্যতা—যাহাতে বর্ত্তমানের কোন বিশিষ্টতার ছাপই পড়ে নাই,—এই-সব মিলাইয়া অতীতের সঙ্গে যেন একটা অদ্ভুতরকম আত্মীয়তা অনুভব করিতেছিলাম।

এই প্রধান বিহারটির পূর্ব্বে, গা' ঘেঁষিয়া স্তূপের চত্বরটা; এর সামনের দিকটা একটি লম্বা-গোছের নাতিউচ্চ মন্দির। তাহার মধ্যে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ ফুট দীর্ঘ বুদ্ধদেবের একটি শয়ানমূর্ত্তি, লাল পাথরে তৈরী, সমস্তটা সোনালী রঙ্‌ মাখান। মন্দিরগাত্রসংলগ্ন একখানি ধাতুফলকে উৎকীর্ণ আছে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডিরেক্টর এ.সি. কারলাইল সাহেব এই মূর্ত্তিটিকে পুরানো মন্দিরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে শতখণ্ডিত অবস্থায় আবিষ্কার করেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে, যেখানে আজকাল মূর্ত্তিটি শয়ান, সেইখানেই দুইটি শালগাছের মাঝখানে বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণলাভ হয়। সে-সময় সমস্ত স্থানটি একটি শালবন ছিল এবং ইহারই কোল ঘেঁসিয়া হিরণ্যবতী নদী প্রবাহিত হইত। নদীটি একটি সোঁতার আকারে আজও বিদ্যমান, তবে

প্রায় মাইল-দেড়েক পূর্ব্বে সরিয়া গিয়াছে। স্থানীয় ভাষায় এর নাম 'রামাভার'।

বৌদ্ধযাত্রী ও এখানকার শ্রমণেরা এই মূর্ত্তিটিরই পূজা করেন। মন্দিরটি ব্রহ্ম, চীন, জাপান দেশীয় নানাবিধ পতাকা ও পূজার উপঢৌকনে পূর্ণ। ধর্মশালার একটি কক্ষে আরও চারিটি মূর্ত্তি রক্ষিত আছে; তিনটি শ্বেত-পাথরের, একটি পিতলের। এত সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি খুব কমই দেখিয়াছি।

ছোট মন্দিরটির গায়েই মহাপরিনির্ব্বাণ-স্তূপ। স্তূপটি বহুদিন যাবৎ ভগ্ন, হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। বিগতে নবেম্বর ১৯২৬ সালে য়ু-পো-কিও নামক কোন এক ব্রহ্মদেশীয় ভক্তের অর্থে, গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে স্তূপটি আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হয়। দেখিলাম যাহারা এই মহাশ্মশানে নূতন করিয়া বুদ্ধদেবের পুণ্যস্মৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মদেশীয় এবং এইজন্যই ব্রহ্মীদের আধিপত্য ওখানে বেশী।

স্তূপটির উচ্চতা একশত ফুটের উপর হইবে, বেড়ও শ-খানেক ফুটের কাছাকাছি। প্রায় দুই-মানুষ উচ্চতা পর্য্যন্ত সিমেণ্ট প্লাষ্টার, তাহার পর সমস্তটা সোনালী রং দিয়া মাজা, মনে হয় যেন সোনার পাত দিয়া মোড়া। এখানকার সংরক্ষক বলিল,—"শুধু এইটুকুতেই ৭৫০০০ টাকা লাগিয়াছিল।" লোকটা অল্পসল্পের দিকে যায় না, ওর কথাগুলাও সোনার পাত দিয়া মোড়া,—সচরাচর প্রদর্শক বা সংরক্ষকদের যেমন হইয়া থাকে।

খননকার্য্যের সময় স্তূপের মধ্যে বুদ্ধদেবের কতকগুলি অস্থি ও অন্যান্য কয়েকটি কি দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহার কতকাংশ না-কি এখন লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে।

মহানির্ব্বাণ-স্তূপ ছাড়িয়া আমরা মাতাকুঁয়ারের দিকে চলিলাম। স্থানীয় লোকেরা সমস্ত নির্ব্বাণভূমিটাকে মাতাকুঁয়ার বলিলেও, আসল মাতাকুঁয়ার একটু দূরে। এখানে নবনির্মিত একটি চতুষ্কোণ গৃহে কাল পাথরে নির্মিত প্রায় ছয় হাত উচ্চ একটি অমিতাভ বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে। চারিদিকে একটি চালচিত্রের মত, তাহাতে সূক্ষ্ম কাজের ছোটবড় নানারকম মূর্ত্তি। সমস্ত মহানির্ব্বাণভূমিতে এই মূর্ত্তিটি পুরাকালীন ভাস্কর্য্যে শ্রেষ্ঠ। অবশ্য গঠনসুষমায় পূর্ব্ববর্ণিত ধর্মশালার মূর্ত্তিত্রয় আরও চমৎকার, তবে সেগুলা ঢের এদিককার তৈরী। এই মূর্ত্তিটিও ভগ্নস্তূপের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। এখানে-ওখানে সিমেণ্ট দিয়া মেরামত করা।

এদিককার দেখাশুনা শেষ করিয়া আমরা দাহ-স্তূপ (Cremation Stupa) দেখিতে চলিলাম। সেটি এইস্থান হইতে পুর্ব্বে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। বেলা বারটা হইয়া গিয়াছে। মুক্ত প্রান্তরের অসহ্য গরম, তবে মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড মেঘে সূর্যদেবকে আবৃত করিয়া একটু-আধটু কষ্ট লাঘব করিতেছিল। রাস্তা নাই, দু-ধারে আখের ক্ষেত চিরিয়া একফালি চলা-পথ, তাহাও মাঝে মাঝে লুপ্ত। প্রায় মিনিট কুড়ি হাঁটিয়া আমরা স্তূপের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম।

এই স্তূপটির এখনও সংস্কার ত হয়-ই নাই, বরং এর গায়ে কালের আঁচড় মানুষ আরও গভীর করিয়া দিয়াছে। ঢিপিটা বেশ উঁচু, নানাবিধ গাছ ও আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য এমন কিছু না থাকিলেও এখানে যে-একজন চীনা ভিক্ষু থাকেন তাঁহার কাহিনীটা বেশ একটু অভিনব। স্তূপের শীর্ষে একটি বটবৃক্ষ আছে; সন্ন্যাসী তারই গোড়ায়, একটি গহ্বরের চারিদিকে বাঁশের বাতার বেড়া দিয়া ঘর বাঁধিয়া থাকেন। নিতান্তই একা, মাইল-দেড়েকের মধ্যে বসতি নাই।

বৃক্ষের উপরেও তাঁহার এইরকম গোছের একটি কুটির আছে, সমস্ত দিনমানটা প্রায় সেইখানেই কাটান। কাশেয়া নগরীটিতে ইনি বেশ প্রসিদ্ধ। প্রথমে প্রথমে নগরে আসিয়া ভিক্ষালব্ধ যাহা পাইতেন তাহাই আহার করিতেন, এই জন্যই তাঁহার নাম পাওহারী বাবা থাকিয়া গিয়াছে। এদিকে বৎসর দুই যাবৎ আর মোটেই আস্তানা ছাড়েন না, কেহ কিছু আহার করিতেও দেখে নাই; বিশ্বাসীদের মতে, তিনি এখন পুরাপুরি অনাহারী। আর যাহাই হউক ইহার আশ্চর্য্য সহ্যশক্তির একটা কথা শুনিলাম এবং তাহার নিদর্শনও প্রত্যক্ষ করিলাম। ইনি মাঝে মাঝে দেহের কোন কোন স্থানে, বিশেষ করিয়া হাতের উপর, মোমবাতি জ্বালিয়া ধ্যানে বসেন। মোমবাতি জ্বলিয়া, গলিয়া, দেহের সেই স্থানটি পুড়াইয়া নিবিয়া যায়, তিনি অবিচলিত ভাবেই ধ্যানস্থ থাকেন। পরে উঠিয়া কি একরকম পাতার রসের প্রলেপ দিয়া আরোগ্য হন।

ভিক্ষু মৌনী। আমরা যখন পৌঁছিলাম, তখন নীচেই ছিলেন। খুব সবল, দীপ্তশ্রী, গৌরবর্ণ পুরুষ, বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হইবে, গায়ে হাতে অনেকগুলি বড় বড় ফোস্কার চিহ্ন। আমরা যাইতে দুইটা করিয়া লবঙ্গে ফুঁ দিয়া প্রত্যেকের হাতে প্রসাদ দিলেন, মাটিতে দেবনাগরীতে লিখিয়া আমাদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম, 'কলিকাতা'। বুঝিতে পারিয়াছেন—শিরশ্চালনে এইটুকু জানাইয়া দিলেন, তারপর বটবৃক্ষের ঝুরি ধরিয়া এবং কোথাও বা একটা বাঁশের গাঁটে গাঁটে পা দিয়া ক্ষিপ্র গতিতে উপরে উঠিয়া গিয়া ভিতর হইতে

দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন। শেষের দিকটা যেন একটু দেখানোর ভাব ছিল, কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বসাকুল্যে সন্ন্যাসী আপাততঃ আমাদের সবার মন বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় অভিভূত করিয়াই দিলেন এবং একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার আহার, নির্জ্জনপ্রিয়তা এবং কৃচ্ছ্র-সাধনার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব আছেই।

উপর থেকে চারিদিককার দৃশ্য অতি মনোরম। চক্রবাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত চারিদিকে সবুজের সমারোহ। স্তূপের প্রায় পাদমূল ধৌত করিয়া অতীতের ক্ষীণ স্মৃতির মত শীর্ণকায়া হিরণ্যবতী,—আঁকিয়া বাঁকিয়া, দূরে সরিয়া আবার কাছে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত জায়গাটিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘিরিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে—মাইলখানেক দূরে মল্লরাজদের কুশীনগরের আধুনিক সংস্করণ কাশেয়া; বাড়িগুলি দেখায় যেন সবুজের গায়ে গোটাকতক শাদা ছোপ। আরও দূরে—দিকচক্রের কোল ঘেঁসিয়া ক্বচিৎ এক-আধটা গ্রাম—নেহাৎ কয়েকখানি কুটিরের সমষ্টি। পশ্চিমদিকে, এই সমস্ত দৃশ্যের সামান্যতার মাঝে নিজের বিরাট ঐশ্বর্য্য-মহিমায় দাঁড়াইয়া মহাপরিনির্ব্বাণ-স্তূপ—মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণে তাহার বিপুল অঙ্গের চারিদিক থেকে, একটা স্বর্নাভ জ্বালা কাঁপিয়া কাঁপিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিতেছে।

দাহ-স্তূপের বটচ্ছায়ায় খানিকটা বিশ্রাম করিয়া আমরা ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িলাম। বর্ত্তমানের সবচেয়ে বড় পেয়াদা জঠরাগ্নির তখন জোর তাগাদা চলিয়াছে।

আগেই ব'লেছি ওরা দু'জনে চাকরিতে থাকতে বিহারের অনেক জায়গায় ঘুরেছি। দেখেছি, শুনেছি, কিছু লেখাও চলেছে তার সঙ্গে। স্বভাবতঃই চাকরি-জীবনে অল্প, চাকরি থেকে মুক্ত হওয়ার পর বেশি। বড় সহর, বড় বাঙ্গালী সমাজ হ'লে অসুবিধা হোত। গোপালগঞ্জ, কি জামতাড়া, কি সাহারসা, কি দানাপুরের মতো জায়গা হ'লেই সুবিধা হোত; অল্প পরিসর জায়গা, ছোট সমাজ, অল্প সময়ের সবার সঙ্গে জানাশোনা হ'লে বেশ আপনজন হ'য়ে পড়তাম সবাই। দানাপুরে আবার ছিল আমার স্বর্ণাসনের ছাত্র অমলেন্দু, ডাক নাম 'ঢেপু'। এম.বি. ডাক্তার হ'য়ে পশার জমিয়ে বসেছে। ওর ছোট ভাই অতুলেন্দু—দু'জনের আবার সাহিত্যের দিকে ঝোঁক আছে। স্বর্ণাসনের সুবাদে একেবারে ভেতর বাড়ি পর্য্যন্ত যোগাযোগ, নূতনের গায়ে পুরাণো এসে প'ড়ে বড় মিঠে হ'য়ে পড়েছিল দিন ক'টা। ওদের সূত্র

ধ'রে প্রধান ব্যবহারজীবী প্রবোধবাবু, তাঁর ছেলে শৈলেশ, বি. এন্. কলেজের প্রফেসার, পরে প্রিন্সিপালও। আমি যেখানকার ছাত্র এক সময়। অনেক কম বয়স আমার চেয়ে। কিন্তু তাতে কি ?—শৈলেশ ছিল যেন বুড়ো ছেলের কম বয়সের বিমাতা ; কোথা থেকে যে একটু সম্ভ্রম এসে পড়তই !

সব চেয়ে বেশি জমেছিল সাহারসায়। মণি তখন ওখানে ম্যাজিস্ট্রেট, জায়গাটা নূতন জেলা সহর হ'য়ে গ'ড়ে উঠছে। সাহারসায় তখন আমার একটা বড় রকমের আকর্ষণও রয়েছে। "কুশী প্রাঙ্গনের চিঠি" বইটার মাল-মসলা জোগাড় করছি। কয়েকঘর বাঙ্গালী, তার মধ্যে অফিসারও কয়েকজন। যতটা পারি মেলামেশা ক'রে, মণির ইনস্পেক্‌শন্ ট্যুরের সুযোগ নিয়ে লেখার খোরাক জমা ক'রে নিতে পারি। নববর্ষ সামনে, একটা ভালোরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—আয়োজনেও সবাই মেতে যাওয়া গেল। এ-ধরণের অভিযানে সাহারসাই ছিল সবচেয়ে জমজমাট। তবে, তার কথা আর এখানে বাড়াব না। একখানা পুরো বই দিয়ে স্মৃতির ঋণ খানিকটা শোধ করা হ'য়ে গেছে আমার।

এই গেল ওদের অবলম্বন ক'রে আমার বিহার পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

একবার বাংলায়ও হয়। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগে (Food control) বাংলা সরকার বিহার সরকারের কাছ থেকে মণিকে ঋণ চেয়ে নেয় ; বোধহয় বছর দু'য়েকের জন্য। ভবানীপুরে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে পার্ক লেনে থাকতাম, নম্বরটা মনে নেই। মাঝে মাঝে গেছি, তারপর একবার টানা আড়াই তিন মাস ছিলাম। কিন্তু কলকাতা তো গোপালগঞ্জ-সাহারসা নয়। আড়াই তিনমাস সেখানে সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্য, একেবারে যেন লুপ্ত হ'য়েই গেছে।

আমার ভ্রমণবিলাস যে একেবারেই শেষ হ'য়ে গেছে, এমন নয়।

আমি কখনও কখনও নিজের থেকে আলাদা হ'য়ে গিয়ে নিজেকে নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে বসি, বেশ কৌতুক বোধ হয়। আমার জীবনটা যে দু'টো বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে, রফা, সন্ধি, একথা পূর্বে কোথাও বলেছি। লক্ষণটা ছিল অন্যরকম—বৈরাগ্যেরই (যদি সেজপিসিমা ত্রিনয়নী দেবীর ভবিষ্যৎ বাণী মানতে হয়)। তারপর তাঁরই বিধান মতো কোন্নগরের বিশালক্ষী দেবীর কবচ-মাদুলী এঁটে আমায় সংসারে আটকে রাখা হয়েছে। এই সন্ধির ফলে দু'টো দিকের কোনটাই ঠিক-মতো হোল না। আটকানোই প'ড়ে রইলাম শুধু, না পারলাম পুরোপুরি

'সংসারী' হ'তে আর পাঁচজনের মতো, না পারলাম একেবারে লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে যেতে।

রফার ফলে দেহটা যখন থাকে বাড়িতে, মনটা বাইরের জন্য উতলা হ'য়ে ওঠে; সেটা যখন থাকে বাইরে তখন সেই মনই আবার বাড়ির জন্যে হ'য়ে পড়ে চঞ্চল।

আবার, সন্ধি ব'লেই এর মধ্যে দৈব-অনুগ্রহের দিকটা সুস্পষ্ট—সংসার না ক'রেও সংসারকে বেশি ক'রে পেয়েছি। বাইরের দিকের সুযোগও দিয়েছেন দু'হাতের অঞ্জলি ভ'রেই।

ভাইদের চাকরি থেকে লব্ধ সুযোগের কথা বলা হোল। এরপর, বহুদিন পরে যাত্রাপথে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে, দ্বিতীয় সুযোগটাও গেলাম পেয়ে, আমার ভাইপোদের চাকরির মাধ্যমে। এদের চাকরিতে আবার আমার ভ্রমণ-বিলাসের একটা নূতন দিগন্ত প্রসারিত করে। এদের চাকরি, আর থেকে থেকে বদলি, বেশ কয়েক বৎসর ধ'রে দক্ষিণ বিহারের পাহাড়ী অঞ্চল ঝাড়খণ্ডে পড়ল। পূর্বে ছাড়া ছাড়া ভাবে যতটুকু দেখা হয়েছে, তাতে পাহাড়ে, অরণ্যে, পদেপদেই বিচিত্র খণ্ডজাতিতে, তাদের বহুযুগাগত আরণ্যক জীবন ধারায়, বিহারের এই অংশটাকে আমার স্বপ্নপুরী ব'লে মনে হয়েছে। স্বপ্নই থেকে যেত, প্রত্যক্ষ করবার সুযোগটা পেলামও, যখন জীবনের গতিপথ একরকম সারা হ'য়ে গেছে, শেষ যাত্রার পালা সামনে।

অদ্যাবধি সভ্যতার যেখানে শেষ পর্যায়, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আদিমানবের নগ্ন, অমলিন রূপ দেখলাম, সহজ সাবলীল, নিরলঙ্কার ভাষার কাকলি শুনলাম; অরণ্য শ্বাপদের নিঃসঙ্কোচ, নিঃশঙ্ক বিহার দেখলাম; সর্বোপরি আদি জননী প্রকৃতিকে তাঁর সেই রূপে দেখলাম, যেখানে তিনি পর্বতে-কান্তারে, নদীতে-নির্ঝরে তাঁর কোল পেতে আছেন ব'সে।

কয়েকটি অভিযানে দেখা হ'য়ে গেল ছোটবড় ঝর্ণাগুলো—জোনহা, দশম, ঘির্ণি, হুড্রু, আরও কিছু কিছু।

এই সময় এদের চাকরির সুযোগের সঙ্গে আর একটি নিতান্তই অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে গেল। দারভাঙ্গাতে আমার সেখানকার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট শ্রীযুক্ত জয়ন্ত বর্মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়; শুধু ওঁতে আমাতে নয়, পরিবারে-পরিবারে পর্য্যন্ত। সবদিক দিয়েই সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবার, ওঁরা হুগলী জেলার সিঙ্গুরের জমিদার বংশ।

ঠিক যখন ঝাড়খণ্ডের পাহাড়ে-অরণ্যে, নদী-নির্ঝরিণীতে, তার উচ্চাবচ গৈরিক সমতলে ঘূর্ণির নেশা জমে এসেছে, জয়ন্তবাবু একদিন

হঠাৎ সপরিবারে আমাদের জামসেদপুরের বাসায় এসে উপস্থিত। এ রকম Pleasant surprise—চমক লাগানো বিস্ময় কম আসে জীবনে।

বেশ কয়েক বছর উত্তরপ্রদেশ, বিহারে ঘোরাঘুরির পর সেণ্ট্রাল ব্যাংকের Regional manager, অর্থাৎ আঞ্চলিক পরিদর্শক হ'য়ে এসেছেন। কাজ, জামসেদপুরকে কেন্দ্র ক'রে প্রায় সমস্ত ঝাড়খণ্ড অঞ্চলটার অফিসগুলির পরিদর্শন ক'রে বেড়ানো। কোম্পানীরই এ্যামবেসেডার মোটর রয়েছে।

সন্থ সন্থ প্রোগ্রাম হ'য়ে গেল আমাদের।

একটা পর্ব আমার জীবনে।

সঙ্গ সংগীতকে আরও মধুময় ক'রে তোলে। একইভাবে-ভাবিত, একই রসে জারিত ছু'টি মন, যা সব দেখেছি তাদের অভিনবত্বে অনির্বচনীয়তায় সমভাবে অভিভূত ছু'জনে—সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা গেছে জীবনে।

গল্প করতে করতে চলেছি ছু'জনে—সাহিত্য, সমাজ, চারুশিল্প, এমনকি জীবন-দর্শনও মাঝে মাঝে—মোটর পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে মসৃণ পিচঢালা সড়কের ওপর দিয়ে—পটভূমি ছু'দিকের দূরের কাছের—নিত্যনূতন দৃশ্য।

একদিন ছুই পরিবারের সবাই জামসেদপুর থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে দলমা পাহাড়ের শীর্ষে গিয়ে সমস্তদিন কাটিয়ে এলাম। একটি স্নিগ্ধ আশ্রম, গুহা ও মন্দির, টাটা কোম্পানির বিশ্রামাগার প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে প্রায় তিন হাজার ফিটের ওপর থেকে সুবর্ণরেখার তীরে জামসেদপুর। মুষ্টিমেয় একটি জনপদ।

একদিন প্রায় ছু'শো মাইল অতিক্রম ক'রে রাঁচি হ'য়ে ডালটনগঞ্জ জেলার বেতলা Govt. Reserve forset (সংরক্ষিত বন্যাঞ্চল) বন্য পশুদের লীলাভূমি দেখে এলাম। একটা পুরো রাত্রি কাটিয়ে। সে যেমন একরাত্রে শেষ হওয়ার নয় তেমনি এক কথাতেও নয়।

স্মৃতির আবর্তে প'ড়ে খানিকটা পেছিয়ে গিয়েছিলাম, আবার ফিরে আসি।

জীবন আমার এখন তিনটি ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে, সীমা বেঁধে পৃথক করবার উপায় নেই। যদি নিতান্তই আলাদা ক'রে দেখতে হয় তো বলা যায় কেন্দ্রীয় ও ছু'দিকে তীরলগ্ন ছু'টি স্রোত—একটু স্তিমিত। তিনটি নাম দিতে হ'লে বলা যায়—সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজনীতি। একটা সাধারণ মানুষের জীবনই বিশ্লেষণ ক'রে দেখান কঠিন। তার

ওপর, একটা মানুষ, যাকে সাহিত্যিক ব'লে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তার জীবন বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো নিশ্চয় আরও কঠিন; সে নিজেই চেষ্টা করুক বা অপর কেউ। এর কারণ, সে এই জটিল, দ্বিপদচারী জীবকে নানা পরিস্থিতিতে দাঁড় করিয়ে দেখাতে গিয়ে নিজেই আরও জটিল হ'য়ে ওঠে। .

তবু মনে হয় একটা সূত্র আছেই, যা আমায় সাহিত্যে একটা পথই ধ'রে বরাবর এগিয়ে যেতে দেয়নি। সেটা হচ্ছে আজ আমার এই তিরাশি বৎসর ধ'রে একটা যে যুগ যাচ্ছে, সেটা নানাদিক দিয়েই এমনই একটা বিক্ষোভের, ভাঙ্গাগড়ার যুগ, যার মতোটি বোধহয় পৃথিবীতে আর কখনও আসেনি। আমার সাহিত্যের অঙ্কুর-অবস্থা দেখলে মনে হয়, রসসাহিত্য, বিশেষ ক'রে কৌতুকরসের সাহিত্যই আমার পুঁজিপাটা। স্রোত দাঁড়িয়ে থাকবার বস্তু নয় ব'লেই একদিন মনে হোল, সমাজ নিয়েই, পরিবার নিয়েই যখন সাহিত্য, সেখানে হাসি ছাড়া আরও সব প্রবৃত্তি যখন সক্রিয়, তখন আর একটু এগিয়ে দেখাই যাক্‌না। "নীলাঙ্গুরীয়" "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বেশ সহজভাবেই এসে গেল। এর পরের যা অবস্থা সেটাকে মনের গতির দিক-পরিবর্তন বলতে পারি।

গোড়ায় কোথাও ব'লে থাকব, ছেলেবেলায় বাংলার 'স্বদেশী আন্দোলন' আমার মনকে একটু প্রভাবিত করেছিল, কতকটা ছেলেমানুষী হুজুগ বা উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশও করেছিল। এই স্বদেশী আন্দোলন যখন বাংলার অগ্নিযুগটাকে নিয়ে এল অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে, তখন বয়স হয়েছে, আরও অন্তর দিয়ে তার বেদনা, তার গৌরব অনুভব করেছি। আমার যা জীবন তাতে আমারও যে ঝাঁপিয়ে'পড়া উচিত ছিল, তা হয়নি—এ-অনুতাপও মনে হয়েছে মাঝে মাঝে। নিষ্ফল অনুতাপেই কেন শেষ হয়েছে, সে-কথাও ব'লে থাকব।

দু'খানা মোটামুটি বড় উপন্যাস শেষ করার পর, মনে যে একটা শূন্যতা, একটা ভ্যাকুয়াম (Vacuum) এসে জড়ো হোল, সেটা এবার একটা নূতন প্রশ্ন দিয়ে ভরাট হ'য়ে গেল, যা অন্যভাবে করা হোলনা তা লেখনীর সাহায্যে যৎকিঞ্চিৎও ক'রে নেওয়া যায় কিনা।

"নব সন্ন্যাস"টা আরম্ভ করলাম।

বইখানা সোসিও-পলিটিক্যাল (Socio-political), অর্থাৎ সমাজ-রাজনীতি দু'টি ধারণা একত্র ক'রে লেখা। সমাজের দিকে সাম্যবাদ, যাতে আমার বিশ্বাসটা পরিপক্ক হ'য়ে উঠেছে সে-সময়, আর রাজনীতির দিকে সশস্ত্র বিপ্লব, যা, লেখার সময় মহাত্মাজীর অহিংস-আন্দোলনে

অনেকটা স্তিমিত হ'য়ে এলেও একসময় বাংলা এবং তা থেকে সারা ভারতের আকাশ কাঁপিয়ে রেখেছিল। আগুন যেখানে শিখায় শিখায় জ্বলে উঠেছিল, সেই মেদিনীপুরকে করলাম আমার নাট-মঞ্চ, কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। সামাজিক দিকটার ঘটনা-চরিত্র আমায় যোগান্ দিল একটি ব্যাপারে। ইতিপূর্বে আমার ভাই অবনীর সঙ্গে কয়েকদিন ধানবাদে থাকাকালে আমার একবার একটা কোন সাহেব-কোম্পানির কয়লার খনি দেখবার সুযোগ হয় এবং তার বিভীষিকা বহুদিন ধ'রে একটা দুঃস্বপ্নের মতোই আমার স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখে। সেই পরিবেশের মধ্যে কুলি সর্দারের মেয়ে চম্পাকে নায়িকা ক'রে বসিয়ে আমার কাহিনী গ'ড়ে তুলি। এ-ধরণের সোসিও-পলিটিক্যাল উপন্যাস বোধহয় আমার এই একটি। জাতীয় জীবনে অনেক গলদ, বহু সমস্যা, মনটা তখন চারিদিকে ছুটছে। নব সন্ন্যাসে খানিকটা সফলতা পেয়ে, সমাজ জীবনে,—এবার শুধু বাঙ্গালীরই নয়, সমগ্র মানবজীবনেই যুগ-যুগ ধ'রে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধে যে একটা অসামঞ্জস্য চলছে, যার জন্য সমাজজীবনে আদি কাল থেকে বিষবাষ্প জমে জমে উঠছে, সেই দিকে মনটা গিয়ে পড়ল। "তোমরাই ভরসা" লিখলাম। "আনন্দবাজার"-এর ১৩৫৬ সালের শারদীয়া সংখ্যায় বের হোল। এই রকম ক'রে একটা লিখে ফেলে মনে যে ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয়েছে, সেটা পূর্ণ করতে এক একটা সমস্যা-উপন্যাস নিয়ে পড়েছি। পরে এল, মূঢ় দেশ বিভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের মর্মান্তিক যন্ত্রণা, তাদের মেরে, তাদের নিয়েই রাজনীতির 'ছকে' দ্যূতক্রীড়া। এবার স্বার্থপর, 'গদিলোভী' নিজের দেশের লোকের দ্বারাই।..."পঙ্ক পম্বলটা" লিখলাম; শেয়ালদা-হাওড়ার প্লাটফর্মে ব'সে চিত্রের পর চিত্র মনের পটে এঁকে নিয়ে। এই নিদারুণ ট্র্যাজেডিরই অন্যদিক নিয়ে একদিন লিখলাম "উর্মি আহ্বান"।

আমি এখানে আমার লেখার Bibliography দিতে বসিনি, সম্পূর্ণ তালিকাও নয়, কোনটা কবে, পর্যায়ক্রমে সন তারিখ দিয়ে তথ্য-সম্বলিত করা আমার কাজ নয় এখানে। তার ক্ষেত্র অন্য ও অপরের। এই ক'রে বেরিয়ে এল "উত্তরায়ণ," "রিকৃশার গান", আরও হয়তো দু'-একটা বই যাতে পূর্ণভাবে না হোক, কিছু কিছু সমস্যার ছোঁওয়া আছেই। আগেই বললাম—একটানা একটা দিকেই এগিয়ে যেতে পারিনা। এতে অন্য মেজাজে লেখা আমার ছোট গল্পগুলো আমায় বরাবর একটা (Relief) তো দিয়ে গেছেই, তা ছাড়া "কাঞ্চন মূল্য", "দোল গোবিন্দের কড়চা", "তাঞ্জাম"-এর মতো খান তিন-চার সম্পূর্ণ

কৌতুকরসের উপন্যাসও ঐ মেজাজেরই কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছে। এর সঙ্গে এসে পড়েছে মানুষের নিত্যদিনের সুখ দুঃখ, স্নেহ-প্রীতি, ভালোবাসা, বিরাগ-বিসম্বাদ নিয়ে আরও কয়েকখানা বই, অর্থাৎ উপন্যাস; "নয়ান বৌ",—"মিলনান্তক", "এবার প্রিয়ংবদা"—জাতের কিছু রম্য-রচনাও।

চাকরির শৃঙ্খল খুলে ফেলে আমার পদযুগল হালকা হোল, তাতে আমার কলকাতায় যাওয়ার সুযোগটাও বাড়ল। এতে ক'রে আর যত কিছু না-হোক আমার জীবনটা স্পষ্টতরভাবে একটা সাহিত্যিক রূপ নিতে পারল। পরিচয়ের বৃত্ত বিস্তৃত হ'তে লাগল। যাঁদের সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচয়, তাঁদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে লাগলাম।

সাহিত্যের আড্ডাগুলোয় ব'সে জমাট আড্ডার মধ্যে হাওড়ায় গিয়ে গাড়ি ধরার কথা ভাবতে হয় না, যখন মনে হয়, যাওয়া যাবে ফিরে। ইতিমধ্যে আড্ডার কিছু কিছু স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃতিরও কিছু রদবদল হয়েছে। বড়গুলোর নাম করলে বলা যায়, "প্রবাসী" অফিস, "শনিবারের চিঠি", "বঙ্গশ্রী", "দেশ", "আনন্দবাজার", কিছু কিছু "বিচিত্রা"। এই হোল পত্রিকার দিকে; যেখানে আমার গতায়াত ছিল। এরমধ্যে "প্রবাসী" অফিস ছিল একেবারে 'পিউরিটান' (Puritan)। রামানন্দবাবুর পাশের একটা ঘরে সহকারীদের আফিস। টেবিলের এক-দিকে ব্রজেন বাবু, অন্য দিকে যোগেশ বাগল। অন্য এক টেবিলে শৈলেন লাহা, আর একজন কর্মচারী, এঁর নামটা মনে পড়ছে না। গিয়ে বসলাম। ব্রজেনবাবু ইতিহাসের স্কলার, গল্প করতে ভালোবাসতেন। উনিই প্রধান বক্তা হ'য়ে গল্প ক'রে যাচ্ছেন; শৈলেনবাবু, যোগেশবাবু মাঝে মাঝে হাতের কাগজ থেকে চোখ তুলে যোগান দিয়ে যাচ্ছেন। কিছু গ্যালি প্রুফ বা "প্রবাসী"-"মডার্ণ-রিভিউ"-এর জন্য কিছু লেখাই। গল্প একটু নরম, সংযত কণ্ঠেই;—পাশেই কর্তার ঘর, তবে মুক্তই। তিনজনেই রসিক, মাঝে মাঝে হাসিও ছলকে ছলকে উঠত তেমন কোন প্রসঙ্গ এসে পড়লে। একদিন কি একটা কথার ওপর ব্রজেনবাবু বললেন—"জানেন বিভূতিবাবু, অনেকের রাগ "প্রবাসী"-তে সীতাদেবী শান্তাদেবীর লেখা বেশি বের হয়। তা আমি বলি—তাদের মতো আর কেউ বলতে পারবে না "প্রবাসী" আমার বাবার কাগজ; বলুন?"

চাপা হাসি ওঠে একটা। আমার গল্পগুলি হাসিরই থাকত ব'লে, তা নিয়েও সরস আলোচনা করতেন। বেশির ভাগ উনিই। প্রথমতঃ, এক রামানন্দবাবুর সম্পাদকীয় গুরুগম্ভীর বিবিধ প্রসঙ্গ ছাড়া, সহকারী

সম্পাদক হিসাবে বেশির ভাগ ওঁর হাতেই ছিল, দ্বিতীয়তঃ, 'শুষ্ক', বিরস ইতিহাসের লোক হ'লেও ওঁর মনটা ছিল সরস।

গল্পের মধ্যে কর্মচারী ভদ্রলোক কয়েকখানি নূতন বই আমার সামনে রেখে দিয়ে একটা খাতায় সই নিলেন। সমালোচনা ক'রে পাঠাতে হবে প্রবাসীর জন্য, 'কষ্টিপাথর' বিভাগে। অনেকদিন ও-কাজ করি আমি মাঝে মাঝে। লাভ বইগুলি।

"শনিবারের চিঠি"র আড্ডা ছিল একেবারে উল্টো ধরণের। বিশেষ ক'রে যখন শ্যামবাজার ২৫নং মোহনবাগান রো'তে রয়েছে। একটা ছোট দোতলা বাড়ি, নীচে ছোট ছোট খান তিন-চার ঘর। পেছনগুলায় প্রেস, আফিস ; সামনেরটা বসবার ঘর। যতটা মনে পড়ছে হাত আষ্টেক লম্বা, হাত ছয়েক চওড়া। মাঝখানে একটা টেবিল। তার দু'দিকে বেঞ্চ। মনে পড়েনা ঘরটা কখনও খালি দেখেছি। এক এক সময় দু'টো দরজার চৌকাঠও ভ'রে যেত। কয়েকজন সে-সময়ের বাছা বাছা সাহিত্যিকও রয়েছেন। এখানকার আড্ডা যে এক একদিন সীমা লঙ্ঘন ক'রে যেত তার কারণ নিশ্চয় "শনিবারের চিঠি"র শেষদিকের তীক্ষ্ণ-সরস মন্তব্যগুলি—ছাপা হোত, সে-সময়ের অতি-প্রগত লেখকদের বাছা বাছা লেখা উদ্ধৃত ক'রে। অনেকেরই মুখ খুলে গিয়ে এক এক সময় হাসি-হুল্লোড়ে ঘরের ছাত ভেঙে পড়ার মতো হয়েছে এও দেখেছি।

ধরণটা একদিনের কথায় বোঝা যাবে—

সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন "শনিবারের চিঠি"র ম্যানেজার, সজনীবাবুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। বেশির ভাগ প্রেসের দিকটাতে থাকতেন। মধ্যাকৃতি শ্যামবর্ণ মানুষটি, হাসি একটা লেগেই থাকত ঠোঁটে সর্বক্ষণ। মাঝে মাঝে এদিকেও ঘুরে যেতেন। একদিন হুল্লোড় যখন খুব জমে উঠেছে, হাসতে হাসতে ওদিক থেকে এসে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"ওগো, তোমরা একটু ক্ষান্ত দাও তো! এখানে অনেকে আসেন সাহিত্যিকদের দেখতে— ছেলেছোকরারাও থাকে, তারা যদি দেখে সাহিত্যিক এই চীজ, তাদের আর শ্রদ্ধা থাকবে না।"

এ ছিল একটা দিক, অন্যদিকে "চিঠি" তখন স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজ, ঐ আড্ডা থেকে তখনকার সাহিত্যের আবহাওয়া অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তখনকার উদিত-উদীয়মান অনেক লেখকই। অবশ্য, সবারই সে মুখ আলগা ছিল এমন নয় ; তবে লঘু-গুরু মিলে বাতাবরণটা এই রকমই হ'য়ে উঠত এক একদিন।

"বঙ্গশ্রী"র ছিল দু'টো কালাংশ। প্রথমবার যখন যাই সেই সময়

সম্পাদক বা ঐ ধরণের পদে রয়েছেন সজনীবাবুই। বোধহয় আমি তখন চাকরি-জীবনেই; ক্কচিৎ কখনও কলকাতায় যাই। স্মৃতিটাও সে সময়ের একটু ধোঁয়াটে। দোতলার একটা ঘরে গিয়ে উঠলাম। সজনীবাবু তাঁর চেয়ারে, চারিদিকে কয়েকটা চেয়ারে বেশ কয়েকজন। তার মধ্যে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, আর একটু একটু প্রেমাঙ্কুর আতর্থী আর কবি অশোক চট্টোপাধ্যায়কে মনে পড়ছে। হঠাৎই গেছি, আমি উঠে গিয়ে দাঁড়াতে সজনীবাবু "আসুন আসুন" ব'লে হাতটা ঘুরিয়ে নিয়ে সবাইয়ের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন— "বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়— বিভূতি মুখোপাধ্যায়!" তারপর বাকি সবাইকে দেখিয়ে নাম ব'লে যাচ্ছেন, অশোক চট্টোপাধ্যায় এসে উপস্থিত হ'তে তাঁকেও পরিচিত করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে।

বেশ জমে উঠল মজলিস সেদিনও। এতটা না হ'লেও, সেদিনও 'রস' একটু বেশি ফেনিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

এর অনেক পরে "বঙ্গশ্রী"র দ্বিতীয় কালাংশ। কাগজটা গোড়া থেকেই বিখ্যাত শিল্পপতি সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যেরই ছিল কিনা আমার জানা নেই, তবে তিনি সব ব্যবস্থা পাল্টে দিয়ে নিজেই সম্পাদক হ'য়ে লিখে যাচ্ছেন। খুব পণ্ডিত লোক এদিকে, লেখা ধাঁচা দেখে মনে হোত কট্টর সনাতনপন্থী— একের পর এক প্রবন্ধ লিখে যেতেন ভারতের সনাতন ঐতিহ্য নিয়ে। কটাক্ষ থাকত গান্ধীজীর নূতন আন্দোলনের ওপর; সমস্তটুকু না হোক, তাঁর জাতি-ধর্ম সব একাকার ক'রে দেওয়ার বিষয়ে থাকতই বিরূপ মন্তব্য।

আমি তখন কলকাতায় গেলেই "বঙ্গশ্রী" আফিসে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসছি। তখন সজনীবাবু ওখানে নেই। কাগজটার আর সব দিক দেখছেন কিরণ রায়। তাঁর সঙ্গে আমার খুব জমত। "বঙ্গশ্রী"তে আমি কতদিন ধ'রে কত লেখা দিই—গল্পই—তা মনে পড়ছে না, তবে লেখার জন্য কিরণবাবু আমায় প্রায় তাগাদা দিতেন। ওঁর চিঠির ধাঁচাটাও ছিল বেশ সরস, "বঙ্গশ্রী"র লেটার হেড দেওয়া পোষ্টকার্ডটা ভ'রে থাকত। সে-চিঠিগুলির একখানাও আর আমার কাছে দেখছিনা।

তখন "বঙ্গশ্রী" আফিসে আর আড্ডা ব'লে জিনিসটা নেই। পাশেই সচ্চিদানন্দবাবুর ঘর। বয়সে অনেকখানিই বড় আমাদের চেয়ে। আবহাওয়াটা অনেকটা "প্রবাসী" আফিসের মতোই। উনি ছিলেন আবার একজন পুঁজিপতি। "বঙ্গশ্রী কটন মিলস্" তখন ওঁর হাতেই, কিনেছেন, কি, পূর্বে থেকেই ছিল, আমার জানা নেই।

শুনেছিলাম, চৌরঙ্গীর বিরাট "হোয়াইট-এওয়ে লেডল"র বাড়িটা উনিই পঁয়তাল্লিশ লক্ষ দিয়ে কিনে নেন।

আফিসটা ছিল লোয়ার সার্কুলার রোডে। উঠে আসে, কি, বরাবর সেখানেই ছিল, ঠিক বলতে পারছি না।

"বঙ্গশ্রী" কয়েক বছর পরেই উঠে গেল। বেশ ভালো কাগজে ভালো ক'রে ছাপা, রুচিসম্মত পত্রিকা একটা। তখন কোন ভালো জিনিসই না টেঁকবার যুগটা আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এইভাবেই "বিচিত্রা" উঠে গেল।

"বিচিত্রায়" আমার লেখা কমই বেরিয়েছে। আড্ডা মোটেই ছিলনা। আমি যেতাম সম্পাদক উপেন গঙ্গোপাধ্যায় মশাই-এর টানে। তাঁর বাসা-বাড়িতে ওপরের ঘরে ডেকে নিতেন, একা তাঁর সঙ্গে গল্প করতাম। রসিক বয়ঃজ্যেষ্ঠ মানুষ, তাঁর ছিল অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার। শরৎবাবুর মাতুল, সেদিক দিয়ে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। আর, অমন সৌজন্য, অমন মার্জিত রুচি আমি কম মানুষের মধ্যেই দেখেছি। উপেনবাবুর কাছ থেকে যেন একটু আলাদা মানুষ হ'য়ে ফিরে আসতাম।

আর আড্ডা ছিল-"দেশ" "আনন্দবাজার"-আফিসে—স্থায়ীভাবে মন্মথবাবু, বিমলবাবু (মৌমাছি), এর ওপর আরও কয়েকজনের যাওয়া আসা আছেই। আফিস তখন চিৎপুরে। পরে সুতারকিন ষ্ট্রীটে উঠে এল (বর্তমান প্রফুল্ল সরকার রোড)। গল্প-গুজব সাগরময়বাবুর সঙ্গে। এ-বাড়িতে এখন সবার চেম্বার আলাদা হ'য়ে গিয়ে একা-একার আসর।

তালিকাটা "যুগান্তর" সাময়িক বিভাগ দিয়ে এখানে শেষ করি। সে আবার ছিল স্বচ্ছ, নির্মল হাসির নির্ঝর, বিশেষ ক'রে পরিমল-বাবুর আমলে। অমন সরস গল্প, অমন রসিয়ে বলার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই দেখেছি।

এই গেল পত্র পত্রিকা নিয়ে। চাকরির পূর্বে এবং তার পরেও বহুদিন ধ'রে।

এর সমান্তরালেই কিছু কিছু শুরু হ'য়ে গিয়েছিল প্রকাশকদের ঘরের আড্ডা। সব প্রায় এক জায়গাতেই; কলেজ ষ্ট্রীট-হ্যারিসন রোডের সঙ্গমে—সেটার আজকাল চলতি নাম প'ড়ে যাচ্ছে "বই পাড়া"। ক্রমে ক্রমে পত্র-পত্রিকার আড্ডাগুলি—(সবগুলি আবার আড্ডাও নয়) আস্তে আস্তে স্তিমিত হ'য়ে এসে, কতকগুলি একেবারে নিভেও গিয়ে প্রকাশালয়ের মজলিসগুলি বেশ জমে উঠল। "বেঙ্গল পাবলিশার্স" "মিত্র-ঘোষ", "এম. সি. সরকার", "ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাব্-লিশার্স"; প্রধানতঃ এই।

এর মধ্যে "মিত্র-ঘোষের" দশনম্বর কাউন্টারের সঙ্গে ২৪ নং মোহন-বাগান রো'র "শনিবারের চিঠি"র একটা মিল ছিল। কিন্তু একটা বিষয়েই; ছোট ঘরে গাদাগাদি হ'য়ে গল্প-গুজব। রুচির দিক দিয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এইখানে একটা কথা ব'লে রাখি। সব প্রকাশকদের দোকান কাউন্টার বা ঘরের আবহাওয়া, নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে থাকলেও, রুচির দিক দিয়ে ছিল এক। গল্প-গুজব, আলোচনা হয়েছে প্রসঙ্গভেদে, অনেক কণ্ঠস্বরের মতামতে আলোচনার তাপ (টেম্পো) গেছে বেড়ে, গল্পও হয়েছে সরসই; কিন্তু কোনও অবস্থাতেই মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে দেখিনি। এটা যেন বই-পাড়ার ট্র্যাডিশনই। বৈশিষ্ট্য হিসাবে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেডের জিতেনবাবুর ঘর শান্ত-সৌজন্যের আবহাওয়া নিয়ে ছিল টু ফরম্যাল (Too formal)। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় আজও তাই, টেবিলে ত্রিদিবেশবাবু বা যেই ব'সে থাকুন। অভ্যর্থনা-আলাপে, আতিথ্যেও একটা আভিজাত্যের ছাপ। "কি ব'লে দিই? ডাব, না, সন্দেশ?" এসে পড়ল। পার্টিশন ক'রে ভাগ করা বিভিন্ন দপ্তর। নীরবে কাজ হ'য়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন মতো কোনও কর্মচারী এসে খাতা নিয়ে দাঁড়ালেন। আগন্তুককে একটা নমস্কার। কাজ সেরে চ'লে গেলেন। একটা পরিচ্ছন্ন চিত্র।

এম. সি. সরকারের আলাদা আবহাওয়া, বিশেষ ক'রে সুধীরবাবু যতদিন ছিলেন বেঁচে। চেহারায়, গাম্ভীর্যে শিবকল্প মানুষটি। যেদিন, যখনই গেছি, একভাবে ঘরের একটি কোণে ব'সে কাজ ক'রে যাচ্ছেন, বেশির ভাগ গ্যালিপ্রুফ দেখাই। টেবিলের এদিকে খানচারেক চেয়ার। নিয়মিত আগন্তুক কেদার চট্টোপাধ্যায়, পাশেই বিশু মুখোপাধ্যায়, তাঁর মৌচাকের কাগজপত্র নিয়ে বেশিরভাগই গ্যালিপ্রুফ নিয়েই ব্যস্ত তিনিও। বাকি খান তিনেক চেয়ার, কেউ উঠছেন তো কেউ এসে পড়লেন—এই ক'রে সর্বক্ষণ ভীড়ই হ'য়ে যাচ্ছে—অচিন্ত্যবাবু, প্রবোধ-বাবু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রমথবাবু, নরেন মিত্র; কখনও বা মনোজ-বাবু পাশেই "বেঙ্গল পাবলিশার্স" থেকে উঠে এসে কাটিয়ে গেলেন খানিকটা। এমনি ক'রে গজেনবাবুও "মিত্র-ঘোষ" থেকে। গল্পের স্রোতটা অনর্গলই চলছে। কেদারবাবুর গল্পের স্টক অনেক—"প্রবাসী"র সেই এলাহাবাদের যুগ থেকে শুরু ক'রে। আমি গিয়ে পড়লে খুব একজন মনের মতো শ্রোতা পেয়ে তাঁর ভাঁড়ার উজাড় ক'রে দিলেন।

এর মধ্যে জমাট আড্ডা বলতে যে-চিত্রটা মনে ভেসে ওঠে সেটা ছিল "মিত্র-ঘোষ"। দশ নম্বর শ্যামাচরণ দে'র ছোট খুবড়ির কথা বলাই হয়েছে, ছোট হ'লেও জমজমাট। এটা আরও কয়েকগুণ বেড়ে

গেল ওঁরা হ্যারিসন রোডের বাড়িটা নেওয়ার পর থেকে। বেড়ে গেল দু'টো কারণে। একে তো দোতলা বড় বাড়ি, তার ওপর বাড়িটার সংস্থান। একটা সরু গলির মধ্যে দিয়ে নীচে-ওপরে খানকতক ক'রে ঘর। নীচের মাঝখানের সবচেয়ে বড়টা হোল একাধারে স্টক রুম। আফিসের গোটা দুই টেবিল, টেলিফোন, আর এদের মাঝখানে বেশ ভালোরকম বসবার ব্যবস্থা ক'রে, যেটাকে বলছি 'আড্ডা'। হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে ভ'রে রাখার যথেষ্ট সুযোগ, আর, থাকতও ভ'রে সর্বক্ষণ। বড়দের কেউ-না-কেউ, কোনদিন-না-কোনদিন আছেনই। প্রায়ই একসঙ্গে অনেকজন—অচিন্ত্য, প্রবোধ, নরেন, প্রমথ, জিতেন চক্রবর্ত্তী; হয়তো বলাইবাবু এসে গেলেন; দৈবাৎ শরৎ পণ্ডিত-মশাই হাসির হররা তুলে গেলেন।

এমন অন্ধ গলির মধ্যে জায়গাটার একটা সুবিধা, এখানে এলে বোঝা যায় না বাইরে কলকাতা ব'লে একটা চিরবিক্ষুব্ধ, জনসঙ্কুল জায়গা আছে। তেমনি কলকাতাও বুঝতে পারেনা এই সরু কানাগলির মধ্যে কী আড্ডাটা জমেছে! রাজা-উজির যতরকমের খোস গল্প থেকে আরম্ভ ক'রে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্যে দুর্নীতি-সুনীতি, য়্যুনিভার্সিটি, খেলার মাঠ, সিনেমা, "কলকাতা কর্পোরেশনের" আদ্যশ্রাদ্ধ। শুধু নিষ্ক্রিয়, নিরীহ আলোচনা। কারুর ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—হাতে সময় আছে, সেটা কাটানো। কর্পোরেশন বাঁচলো, কি, ডুবলো সে-চিন্তা নিয়ে কারুর যে ঘুম হচ্ছে না এমন নয়, শুধু যতদিন আছে, আড্ডার খোরাক যুগিয়ে থাক্।

একবার যেন কার মুখে শুনি, বিলাতে থাকাকালে তাঁর এক বিলাতী বন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা, একান্ত তোমাদের 'বাঙ্গালীদের বৈশিষ্ট্যটা কি? যেমন ধরো, জার্মানদের নীরবে গবেষণাবৃত্তি, ফ্রেঞ্চদের রূপ-চর্চা, ইটালিয়নদের কারুশিল্প, চিত্র, ভাস্কর্য—ইত্যাদি, আমাদের পলিটিক্স্, তেমনি তোমাদের কি?" ভদ্রলোক একটু ভেবে মিলিয়ে নিয়ে বললেন—"আড্ডা।"

প্রশ্ন হোল—"জিনিসটা কি?"

উত্তর করলেন—"সে তোমায় বোঝানো যাবে না; কেননা তার সমতুল কোন জিনিসই পৃথিবীর কোন দেশে, কোন সমাজে নেই। কিছু বাঙ্গালী একত্র হ'লেই—অবশ্য যখন হালকা মেজাজে, বাতাসে কী একটা এসে পড়ে তাকে নাম দিয়ে বোঝানো যায় না। একটা আমেজ, একটা হাত-পা ছড়ানো নিশ্চিন্ততা যে কোনও পরিবেশের মধ্যে; তার সঙ্গে যখন যেটা এসে পড়ল—পলিটিক্স্, গবেষণা,

রূপ-চর্চা, যে কোনও আকারে হোক—যখন যেটা এসে পড়ল। তবে সম্পূর্ণ নিষ্কাম—নির্লিপ্তভাবে…”

উনি বললেন—“খানিকটা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ভাব এসে পড়ছে যেন। জিনিসটা আমাদের আরত্ত করবার চেষ্টা করলে হয় না? যোগ-সমাধির মতো।” উত্তর হোল—“হওয়ার উপায় নেই। আমাদের মতো তাকিয়া-জড়ানো জাত হওয়া চাই। তোমরা যাকে বলস্টার (Bolster) বল। তাকিয়া অবশ্য কাঁখে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবেনা, অভ্যেসটা থাকলেই হোল। নিজেরই অর্জিত অভ্যাস হোক্ বা বংশানুক্রমিক হোক। আমাদের আবার যুগযুগ ধ'রে অভ্যাস ব'লে জাতিগত হ'য়ে পড়েছে। মোট কথা আড্ডার স্বাদ পেতে হলে বাঙ্গালী হওয়া চাই। তারপর দশজন একত্রিত হ'লেই…”

“কোথায়?…জায়গাটা?”

“যেকোন জায়গা হ'লেই হোল, আড্ডার ঐ আর একটা সুবিধা। কলেজ, অফিস, রেলগাড়ি, স্টীমার, নেমন্তন্নবাড়ি, সম্পাদকের ঘর, প্রকাশকদের কাউণ্টার, ক্লাবঘর—এসব তো আছেই, এমন কি শবদাহ ক'রতে গিয়ে শ্মশান পর্য্যন্ত। আড্ডা সেদিক দিয়েও নির্লিপ্ত, কোন বাছ-বিচার নেই। পক্ষপাতিত্ব নেই।”

আর একটা বড় যায়গা ছিল আমার; রেডিও অফিস। যখন ডালহাউসি স্কোয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে হেয়ার স্ট্রীটে, সে-সময় থেকে উপস্থিত ইডেন গার্ডেনে পর্যন্ত। গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটা ডিসিপ্লিন রক্ষা ক'রে যেতে হয়, বিশেষ ক'রে কণ্ঠস্বরে; ইউনিভার্সিটি বা কর্পোরেশনে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে-সবও বধূর মুখে শ্বশুর-ভাসুরের নামের মতো অনুচ্চারিতই রাখতে হোত, তবু, আড্ডার ভাবটা একেবারেই নির্বাসিত হোত না। নাটক-বিভাগের সরলবাবুর টেবিলে জমত আমার বেশি। খুব গল্পিয়ে মানুষ ছিলেন। আমি গেলে হলটার আরও কয়েকটা টেবিল টেনে নিয়ে ঘিরে বসতেন। গল্প চলত। এর ওপর যদি ঘুরতে-ফিরতে কোনদিন বীরেন ভদ্র এসে পড়লেন তো সেদিন ডিসিপ্লিনের বাঁধ ভাঙ্গো-ভাঙ্গো হ'য়ে উঠত। কলকাতা রেডিওর গোড়াপত্তনে উনি। অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প সব, তার ওপর “বিরূপাক্ষের” ডেলিভারি, হাত দিয়ে পেটের হাসি চেপে ডিসিপ্লিন রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণান্ত হ'তে হোত। ওঁর কথা যখন এসেই পড়ল, তখন ওঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথাটা এইখানেই শেষ ক'রে দিই। তাতে আমার সাহিত্যিক জীবন কি ক'রে আর একটা দিকে খানিকটা

সার্থকতা লাভ করে সে দিকটাও একটু ছুঁয়ে রাখা হবে। এটা চাকরি-মুক্ত যুগের কথাও। চাকরিতে থাকলে, বিশেষ ক'রে বাইরে চাকরিতে থাকলে এ সার্থকতা থেকে আমায় বঞ্চিতই থাকতে হোত। সংক্ষেপেই বলব।

আরম্ভ করল এখানকার মেডিকেল কলেজের ছেলেরা। বাঙ্গালী ছেলেরাই অবশ্য। তখন ছিলও অনেকগুলি। সমস্ত বিহারে সে-সময় মাত্র দু'টি মেডিকেল কলেজ—পাটনা আর দ্বারভাঙ্গা; চারিদিক থেকে এসে একটি বেশ বড় দলই দাঁড়াত।

কয়েদখানার দাপটেও বাঙ্গালীর সাহিত্য-প্রীতিকে দাবিয়ে রাখতে পারেনা, মেডিকেলের ডিসেক্‌শন রুম বা অপারেশন টেবিলে পারবে কেন? "সন্ধ্যা-মজলিস" ব'লে ওদের একটা সাহিত্য-বাসর ছিল। বছরের শেষে তার একটা ক'রে বৈঠক হোত। আমায় সভাপতি করা হোত আর কলকাতা থেকে প্রধান অতিথি আনিয়ে দেওয়ার ভারটা থাকত আমারই ওপর। মেডিকেলের পরে এখানকার আর্টস-সায়েন্সের সাধারণ কলেজের ছাত্ররাও করলে আরম্ভ, সময়ের কিছু এদিক-ওদিক ক'রে। এখানেও আমার ঐ ভূমিকা, সভাপতিত্বের সঙ্গে প্রধান অতিথি আনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব। এঁরা এসে সবাই উঠতেনও আমার বাড়িতেই। এতে তখনকার অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের পায়ের ধুলো পড়ে আমার বাড়িতে—কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, সাংবাদিক—মনোজ বসু, গজেন মিত্র. সুমথ ঘোষ, প্রবোধ সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন মিত্র, ডক্টর সুশীল দে, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ডক্টর অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, রঙ্গীন হালদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, গৌরকিশোর ঘোষ, নৃপেন চক্রবর্তী,—নামগুলি কালানুক্রমিক নয়। কিছু বোধহয় ছেড়েও যাচ্ছে। আরও দু'তিনজন এসে অন্যত্র থাকেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এসে লাহেরিয়াসরাইয়ে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকেন। হিন্দী-কবি-সাহিত্যিক হংসকুমার তেওয়ারীও একবার আসেন। বাংলায় বাঙ্গালীর মতোই দখল, রবীন্দ্রসাহিত্যে বিহারে একজন অথরিটি ব'লে গণ্য। আমার সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্য থাকায় ইনিও আমার সঙ্গেই ছিলেন। বড়দের মধ্যে আসতে পারেন নি বলাইবাবু (বনফুল,) তারাশঙ্কর আর অচিন্ত্য সেনগুপ্ত।

প্রায় একটা দিন বেশি ধ'রে রাখতাম। কলেজের হাঙ্গাম মিটে গিয়ে আমরা নিজেদের দু'জনকে নিয়ে বসতাম। নিশ্চিন্ত অবসরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে দু'জন সাহিত্যিক মনের কপাট খুলে আলাপ-আলোচনা,

নিজেদের নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে, জীবন নিয়ে, জীবনাতীত যা সাহিত্যে ধরা যাচ্ছে না, তাই নিয়েও। তন্ময় হ'য়ে কখনও কখনও গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত।—সে যে কী আনন্দ ব'লে ওঠা যায়না।

একবার বীরেন ভদ্র মশাইকে ডাকা হোল মেডিকেল কলেজের সন্ধ্যামজলিসের পক্ষ থেকে।

মজলিসী মানুষ মজলিসে আসছেন। সেদিন সন্ধ্যার অনুষ্ঠানটি আরম্ভও হোল একটা নাটকীয় পরিস্থিতি দিয়ে। সময় হাতে রেখে আসতে পারেন নি। ওঁর সোজা একেবারে অনুষ্ঠান-মণ্ডপে আসবার কথা থাকায় সবার একটা উদ্বেগ লেগে ছিলই, তাতেও কি একটা গোলমাল হ'য়ে যাওয়াতে সে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা চতুর্গুণ হ'য়ে গেছে বেড়ে, ভরা সামিয়ানার মধ্যে হতাশার চঞ্চলতা, ওঁকে নিয়ে মোটর এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল গুমোটের ওপর কালবৈশাখীর ঝড়। উনি সমস্তিপুর-দ্বারভাঙ্গা পর্য্যন্ত যতরকম দুর্ভোগ (দুর্ভোগের তীর্থস্থলও এটুকু) নিজের মনের রসায়ণে রসিয়েই নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর রেডিও কণ্ঠে, রেডিও-পরিচিত ভঙ্গীতে বিবৃত করার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসির ঝড় ব'য়ে গিয়ে মণ্ডপের গুমোটটুকু ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিল। ক্লান্ত রয়েছেন সে কথা ভুলে ছেলেদের "আর একটু! আরও কিছু বলুন!" আওয়াজে সেদিনকার মজলিস সময় আর মজলিসত্বের দিক থেকে রেকর্ড সৃষ্টি করে।

বাড়ি এসে বললাম—"ছেলেরা বড্ড খাটালে আজ আপনাকে। একে এতটা ধকল গেছে!"

"বলেন কি মশাই!"—চোখ কপালে তুলে, ঘাড়টা বেঁকিয়ে বললেন—"বলেন কি মশাই!! এরা খানিকটা হালকা ক'রে দিলে ব'লে বাঁচলাম।...কৈ, জানাননি তো 'বি-এন-ডব্লিউ-আর-এর ব্রাঞ্চ-লাইন' এখনও আপনার বাড়ির কানাচেই এ ভাবে আছে বেঁচে!...উফ্!!"

ওঁকে দু'দিন আটকে রাখতে হোল। কয়েক জায়গা থেকে ফরমাসের জন্যেই। তার মধ্যে দ্বিতীয় দিনে এখানকার পাবলিক লাইব্রেরী ও কলাকেন্দ্রয় নিয়ে যেতে হোল। বিহারীদের প্রতিষ্ঠান, বেশির ভাগই মৈথিল। পরিচিত করিয়ে দিতে গিয়ে দেখলাম, আমার চেয়ে কম পরিচিতি নন উনি ওঁদের কাছে। ওঁর বাংলা কৌতুক-চিত্রগুলির সঙ্গে অনেকে পরিচিত আছেন, বিশেষ ক'রে মৈথিলদের মধ্যে, যাঁরা বাংলা খানিকটা ক'রে বোঝেনই, কিন্তু ওঁর ব্যাপক পরিচয় রেডিও প্রচারিত মহালয়ার চণ্ডীপাঠের বিশুদ্ধ উচ্চারণে, আবেগময় কণ্ঠস্বরে। সেখানে উনি যে কতটা একক, অনন্য ছিলেন, সরকারী মূঢ়তায় রদবদল ক'রতে

গিয়ে সেটা স্পষ্টই হ'য়ে গেছে এবারকার অর্থাৎ ১৩৮২ সালের প্রচারে।

সরলবাবুর বিদায়ের (বা বদলির?) পর আমার বসবার ঘর বহুদিন ছিল প্রোগ্রাম একজিকিউটিভের ঘরে।

নিজে সৎ সাহিত্যিক—মণিপুর অঞ্চল নিয়ে কয়েকখানি সুন্দর বই লিখেছেন, আলোচনাটা সাহিত্যিক অঙ্গেরই হোত। উনি বদলি হ'য়ে যেতে জমতাম বেতার জগতের সম্পাদকা সুভাষ বসুর ঘরে। অনেকেই, কেননা "বেতার-জগৎ"কে একটা সাহিত্যিক রূপ দিয়ে ইনি অনেককে নিয়েছেন টেনে। এঁরা দু'জনেই আমার চেয়ে বয়সে অনেক—অনেক ছোট। চরিত্রগুণে, অমায়িক ব্যবহারে আমার রেডিও-স্মৃতির একধারে শ্রদ্ধা-স্নেহ-প্রীতির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছেন।

অনেক গল্প, অনেক কথিকা, অনেক নাটিকা নিয়ে রেডিও স্টেশনের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্বন্ধ। এমনই অনেক দুর্লভ পরিচয়ে সমৃদ্ধ, এমনই বৈচিত্র্যে বহুমুখী তার স্মৃতি।

বয়ে চলেছে আমার জীবন প্রবাহ।

একজন মসীজীবী বাঙ্গালী তার অর্ধেকটা জীবন—তাও পরিণত উত্তরার্ধটা মাসান্তের উপার্জন পকেটে ভ'রে বাড়ি ঢুকলনা,—এ ব্যর্থতার একটা লজ্জা আছে, বাঙ্গালী ব'লেই। এদিক দিয়ে আমার সাহিত্য আমায় বিশেষ কিছু দেয়নি, ক্ষতিপূরণ করেনি বললেও ভুল হয় না। চালিয়ে গেছে, এইটুকুই স্বীকার করা চলে। তবে, অন্য দিক দিয়ে সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়েছে এটা মানতে হয়। সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা বয়ঃজ্যেষ্ঠ তখনও জীবিত রয়েছেন, কবি, প্রাবন্ধিক, যাঁদের সাহিত্য-কৃতি, বিশেষ ক'রে চারিত্রিক কোনও বৈশিষ্ট্য আমার জীবনে প্রেরণা জুগিয়েছে—পরিচয়ের পূর্বে বা পরেও—তাঁদের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি। কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি—সেই একটা যুগ যা বিদায় নিচ্ছে দেশ থেকে, তার প্রতিভূ। এঁদের মধ্যে যাঁরা কলকাতার—কুমুদরঞ্জন ছাড়া আর সকলেই—গেলে একবার দেখা না ক'রে এলে কলকাতায় যাওয়াটাই ব্যর্থ মনে হোত। পল্লী কবি, ভক্ত কবি কুমুদ'দা তাঁর জন্মস্থান কোগ্রাম ছেড়ে বেরুতেন না বড় একটা। একবার 'মহাবোধি' হলে তাঁর সম্বর্ধনায় গেছি, উঠে এসে পিঠে হাত দিয়ে নিয়ে গিয়ে পাশে বসালেন ডায়েসের ওপর। পত্রাচার ছিল, তবে চোখে দেখা সেই প্রথম। সেইখানেই আমার

কাছে কথা আদায় ক'রে নিলেন—একবার যেতেই হবে তাঁর কোগ্রামের বাড়িতে। গেলাম, তবে বোধহয় বছর চারেক পরে সুযোগটা হোল। তার কথাটা কোনও তীর্থযাত্রার সঙ্গে আনন্দে, আতঙ্কে, তার ওপর খানিকটা রহস্যজড়িত হ'য়ে স্মৃতির পটে একটা বিশিষ্ট স্থান নিয়ে রয়েছে ব'লে একটু প্রসঙ্গ ছেড়েই ব'লে নি। তীর্থ যাত্রাই, কিন্তু যাত্রাটা শুভ হয়নি; কিম্বা এ-ওতো বলা যায়, যে-ব্যাপারটা হোল, সেটা তীর্থ-মাহাত্ম্য দেখবার জন্যেই দৈব-নির্দিষ্টই ঘটনা ছিল একটা। হঠাৎ গেছি কোনও চিঠি না দিয়েই, কুমুদ দা' বেরিয়ে এসে একটু থমকে দাঁড়ালেন, তারপরই এগিয়ে এসে সেইরকম স্নেহভরে পিঠে হাত দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঠিক ভেতর-বাহির ব'লে কিছু নেই, নানা রকমের গাছপালায় ছায়াচ্ছন্ন প্রশস্ত প্রাঙ্গনের একধারে কয়েকটি পাকা ঘর, আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে একটা ঋষি-আশ্রমই।

একটা নূতন জন্মই যেন। বেশ খানিকটা রাত পর্য্যন্ত আমার একান্ত প্রিয় ভক্ত-কবির সাহচর্যে কাটান নূতন জন্মই বৈকি।

কিন্তু নবজন্ম যে আর এক অর্থে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ছিল, সেটা কি তখন বুঝতে পেরেছি?

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের রোদে বীরভূমের ঊষর মাঠের মধ্যে দিয়ে বর্ধমান-কাটোয়া ছোট লাইনের গাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে আসা, স্টেশন থেকেও মাইল দুয়েক পথ—নেমেই একটা চায়ের স্টলে কিছু অনাচার হ'য়ে থাকবে, সকাল থেকেই অসুস্থ হ'য়ে পড়লাম। আক্রমণটা খুব খারাপ গোছের ছিল, যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ে যেতে লাগল। বাড়িতে লোকবল নেই, যখন গেছি শুধু তাঁর স্ত্রী আর দু'টি নাতি-নাতনী। বাড়িটা গ্রাম থেকে আলাদা, অজয় আর একটা ছোট নদীর সঙ্গমস্থলের কোণটায়। মুখ সবার শুকিয়ে আসছে, তারই মধ্যে দাদারই একটা সহজভাব ফুটিয়ে রাখবার চেষ্টা। নিজে হোমিও-প্যাথি করতেন, লাগছে না। একটু দূরে কে একজন হোমিওপ্যাথ আছেন, বোধহয় একটু লাগল তাঁর ওষুধ, তারপর আর না। আমার অবস্থা দ্রুত খারাপ হ'য়ে উঠছে। ওষুধ পালটে যাচ্ছেন, কোনটা একটু কাজ করছে, তারপরে আর না। আমায় স্তোক দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বুঝছি নিজেকে আর দিতে পারছেন না। উনি বৈষ্ণব, অন্ততঃ লেখায় তারই প্রতিভাস কিন্তু ওঁর আরাধ্যা দেবী তারা, বাসা থেকে একটু গিয়ে একটি ছোট ঘরে দেবীমূর্তি। রাত্রে শুতে যাওয়ার সময় তাঁর ফুল এনে আমার মাথার বালিশের নীচে রেখে দিয়ে বললেন—"ভয় নেই, ঠিক হয়ে যাবে। ঘুমোও।"

ওষুধটা পালটে দেওয়া হয়। নিজে এনে দিলেন, কি, ডাক্তার এসেছিলেন, সন্ধ্যার আগে থেকেই সে-চেতনা আমার ধোঁয়াটে হ'য়ে এসেছে।

রাত্রিটা ছমছমে, একটু ঘুম হ'য়ে থাকবে। ভোর থেকেই কিন্তু অবস্থা আবার দ্রুত খারাপের দিকে যেতে লাগল। কঠিন ব্যাধির মধ্যে, বিদেশ-বিভুঁইয়ে আমার যেটুকু চৈতন্য অবশেষ রয়েছে, সবটুকুকে গুছিয়ে নিয়ে তীর্থ-মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি। দাদা, তাঁর স্ত্রী এই নূতন আক্রমণে একেবারে দিশেহারা হ'য়ে পড়েছেন। দাদা কেন যে এলোপ্যাথির চেষ্টা করেন নি, আমি বলতে পারব না। হয়তো ক'রে থাকবেন, না পাওয়ায় আমি আরও ঘাবড়ে যাব ব'লে আমায় বলেননি। হয়তো হোমিওপ্যাথিতে অটল বিশ্বাস, মাঝে মাঝে একটু-আধটু কাজ দেখিয়েও গেছে, আশায় আশায় থেকে গেছেন। সকালের অবস্থা দেখে একেবারে দিশেহারা হ'য়ে পড়েছেন।

বেলা প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত প্রায় এইভাবেই চলল। তারপর হঠাৎ এক অদ্ভুত, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। একটা মোটরের হর্ন্। শব্দটা যেন শুকনো নদীর বালির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। একটু পরে বাড়ির দরজায় এসে থেমে গেল। এঁরা ক'জনেই আতালি-পাতালি হ'য়ে বেরিয়ে গেছেন। দাদার বোধহয় বড়ছেলে—কৃষ্ণনগরের সিভিল-সার্জেন, একটা এন্‌কোয়েরীতে বেরিয়েছিলেন নবদ্বীপে। এতদূরে এসে বাবা-মাকে একবার দেখে যাওয়ার ইচ্ছে হওয়ায় জীপটা ফেরিতে গঙ্গা পার করিয়ে সোজা চ'লে এসেছেন। একেবারে কোন কথাই ছিলনা এখন আসার।

দেখে পাকা ডাক্তারের সংযত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন—"খুব খারাপ টাইপের ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি, এখানে কিছুই হবে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে যেতে না পারলে..."

বাইরে যেতে যেতেই কথা হচ্ছিল, 'নিয়ে যেতে না পারলে' কি হবে সেটা শোনা গেল না। জীপে হবে না। সিভিল-সার্জেন ব'লেই স্থানীয় ব্লক অফিসের চেষ্টায় একটা 'ভ্যান' গোছের বড় গাড়ি জোগাড় হোল। উনিই সঙ্গে থেকে ত্রিশ মাইল অতিক্রম ক'রে যখন বর্ধমান হাসপাতালে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। আমার চৈতন্যের ওপরেও একটা গোধূলির আবরণ। শুনছি জায়গা নেই, ওঁরই চেষ্টায় বারান্দায় তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা চিকিৎসা আরম্ভ হ'য়ে গেল।

এরপর আর বাড়াব না। বেঁচে যে গিয়েছিলাম তার প্রমাণ দিয়ে যখন রয়েছি সশরীরে বেঁচে। আমার তো একথা মনে হ'চ্ছেই হবে,

সেদিন আয়ুশেষের শূন্য হাতেই যাত্রা করেছিলাম, অঞ্জলি ভ'রে নিয়ে আসি। যদিও, এই নূতন আয়ুর পুঁজি নিয়ে এবার নূতন জীবন আরম্ভ করতে প্রায় মাস দেড়েকের কাছাকাছি লেগে গেল।

বেণীই টেনে তুলল। আমার প্রথম শিবপুর জীবনের ফুটবল মাঠের সাথী। সেদিন ছিল ক্যাপ্‌টেন, এখন হাওড়া-শিবপুরের চিকিৎসকদের পুরোভাগে।

জীবনের এ-প্রান্তে এসে আমরা আর একবার গিয়েছিলাম এক হ'য়ে। সে-সব দিনের মাত্র দু'টি প্রতিনিধি।

এর সঙ্গে একটা প্রশ্নও জাগে মনে, বিশ্বাসের আকারে; —যাঁরা নমস্য, স্নেহ করেন, ভালোবাসেন অন্তর দিয়ে, এইরকম সঙ্কটের দিনে তাঁদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তাঁদের আশীর্বাদকে যে আরও বেশি ক'রে সফল, সার্থক ক'রে তোলে কি?

এ বিশ্বাসের একটু কারণ আছে, যদিও বিশ্বাসে—বাস্তবে কতটা মিল থাকে সেটা চিরকালই রহস্যাবৃত। বিষয়টা হচ্ছে, আমার সাহিত্যিক জীবনের একটা দিক খানিকটা সার্থক হ'য়ে উঠতে বাকি ছিল। কো-গ্রামের পর সেটা অল্প অল্প ক'রে শুরু হ'য়ে গেল। সদ্য সদ্যই নয়, ত্বরিত গতিতেও নয়, তবে এ নূতন পথের ল্যাণ্ড-মার্ক (Land mark) যে কোগ্রামই এ কথাটা খুবই সত্য।

একটা ইংরাজী বাচনভঙ্গী অনুকরণ ক'রে বলি, এরপর বেশ কিছু জল গঙ্গার পুলের নীচে দিয়ে বয়ে গেছে, একদিন বিকালে এম. সি. সরকারের ছোট মজলিসটাতে ব'সে আছি, বোধ হয় একাই, টেবিলের ওধারে সুধীরবাবু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে ব'সে কি কাজ করছেন; পেছন থেকে প্রমথ বিশী এসে আমার চেয়ারের পিঠটা ধ'রে দাঁড়ালেন, ঘুরে কিছু প্রশ্ন করবার আগেই বললেন—"আপনার ডান হাতটা একবার দেখি।"

পেটে কৌতুকের একটা কিছু রেখে কথা কওয়ার অভ্যাস, আমি একটু হেসে প্রশ্ন করলাম—"হঠাৎ"?

"দিন না, আমি একটু একটু গুণতে জানি।"

"কিন্তু আমি তো গোণাইনা।"— ব'লে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। নিয়ে রেখা বিচারের ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ টেনেটুনে দেখে বললেন— "আপনার একটা প্রাপ্তি যোগ আছে।"

সুধীরবাবু সামান্য একটু হেসে মুখটা তুলে তখনই নামিয়ে নিলেন। প্রমথবাবু যেন ঐটুকু বলতেই এসেছিলেন। দু'একজন কে এসে পড়লেন, উনি কিন্তু না ব'সে চ'লেই গেলেন।

কয়েকদিন পরে শুনলাম "আনন্দবাজার পত্রিকা", এম. সি. সরকার, "উল্টোরথ" প্রভৃতির পক্ষ থেকে সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করবার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছে, তাতে আনন্দবাজারের পক্ষ থেকে প্রাইজটা আমাকে দেওয়া হচ্ছে।

অবশ্য প্রমথবাবু কমিটির একজন সভ্যই ছিলেন, হয়তো আমার নামটাও তিনিই ক'রে থাকবেন, সুতরাং মাঝখান থেকে গণৎকারের যশ নেওয়াটা তেমন শক্ত হয়নি।

এর পরের যশটা নিলেন গজেনবাবু। একদিন মিত্র-ঘোষের ঘরে ব'সেই গল্প-গুজব করছি, অনেকেই রয়েছেন, উনি পাশের ঘর কিম্বা বাইরে কোথাও থেকে এসে আমায় দেখে বললেন— "এই বিভূতিবাবু এসে গেছেন..."

যেন একটা কথা বলতে গিয়ে বেশি লোক দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন।

"কেন কিছু দরকার আছে নাকি?" —প্রশ্ন করলাম আমি। বললেন —না, তেমন কিছু নয়...এই সময়টা আসেন আপনি, তাই বলছিলাম।" তারপর, গল্পগুজব জোর চলছে, আমার কাঁধের দু'দিকে হাত দিয়ে ঝুঁকে একটু নীচু গলায় বললেন —"মনে হচ্ছে যেন একটা প্রাপ্তিযোগ আছে আপনার।" "সত্যি নাকি? কি ক'রে জানলেন?" লঘুভাবেই একটু হেসে প্রশ্ন করলাম।

বললেন—"এমনই।...বাতাসে যেন গুনগুনুনি শুনতে পাচ্ছি একটু।"

দ্বারভাঙ্গায় ফিরে এসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-থেকে একটা চিঠি পেলাম। শরৎ-স্মৃতি স্বর্ণপদক আমায় দেওয়া হয়েছে।

আরও দিন কয়েক পরে। আমায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালের শরৎচন্দ্র মেমোরিয়াল লেক্‌চার দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হোল। আমার বিষয় ছিল "সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাত মুখোপাধ্যায়।" দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংসে তিনটি লেকচারে আমি এটি শেষ করি। বইখানি এ. মুখার্জি এণ্ড কোম্পানী প্রকাশিত করেন।

এরপর ১৯৭৪-৭৫ সালের 'ডি. এল. রায়' মেমোরিয়াল লেকচার দেওয়ার জন্য আমায় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাকা হয়। একবছর সময় দিয়ে। বক্তৃতার স্থান এবার ছিল গড়িয়াহাট গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইন্সিটিট্যুটে। এও তিন দিনের ব্যাপার।

আমার বিষয় ছিল "বঙ্গ সংস্কৃতির ত্রিধারা"। প্রথম দিন রাখি সাহিত্য। দ্বিতীয় দিন "বাংলার অগ্নিযুগ।" তৃতীয় দিন রাখি "ধর্ম"। দু'টি ভাগে বিভক্ত ক'রে। রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম-ধর্ম এবং

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সনাতন হিন্দুধর্মের ভিত্তির ওপর সর্বধর্ম-সমন্বয়বাদ।

আমার প্রতিপাদ্য ছিল, আধুনিক ভারতের নবজাগরণের মূলে রয়েছে সাহিত্যে, রাষ্ট্রবিপ্লবে এবং ধর্মে বাংলার এই রেনাসেন্স, এই নবীন বলিষ্ঠ চিন্তাধারা। দেখাবার চেষ্টা করেছি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিমের ঝড় বুক পেতে নিয়ে, সে-ঝড়ের গতি উল্টে দিয়ে বাংলা শুধু যে স্বাধীনতা অর্জনের পথ পরিস্কার ক'রে দিয়েছে, তাই নয়, নিজের প্রতিভায়, এই ঝড়কেই নিয়ন্ত্রিত ক'রে একে সাহিত্যে, ধর্মে একটি শান্ত বিপ্লব ঘটিয়ে ভারতের বাইরেও তাদের একটা শ্রদ্ধাও স্থান ক'রে দিয়েছে।

আমায় এই বছরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী মেডেলটা দেওয়া হয়েছে ব'লে Estate Trust office থেকে জানানো হয়। এর পর পেলাম 'রবীন্দ্র পুরস্কার'; সাল ১৯৭২।

এই "প্রাপ্তিযোগ"—ব্যাপারটা দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, যাতে সম্মান বা স্বীকৃতির সঙ্গে হাতেও কিছু আসে। জগত্তারিণীর শুধু মেডেল, বাকি ক'টিতে কিছু ক'রে নগদও। দ্বিতীয়, যাতে শুধু সম্মান বা স্বীকৃতি।

প্রথম বিভাগের প্রথম চারটি পাই যেমনভাবে পাওয়ার কথা; যথা পদ্ধতি।

সর্বশেষ "জগত্তারিণী স্বর্ণপদক" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়). ১৯৭৩ সালে প্রাপ্য হ'লেও ইউনিভার্সিটির কয়েকটি কারণে (Technical difficulties) ১৯৭৮ সালে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্তির ইতিহাসটুকু কিন্তু— বিলম্বের উদ্বেগ না থাকলেও, বেদনাময়, যার জন্যে এক সময় প্রায় স্থিরই করেছিলাম, এ-পুরস্কার আমি নোবনা। একটা দীর্ঘ মানসিক দ্বন্দ্বের পর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে বেশ বিলম্ব হ'য়ে যায়, দূরে থাকায় পরিস্থিতিটা বোঝবার জন্যে বেশ কিছু চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও চলে। আমার শরীর এই সময় খুব খারাপ যাচ্ছিল, খুব একটা বড় রকম অসুখের জের টানছি, তার ওপর এই, মাসখানেকের ওপরই বেশ একটা উদ্বেগ, অশান্তির মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়।

এও সংক্ষেপেই বলি। ২৯ মার্চ, '৭২ সাল। দ্বারভাঙ্গা থেকে আগের-দিন বেরিয়ে সকালবেলায় নিউ আলিপুরে দুর্গাপ্রসাদের বাড়ি গিয়ে উঠি। এরপর কয়েকদিন কলকাতায় ঘোরাঘুরি ক'রে অসুস্থ হ'য়ে পড়লাম। কলকাতায় গেলেই একটু-আধটু এইরকম হ'য়ে পড়ে, খাটুনি

আর অনিয়মের জন্য, এবার কিন্তু রোগটা একটু বাঁকা, চটচট ক'রে ধাপে ধাপে বাড়তে বাড়তে দিন তিনেকের মধ্যেই আমায় একেবারে শয্যাশায়ী ক'রে দিল। এমন অবস্থা যে, দুর্গা থেকে নিয়ে বাড়ির সবার মুখ গেল শুকিয়ে। দুর্গা তার বন্ধু বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার শ্রী গোষ্ঠ দে-র হাতে তুলে দিলে আমায়। ওপর থেকে নীচে নামা তো বন্ধই, খাট থেকে মেঝেয় নামাও একরকম বন্ধই রইল। তরল পথ্য, সামান্য এক আধটু ফল।

দিন দশেক ভুগলাম। রোগটা ক্ষান্ত হ'লেও পথ্যের দিকে অতিরিক্ত সতর্কতার জন্যে দুর্বলতা যেতে চায়না। দুর্গা বাইরে বাইরে সহজ ভাব ধ'রে রাখলেও ভেতরে ভেতরে খুব নার্ভাস্ হ'য়ে পড়েছিলেন, "আর দু'টো দিন দেখুন ··· রিজার্ভেশন পাওয়া যাচ্ছেনা" এই ব'লে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন দীর্ঘ সফরের জন্য একটু সামর্থ্যের অপেক্ষায়। ইতিমধ্যে একদিন "মিত্র-ঘোষ" থেকে গজেনবাবু আর ভানু আমায় দেখতে এলেন। ওঁরা আমায় কিছু না ব'লেই দ্বারভাঙ্গায় লিখে দেন, দিন ৪।৫ পরে একদিন বিকালে আমার ভাই অবনী বৌমাকে নিয়ে উপস্থিত হোল।

দিন দুই পরেই আমি তাদের সঙ্গে দ্বারভাঙ্গা চ'লে এলাম।

এবার "রবীন্দ্র পুরস্কারের" কথা—

আসবার আগের দিন সন্ধ্যায় বিশুবাবু দেখা করতে এলেন। সবাই ছিলাম, কিছুক্ষণ গল্প-স্বল্পের পর আমায় বললেন— "একটু উঠতে পারবেন? একটা কথা আছে।"

আমার ঘরের পরেই আর একটা ঘর, দুর্গার বড় ছেলে রঞ্জন থাকে, তার ওদিকে খানিকটা খোলা ছাত। দু'জনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললেন— "যাওয়ার আগে একটা ভালো খবরই দিতে পারতাম, কিন্তু তাতে একটু খুঁৎ থেকে যাচ্ছে।"

খবরটা কি প্রশ্ন করতে বললেন— "রবীন্দ্র পুরস্কারটা" এবার আপনাকেই দেওয়ার কথা হয়েছে, কিন্তু একজন ইনফ্লুয়েনসিয়াল্ (Influential) প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়েছেন। নিজের জন্য কি, অন্য কাউকে সমর্থন ক'রে বোঝা যাচ্ছেনা, কেননা যথেষ্ট ইন্‌ফ্লুয়েন্স্ থাকলেও তিনি নিজে ঠিক সাহিত্যিক মহলের নয়, সাংবাদিক। নামটাও বললেন। ...

আমি একটু হেসে বললাম— "আপনি তো জানেন, আমার নিজের এ বিষয়ে কোন চেষ্টা থাকেনা। বইও এগিয়ে দিই না। এ-অবস্থায় পেলে মুফুতে পাওয়া যায়, না পেলে দুঃখ থাকবার কথা নয়। তবু যে বৈরাগ্যই আছে, এ কথা কি ক'রে বলব? যেমন হয় জানাবেন।"

এর পর তারিখ ১২ই এপ্রিল, '৭২ সাল। দ্বারভাঙ্গায় ফিরে আসবার কয়েকদিন পরে সন্ধ্যার পর বাইরে ব'সে আছি। শরীর তখনও খুবই দুর্বল, আমার চতুর্থ ভাই ইন্দু এসে বলল— "মেজদা এইমাত্র আটটা তিরিশের রেডিওতে এনাউন্স করলে যে তোমায় এবারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওভাবে বলল কেন?— আর কোন বই না পাওয়ায় বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'এবার প্রিয়ংবদা'র ওপর' দেওয়া হোল পুরস্কার। হঠাৎ রেডিও মুখেতেই শোনা, আমার অবশ্য সবটা ঠিক ক'রে শোনা হয়নি।"

আমার যেটুকু জানা তা আর বললাম না। "টের পাওয়া যাবেই"— ব'লে চুপ ক'রে গেলাম। শরীরটা খারাপ, মনটা হরিষে-বিষাদে অনেকক্ষণই ঝিমিয়ে রইল। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা দায়িত্বশীল রাজ্য সরকারের দেওয়া পুরস্কার—রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে জড়িত—তাতে সাধারণ সৌজন্যের এতটা অভাব হয় কি ক'রে! কারুর বই ছিলনা এ-বছর তো কে গিয়ে 'রাজভবন' বা সেক্রেটারিয়েটে ধর্ণা দিয়ে পড়েছিল?

রহস্যের একটা খুঁট অবশ্য হাতে রয়েছে। কমিটিতে কিছু হোলনা, আক্রোশ বশে রেডিও থেকে বিকৃত ক'রে প্রচারিত করার মধ্যে একটা সুলভ আনন্দ আছে নিশ্চয়। সেক্রেটারিয়েট থেকে নিয়ে রেডিও পর্যন্ত এ প্রভাবও থাকা সম্ভব, কিন্তু সেখানে আমার অনুযোগ চলেনা, রাস্তা থাকলেও সেরকম রুচি থাকতে পারে না। একজন নির্ভরযোগ্য লোকের মুখে কথাটা পূর্বেই শোনা আছে ব'লেই আমার এই একটা সম্ভাব্য কার্যকারণ সূত্র গড়ে তোলা। এগুতে হ'লে আমায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে পত্রাচার করতে হয়।

কিন্তু মুসকিল হোল, রেডিওর ভাষাটা আমি নিজে শুনিনি, ইন্দু শুনেছে, তাও পুরোপুরি নয়। এ-ছাড়া, এইটুকু জানি, এর একটা স্বাধীন বিচারকমণ্ডলী আছে, তারই সুপারিশে রাজ্যসরকারের সেক্রে-টারিয়েট থেকে দেওয়া হ'য়ে থাকে পুরস্কার। কিন্তু আমি কাদের নিয়ে সে মণ্ডলী গঠিত ঠিক মতো জানিনা; দ্বিতীয়তঃ, সেক্রেটারিয়েটের কোন্ মহল থেকে ব্যবস্থা করা হয়, কার দায়িত্বে, সেটা একেবারেই নয়। সবচেয়ে মুসকিল, ওদিক থেকে কোন চিঠি না আসা পর্যন্ত, এটা কি ক'রে সাব্যস্ত হচ্ছে যার ওপর আমি পত্রাচার করতে পারি? রেডিও বলতে গেলে একটা আধা-গুজব জিনিস, কেউ শুনছে, কেউ পাচ্ছেই না শুনতে।

বেশ অশান্তিতে কাটল দু'দিন। তারপর আমি কলকাতায় কয়েকটা

চিঠি ছেড়ে দিলাম। বিশুবাবু এবং আমার আরও দু'তিনজন সাহিত্যিক বন্ধুকে যাঁর মধ্যে অন্ততঃ একজন কমিটিতে আছেন ব'লে যেন আমার শোনা ছিল। ডাকবিভাগের সাম্প্রতিক অব্যবস্থায় কলকাতায় চিঠি লিখে তার উত্তর পেতে নয়-দশদিন লেগে যায়, এদিকে রেডিওতে বিজ্ঞাপিত ক'রে রাজ্য সরকারও চুপচাপ। কলকাতায় আমার অসুখটা খুবই কড়া ছিল, দুর্গা তখন বলেননি, পরে শুনলাম প্যারাটাইফয়েড, দুর্বলতা যেতে চাইছে না। এর মধ্যে মনের এই অবস্থা। কি করে নিরুপায়ভাবে দিনগুলো কাটছিল কাউকে বোঝানো শক্ত। মনটা গ্রহণ আর বর্জনের মধ্যে দোল খাচ্ছে, কিন্তু ত্যাগও যে করব তা কার কাছে? কি সুনিশ্চিত ভিত্তি বা যুক্তির ওপর?

অবশেষে এ-দিককার চিঠিগুলোর উত্তর পেতে লাগলাম, বেশ যেন মিল নেই তথ্যের দিক থেকে; তবে একটা কথা মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে যে, একটা মিটিং হয়, তাতে আমার নামও সর্বসম্মতিক্রমেই নির্ধারিত হয়। কিন্তু কোন বই পাওয়া যাচ্ছিল না ব'লে কমিটি একটু মুসকিলে পড়ে এবং একজন সভ্য (বোধহয় মনোজবাবু) "প্রকাশ ভবন" আর "এম. সি. সরকার" ঘুরে, "এম. সি." থেকে আমার "এবার প্রিয়ংবদা" বইখানি নিয়ে আসেন এবং এরই ওপর আমায় পুরস্কারটা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হয়।

তাহলে শেষ পর্যন্ত একথাই দাঁড়ায় যে, ভাষাটার মধ্যে একটা হেলা-ফেলা, মুর্খামি, অর্থাৎ সৌজন্যের অভাব (জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ), বা ইচ্ছামত কারচুপি রয়েছে, যে-কারণেই হোক বা যে Source থেকে। একটা বিধিবদ্ধ রাজ্য-সরকারই যখন, এটা কেন হবে?

উৎকট মানসিক দ্বন্দ্ব চলল ক'দিন ধ'রে। তার মধ্যে একটা আত্ম-প্রশ্ন যা মাঝে মাঝে মনে চাড়া দিয়ে উঠছিল তা এই যে, যখন ভেতরকার কথা খানিকটা জানি, প্রতিপক্ষ যেই হোক, প্রত্যাখ্যান ক'রে তার তৃপ্তি-সাধন করি কেন?

শেষকালে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে আপাততঃ সরকারী চিঠিরই অপেক্ষা করতে লাগলাম। যদি রাজ্যসরকারের জ্ঞানতঃ এটা হ'য়ে থাকে তাহ'লে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে রেডিওর ভাষাটাও ব্যবহৃত হবে চিঠিতে। সেক্ষেত্রে আমিও উপযুক্ত ভাষায় প্রত্যাখ্যানই করব। আরও একটা সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রে বিক্ষুব্ধ মনটাকে খানিকটা শান্ত করলাম। সরকারী চিঠির ভাষাও রেডিওর অনুরূপ হ'লে, আমি Statesman ইত্যাদি কাগজে প্রশ্নটা তুলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করব। সেটাই যে জনসাধারণের

স্বার্থে, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে আমার একটা কর্তব্য হবে, এ সিদ্ধান্তেও খানিকটা সান্ত্বনা পেলাম।

তবে, একথাও এখানেই ব'লে রাখি, এই সঙ্কল্পের সমান্তরালেই একটা আত্মপ্রত্যয়ের অভাব মাঝে মাঝে শিথিলও ক'রে দিচ্ছিল সেটাকে।

ঘোঁট পাকানোর মধ্যে মনের যে দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন তা আমার নেই। নিজেকে যতটা জানি, তাতে দেখেছি যাকে বলে "মানে মানে স'রে আসা" এইটেই আমার মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। অন্যের সম্বন্ধে হ'লে বলতাম এস্কেপিজিম্—(Escapism)—দুর্বল, পলাতক মনোবৃত্তি, তাতে 'মানের' অবস্থা যাই হোক।

এত বলা হয়তো দরকার ছিলনা, তবু শরীরের সে-অবস্থায় মনের তৎকালীন প্রতিক্রিয়াটা রাখলামই লিপিবদ্ধ ক'রে। পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটেরিয়েট থেকে একটা চিঠি পেলাম। তারিখ ...। এমার্জেন্সীর সময় নয়। আফিসের ফুরসৎ মতো ধীরে সুস্থে ডাকে দেওয়া হয়েছে। লিখছেন...ভাষাটা সংক্ষিপ্ত, যেমন হওয়া উচিত। তবে অফিসিয়াল সৌজন্যের অভাব নেই, বরং একটু এগিয়ে আমায় এই পুরস্কার-প্রাপ্তির জন্য অভিনন্দিতই করা হচ্ছে। আমি যেন যথাসময়ে উপস্থিত হ'য়ে পুরস্কারটি গ্রহণ করি।

আমি উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখলাম—আমি সম্প্রতি একটানা অসুখ থেকে উঠেছি। বর্তমান শারীরিক অবস্থায় এত দূরের রেলযাত্রার ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়, অনুগ্রহ ক'রে সময়মত পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব।

রেডিওর কথার কোন উল্লেখ নেই। আমিও একটা অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ তুলে বিষয়টাকে বাড়ালাম না। তবু, বহুদিন পর্যন্ত মনে একটা সংশয় খচখচ করতেই থাকল, সত্যই কি রেডিওতে তেমন কিছু ছিলনা, কিম্বা থাকলেও আফিসের সঙ্গে তার কোনও সংস্রব ছিল না?

এর স্বরূপটাও একদিন স্পষ্ট হোল, বেশ কিছুদিন পরে।

...কলকাতায় গেছি। "মিত্র-ঘোষে" খানিকটা ব'সে শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট দিয়ে "প্রকাশ-ভবন" এর দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ পিঠে একটা ভারি হাত পড়ল। ঘুরে দেখি মনোজবাবু। ওঁর ছেলের দোকান "গ্রন্থপ্রকাশ" থেকে কখন বেরিয়ে এসে পাশাপাশি হয়েছেন। বললেন—"এই যে বিভূতিবাবু। কবে এলেন?...চলুন আমার সঙ্গে...কি খাবেন?"

প্রথম সাক্ষাতে খাওয়ার কথাটা এইরকম থাকেই, হেসে বললাম—"সন্দেশ ছাড়া আর কি"?

"চলুন।...তাই হবে"...

পিঠে হাতটা আলতোভাবে রয়েছেই। যেতে যেতে বললেন আমায় —"একটা বেশ মজা হয়েছে—একটু ছুঃখ ক'রেই বলেছিলেন— 'বিভূতিবাবু যে প্রাইজটা নিতে এলেন না...সেটা কি ক'রে কার ভুলে ওরকম একটা আনপ্লেজেন্ট ব্যাপার হয়ে গেল বলেই? উনি অবশ্য অসুস্থতার কথাই লিখেছেন।' ... আমি বললাম 'না, ওটা যে টপ্ লেভেল (Top level) থেকে হ'তে পারেনা এটা উনি বুঝবেন বৈ কি; নিশ্চয়ই অসুস্থই ছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীটে "বেঙ্গল পাবলিসার্স"-এ গিয়ে বললাম ছু'জনে। সেদিন ওঁর সন্দেশের একটা আলাদা স্বাদ পেয়েছিলাম; ও-সব কথার মধ্য দিয়ে আর সেটা নষ্ট করলাম না।

এর পরেও একটু আছে, যাতে সমস্ত ব্যাপারটুকু আরও অনেকখানি পরিস্কার হ'য়ে যায়, এবং রেডিওর ঐ বিকৃত উক্তি ছাড়া আর কিছু বাকি থাকেনা।

জামসেদপুরে থাকতে "টেলকো"-র "রবীন্দ্র-সংসদে"-এ আমার যাওয়া আসা ছিল। এই সূত্রে সংসদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালহরি বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পত্র ব্যবহার হয় মাঝে মাঝে। সম্প্রতি ওঁর এক পত্রে উনি লিখলেন, "রবীন্দ্রচর্চা" নামক পত্রে শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় আমার সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন। পত্রটি পাঠিয়ে দিতে লেখায় গোপালহরি আমায় এককপি পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিখানি সম্পাদিকাকে লেখা, নাতিদীর্ঘ। শীর্ষে বোল্ড টাইপে লেখা— "ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয়।"

আমার সঙ্গে যেটুকুর সম্বন্ধ তা এই—

"সবিনয় নিবেদন,

'রবীন্দ্রচর্চা' আবার পেয়েছি। ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয় সে কথা ভেবে আবার লিখছি। ... ... প্রমথনাথ বিশী একবার প্রস্তাব করেছিলেন যে শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হোক। তাঁর বই আমাদের তালিকায় ছিলনা। প্রমথবাবু ছু'খানি বই-এর নাম দেন। বই ছু'খানি আমরা প্রত্যেকেই পড়ি। তার পরে আমরা একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত করি যে একখানি বই রবীন্দ্র পুরস্কারের যোগ্য। আমাদের সেই সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেন ও বিভূতিবাবু পুরস্কার পান।

২৩৩ যোধপুর পার্ক
কলিকাতা—৬৮

চিঠিতে তারিখ নেই। পত্রিকাটির প্রকাশকাল জুলাই ১৯৭৬। যেমন শুনেছি, অন্নদাশঙ্করই ছিলেন কমিটির কন্‌ভিনার (Convenir) কিম্বা চেয়ারম্যান (Chairman)। রেডিওর প্রচার-রহস্য সম্বন্ধে ওঁর কিছু জানা আছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন ক'রে ওঁকে বিব্রত করা আর প্রয়োজন মনে করিনি।

আমার রবীন্দ্র পুরস্কারের অধ্যায়টি এইভাবেই শেষ হয়েছে। প্রাপ্তি-যোগের এই অংশটাও।

এর পর অপর অংশটার কথা এসে পড়ে, অর্থাৎ যেখানে শুধু সম্মান এবং স্বীকৃতিই আছে ; হাত বাড়িয়েই নয়, নিছক অন্তর দিয়ে নেওয়ার জিনিস।

এ-সম্বন্ধে, সন তারিখ দিয়ে, তালিকা বদ্ধ ক'রে গুণে গুণে ব'লে যাওয়া আরও অস্বস্তিকর। অথচ, লিখি, বাংলার পাঠক পাঠিকার সঙ্গে একটা যোগাযোগ আছে, একটা কৌতূহল থাকা সম্ভব তাঁদের আমার সম্বন্ধে, খানিকটা তৃপ্ত করা আমার দায়িত্বও—সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে চুপ ক'রে থাকাও অস্বস্তিকরের ওপর অশোভনও।

তা'হলে আমি আমার এক কিশোর পাঠককে যা লিখেছিলাম সেই দিয়ে শুরু করি।

তাকে দেখিনি আমি। কাঁচা লেখা, কাঁচা মন দেখে মনে হোল কিশোরই ; স্কুলের শেষ ধাপে, কি, কলেজের প্রথম ধাপে। এখান থেকে অনেক দূরে, কলকাতা থেকেও অনেক দূরে, সুদূর উত্তরবঙ্গের ছেলে। আমার লেখা কিছু কিছু পড়েছে, ভালোই লেগেছে ব'লে মনে হয় ; কিন্তু, বোধহয়, দূরত্ব এবং বয়সের জন্যেই সদর-বাংলার সভা-সমিতি-আদির রিপোর্টে আমার নাম তেমন দেখতে না পাওয়ায় ব্যথিত বোধ করছে। নিজেও লিখছে কিছু কিছু, কয়েকজন সম-বয়সীকে নিয়ে একটি "সাহিত্যগোষ্ঠী" করেছে।

আমার প্রতি দেশের ঔদাসীন্য দেখে তার সাধ্যমত কিছু প্রতিকার করার শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের দু'টি কবিতার সঙ্গে লিখে পাঠিয়েছে, তারা একটি সভার ব্যবস্থা করে আমায় প্রধান অতিথি ক'রে নিয়ে যেতে চায়।

বেশ মিষ্টি লাগল ছেলেটিকে। উৎসাহই দিলাম। অবশ্য, কবিতার দুর্বোধ্যতা অনুশীলনে নিরুৎসাহই ক'রেই।

সেদিন আর একটা কাজ করি। আমার প্রতি দেশবাসীর বিরূপতা বা ঔদাসীন্যের ধারণাটা দূর করবার জন্যেই, খানিকটা আত্ম-প্রচারের ভাব

থাকলেও, তাঁদের হাত থেকে যা পেয়েছি, তাকে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া কর্তব্য মনে করি।

এখনও যা আগে বললাম, এবং যা বলতে যাচ্ছি তা আত্মপ্রচারের অস্বস্তি কাটিয়ে সেই মনোভাব নিয়েই। যা-কিছু আমার যাত্রাপথ সুগম করেছে তার কথাও বলতে হয় বৈকি। তা না হ'লে, শুধু দুর্গমতার কাহিনী ফেঁদে আমার পাঠক-পাঠিকাদের বিড়ম্বিত করাই সার হয়, আমার সুপ্ত স্মৃতিকেও শুধু ব্যথার মধ্যেই জাগিয়ে যেতে হয়।

অন্যদিকে যাওয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পথেই কথাটা আর একটুকু ব'লে না রাখলে যেন বেশ স্বস্তি পাচ্ছি না, অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। আমি যে ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, নিতান্ত সাধারণ একজন গ্রাজুয়েট হ'লেও আমার এই গৌরব-বোধটা আছে, আরও এইজন্য যে, একটা বৎসর এদিক-ওদিক হ'লেই আমি এ-গৌরব থেকে বঞ্চিতই হ'তাম। আমি যে-বৎসর পাটনা বি. এন. কলেজ থেকে পাশ করি, ১৯১৬ সালে, তারপরের বৎসরই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু। যদি সতেরোতেই পাশ করতে হোত, বড় গলা ক'রেই বলতাম, আমি এ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েটের মধ্যে। তবে একটা প্রভেদ থেকেই যেত, এদিক থেকে বলতে গেলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানের মধ্যে একটা স্নেহ-স্পর্শ পেয়েছি তো ভুল হয় না, নিজের বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকের আলমা মেটার (Alma-Mater) অর্থাৎ জননীরই সমগোত্র।

এবার প্রীতি-সমাদরের অন্য দিকটায় আসা যাক। আমার প্রথম মানপত্র পাই মজঃফরপুর-প্রবাসের দ্বিতীয় পর্বে, অনুমান ১৯৩১-৩২ সালের কিছু এদিক-ওদিক। উদ্যোক্তা ছিলেন আমার সাহিত্য-বন্ধু শ্রী শৈলেশ রায়, যাঁর কথা পূর্বে মজঃফরপুর-প্রসঙ্গে বলেছি। একটি ঘরোয়া বৈঠকে, আড়ম্বরহীন পরিবেশে মানপত্রটি দেওয়া হয় আমায়। সেটি রাখতে পারিনি, সম্ভবতঃ '৩৪ সালের ভূমিকম্পে নষ্ট হ'য়ে যায়। অভাবেই স্মৃতিতে আরও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। এরপর যা রয়েছে, তাও ঐ মজঃফরপুরের দান, দিচ্ছে মজঃফরপুর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা, বাংলা-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে, আশ্বিন ১৩৫২ সাল। হাতে লেখা কালি ফিকে হ'য়ে এসেছে; তবে সময়ের হিসাবে এইটিই এখন সুদূরতম ব'লে ধূসর দিগন্তের একটা মায়া সবচেয়ে বেশী বিস্তার ক'রে রেখেছে আমার মনে।

এরপর দেখছি একেবারে ১৩৬৫ সাল। পাচ্ছি হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদ থেকে। চাকরি থেকে বেরিয়ে এসে তখন বাংলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগটা বেড়েছে, আমি এই সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে

নিবিড়ভাবে জড়িত। সভাপতি যামিনী সোম। রয়েছেন বন্ধুবর রামপদ মুখোপাধ্যায়, অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ নিমাই সাধন বসু, উদীয়মান লেখক হরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় আর মণিশঙ্কর।...মণিশঙ্কর এখন 'শঙ্কর' নাম নিয়ে উপন্যাসিক হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইনি পরিষদের সভ্য ছিলেন কিনা বলতে পারছিনা, কখনও কিছু পড়েছিলেন কিনা তাও নয়। তবে প্রত্যেক অধিবেশনের শেষের দিকে একটি কোণে ব'সে থাকতেন মনে আছে।

পরিষদের আফিস ছিল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ নিমাই সাধনদের পৈত্রিক বাড়িতে, রামকৃষ্ণ লেনে। একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, রামকৃষ্ণপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ২০নং নেপাল সাহা লেনের অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যতদূর মনে পড়ছে এঁর সূত্র ধ'রেই আমার পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ। উনি ছিলেন আমার বৈবাহিক। পরিষদটি কয়েকবছর ধ'রে বেশ কাজ করছিল। এখন আর নেই।

বাঙ্গালী তার সাহিত্যকে ভালোবাসে। শুধু বাঙ্গালীই যে ভালোবাসে একথা বলার কোন অর্থ হয় না; তবে, বাঙ্গালী যে ডেকে, সভা ক'রে, মানপত্র-অভিনন্দনে নিজেদের ভালোবাসাকে সুন্দর-শোভন ক'রে দেখাতে ভালোবাসে, এ আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি; আমাকে নিয়ে বা অপর কাউকে নিয়ে। এখানে এটাই ব'লে রাখতে হয়, অ-বাঙ্গালী যাঁদের মধ্যে রয়েছি, তাঁদের কাছ থেকেও সমাদরের চুয়াচন্দন লাভ হ'য়েই গেছে আমার।

ধারাটা বয়েই গেছে, কখনো ঘরোয়া পরিমণ্ডলে, শুধু মাল্যচন্দন, কখনও সাড়ম্বর। আমিই সব সময় সাড়া দিয়ে উঠতে পারিনি।

এর প্রধান কারণ, বড় বড় সভাসমিতিগুলির সময় থাকে বড়দিনে ছুটির সময়, একেবারে মাঝশীতে। এই জিনিসটাকে আমি একেবারে বাঘের মত ভয় করি। দু'বার এর থাবার আঁচড় খেয়ে ভয়টা আরও কায়েমী হ'য়ে ব'সে যায় মনে। একবার ১৯৫৯ সালে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের গুজরাট-আমেদাবাদ অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতি হিসাবে গিয়ে। যাওয়ার সময় ভালোই যাই, সঙ্গী ছিলেন শ্রীমতী লীলা মজুমদার আর বন্ধুবর প্রেমেন্দ্র মিত্র। শীতে আমেদাবাদের জলবায়ু বসন্তেরই মতো, খুবই সুখকর। কিন্তু ফেরার সময় ভোরে দিল্লীতে স্টেশনে গাড়ি বদল করতে যে ঠাণ্ডা লাগে তাতে শিবপুরে এসে সেবারেও আমায় প্রায় সপ্তাহ তিনেক ভুগতে হয়। আবার বেশীকেই ভুগিয়ে।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা মাদ্রাজ-সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়ে। ঐ বড়দিন, এক্স-মাসের সময়। পুরী-ভুবনেশ্বরের নীচে আমার দক্ষিণ ভারত দেখা হয়নি। মাদ্রাজ চিরবসন্তের দেশ। দিন চার-পাঁচ আগে গিয়ে চিদম্বরে সর্বভারত ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সটা শেষ ক'রে—দর্শক হিসাবেই—রামেশ্বর-সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত একটা ঘূর্ণীচক্কোর দিয়ে মাদ্রাজ অধিবেশনে দু'টো দিন কাটালাম। শীতের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। যে হোটেলে জায়গা পাই, মাথার ওপর পাখা খুলে তাপ নিবারণ করতে হচ্ছে। আমি বিহারের মানুষ, সে হিসাবে বাংলার শীতও আমার পক্ষে বসন্তই, সবই অনুকূল, তবু উড়িষ্যা পেরিয়ে দক্ষিণের সঙ্গে যা একটু তাপমাত্রার প্রভেদ ঘটল তাইতেই আবার এক আঁচড়। এবার অনিদ্রা-অনিয়মে দক্ষিণের ঘূর্ণি-চক্কোরে শরীরটাও পড়েছিল ভেঙ্গে। বেণীকে দিন দশ-বারো যাওয়া-আসা করতে হোল।

এইসময় একবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বানে বোধহয় গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে হ'য়ে এসেছি। বেশীদিনের কথা নয়, বারাণসীর বাঙ্গালীদের আমন্ত্রণে ১লা বৈশাখের একটা বড়রকম সভায় পৌরোহিত্য ক'রে এসেছি, পশ্চিমের 'লু'-বাতাসের মধ্যে কয়েকটা ছোটখাট প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে প্রচুর ঘোরাঘুরি ক'রে, অক্ষত শরীরেই। যদি বলি, অল্প সময় হলেও, খানিকটা পশ্চিমের স্বাস্থ্য গায়ে মেখে, তো ভুল হয় না। গ্রীষ্মটা সয়, কিন্তু শীত 'নৈবচ নৈবচ'।

পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কয়েকবছর ধ'রে সাড়ম্বরে গুণী-সম্বর্ধনা করছিলেন। একসঙ্গে সাহিত্যিক, সংগীতকার চিত্রকলাকার, অভিনেতা, আরও জীবনের বিবিধক্ষেত্রে যাঁরা বিশিষ্ট তাঁদের ডেকে রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে। একবার আমায় ডাকেন তারাশঙ্করের সম্বর্দ্ধনায় তাঁকে 'পরিচিত' করবার ভার দিয়ে। তারপর একবার ১৯৫৯ সালে আমাকেই সাহিত্য বিভাগে বরণ করা স্থির করেন তাঁরা। আমায় পরিচিত করেন শ্রদ্ধেয়া আশাপূর্ণা দেবী। অনেক কিছুর মাঝখানে সেবারের একটা জিনিস স্মৃতিতে বেশী ক'রে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। ডায়াস থেকে নেমে আসতে নরেনদাদা (৺নরেন্দ্র দেব) রাধারাণী দেবীর সঙ্গে এগিয়ে এসে একরাশ রজনী-গন্ধা আমার বুকে চেপে ধ'রে তাঁদের দু'জনের আশীর্বাদ জানালেন।

এগুলো আসলের সঙ্গে সুদ, আরও মিষ্ট।

কতকটা এই ধরণের একটা অভিজ্ঞতা, মিত্র-ঘোষ কর্তৃক আয়োজিত আমার অশীতিতম জন্মদিনের সম্বর্ধনা স্মৃতির এক কোণ আলোকিত ক'রে রেখেছে। সেদিনকার আয়োজন-আড়ম্বর একা আমাকেই নিয়ে

ব'লে, মঞ্চ থেকে নামার সঙ্গে আমাকে ঘিরে ভিড়টাও জমে উঠেছিল বেশি। তারই মধ্যে ব্যক্তিগত অভিনন্দন, কুশল-প্রশ্নাদি ছাড়া, কিছু কিছু উপহার-উপঢৌকনও হাতে এসে পড়েছে, ডায়াসে স্তূপীকৃত মাল্য উপঢৌকনের ওপর জড়ো ক'রে ক'রে গেছি। বাড়িতে এসে গোছগাছ করবার সময় অনেকগুলির সঙ্গে নাম পিন্ করাই পাওয়া গেল। কোন কোনটির সঙ্গে না থাকলেও দাতাদের হদিস্ পেতে তেমন অসুবিধা হোলনা, একটির সম্বন্ধে কোন আন্দাজই খাটছিল না। একটি জরির পাড়-দেওয়া গরদের জোড়। নাম ধাম কিছুই নেই। জিনিষটা একটু বিশিষ্টই, তাছাড়া তারমধ্যে এমন একটা আনুষ্ঠানিক মর্যাদা ছিল যে, দাতার নামটা আবিষ্কার করতে না পারায় মনটা বেশ খারাপই হ'য়ে রইল।

এর অনেক পরে একদিন দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হ'তে বললাম; মনে হোল ওঁকে হয়তো জিজ্ঞাসা করা যায়, ওঁরা গিয়েছিলেন। স্বামী স্ত্রী আর আর ছোটো ছেলে মিলে। কুণ্ঠাও ঠেলে আসছে একটা। খুব ডেলিকেট্ ব্যাপার এদিকে; ওরা যদি কিছু না দিয়ে থাকেন তো লজ্জায় প'ড়ে যাবেন প্রশ্নটায়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ক'রেই ফেললাম প্রশ্নটা— এই রকম একটা অস্বস্তিতে পড়া গেছে কিছু আন্দাজ করতে পারেন উনি?

দুর্গা একটু মুখের দিকে চেয়ে সঙ্কুচিতভাবে হেসে বললেন— "আপনার মা তার ছেলের জন্মদিনে দিয়েছে।" মণিকাকে ডাকলে কিম্বা তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে আমি মা-কথাটা জুড়ে দিই তাঁর নামের সঙ্গে।

কথাগুলির সঙ্গে দুর্গার সলজ্জ হাসিটুকু মিশে সে যে মধু, তার স্বাদ যাবেনা কখনও আমার জিহ্বা থেকে।

স্রোতটা বহেই গেছে, কখনও স্তিমিত, কখনও উদ্বেল, স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা সিঞ্চিত মাল্য উপহারের স্তূপ কোথায় রাখব ভেবে পাইনি। এটা বিশেষ ক'রে এক ঝোঁক এসে পড়ে রবীন্দ্র-পুরস্কার পাওয়ার পর। পাটনা, ভাগলপুর, রাঁচি, মজঃফরপুর, ঘরের কাছে সমস্তিপুর, ঘরে এসে লাহেরিয়াসরাই—দ্বারভাঙ্গা—

.কে কিভাবে আমার আনন্দটাকে শতগুণ বেশী নিজের ক'রে দেখাতে পারে—একটা রেষারেষি প'ড়ে গিয়েছিল। সবার মধ্যে নূতন ক'রে বাঁচার সে এক অপরূপ উন্মাদনা!

এই সঙ্গে কোন মহা-মনীষীর স্মৃতি-তর্পণের পূত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ।

মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানে ডাকলেন। সভাপতি বন্ধুবর বলাইবাবু (বনফুল), আমি প্রধান-অতিথি। অনেক সময় একটা আধটা টিপ্পনীতে আরও মিষ্ট হ'য়ে ওঠে এই সব ব্যাপারগুলা। আমাদের দু'জনকে নীচে থেকে ওপরের ডায়াসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মনোজবাবু হলের প্রথম সারিতে ব'সে ছিলেন, ওঁর সামনে দিয়ে যাওয়ার সঙ্গে রহস্য-মন্তব্য করলেন "অল্ বিহার" (All Bihar)—একটু নিম্ন স্বরে হ'লেও কাছাকাছি দু'তিন সারিতে একটু হাসি ছলকে উঠল।

আমার বক্তব্যের সময় উঠে আমি এই মিষ্ট হাসিটুকু আরও একটু ছড়িয়ে দিলাম। ওঁর সঙ্গে তাল রেখেই। একটু হেসেই বললাম—"আমি আসছি বিহার থেকে একটা সংবাদ বহন ক'রে, জানিনা আপনারা কিভাবে নেবেন। ওঁরা দাবি করছেন—শরৎবাবুর বাল্যকাল যখন সেখানেই কেটেছে, বিশেষ ক'রে তাঁর সাহিত্যের 'হাতেখড়ি' যখন সেখানেই, তখন তিনি বাংলার চেয়ে বেশিমাত্রায় তাঁদেরই—"এটা অনেকটা কৌতুক ক'রেই, যদিও বিহারের এ দাবী যে নিরর্থক নয় শরৎ স্মৃতি শতবার্ষিকীর ভাগলপুর অনুষ্ঠানে বিহারীদের যে ভূমিকা তাতে এ সত্যটুকু ভালো ভাবেই মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল।

"প্রাপ্তিযোগ"-এর কথা এখানেই শেষ করি। অনেক কিছু গেল ছেড়ে, যা মনে পড়ল তাও ভাষার অভাবে উপযুক্ত ভাষায় বলা গেলনা; অপূর্ণতা নিয়েই আপাততঃ বিদায় নিই এ প্রসঙ্গ থেকে।

চাকরি-জীবন থেকে স'রে এসে প্রথম অসুবিধা যা কিছুদিন ভোগ করতে হোল, তা অর্থাভাব। একটা বাঁধা মাইনে ছিল, সেটা গেল। তবে প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠে এটা স'য়ে আসতেও দেরি হোলনা, কেননা ধাক্কাটা সেরকম রূঢ় হ'য়ে লাগতে পারেনি। তার কারণ আমার একটা দুর্ভাগ্যই এই সময় সৌভাগ্যের আকারে এসে সহায়তা করল।

The white man's burden, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গের দায়িত্ব ব'লে পাশ্চাত্য রাজনীতিতে একটা কথা আছে। এই দায়িত্ব পালন করবার শুভ ব্রতে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে তারা এশিয়া, আফ্রিকা, এমেরিকায় দুই শতাব্দীরও অধিক ব্যাপৃত ছিল। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে দেখেছি ভারতবর্ষে আমরা একটু মাথা তোলবার চেষ্টা করলেই ইংরাজ শাসক হুমকিতে-হুজ্জতে তাদের এই দায়িত্বের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিত। নামটা মনে পড়ছেনা, একবার এইরকম একটা উপলক্ষে একজন পদস্থ ইংরাজ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, তারা এদেশ ছেড়ে চ'লে

গেলে একটি মানুষেরও খাস-সম্পত্তি (Private property) ব'লে কোনও সামগ্রী থাকবেনা, কোনও নারীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবেনা।

বাংলাই সর্বপ্রথমে দেশটা কাদের সম্পত্তি এই প্রশ্নটা তোলায়, বাংলার ওপরই আক্রোশটা ছিল বেশি, ক'টা কোপ ক'জায়গায় দিল। শায়েস্তা হয়না দেখে, অন্য উপায়ও ধরল। তার মধ্যে নিত্যদিনের ছোটখাটগুলোর কথা ছেড়ে ১৩৫০ সালের মনুষ্য-রচিত দুর্ভিক্ষ (Man made famine), ১৯৪৬ সালের কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং শুভবুদ্ধির উদ্বোধনের শেষ চেষ্টা হিসাবে পিঠোপিঠি বাংলাব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যবস্থা করে।

১৯৪৬ সালের কলিকাতার দাঙ্গার আমার খানিকটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। আমি তখন কিছুদিন ধ'রে বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে রয়েছি। একদিন শিয়ালদ'র দিক থেকে ওঁর বাড়ি আসবার পথে ভুলক্রমে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ঢুকে প'ড়ে, নিতান্তই দৈবক্রমে একটা পুলিশ ভ্যান এসে পড়ায় সে-যাত্রা রক্ষা পাই।

এর পরের অভিজ্ঞতা খানিকটা অপ্রত্যক্ষ এবং সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে থেকে। সেবারের নাটমঞ্চে নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে জবাহরলাল নেহেরুর আবির্ভাবের জন্য সমস্ত দৃশ্যপট আমার চোখের সামনে এখনও জ্বল জ্বল করছে।

১৯৪৬···, আমি তখন পাটনার মহকুমা বাঢ়ে রয়েছি। অবনী সেখানে ভেটেরিনারি সার্জেন। দাদা কিছুদিন থেকে অসুস্থ। পাটনায় যাওয়া-আসা ক'রে তাঁর চিকিৎসার জন্য তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিছুদিন পরেই আবার দাঙ্গা শুরু হোল। এবারেরটা আরও ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে। Statesman নাম দিল "দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং" (The great Calcutta killing)। কলকাতা এবার নিজেকেও ছাড়িয়ে গেছে। দেখতে দেখতে পূর্ববাংলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল আগুন। গান্ধীজী দলবল নিয়ে কুমিল্লার গ্রামে গ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় পদব্রজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ফল বিশেষ কিছু হচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছেনা। বিয়াল্লিশের ১৫ই আগষ্টের 'কুইট ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ "ভারতছাড় আন্দোলন"—এর পর ইংরাজ বুঝে গেছে, এখান থেকে তাদের পাত্তাড়ি গুটিয়েই নিতে হবে। ওপরতলায় কথাবার্তা সেইদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

ভেতরে ভেতরে হুমকিটা সপ্রমাণ করবার শেষ চেষ্টা—আমরা না থাকলে তোমাদের হাল কী হবে একবার ভালো ক'রে বুঝে নাও।

হঠাৎ একটা স্ফুলিংগ কি ক'রে ছিটকে বিহারে এসে পড়ল। প্রথমে বোধহয় পাটনা, তারপর তার আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

এর প্রথম ফলশ্রুতি, কলকাতার অবস্থা আরও খারাপ হ'য়ে উঠল। দাদাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালেই ভালো হয়, কিন্তু হাওড়ায় নেমে আর বাইরে বেরুবার উপায় নেই। লীগ-গভর্ণমেণ্ট, শোনা গেল সুরাওয়ার্দি স্বয়ং লালবাজারের কণ্ট্রোলরুমে ব'সে হুকুম দিয়ে যাচ্ছেন।

পাল্টা জবাবে বিহারে আগুন দাউদাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে। হিন্দু প্রধান জায়গা, অপর পক্ষেরই ক্ষতি হচ্ছে বেশি। জবাহরলাল দিল্লী থেকে উড়ে এসেছেন বিহারের পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখে সামলাবার জন্য।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে বিরাট মিটিং বিশৃঙ্খলায় পরিণত হোল। শুনলাম, ভীড়ের মধ্যে দিয়ে তাঁকে বের ক'রে আনবার সময় তাঁর মাথার গান্ধীটুপি পেছন থেকে টোকা মেরে উড়িয়ে দেয়।

কলকাতা ছেড়ে দিয়ে বিহারে আসবার জন্যে জনতা আরও উঠেছে ক্ষেপে। এরও ফলশ্রুতি, এখানে দাঙ্গার উত্তাপ আরও বেড়ে যাওয়া।

ওঁর পাটনায় আসার সেই দিনের কথা কি পরের দিনের মনে পড়ছেনা। আমাদের বাসাটা একটা তেমাথার ওপর। পাটনা থেকে একটা রাস্তা গঙ্গার সমান্তরালে বক্তিয়ারপুর-বাঢ় হ'য়ে মোকামার দিকে চ'লে গেছে। বাঢ়ের বাজারে স্টেশন থেকে একটা রাস্তা এসে এইখানটায় মিলেছে। রাস্তার ওধারে, আমাদের বাসার ঠিক সামনা-সামনি বাঢ়ের পুলিশ স্টেশন। ক'দিন থেকেই সেখানে গোলমাল। থানা ব'লেই হৈ-চৈ টা বেশি নেই, তবে একটা তীব্র উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের ভাব সমস্ত জায়গাটায় যেন ছেয়ে রয়েছে; তার সঙ্গে একটা চাপা আক্রোশেরও ভাব বৈকি। এখানে-ওখানে ছোট ছোট দলে দাঁড়িয়ে আলোচনা, হিন্দু আলাদা, মুসলমান আলাদা। একই দৃশ্যে দুই অংশের মনোভাব বিভিন্ন। দৃশ্যটার মাঝে মাঝে থানার সামনে একটা দু'টো করে লরি এসে দাঁড়ালো। শরনার্থীদের দল। শিশু, ছেলে, বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ। আহত, সুস্থ। যারা সুস্থ তাদের মুখেও মৃত্যুর ছায়া ঘনীভূত। থানার লোকেরা প্রস্তুতই রয়েছে, সবার নামধাম বিবরণ লিখে ছেড়ে দিতে লরিটা এগিয়ে যাচ্ছে। কিছু দূরেই একজন জমিদারের বড় কম্পাউণ্ডওলা বাগানবাড়ি। গভর্ণমেণ্টের দিক থেকে দখল ক'রে নিয়ে তাঁবু ফেলে শরণার্থীদের আশ্রয়শিবির করা হয়েছে।

বড় সদর রাস্তা, কিন্তু ওদিকটায় কেউ বিশেষ যাচ্ছেনা। হাতের কাছে পেলে, মনের যা অবস্থা, নিরুপায় শরণার্থীই কি হ'য়ে উঠবে কে বলতে পারে?

তবু একবার সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে গেলাম। না দাঁড়িয়ে যতটা দেখলাম তাতে ব্যবস্থাটা ভালোই। বেশ বড় বাড়িই, অনেকগুলি তাঁবু খাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা সুস্থ তাদের মধ্যে কতকটা নিশ্চিন্তভাবে ঘোরাফেরার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। অথচ বিগত ক'টা দিন এদেরই কিভাবে কেটেছে কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। এখানে-ওখানে কয়েকটি শিশুর দলকে জটলা ক'রে খেলা করতেও দেখলাম; যাদের অতীত নেই ভবিষ্যৎও নেই, বর্তমান থেকে রসটুকু নিংড়ে নেওয়ার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণই রয়েছে, এখনও।

আরও একটা দৃশ্যে মন খানিকটা ঘুরিয়ে দিল কিছুক্ষণের জন্যে। একটি মেডিকেল স্কোয়াড (Medical Squad); আহতদের সেবায় নিরত চিকিৎসাব্রতী স্বেচ্ছাসেবীর দল। আমারই মতো কৌতূহলী একটি পথিককে প্রশ্ন ক'রে জানতে পারলাম এরা সব কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে এসেছে। এর মধ্যেও একটা জিনিস যা বেশি ক'রে এই ট্রাজেডির মধ্যে আশার আলো এনে দেয় তা এই যে, এদের বেশির ভাগই হিন্দু ছাত্র। কারণটা নিশ্চয় মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা কলেজেও কম ব'লেই।

প্রভেদটা ধরা পড়ে কয়েকটি ছেলের মাথার শিরস্ত্রাণ দেখে। আরবদের অনুকরণে মুসলমান ছাত্রদের মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত একটা বস্ত্রখণ্ড কপাল বেষ্টন ক'রে দু'ফেরতা মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা; টুপিই বলা হোক বা পাগড়িই বলা হোক। বলতে কি, আমার দৃশ্যটা ভালো লাগেনি; বিশেষ ক'রে সেই পরিবেশের মধ্যে যেখানে উভয় পক্ষেরই সাধারণ বিপদ জেনে এক পক্ষ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় মুসলমানদের এ-শিরস্ত্রাণ কখনও ব্যবহার করতে দেখিনি ব'লে এতে ক'রে ব্যবধানটা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাই ছিল যেন। যে- ব্যবধানের জন্যেই সে-দিনের সেই ট্রাজেডি, সেটাকেই অন্য পথে ঘুরিয়ে আনা। একটা "ভিসিয়াস সার্কেল" (Vicious circle) অর্থাৎ দুষ্ট বৃত্ত সৃষ্টি করা।

একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ঘুরে এক নজর দেখে নিয়ে আমি রাস্তার পাশেই আমাদের বারান্দাটায় এসে পড়লাম। উৎকট দৃশ্য আর উৎকট নেশা মনের দিক দিয়ে একই ধরণের জিনিস। সহ্য হচ্ছেনা, ভেতরে গিয়ে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করছি, আবার বাইরের স্তব্ধতা ভেদ ক'রে হঠাৎ একটু আওয়াজ, বোধহয় লরিরই শব্দ; বেরিয়ে আসছি।

অবনীর আফিস বাসাটারই সঙ্গে, সামনের দিকে দু'টো ঘর নিয়ে, পাশেই রাস্তার ধারে নীচু বারান্দা, সেইখানে একটা চেয়ার পাতিয়ে রেখেছি। অবনী বাইরে গেছে, ট্যুরে কিংবা সহরের মধ্যে কোথাও।

বেলা পড়ে এসেছে। ভেতরে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হোল, একটা-যে গোলমাল চলছিলই বাইরে, একেবারে চাপা প'ড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখে আমিও একরকম স্তম্ভিতই হ'য়ে গেলাম; দেখি, একটা জীপ থেকে নেহরু নেমে ঠিক তে-মাথাটার ওপর দাঁড়িয়ে। বোধহয় 'সারপ্রাইজ ভিজিট' (Surprise visit), অর্থাৎ সূচনা না দিয়েই আসা। থানার দিক থেকে কয়েকজন হন্তদন্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসছে, তার আগেই উনি ওদিকে না গিয়ে রাস্তা ধ'রেই কয়েক পা এগিয়ে পড়েছেন।

এর পরের চিত্র যা স্পষ্ট মনে আছে, উনি রাস্তার মাঝখানে, একজন মুসলমান ভদ্রলোক একটা ফুলস্কেপ কাগজে একটা দরখাস্ত এগিয়ে এসে দিলেন। থানার দারোগা থেকে নিয়ে যে যেখানে ছিল যেন চিত্রার্পিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে দূরে দূরেই। কোন লরিও সেই তখন, চওড়া সড়কটার মাঝখানে শুধু নেহরু আর আবেদনকারী ভদ্রলোক। দু'জনেরই পরিধানে সাদা পায়জামা আর চাপকান। নেহরু হেঁট হ'য়ে খানিকটা প'ড়ে গেলেন। তার পরেই—বোধ হয় সবটা পড়াও হয়নি—হঠাৎ মাথাটা তুলে তাঁর দিকে চেয়ে, দু'হাতে দরখাস্তটা ছিঁড়ে ফেলবার ভঙ্গি ক'রে—"মৈ ইসে ফাড় দুঁ? মৈ ইসে ফাড় দুঁ?"—ব'লে একবার সামনে একবার পেছনে লাফিয়ে যেতে লাগলেন।

সবাই অবাক হ'য়ে গিয়ে সমস্ত জায়গাটা একেবারে নিশুতি হ'য়ে গেছে। ভদ্রলোকের অবস্থা বলে বোঝানো যায়না। হতচকিত হ'য়ে একেবারে পুত্তলিবৎ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, 'ন যযৌ ন তস্থৌ।'

এরপর আমার পালা।

কয়েকটা সেকেণ্ড মাত্র অবশ্য, তারপরেই নেহরু থানার দিকে ঘাড়টা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে সামনের দিকেই পা বাড়ালেন। থানার দারোগা নিয়ে কয়েকজন লোক এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গ নিল। একটা ভিড় বেশ চাপ বেঁধে উঠেছে, তে-মাথায় পুলিশ কর্ডন দাঁড়িয়ে গিয়ে তাদের রুখে রাখল। আমি ভেতরে ভেতরে বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছি। নেহরু ওদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে কয়েক পা এগিয়ে আসতে আসতে দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন, আবার এগিয়ে আসছিলেন, এই করতে করতে আমাদের বাসার সামনে এসে যেন মনে হোল দাঁড়িয়েই পড়লেন। দারোগার কাছ থেকে কিছু কাগজপত্র নিয়ে দেখছেন, কিছু কথাবার্তাও হচ্ছে।

আমি ভেতরে ভেতরে বেশ চঞ্চল হ'য়ে পড়েছি। আমার একেবারে

সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নেহরু—ভারতের প্রধানমন্ত্রী—যে কারণেই হোক, থানা থেকে তাঁকে বসতে দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই হচ্ছেনা, এ অবস্থায় আমার কোন কর্তব্য আছে কিনা, থাকলে তা কতদূর পর্যন্ত ? মেজাজের যা নমুনা দেখলাম, সমস্ত পরিস্থিতিটাই যেমন বিদ্যুৎগর্ভ, তাতে এগিয়ে গিয়ে কিছু বলতে যাওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিনা। এদিকে মুহূর্তগুলি দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে।

না এগিয়ে আমি ভেতরে চ'লে গেলাম। কোন রকম শব্দ করতে মানা ক'রে। চাকর আর আফিসের লোক দিয়ে ভেতর থেকে আফিসের চেয়ার টেবিলগুলি বের করিয়ে চওড়া বারান্দাটায় সাজিয়ে দিলাম। খান চারেকই চেয়ার। বাড়ির ভেতর থেকে আরও আনতে গেছে। তার আগেই নেহরু উঠে এলেন। আমি নীরবে একটা নমস্কার জানাতে, মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। দারোগা-কেরাণি কি সব কাগজ এগিয়ে দিতে দেখতে আরম্ভ করলেন। কিছু প্রশ্ন-উত্তর চলল; একটু মগ্নস্বরেই, অন্ততঃ আফিসের দিক থেকে। বারান্দাটা বেশ বড়ই, আমি স'রে গিয়ে একপ্রান্তে দাঁড়ালাম।

আতিথ্যের প্রথম দফাটা স্বীকৃত হয়েছে। এখন, গৃহস্বামীকে ওঁর যদি কিছু বলবার থাকে। কিম্বা আমারই আর কিছু করবার আছে কি ? এত অকস্মাৎ, ওদিকে অতিথি এতই বড়, সর্বোপরি মেজাজের অবস্থা যা দেখলাম, তাতে আর এগুনো ঠিক হবে কিনা কাজের মধ্যে, ঠিক মাথায় আসছেনা। তারপর মাঝামাঝি একটা রফা করলাম। রাস্তায় নেমে, ঘুরে বাড়ির মধ্যে গিয়ে চা আর জলযোগের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি ক'রে রাখতে ব'লে বেরিয়ে এসেছি, যেমন সুযোগ বুঝি করা যাবে, দেখি নেহরু উঠে বারান্দা থেকে নেমে পড়ছেন। ক্যাম্পের দিকে হয়তো গিয়ে থাকবেন, ঠিক মনে পড়ছেনা। থানায় আর না ঢুকে জীপে উঠে প'ড়ে সোজা পাটনার দিকে চ'লে গেলেন।

বিহারের হাঙ্গামা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে বাংলারটা কমে এসেছিল, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

শুনলাল চিৎপুর-কলুটোলা দিয়ে যখন হিন্দুদের শান্তি-মিছিল এগিয়ে যাচ্ছিল, মুসলমানদের দোকান থেকে পিচকিরি-ভরা গোলাপজলের ফোয়ারা এসে তাদের নাইয়ে দেয়।

এরপর "বাগে-কমিশন"-এর দেশ বিভাগের পরে আর এক চোট।

এরপর আবার ওখানেও ঘরে ঘরে, এখানেও ঘরে ঘরে। ভারত উপমহাদেশের এ-অভিশাপ কবে, কিভাবে মিটবে কে বলবে ?

দাদাকে বাঁচান গেলনা। একটা বিশ্বাস মনের মধ্যে গেঁথে ব'সে থেকে ছে'চল্লিশের দাঙ্গাটাকে আরও যেন নিদারুণ ক'রে দিয়েছে আমার কাছে। পাটনায় হোলনা, তবে তাঁর যা অসুখ তাতে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারলে বাঁচাতে পারা যেতই তাঁকে। একমাত্র কলকাতাতেই তখন কিছুদিন আগে থেকে এর চিকিৎসার ব্যবস্থাটা হয়েছে।

এইসব খণ্ডপ্রলয়ে প্রত্যক্ষগুলি হিসাবে ধরা পড়ে, অপ্রত্যক্ষ সর্বনাশ কত যে ঘ'টে গেল, কে তার হিসাবে রাখবে?

আমার মনের বেদনাকে আমি তিনটি বড় গল্পে রূপায়িত করবার চেষ্টা করি, 'বিশ্বাস', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'সত্যাগ্রহী'। বই বের করি "কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার" নাম দিয়ে। বের করলেন "জেনারেল প্রিণ্টার্স", সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে।

উৎসর্গ করলাম—

"বিদেশীর ভাঙ্গন-মন্ত্রের ফলে নিরপরাধ যাহারা প্রাণ দিল, আর প্রাণ থাকিতেও যাহারা নিষ্প্রাণের অধম হইয়া রহিল, তাহাদের উদ্দেশ্যে।"

এর মধ্যে আমিও একজন থেকে গেছি। দাদা ছিলেন আমার জীবনের মূলসত্তা।

স্রোত এগিয়ে চলেছে। কখনও বেগ-চঞ্চল, কখনও স্তিমিত, মন্থর। এত মন্থর যে, মনে হয় যেন কোন্ অতলে এবার লুপ্তই হ'য়ে যাবে। মনে হয় যাকই লুপ্ত হ'য়ে; সুখের মধ্যে বজ্রের আঘাত হেনে, দুঃখের মধ্যে সুখের সঞ্জীবনী এনে দিয়ে, লুব্ধ ক'রে এ ধারা কোথায় নিয়ে চলেছে? কেন? কোথায় শেষ এর?

প্রিন্‌সিপ্যাল ডি. এন. সেন, আমাদের একটা কথা প্রায় বলতেন—জীবনের ব্যাপ্তি তিন দিকে—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর বেধ, Length, breadth and thickness—এর মধ্যে সুখ আর দুঃখের যা চরমরূপ, শোক, সেটা হচ্ছে বেধ, যা ঊর্ধ্ব আর অতলের সন্ধানে প্রবৃত্ত করে মনকে। অর্থটা সেদিন বোঝবারই চেষ্টা করেছিলাম মাত্র, ফিলজফি, অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের পাঠ হিসাবে; এখন উপলব্ধি করছি।

এই সময় দুঃখ-শোকের একটা মিছিলই চ'লে গেল যেন আমার জীবনের সামনে দিয়ে। শেষেরটা ছিল মৃত্যুর চেয়েও মর্মন্তুদ। কি কারণে জানিনা, বহুদিন পর্যন্তই কলকাতার সঙ্গে যোগসূত্র আমার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। লেখা পাঠিয়েছি, বেরিয়েছে, বইও বেরিয়ে গেছে কিছু কিছু, এই পর্যন্তই; যাওয়া-আসা একরকম বন্ধই ছিল। কোন বিশেষ কাজে যদি গিয়েও থাকব, তো শিবপুরে এক আধদিন থেকে চ'লে

এসেছি। একবার এইরকম শিবপুরে গিয়ে কার মুখে খবর পেলাম—বুদ্ধদেব কিছুদিন থেকে মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে ভুগছেন। তখন এমন অবস্থা, দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ রাখতে হয়েছে। ওঁর একজন প্রতিবেশী যুবক মাঝে মাঝে আমাদের বৈঠকে এসে বসতেন—নাম রমেশ সেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথের পুত্র। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তিনি আমায় বারণই করলেন চেষ্টা করতে। চিকিৎসা চলছে; এ-সময় পরিচিত কাউকে দেখলে মন আরও বিচলিত হ'য়ে উঠে, ফল খারাপই হয়।

বেশ কিছুদিন পরে তাঁর কাছেই খবর পেলাম—মারা গেছেন বুদ্ধদেব-বাবু।

এরপর ক'টা বছরই আমার জীবনে একটা শূন্যতা গেছে, যার মধ্যে থেকে আমি খুঁজে পেতে বিশেষ কিছু বের করতে পারছিনা। একটা রুটিনগত ধারায় লেখা ছাপা হ'য়ে যাচ্ছে। কিছু বইও বেরিয়ে যাচ্ছে; কিছু চলচ্চিত্রও, কিন্তু কোনটাই খুব বেশি দাগ রেখে যেতে পাচ্ছে না। এই-সময় বরাবর আর একদিক থেকে একটা চোট খেয়ে মনটা যেন আরও ঝিমিয়ে রইল।

আমার জীবনের মুল বৃত্তি সাহিত্য। সে এক নিতান্তই আমার অন্তরের জিনিস, গৃহের মধ্যে গৃহ। আমার পরমাশ্রয়। বাইরে থেকে কোন সংঘাত এলে সেখানে গিয়ে দাঁড়াই, তৃপ্তি খুঁজি; ভাল কিছু সঞ্চয় হ'লে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে পূর্ণতর ক'রে নিই। পঠন-স্বজন নিয়ে এ আমার একান্ত নিজের সংসার; বিচিত্র চরিত্রের সমষ্টি নিয়ে নিত্য-ঘটন-অঘটনের অভিনবত্ব নিয়ে। কবিগুরু গেছেন, শরৎচন্দ্র গেছেন। হতাশার হাওয়া বইয়ে দিয়েই। তেমনি আবার নব নব শক্তির পরিচয় পাচ্ছি। নব নব সম্পদে পুষ্ট হ'য়ে উঠছে আপন-পর নিয়ে এই নিতান্তই আপন সংসার; হঠাৎ দেখা গেল এ সংসারে ঘুণ ধরেছে। এ যুগের সাহিত্যেয় একটা শুভ লক্ষণ—কবির ভাষায় আর খেদ ক'রে বলবার কারণ ছিল না—"যে জন পুজিবে ও-পদযুগল সেই সে চরিত্র হবে।" সাহিত্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—সরস্বতী-লক্ষ্মী দুই বোনের যুগ্ম পূজা। সেটা গিয়ে একদিকে শুধু অর্থের পূজা রইল বেদী দখল ক'রে। লক্ষ্মীও নয় পাশ্চাত্য পুরানের বিত্ত-দানব ম্যামন্ (Mammon)। এই ম্যামনের প্রভাবে সাহিত্য হ'য়ে উঠতে লাগল কলুষিত; দ্রুত, দুর্বার গতিতে। নিয়ে যাও যত অতলে নিয়ে যেতে পার সাহিত্যকে। আমি রসদ যোগাচ্ছি। রক্তিম সুরা ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠুক তোমার লেখনি পাত্রে, যত যুবক যুবতীর ধমনীর রক্ত দিক তোলপাড় ক'রে। কিশোর

অকাল-যৌবনের ব্রত নিক। প্রৌঢ় বৃদ্ধদাক্ত যৌবনে ফিরে আসবার জন্যে লালায়িত হ'য়ে উঠুক। আর মসি নয়, সুরা-পাত্রে লেখনি ডুবিয়ে লিখে যাও। আমি আছি—'ম্যামন'।

একটা যেন মন্বন্তর এসে গেল সাহিত্যজগতে। পত্র-পত্রিকা, পুঁথি, সনেমা নাট-মঞ্চ, এমন কি রেডিওতে পর্যন্ত নগ্নতার জয়গান! সমাজ সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল। শাসক সম্প্রদায়ও। স্বাধীন চিন্তার যুগ। হস্তক্ষেপ করতে যাওয়া জুলুমবাজি; চলবে না। ঘুরপথে আদালত পর্যন্ত উঠল শ্লীল-অশ্লীলের বিচার। পরে এ-ও শোনা গেল, এটা ছিল নাকি চতুর আসামী পক্ষের সূক্ষ্ম চাল। অভিযুক্ত গ্রন্থের সর্বাধুনিক বিজ্ঞাপন কৌশল।

ম্যামন-দানবকেও নাকি তার স্বরূপে চেনা গেছে। এমেরিকাই জুগিয়ে যাচ্ছে টাকা; যত চাও।

একটা চরমে এসে না পড়লে কোন কিছুর আসল রূপটা স্পষ্ট হয়না। সেটা যখন এল, সমস্ত জাতির মুখে কলঙ্ক প্রলেপ দিয়েই এল একদিন —চরমেরও চরম ব'লে যদি কিছু থাকা সম্ভব হয় তো, সেইরূপে। ১৯৭২ সালের রবীন্দ্র পুরস্কারকে কেন্দ্র ক'রে। সাহিত্য সম্রাটকে স্মরণ ক'রে জাতির পক্ষ থেকে সাহিত্যব্রতীর জন্য যা শ্রেষ্ঠ অবদান, তাঁর স্মৃতিমূলে পবিত্রতম অর্ঘ্য।

একটা মন্বন্তরই। কোনও সভাসমিতিতে যেতে আশঙ্কা হোত। বিরোধিতা ক'রে সভা করার উপায় ছিল না। তবু, বাঙ্গালীর সাহিত্য-প্রীতি, নিরপেক্ষভাবেই একটু আলোচনা করবার ইচ্ছা হোল—কোন কোন বিশেষ বিষয় বা বিশিষ্ট সাহিত্যিকের রচনা-সম্ভার নিয়ে, আসরের এক কোণ থেকে একটা দল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল—চ্যালেঞ্জ—সাহিত্য-সভার এজেণ্ডায় আজকের যা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, শ্লীলতা-অশ্লীলতা, তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে কোন যুক্তিতে? শুরু হ'য়ে যায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে, যারা শুভ-বুদ্ধিপ্রণোদিত হ'য়ে করেছিল আয়োজন।...সভায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

হ্যাঁ, একটা প্রতিপক্ষ আছে বৈকি। এক একবার মনে হয়েছে, সারাদেশটাই প্রতিপক্ষের। আতঙ্কে বিস্ময়ে, মূক হ'য়ে গেছে, যদি সমধর্মী, কাউকে পায় তো বলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

এ-অভিজ্ঞতাও হ'য়ে গেছে মাঝে মাঝে। তাইতেই বুক বেঁধে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি এখনও। এ-গুলো হয়েছে আকস্মিকভাবে, এবং দৈব-নির্দিষ্ট অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে। ভবিষ্যতের কথা বললাম এই জন্য যে এরা সকলেই যুবক; সুস্থ,

পরিচ্ছন্ন বিচার দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করার দায়িত্ব যাদের কাঁধে।

শোভনের সঙ্গে বহু পূর্বের পরিচয়। মোহিতবাবু—কবি মোহিতলাল মজুমদারের বাসায় কলকাতায় গেলেই যেতাম। রুক্ষ, তেজস্বী, কড়া মানুষই ; বাংলাভাষা আর বাংলা দেশের প্রতি অসীম প্রীতি, ইংরাজিতে যাকে বলা যায় 'To a fault'—তারই কাছাকাছি—আপোষহীন, আর সব কিছুকে ঠেলে রেখে। কোণে—কাণে সর্বত্র মতে না মিললেও আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছিলাম ওঁর ব্যক্তিত্বে, সর্বত্র মতে মিলছে না জেনেও ওঁর একটা প্রশ্রয় ছিল আমার ওপর, বয়োজ্যেষ্ঠতার একটা স্নেহ।

সেইখানে একদিন শোভনের সঙ্গে দেখা হল। আমার যাওয়া কালে-ভদ্রে, কলকাতা যখন গেলাম। শোভন প্রায়ই যেত। ওর বাসাও ঐ দিকে টালিগঞ্জে। একদিন আমি গিয়ে গল্পস্বল্প করছি, শোভন এসে উপস্থিত হোল। গল্প হয় সাহিত্য, না হয় পলিটিক্স্, বাংলার ওপর কেন্দ্রের অবিচার। তখন নেহেরুর যুগ চলছে।

দূর পথের যাত্রী, আমায় উঠতে হোল। অল্প আগে এলেও শোভনও উঠে পড়ল। গল্প করতে করতে এলও আমার সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত। তাই থেকে দু'টো কথা জানতে পারলাম ; আমার মোহিতলাল প্রীতির সঙ্গে ওর প্রীতির একটা ভাবগত ঐক্য আছে ; আর, স্পষ্ট ক'রে না বললেও, আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটা বোধহয় ইঙ্গিত ছিল মোহিত-লালের দিক থেকে। যার জন্যেই যেন ও এই প্রথম সাক্ষাতের সুযোগটা এত ভালো ক'রে নিল।

শিক্ষিত, তীক্ষ্ণধী, আদর্শপ্রিয় যুবক। সবতাতেই সুচিন্তিত বলিষ্ঠ মতামত। এঁখন আমার জীবনের অনেকখানিই দখল ক'রে নিয়ে রয়েছে শোভন। জীবনের দিকে আমার যা attitude বা মনোভাব, ওরও তাই। তার সঙ্গে এটাও সত্য যে, এটা আমার সংস্পর্শে আসার জন্যেই হয়নি, আমার মতো ওরও স্বভাবসিদ্ধই।

সাহিত্যে এ-কলুষ ওকেও সমান ভাবেই ব্যথিত করেছে ব'লে, শান্তি পাই ওকে কাছে পেলে। ঐ দুর্ভোগের মধ্যেও পেতাম শান্তি।

কিনড্রেড স্পিরিট বা সম-মনোভাবের তৃপ্তি পাই প্রসিতেরও সঙ্গে আলোচনা ক'রে। ওর সঙ্গে পরিচয়, সে একটা আরও অদ্ভুত যোগাযোগ।

কলকাতায় গেলে বিশেষ ক'রে শিবপুরে গিয়ে উঠলে বোটানিক্যাল গার্ডেন একবার ঘুরে আসাটা আমার প্রায় নিয়মের মধ্যেই। যাই দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়েই, কিছু সময় হাতে থাকে।

সেবার আমার একটা বিশেষ কাজে খুব অল্প দিনের প্রবাস সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। শিবপুরেই উঠেছি। বাগানের জন্যে যে সময়টা ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, কি একটা বাধা পড়ে সেটা "নষ্ট" হ'য়ে গেল। পরদিনই বোধহয় ফিরে আসছি। বাগান আর হোলনা এবার।

বিকালে একটু ফাঁক পেয়ে মনে হোল একবার আসিই ঘুরে। পাম এভেনিউ (Palm Avenue) হ'য়ে একটু এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসছি, মাঝামাঝি এসে দেখি দু'টি যুবক ওই পথেই এগিয়ে আসছেন। একটু পা চালিয়েই, গল্প করতে করতে। একটু কাছাকাছি হ'তে মনে হোল, তাঁদের গতিবেগ একটু শ্লথ হ'য়ে গেছে হঠাৎ, আমার মুখের ওপর যে দৃষ্টি এসে পড়েছে তাতে খানিকটা কৌতূহল মাখানো। দু'দিকে যে যার এগিয়ে গেলাম।

কয়েক পা গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, ওঁরাও দাঁড়িয়ে আছেন এদিকে চেয়ে। আমিও দাঁড়িয়ে পড়তে এগিয়ে এলেন। প্রসিতই অর্ধোচ্চারিত প্রশ্নটা করলেন—"আপনি কি...?" বললাম—"হ্যাঁ, বিভূতি মুখার্জি। ...তোমরা ?"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয়। প্রসিত রায় চৌধুরী আর তার বন্ধু অসিত। প্রসিত যাদবপুরের ওদিকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক, অসিত অন্য একটা কলেজের। বহুদিন থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনটা দেখবার ইচ্ছা দু'জনের, যোগাযোগ হয় না। আজ ভোরে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

বললাম—"সে তো অনেক দূর।"

"তা বৈকি...। দু'জনে আবার একত্র হওয়া চাই। একটা ছুটি ছিল। আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা হ'য়ে যাওয়াটা...দৈব-নির্দিষ্ট মনে হয় না ?"—হাসলেন, চাপা উল্লাসে মুখটা রাঙা হ'য়ে উঠেছে।

"তা বৈকি। আমারও আসবার কথাই ছিলনা আজ।"—হেসেই উত্তর করলাম আমি। বই কি কি পড়েছেন তার কথাও তুললেন। ঠিকানা চাইলেন, একদিন এসে দেখা করবেন। বললাম—"ঠিকানা দিচ্ছি। কিন্তু এবার তো হবে না। আমি চ'লে যাচ্ছি।"

হাতে সময় নেই। কিন্তু আমায়ও অভিভূত ক'রে দিয়েছে এই অদ্ভুত যোগাযোগটা। আর বাড়ির দিকে না গিয়ে বললাম—"এসো, বরং আমরা ঐ গাছটার নীচে গিয়ে বসি একটু। নরেন্দ্রপুর সম্বন্ধে আমার খুব একটা কৌতূহল আছে। আর ডায়মণ্ডহারবার আমার ফেভারিট রিসোর্ট (Favourite resort), প্রায়ই যাই। এসো, তোমাদের যখন এমন-ভাবে পাওয়া গেছে।

সেই থেকে প্রেসিতের সঙ্গে চ'লে আসছে যোগসূত্র। দেখাসাক্ষাতে চিঠিপত্রে। একবার ওঁর মধ্যস্থতায় ভালো ক'রে দেখে এলাম মহা-বিদ্যালয়। অধ্যাপক হিসাবে সেখানে একটি ভালো জায়গাও করে নিয়েছেন।

এই সেদিন ওঁর চিঠি পেলাম। থিসিস্ লিখে ডক্টরেট পেয়েছেন।

কালিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গেও হঠাৎ এইরকম পরিচয়। যেন কেউ একজন লগ্ন ঠিক ক'রে রেখেছিল। উনি ওঁর বাড়ি নবদ্বীপ থেকে আসবেন, আমি দ্বারভাঙ্গা থেকে এসে শিবপুরে যাব, দু'জনে দেখা হ'য়ে যাবে দক্ষিণেশ্বরে। আগে সাক্ষাৎভাবে বা পত্রাচারে জানাশোনা একেবারেই ছিলনা। চোখাচোখি হ'তেই সেই একটু থমকে গিয়ে প্রশ্ন—"আপনি কি বিভূতিবাবু?" ঠিকানা নিয়ে একদিন শিবপুরে এসে দেখা করলেন। অল্পক্ষণই গল্পস্বল্প হোল। আদর্শপ্রিয় যুবক। ওঁর চিঠিগুলো পড়লে মনে হয়, সাহিত্য যে-পথ ধ'রে চলতে আরম্ভ করেছে, তাতে যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কোথায় দাঁড় করাবে সমাজকে, যেন ওঁর দিবসের দুশ্চিন্তা, রাত্রির দুঃস্বপ্ন।

এদিকে এরকম শেষ পরিচয় হোল প্রফুল্লর সঙ্গে। প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়। চাতরায় গিয়েছিলাম। আদি বাড়ি, একটা টান আছে, তা ছাড়া শেষ জীবনে একজন অকৃত্রিম বন্ধু পেয়ে গেছি, উপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী। অগাধ পাণ্ডিত্য; দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ—কিছুই বাদ নেই; সর্বোপরি একটি সরল, নিরহঙ্কার মনের অধিকারী। এমন একজন, যাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই অন্তরঙ্গ না হ'য়ে পারা যায়না।

বাড়ি শীতলাতলা, উপেনবাবুর বাড়ি হ'য়ে ফিরছি, শ্রীরামপুরে ট্রেন ধরব। প্রচণ্ড ভিড়, খান দুই গাড়ি ছেড়ে দিতে হোল। পরিণামে অবশ্য ভালোই হোল, নৈলে প্রফুল্লর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিলনা।

তৃতীয় গাড়িটাতেও এইরকম ভিড়, কিন্তু আর ছেড়ে দেওয়া চলেনা। সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে। আমি সেবার এসে কিছুদিন থেকে নিউ আলিপুরে দুর্গাপ্রসাদের বাড়িতে রয়েছি। কলকাতায় ভিড় ঠেলে পৌঁছাতে এমনিই খানিকটা রাত হ'য়ে যাচ্ছে, এর ওপর আর দেরি করা চলেনা। কোনরকমে ঠেলেঠুলে রড্ ধ'রে উঠে পড়লাম। গাড়ি ছাড়লে আর একচোট চেষ্টা ক'রে মাঝামাঝি গিয়ে একটা হ্যাণ্ডার ধ'রে ফেললাম। ভাবছি অবস্থার আর একটু উন্নতি হয়না? দৃষ্টিটা ভেতরে গিয়ে পড়ল। একটা তিল ফেললে নীচে পড়েনা। হতাশার পরম আশ্রয় হ্যাণ্ডারটাকে

ভাল ক'রে চেপে ধ'রে নজরটা ঘুরিয়ে নোব, দেখি একেবারে শেষের বেঞ্চে একটি যুবক আমার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ব'সে আছেন, একটা নিরুপায় উদ্বেগের ভাব। এসব ক্ষেত্রে যেমন হ'য়ে থাকে, দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেওয়ার পর আবার ওঁরই ওপর ঘুরে পড়তে, চেয়েই ছিলেন; বললেন—"চলে আসুন।"

দেখি, কি ক'রে এর মধ্যে পাশে খুব সংকীর্ণ একটু জায়গা ক'রে নিয়ে সেখানটা শক্ত ক'রে নিজের বাঁ হাতটা চেপে রেখেছেন। এগুনোও মুস্কিল। এই সময় রিষড়া এসে পড়ায় ভিড়ের মধ্যে যে একটু চাঞ্চল্য এসে পড়ল, তারই সুযোগে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। ও-বেঞ্চ থেকে একজন উঠে যাওয়ায় যুবক পাশের ছু'জনকে সরে বসতে ব'লে জায়গাটা বাড়িয়েও নিলেন। ভালোভাবেই বসতে পারলাম আমি।

প্রথম পরিচয় সেই একইভাবে—"আপনি বোধহয় বিভূতিবাবুই?"

তারপর ভিড়, তা থেকে আধুনিক যুগ, তারপর আধুনিক সাহিত্য থেকে সাম্প্রতিক অতি-আধুনিকায় এসে প'ড়ে কুণ্ঠিতভাবেই প্রশ্ন করলেন—"এতে আপনার কি মত?" "কি হওয়া সম্ভব মনে কর তুমি?"

—আমার প্রশ্নটা যে একটু শ্লেষের ভঙ্গিতেই বেরিয়ে প'ড়ে থাকবে তার একটু কারণ ছিল। এই বয়সের যুবকেরা প্রথমটা সতর্কভাবে টোপ ফেলে শ্লীলতা-পন্থী কি অশ্লীলতা-পন্থী বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, পরে প্রতিক্রিয়াশীল শ্লীলতাপন্থী দেখে তর্কে নামাবার চেষ্টা করেছে, এরকম অভিজ্ঞতা কয়েকটা হ'য়ে গেছে আমার, গোড়াতেই কেটে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করি। উপকৃত হওয়ার জন্যই একটু যেন রূঢ় হ'য়ে গেছে মনে হওয়ায় নরম ক'রেই বললাম—"কিন্তু কৈ, আপত্তিরও তো কিছু দেখছিনা।"

"কি বলেন আপনি"—একটু জোরের সঙ্গেই উত্তর করলেন। বললেন—"ঘরে ঘরে আপত্তি। কিন্তু কার কথা কে শোনে? বড় বড় কাগজগুলো দেখছেনই। বলবেন—কেন, চিঠিপত্র তো ছু'একজনেরই ছাপছে।...হ্যাঁ, ছাপছে বৈকি, পাঁচখানা স্বপক্ষে তো ছু'খানা বিপক্ষে, তাও বেছে বেছে ছুর্বল চিঠি। কাগজ বিক্রির বিজ্ঞাপন। সেরকম এডিটোরিয়াল কোথায়? চাবুক কোথায় শনিবারের চিঠির মতন?"...

উদ্দীপিত হ'য়ে উঠেছেন। এতক্ষণ সেদিকটায় দৃষ্টি যায়নি। একটু যেন সচেতন হ'য়ে দেখলাম—একটু স্থূল, সবল, পুষ্ট দেহ, মাথায় প্রায় একভাবে ছাঁটা চুল, মুখেও অবিন্যস্ত দাড়ি গোঁফের যথেচ্ছাচার নেই, সাজ-পোষাকও অনুরূপই, ধুতির ওপর একটা সাদা পাঞ্জাবী। ছু'জনেরই

এক সমস্যা, আলোচনার বিতর্কের ঝাঁজ নেই। দুঃখের কথা কইতে কইতেই এলাম হাওড়া পর্যন্ত।

প্রফুল্লদের বাড়ি শ্রীরামপুরে। উনি ব্যারাকপুর কলেজে প্রফেসারি করেন, বোধহয় দর্শনশাস্ত্রের ব'লে থাকবেন। আমি যে চাতরার মানুষ, মৌলিক বিচারে এ আবিষ্কারটুকু একটা পুলক সঞ্চার ক'রে থাকবে প্রফুল্লর মনে, তার ওপর একই ধরণের মতামত। হাতে প্রচুর সময় পেয়ে অনেক কথা ব'লে গেলেন উনি। ওঁদের বাড়িতে রীতিমতো সাহিত্য আলোচনা হয়। ওঁর পিতা বিশেষভাবে বইয়ের ভক্ত। সাধারণভাবে একটা আবহাওয়া বাড়িতে আছেই, যার যেমন ইচ্ছা সেইভাবে হয় চর্চা, লিখে, প'ড়ে, আলোচনা ক'রে, এছাড়া পাড়ার কয়েকজন প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ নিয়ে ওঁদের নিয়মিতভাবেই একটা বৈঠক বসে। একটা পাঠচক্র, তাতে বঙ্কিম থেকে নিয়ে বর্তমান সময়ের ভালো ভালো বই পড়া হয়। মজলিসের একটা বিশেষত্ব—সভ্যদের বয়সের কথা ধ'রে—হাস্যরসাত্মক বইএর প্রতি একটা বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে। পেলে ভট্টচায্যিবাড়ির বৈঠকখানা বয়সের কথা ভুলে সবার ঘর ফাটিয়ে হাসি, পাড়ার একটা ফিচার (Feature)।

আমার দু'-একখানা বইএর নাম ক'রে খানিকটা আত্মপ্রসাদও এনে দিলেন প্রফুল্ল। বাংলাতে দু'একটা গল্পের উল্লেখ ক'রে আমাদের একটু টেনেই নিলেন তার মধ্যে। তারপর হঠাৎ তারই মধ্যে গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বললেন—"কিন্তু যে কথা হচ্ছিল আমাদের, রুচির একটু এদিক-ওদিক হ'লে সে বইয়ের স্থান নেই ওঁদের মজলিসে। একবার শারদীয়া পত্রিকায় কয়েকটা সংখ্যা বেরিয়ে গেছে, হকার এসে দু'টো মোটা মোটা নামকরা পত্রিকা বের ক'রে বাবাকে বলল—"নেবেন বাবু? বেরিয়ে গেছে।"

বাবা বাইরেই বসেছিলেন, একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে বললেন—"না, এ বাড়িতে 'বটতলা' রাখা হয় না, অন্য বাড়ি দেখ।"

বললাম—"তুমি বাড়ির এই পবিত্র ট্রাডিশন্‌টা বজায় রেখো।... জানি রাখবেই।"

বললেন—"আশীর্বাদ করুন।"

এঁরা সব ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা আশা বাঁচিয়ে রেখেছেন আমার মনে। বাইরে ঘুরে ঘুরেও কয়েকটি শুচিস্নিগ্ধ মনেরও স্পর্শ পেলাম, গোষ্ঠীরচনা ক'রে সাহিত্যকে সবরকমের কলুষস্পর্শ থেকে আগলে রেখেছেন। জামসেদপুর রবীন্দ্র-সংসদের গোপালহরির কথা মনে পড়ে, রাঁচির সরোজ বসু, ভাগলপুরের বিনয় মাহতো, সমস্তিপুরের তুষার—সাহিত্যের

প্রতি শ্রদ্ধা একজন সাহিত্যসেবীর ওপর প'ড়ে যাদের একদিনের পরিচয় চিরদিনের সখ্যে পরিণত হয়েছে।

মনে তো হচ্ছে হাওয়া একটু একটু ঘুরেছেও। ঘুরবেই। "If winter comes, can spring be far behind?"

ঋতুচক্রে শীতের সর্বনাশা তুহিন বায়ুই কি শেষ কথা? নির্মল, মুক্তপ্রাণোচ্ছল বসন্ত কি বাইরেই থাকবে প'ড়ে?

এই আমার সাহিত্যজীবন, যা আজ পর্যন্ত চ'লে এসেছে। শৈশবে, যখন স্কুলে প্রাক-ম্যাট্রিকুলেশনের ছাত্র, সেই যে সন্তোত্থিতা কিশোরীকে প্রভাতের আলোর সঙ্গে মুখোমুখী ক'রে দাঁড় করিয়ে চ'লে এসেছি, সেইদিন থেকে। পরে এক-একবার মনে হয়েছে, এত মসি অপচয় করলাম, কৈ তাকে তো পূর্ণ করা হোলনা! তারপর ভাবলাম, না, এই থাক; সন্থ-আবরণ-মুক্ত মুক্তাবিন্দুর মতো নিজের নিষ্কলঙ্ক একাকীত্বেই পূর্ণ হ'য়ে থাক আমার প্রথম নায়িকা। তাকে ঐভাবেই ছেড়ে এবার অন্য কথায় আসি—

আমি আমার জীবনের তিনটি মূল ধারার কথা বলেছি—সাহিত্য, পলিটিকস্, সমাজ। প্রথম দু'টির কথা বলা হোল একরকম, এবার আমার সামাজিক জীবনের কথায় আসি। আমার জীবনে এর দু'টি স্তরবিভাগ আছে। একটি সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমিত, যে সহরে বাস, দ্বারভাঙ্গা, তার সামাজিক কার্যকলাপ, অনুষ্ঠানাদি নিয়ে, অপরটির পরিধি ব্যাপক, সমস্ত বিহার।

দ্বারভাঙ্গার বাঙ্গালী সমাজটা ছোট এবং অনেকখানিই বৈচিত্র্যহীন, বিশেষ ক'রে যেমন গোড়ার দিকে দেখেছি। এর কারণ, এর গঠন এবং ট্র্যাডিশন, যা ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। দ্বারভাঙ্গা একটা জেলা সহর, কিন্তু গোড়া থেকেই একটা আধুনিক জেলা সহর হ'য়ে গ'ড়ে উঠতে পারেনি। আমাদের আসবার বহুপূর্বে এখানে একটা খুব সংক্ষিপ্ত শাসনব্যবস্থা ছিল। সীমিত-ক্ষমতা-সম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেসি, এবং বিচার বিভাগের জন্য একটা "চৌকি"। যেখানে মাঝে মাঝে মজঃফরপুর থেকে কোনও জজ-মুনসেফ এসে জমা-ক'রে রাখা বিচার কার্যগুলো সমাধা ক'রে যেতেন।

এভাবে কতদিন চলেছিল জানিনা, তবে আমরা এসে দেখলাম জেলা

সহরের—এ-গন্ধটুকুও নেই দ্বারভাঙ্গায়, আর, মাইল তিনেক দূরে আধুনিক শাসনকার্যের সব সরঞ্জাম নিয়ে লাহেরিয়াসরাইয়ে একটি সহর প্রস্তুত হ'য়ে উঠেছে। এই দূরীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ, যাই বলা হোক, এর ঐতিহ্য—যদি বিশ্বাস করতে হয় তো—বেশ একটু কৌতুকজনক। তখন রাজের খুবই দাপট, ওদিকে মহামহিম ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি, বেশ একটু আড়াআড়িভাব থাকতই ভেতরে ভেতরে, সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশি ব'লে, সেটা বিশ্রীভাবে প্রকাশও হ'য়ে পড়ত মাঝে মাঝে। রাজের দিকের সেপাই আর সরকারের দিকের পুলিশ—সংঘর্ষ বেধে যেত। সেই "তোম্‌ভি মিলিটারি, তো, হাম্‌ভি মিলিটারির ভাব।"

নিশ্চয় এক বেশ সুস্থ অবস্থা নয়। তাই মজঃফরপুরের ওপর নির্ভরশীল না ক'রে দ্বারভাঙ্গাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জেলা সহর ক'রে দেওয়ার কথা উঠলে মহারাজা তিন মাইল দূরে দেওয়ানী-ফৌজদারী কাছারী, কোৎওয়ালি, হাসপাতালাদি প্রয়োজনীয় সংস্থার জন্যে গভর্ণমেণ্টকে জমি দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। তাল ঠোকাঠুকির সম্ভাবনা কমানো ছাড়াও, আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল মহারাজের। যত অল্প-মাত্রাতেই হোক, একই জায়গায় পাশাপাশি রাজ আর সরকার, এতে রাজের জৌলুস একটু ব্যাহত হচ্ছিলই, সরকারের দিকটা পূর্ণাবয়ব হ'লে রাজকে যে আরও নিষ্প্রভ ক'রে দেবে এ-আশঙ্কাটাও ছিল।

বাঙ্গালী সমাজ নিয়ে কথা হচ্ছিল। বলেছি, নিজ্ দ্বারভাঙ্গায় আমাদের সামাজিক জীবন, অন্ততঃ গোড়ায় যা দেখেছি, তা খানিকটা বৈচিত্র্যহীন ছিল। সরকারের তুলনায় রাজ অনেকটা Stagnant বা স্থিতিশীল। রাজে তখন ওপরের দিকে অনেকগুলি বড় বড় পদেই বাঙ্গালী, আফিসের অনেক নীচুর দিকের কর্মচারীও। কিন্তু এক সরকারী দপ্তর দূরে থাকায় দ্বারভাঙ্গা সেই জিনিস থেকে বঞ্চিত রইল যাকে বলা যায় নাগরিক জীবনের সচল অংশ, উকিল-মোক্তার, বিত্তশালী, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে, আর, উচ্চস্তরের বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে। তখন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জেন, পুলিশ সুপার, যারা ইংরাজই হতেন সাধারণতঃ, তাদের ছাড়া মুন্সেফ-ডেপুটি, হাসপাতালের অন্যসব ডাক্তার, দারোগা, পূর্ত বিভাগের সুপারভাইজার প্রভৃতি সবাই প্রায় বাঙ্গালী হতেন, এমনকি জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের স্তরের বাঙ্গালী অফিসারও মাঝে মাঝে এসে পড়তেন। সবই বদলির কাজ। এঁদের যাওয়া-আসাতে সমাজজীবনে একটা নিত্য সচলতা থেকেই যায়।

নুতন নুতন আইডিয়া, ওপর মহলে তেমন-কেউ এলে তাঁকে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অভিনন্দন বা বিদায়সভা।

দ্বারভাঙ্গায় এ-সবের কোনও সম্ভাবনা ছিলনা। এইজন্যে কতকটা স্থিতিশীল বলেছি।

তবে একটা জিনিস ছিল। এবং সেটা এই সীমাবদ্ধ স্থিতিশীলতার জন্যই; একটা নিবিড় অন্তরঙ্গতা, একটা সুনিবদ্ধ বৃহৎ পরিবারের মতোই। পরস্পরের সম্পদে-বিপদে একেবারে আপন জেনে বুক দিয়ে পড়া। প্রবাসী বাঙ্গালীর (কথাটা অচল হ'লেও ব্যবহার করছি) জাতিভেদ নেই। এই বুক দিয়ে পড়ার মধ্যে একদিকে যেমন কোন রকম উন্নাসিকতা ছিলনা, তেমনি কোন হীনমন্যতারও সম্ভাবনা ছিলনা।

এই হোল সমাজের নিত্যজীবনের পারিবারিক দিক। তার একটা প্রাতিষ্ঠানিক দিক আছে। সেদিকে তখন আমাদের সম্বল ছিল খুব অল্প। ক্লাব নয়, লাইব্রেরী নয়, সভাসমিতিও নয়। ঐ একটি বাংলা স্কুল; আর বছরে একবার ক'রে কালী পূজা, তার সঙ্গে একটা থিয়েটার। কয়েকদিনের প্রস্তুতির পর এক রাত্রেই শেষ হ'য়ে গিয়ে সমাজজীবন আবার পূর্ববৎ নীরব, নিথর।

প্রত্যেক পরিবারের একটা স্বধর্ম বা স্বকীয়তা আছে। পাণ্ডুলে আমাদের জীবনটা আরও স্টাগ্‌নেণ্ট থাকলেও বাবা যে সমাজ-ঘেঁষা ছিলেন একথা পূর্বে বলেছি। অবশ্য, থিয়েটার নয়, ক্লাব নয়, ওদিকে তাঁর রুচিও ছিলনা, তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমরা একটু সমর্থ হ'য়ে উঠলেই, সমাজের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে শুরু ক'রে দিলাম।

প্রথমটা ছোট-বড় সামাজিক কাজে, নিমন্ত্রণে পরিবেশন, রোগে পরিচর্যা,—ইত্যাদি হুজুগ অঙ্গেরই কাজ; সমাজসেবার হাতেখড়ি বলা যায়। তারপর বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে আরও উঁচুর দিকে। আমাদের ব্যাচে দাদাই এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। তিনি কলেজের শিক্ষা অসম্পূর্ণই রেখে কাজে ঢুকে পড়ার জন্যেই অবসর পেতেন প্রচুর, এবং সে অবসরের অনেকখানিই সমাজের কাজে দিতে পারতেন। চাকরিও পেলেন জজিয়তিতে, ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগও বেড়ে যেতে লাগল। এবং সে-সুযোগের বেশ খানিকটা সমাজের ভাগে পড়ল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি; একটি যে গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছে, তার একজন। কলেজের ছুটিছাটাতে এসে যোগ দিই।

আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ দিয়ে যাঁরা এই গোষ্ঠীটিকে পরিচালিত করতেন তাঁদের পুরোধা ছিলেন বিশেষ ক'রে পাঁচজন ; বাংলা স্কুলের হেডমাষ্টার সুধীরবাবু, যাঁর কথা পূর্বে বলেছি। এখানকার উদীয়মান উকিল বীরেন্দ্র বিশ্বাস, যিনি পরে ফৌজদারি বিভাগে শীর্ষস্থানেই উঠে যান, রাজ হাসপাতালের ডাঃ সুশীল সেন ও ডাঃ রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং চীফ মেডিকেল অফিসার মনোমোহন রায়। ইনি বাইরে থেকে এসে নিজের পদমর্যাদার সুযোগে বাঙ্গালী সমাজের যথেষ্ঠ উপকার করেন, তার মধ্যে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা। পরে, দুর্গাপূজার সঙ্গে যে-জিনিষটা যেন অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত হ'য়ে আছে—দলাদলি, সেটা এসে পড়ায় তিনি কিছু অনিষ্টই ক'রে যান বাঙ্গালীদের।

ঐ একটু যা খুঁৎ থেকে যায় ওদিকে, নৈলে বেশ সুচারুভাবে কাজ হ'য়ে এসেছে। কাজ তখন অল্পই, যেমন আগে বলেছি, ঐ বাংলা স্কুলটি, আর বছরে একবার করে কালীপূজা, এক রাত্রির থিয়েটার। আমি উঠতে উঠতে থিয়েটারে পর্যন্ত উঠে গেছি, কমিক পার্টই দেওয়া হোত আমায়, কোরাস্ গানও। রাজস্কুলের ড্রইংমাষ্টার শরৎবাবুর সঙ্গে সীনও এঁকেছি। ওঁরই শিষ্যত্বে একদিন চিত্রাঙ্কনে একটু তালিম পাই। সূক্ষ্ম তুলির হাত আছে ব'লে ওঁর সন্দেহ হয়, তারপরে থিয়েটারের পর্দার ওপর মোটা ব্রাসের (Brush) টানে সেটা কি ক'রে কখন লুপ্ত হ'য়ে যায়। ঐ একটা জিনিস হারিয়েই বসলাম আমি।

দাদা মারা গেলেন। তাঁর আগেই রাজেন বাবু। পরে সুশীল বাবু, বীরেন বাবু, অবশ্য, অনেক পরে। তবে, মনোমোহন রায় রাজ থেকে অবসরান্তে দ্বারভাঙ্গা থেকে চ'লে গেলেন। এঁর মধ্যে "ইণ্ডিয়ান নেশনে" আমার চাকরি জীবনের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত ক'রে বাড়ি এসে বসেছি। বোঝাটা আমার ওপর এসে পড়ল। দ্বারভাঙ্গায় ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাঙ্গালীদের কথাই ধরি। লোক বেড়েছে। সেই একটি রাজস্কুল, আর টিম-টিম করছে একটি বাংলা স্কুল, তার জায়গায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাঁচ-ছয়টি স্কুল, তিনটে কলেজ। এসব অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান হ'লেও বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কিছু প্রফেসার। মেডিকেল কলেজ, তাতেও বাঙালী ছাত্রছাত্রী। আর কিছু না হোক, বাঙ্গালী থাকলেই তাদের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। জড়িয়ে পড়ি। লাহেরিয়াসরাইয়ের সঙ্গে দূরত্ব কমে গিয়ে সেখানকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির সঙ্গেও খানিকটা যোগ রেখে যেতে হয়।

এদিকে দাদাদের সময়েই উনিশশো চৌত্রিশের বিহার ভূমিকম্পের পর বাংলা স্কুলটাকে নূতন ক'রে তৈরি ক'রে, সেটাতে দুর্গামন্দির, স্টেজ জুড়ে দিয়ে—স্কুল, পূজা, নাটকাদি বাঙ্গালীদের যতরকম জাতীয় অনুষ্ঠান আছে সেগুলির প্রাণ-কেন্দ্র করা হয়েছে। বেশ একটি পূর্ণতা পেয়েছে জাতীয় জীবন।

এদিকে নিজের আয়ু পূর্ণ হ'য়ে ক্লান্তিও এসে গেছে। সময় এসেছে ছুটি নেওয়ার। তারই জন্য প্রস্তুত হবো, এমন সময়, কবির কথায় হুকুম এলো—"এখনি অন্ধ বন্ধ কোরনা পাখা।"

এবার কর্মক্ষেত্র আর এককোণে-প'ড়ে থাকা দু'টি ছোট শহর নিয়ে নয়, সমস্ত বিহার নিয়ে।

বিষয়টা আগে কোথাও একটু ছুঁয়ে গিয়ে থাকব। ইংরাজ আমলের কথা, শেষদিকে বাঙ্গালী চক্ষুশূল হ'য়ে গিয়ে তাকেই আগে খতম করা যখন ইংরাজ-শাসনের মূল মন্ত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিহারকে আলাদা ক'রে দিয়ে, বিভেদটা বাড়ানোর জন্যে "ডোমিসাইল রুল" (Domicile Rule) সৃষ্টি করা হোল। চাকরি পেতে হ'লে পুরাণো দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে, তুমি এই মাটিরই সন্তান (Child of the soil)। বাঙ্গালী ছাড়া আরও অনেকেই আছে। কিন্তু খড়্গটা কার্যতঃ বাঙ্গালীকেই উদ্দেশ্য ক'রে।

বাঙ্গালী "স্বদেশী" আন্দোলনের পর আর একবার "রাখী বন্ধনের" ব্রত নিল। এবার অবশ্য পরস্পরের মণিবন্ধে নয়, অন্তরে-অন্তরে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাই, ব্যারিষ্টার প্রিয়রঞ্জন (পি. আর. দাশ) তখন পাটনায়। তাঁর নেতৃত্বে সমস্ত বিহার নিয়ে বেঙ্গলী এসোসিয়েশন, অর্থাৎ বাংলা সমিতি গঠন করা হোল এই "অন্যায়" ন্যায়ের (Lawless law) বিরুদ্ধে, সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালাবার জন্য শহরে-শহরে প্রতিবাদ-সভা ক'রে। একটা সভা দ্বারভাঙ্গাতেও (লাহেরিয়া-সরাইয়ে) হ'য়ে গেল।

কিছু কাজ হয়েছিল। উনিশশো সাতচল্লিশ সালে দেশ স্বাধীন হোল। নূতন করে "সংবিধান" সৃষ্ট হোল। তার মূল কথাটা হোল, ভারতবাসী ভারতের যে যেখানে আছে, সর্ববিষয়েই পূর্ণ এবং সমান অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারবে।

মনে হোল ডোমিসাইল-দানব বুঝি বিদায় হোল।

কিন্তু মাত্র সংবিধানে আইন ক'রে দানবকে বিদায় করা যায় না। সে ভেতরে-ভেতরে যা দরকার সাধ্যমত ক'রে যাচ্ছিল, এবার রুজির সঙ্গে ভাষাও দাবি করল। এখানে থাকতে হোলে স্কুল-কলেজে শিক্ষার সর্ব

ক্ষেত্রে বাংলা ছেড়ে হিন্দি ধরতে হবে। এগারো বছরের পর বেঙ্গলী এসোসিয়েশনকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে হোল। উদ্যোগী হ'য়ে উঠলেন পাটনার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি! ডাক্তার শরদিন্দু ঘোষাল, ডাঃ বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রবীন্দ্রলাল সিংহ, প্রফেসার বিমানবিহারী মজুমদার, প্রফেসার রঙিন হালদার, ডাঃ গুরুপ্রসাদ সামন্ত, অ্যাডভোকেট বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার ঘোষ, প্রফেসার শম্ভুপ্রসাদ মুখার্জ্জী, বিহার হেরাল্ডের দীপেন্দ্রনাথ সরকার, ডাঃ যোগেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি। শীর্ষে রইলেন ডাঃ শরদিন্দু ঘোষাল, পাটনার সব্যসাচী, নিজের বৃত্তি ছাড়া পাটনার সামাজিক সর্বস্তরে তাঁর একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল! বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী নির্বিশেষে। এবার চ্যালেঞ্জটা বড়, মুখের ভাষা পর্যন্ত নিয়ে, যে-ভাষাই নাকি আর সবের সঙ্গে বাঙ্গালীর প্রধান পরিচয়। সমিতিকে বেশ শক্ত ক'রে, ব্যাপক ক'রে তুলতে হোল। প্রতি শহরে—জেলা শহর ছাড়া অন্যত্রও, সহায়ক সমিতি সংগঠন, বছরের শেষে কোন একটা শহরে একটা ক'রে সর্ববিহার সম্মেলন করা ছাড়া আরও চারটে ছোট সম্মেলন ক'রে কার্য-পদ্ধতি ঠিক করা, পাটনার কেন্দ্রীয় আফিস ক'রে সেখান থেকে সেই কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করা, একটা নিজেদের পাক্ষিক পত্রিকা বের ক'রে প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়া। পত্রিকার নাম দেওয়া হল "সঞ্চিতা"। একশত বৎসরের পুরাণো, বাঙ্গালীদের ইংরাজী সাপ্তাহিক "বিহার হেরাল্ড"-কে আরও জোরদার ক'রে তোলা হোল।

আমার ডাক পড়ল। অদৃষ্টের পরিহাস, যে-পলিটিক্সকে বিদেশীর শাসনের দিনে পরিহার ক'রে গেছি, জীবনের মধ্যাহ্নে, নিজেদের দেশের লোকেদের কাছ থেকে নিজেদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা আদায় ক'রে নিতে জীবনের সায়াহ্নে সেই পলিটিক্সে নামতে হোল।

সুখের বিষয় যে এতবড় বিপদেও আমাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারাইনি, বাঙ্গালীর যা ট্র্যাডিশন, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙ্গালীর যা লক্ষ্য ছিল তা থেকে বিচ্যুত হব না। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে, পরস্পরকে বুঝে, বুঝিয়ে, আরও কাছাকাছি এসে পড়বার চেষ্টা থাকবে আমাদের। আমাদের পলিসি-দ্যোতক বাণী (Motto) আর প্রতীক কি হওয়া উচিত, আমার অভিমত চাওয়া হ'লে আমি লিখে দিলাম—মৈত্রীতে নিবদ্ধ দু'টি হাত, করমর্দনের ভঙ্গিতে, আর মোটোর (Motto) দিকে—"সংহতি-ও-সমন্বয়"। কেন্দ্রীয় কমিটি এটা গ্রহণ ক'রে নিলেন। ভাবটা রইল নিজেদের মধ্যে 'সংহতি', ওঁদের সঙ্গে 'সমন্বয়' বা বোঝা-পড়া। পরে তৃতীয় বৎসরে যখন পাটনা-ভাগলপুরের পর দ্বারভাঙ্গায়

বার্ষিক সম্মেলনটা ডাকলাম, আমাদের স্মারক-পত্রিকাটার নাম রাখা হোল—"অ-প্রবাসী"। এর মধ্যেও পরস্পরকে সচেতন ক'রে দিয়ে সমন্বয়েরই ইঙ্গিত রেখে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। ইংরাজ আমলে অন্য প্রদেশে গিয়ে বাস করলে "প্রবাসী" ব'লে চিহ্নিত ক'রে দেওয়ার রেওয়াজটা খুব চ'লে গিয়েছিল ; নিজের দিক থেকেও, আবার যাদের মধ্যে গিয়ে থাকা তাদের দিক থেকেও। যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে নামলেন তাঁদের লড়াইটাই ছিল ওই কথাটা নিয়ে ; তাঁরা বললেন—তোমরা সবাই, কবির ভাষায়—"নিজ বাসভূমে পরবাসী" হ'য়ে আছ এবং সেই বাসভূমিটা হোল আসমুদ্রহিমাচল এই বিরাট অখণ্ড ভারতবর্ষ। স্বাধীনতা এলে এই সুরেই তাঁরা নব-সংহিতা সংবিধান রচনা করলেন। অর্থাৎ ভারতবাসী এই অখণ্ড ভারতে যে যেখানেই থাক, সে সর্বতোভাবে, সমান অধিকারে ভারতবাসীই।

আমরা আমাদের স্মারক-পত্রিকার নামের মধ্যে এই কথাটাই উভয় পক্ষকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম ; আত্মপক্ষে—আমরা যেমন এখানে দ্বিতীয় স্তরের প্রজা বা নাগরিক হওয়ার হীনতাটা স্বীকার ক'রে নিতে প্রস্তুত নই, তেমনি সম-স্তরের নাগরিকের সব দায়িত্ব আমাদের মেনে নিয়ে এই দেশের সেবা ও সুখ-সমৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। অন্য দিকে, আমাদের পলিসি তো আছেই লিপিবদ্ধ হ'য়ে, "অ-প্রবাসী" নামের দ্বারাও অপরপক্ষকে মনে করিয়ে দেওয়া, আমরা এখানে সংখ্যালঘু (Minority) হ'লেও ভারতবাসী, এবং সেই সাধারণ অধিকারেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগের দাবী আমাদের—জীবনের সর্বস্তরেই, বিশেষ ক'রে শিক্ষা (নিজের ভাষায়) এবং জীবিকার্জনে।

আমাদের এই যে নির্বিরোধ অথচ নিঃসংশয় দাবি, এটার মধ্যে কোনরকম গোপনীয়তা না রেখে, আমরা অনুদ্ধত যৌক্তিকতার সঙ্গেই অপরপক্ষেরও সামনে উপস্থাপিত ক'রে তাঁদের সহযোগিতা এবং সহানুভূতি চাই। এসোসিয়েশনের প্রথম অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এর উদ্বোধন করেন বিহারের তৎকালীন রাজ্যপাল নিত্যানন্দ কানুনগো। তাঁরা সকলেই আমাদের দাবী যে ন্যায়সঙ্গত সেটা স্বীকার তো করেনই, উপরন্তু বিহারের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বাংলার দানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তদবধি আমাদের সব সম্মেলনগুলি এই রীতিতেই পরিচালিত হ'য়ে আসছে—উদ্বোধক, প্রধান-অতিথি মন্ত্রীস্তরেরই কোন ব্যক্তি, বা, বিহারের নেতৃস্থানীয় কেউ। মুখ্য-মন্ত্রীকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকেও পেয়েছি। আমাদের দাবী দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট

ভাষায়, সংবিধান-সঙ্গত। স্বীকৃত হয়েছে সেসব দাবীর ন্যায্যতা, কাজও অনেক হয়েছে, হ'য়ে যাচ্ছে।

অবশ্য খুব দ্রুত ও মসৃণ গতিতে নয়। বিহারে নিত্যই মন্ত্রিমণ্ডলের রদবদল একটা বড় অন্তরায়। এছাড়া আমলা মহলে দীর্ঘসূত্রতা, এমনকি ওপরের অর্ডার বানচাল করার অপচেষ্টাতো আছেই।

এইসব সত্ত্বেও কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কাজ যা হয়েছে তা গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে এসোসিয়েশনের স্বীকৃতি। কোনরূপ গোপন-চেষ্টা না থাকায় সমিতির ইমেজ (Image) বা স্বরূপটা তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট। শিক্ষা, সংখ্যালঘু কমিশন্ প্রভৃতিতেও সমিতির প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি গভর্নমেণ্টের দিকে বিহারের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে সমিতির ডাক পড়েছে, অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে বাংলা সমিতি এই গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

সমিতির সম্প্রতি একটি বড় কাজ হ'য়ে গেল, সাঁওতাল পরগণার কার্মাটারে কয়েক একার (Acre) জমি সহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ি কিনে নিয়ে তাতে একটি বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং সাক্ষরতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। সম্প্রতি সমিতির উদ্যোগে কার্মাটার স্টেশনের নাম বদলে "বিদ্যাসাগর"-ও করা হয়েছে। সমিতির প্রতি সরকারের আস্থা এবং সহানুভূতি কতখানি তা এই থেকে প্রকাশ পাবে যে, তৎকালীন মন্ত্রিসভার অধ্যক্ষ শ্রী হরিনাথ মিশ্র এবং শিক্ষামন্ত্রী রামরাজপ্রসাদ সিন্‌হা উপস্থিত থেকে উদ্বোধন ও সংগঠন কার্যে সহায়তা করেন।

পূর্বে সম্পত্তিটা খরিদ করতে বিহার সরকার প্রায় ত্রিশ হাজারের মধ্যে পনের হাজার দিয়ে সহায়তা করেন।

আমাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য আমরা কতটা আদায় করতে পেরেছি এখন পর্যন্ত, তার জন্য আমাদের নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা কি পরিমাণ, তার খতিয়ান আলাদা। একটা কথা সত্য, বেঙ্গলী এসোসিয়েশন বা বাংলা সমিতি বিহারে বাঙ্গালীদের সঙ্গত বা সঙ্ঘবদ্ধ শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, এবং সমন্বয়-সাধনার দিকে তার প্রয়াস অনেকখানি সার্থক। আর একটা বড় লাভ, বাঙ্গলার বাইরে যেখানে যেখানে বাঙ্গালীর বেশী সংখ্যায় বসবাস—উত্তরপ্রদেশ, ওড়িসা, আসাম, বিহারের বাঙ্গলা সমিতি তাদের আত্মসচেতন ক'রে তুলছে। তারা আমাদের Guidance অর্থাৎ নির্দেশনা চাইছেন, আমাদের সম্মেলনের সঙ্গে যোগদান ক'রে প্রত্যক্ষভাবে যোগরক্ষা করতে উদ্যোগী হ'য়ে উঠেছেন।

এবার সমিতির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগ আর এবিষয়ে আমার অভিজ্ঞতার কথা ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। গোড়াতে ব'লে রাখা যায়, অভিজ্ঞতাটা বিষামৃতের ; অর্থাৎ কটু এবং মধু দুই-ই।

মধুর এবং নিকটতম, দ্বারভাঙ্গায় এবং লাহেরিয়াসরাইয়ে বাঙ্গালী সমাজের এক হ'য়ে গিয়ে সংহতির একটি শ্লাঘনীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা। সময়ের তাগিদেই দু'টি জায়গা কাছাকাছি এসে পড়ছিল, যেটুকু প্রভেদ-বা থেকে যাচ্ছিল, মিটিয়ে ফেলে এইবার জাতির বৃহত্তর স্বার্থে একজোট হ'য়ে কাজ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করল। আমায় কেন্দ্র ক'রে। বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান। পাশে রইলেন, প্রাক্তন জেলা-কংগ্রেস-সভাপতি ডাঃ মহেন্দ্র সরকার আর স্থানীয় মেডিকেল কলেজে শিশু-চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বীরেন্দ্র দাশগুপ্ত। তারপর, দু'জায়গার আরও কয়েকজন কর্মী যুবক এবং বয়োপ্রাপ্তরাও এসে দাঁড়ালেন।

সশঙ্ক কুণ্ঠার সঙ্গে নিই দায়িত্ব, পরিত্রাণ ছিলনা ব'লেই। কিন্তু দেখলাম মৃত-সঞ্জীবনী একান্ত একটা কবিরাজী রসায়ণই নয় ; কর্মের মধ্যেও মৃত, বা, মৃতকল্পকে জীবনে ফিরিয়ে আনার শক্তি নিহিত রয়েছে। সবার উৎসাহ সংক্রামিত হ'য়ে বয়সের কথা ভুলেই চললাম কাজ ক'রে।

পাটনা, তারপর, ভাগলপুর, তৃতীয় বর্ষে সম্মেলনটা দ্বারভাঙ্গায় ডাকলাম আমরা। প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে যে কাজটা করলাম আমরা দ্বারভাঙ্গা লাহেরিয়াসরায়ে সে-ধরণের সামাজিক কাজ এর আগে কখনও হয়নি।

এই সম্মেলনেই আমায় একটা কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হোল। এই সময়ে সমিতির সাধারণ, অর্থাৎ নিখিল বিহারের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন পাটনার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, ভারতের বাইরেও খ্যাতিসম্পন্ন ডাঃ বিষ্টু মুখোপাধ্যায়। বিহার সরকার তাঁকে স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার ক'রে টেনে নেওয়ায়, দু'বছরের জন্য এ দায়িত্বটাও সবাই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। দু'বছর বহন ক'রে জরাস্পৃষ্ট দেহটাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে হ'ল ক'জায়গায়।

অভিজ্ঞতায় যে অমৃতস্বাদের কথা বলেছি তা এই উপলক্ষেই। কত-ভাবে কত বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে কত মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেলাম এই পরিক্রমার সুযোগে তা ব'লে শেষ করা যায় না। একটা কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে। এই পুনরুজ্জীবিত সমিতির মূল উৎস ছিলেন ডাঃ শরদিন্দু ঘোষাল। ঠিক এই ধরণের একটি মানুষের সামনে আমি জীবনে আর পূর্বে আসিনি। বিশেষ ক'রে, ওইরকম একজন অরগ্যানাইজার

(Organiser) বা সংগঠক। দীর্ঘচ্ছন্দ, ঋজু, শ্যামবর্ণ, মাথায় পক্ক কেশ। বর্ণ শ্যাম ব'লেই যেন আরো শুভ্র, চক্ষু দু'টি দীপ্ত। মেডিকেল কলেজের নামকরা প্রফেসার। চিরকাল সমাজসেবায় নানাভাবে কাজ ক'রে—বিহারী-বাঙ্গালী-নির্বিশেষে—নানা প্রতিষ্ঠান গঠন ক'রে, পরিচালিত ক'রে, সংগঠন এবং পরিচালনার শক্তিটা যেন মজ্জাগত হ'য়ে উঠেছে। এবং রিটায়ার ক'রেও অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে, সে-শক্তি অলস নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে অবরুদ্ধ হ'য়ে থাকলে তিনি যেন বাঁচেন না। একটা ডিক্টেটারশিপের (Dictatorship) ভাব ছিল। এটার উত্তর হয়তো এইখানে যে, চিকিৎসাক্ষেত্রের লোক হ'লে প্রায় সকলেই তাঁর ছাত্র, অন্য ক্ষেত্রেও যাঁরা সমাজসেবার কাজ নিয়ে রয়েছেন সবাই তাঁর শিষ্য। এটা অন্যত্রও গিয়ে পড়ত। যেখানে অনুরোধের সম্বন্ধ সেখানেও না মেনে—শ্রদ্ধার সঙ্গে না মেনে, উপায় থাকত না। তার কারণ জিনিসটা ছিল, যাকে রাজনীতির ভাষায় বলা যায় Benevolent dictatorship—যদি তার চেয়েও বড় কিছু থাকে—নিঃস্বার্থ, নিরহঙ্কার, যখন, যাদের বলছি তাদের ব্যাপক, বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই বলছি, তখন শুনতে হবে বৈকি। ওঁর কথাগুল হ'ত সংক্ষিপ্ত, ঋজু। আমায় একবার আকাশেও তুলে দিয়েছিলেন কিন্তু তার পেছনে এই কথাটা দৃঢ়তার সঙ্গে থাকতই—অর্থাৎ, যা বলছি তা যখন আপনাদেরই স্বার্থে—ইত্যাদি। আমার অভিজ্ঞতাটা বললে অনেকটা স্পষ্ট হবে। আমি ওঁর চেয়ে কয়েক বছর বড়ই ছিলাম—

যেবার আমরা দারভাঙ্গায় সম্মেলনটা ডাকলাম সেই বারের কথা। বাড়িতেই রয়েছি হঠাৎ পাটনা থেকে টেলিফোনে ট্রাংক্‌কল্‌।—

"নমস্কার, আমি শরদিন্দু···ডাঃ ঘোষাল"

"নমস্কার। বলুন।"

"বিষ্টুকে বিহার গভর্নমেণ্ট ডেকে নিয়েছে। গভর্নার নিজে ডেকে হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টার ক'রে নিয়েছেন। বিষ্টু না যাওয়ারই চেষ্টা করেছিল ফল হয়নি। তার এসোসিয়েশনের জেনারেল প্রেসিডেণ্টের দায়িত্বটা নিতে হবে আপনাকে..."

"সে কি !!"—শিউরেই উঠলাম আমি। অসংলগ্নভাবেই বললাম—"আমি !!...দ্বারভাঙ্গায় ব'সে !!—বয়স...তার ওপর এখানকার চার্জ...একটা বড় দায়িত্ব এবার..."

"সব জেনেশুনেই আমরা ঠিক করেছি।...আর লোক নেই আমাদের ...বন্ধ করছি। We will take no denial."

অপারেটারকে চালিয়ে যেতে বললাম।

"শুনুন ডাঃ ঘোষাল—এ যে অসম্ভব কাণ্ড...এত চাপ—যা রয়েছেই ঘাড়ে তার ওপর..."

"আনন্দ পাচ্ছেন না ? বলুন ?"

—একেবারে সুর বদলে। থতমতই খেয়ে যেতে হোল—

"তা...আনন্দ যে নেই একথা...কিন্তু..."

"তাহলে নিন্—সবার বিশেষ অনুরোধ।"

বার তিনেক রিপিট্ করিয়েও কোন ফল হোল না। শেষ পর্যন্ত তাবৎকালের জন্য সম্মতি দিতেই হোল, বললাম—"বেশ, আপনারা তো সম্মেলনে আসছেনই। টেলিফোনে হবে না, সাক্ষাতে আপনাদের নিশ্চয়ই Convince করতে পারব আশা করছি।"

সেটা অসম্ভব জেনেও একটু হাতে রেখে বলা। তুই বছর পরে ডাঃ মুখোপাধ্যায় ওইদিক থেকে খালাস হ'য়ে ফিরে এলে মজঃফরপুর সম্মেলনে তাঁকে সর্ব-নায়কত্বের দায়িত্বটা ফিরিয়ে দিলাম।

ডাঃ ঘোষাল আর নেই। হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন, বার তুই আক্রান্ত হওয়াই ছিল, তার ওপর এই অমানুষিক পরিশ্রম, ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে হঠাৎই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শুধু পাটনা নয়, সারা বিহারের বাঙ্গালী-সমাজ অনেকখানি নিঃস্ব হ'য়ে পড়ল।

আমার সান্ত্বনা, উভয়ের জীবনের সায়াহ্নে পরিচয় হ'লেও যেটুকু ছিল, তার ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হওয়ায়। আর, তাঁর ব্যক্তিত্বকে চিনে নিয়ে, অনুরোধের আকারে হ'লেও তাঁর নির্দেশের অমর্যাদা না করায়।

এই আমার জীবনের তৃতীয় ধারা, সমাজ। এখনও চালিয়ে যেতে হচ্ছে। শক্তি পাচ্ছি, যেটুকু সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে, তাই থেকে। আজকালকার Totalitarian State, বা, সর্বাত্মক শাসন-ব্যবস্থায় পলিটিক্স্ সবাইকে একরকম বাধ্য হ'য়েই করতে হয়, তবু নিজের দেশের মানুষকে যদি বোঝাতে হয় যে আমিও তোমাদের মতোই এক দেশেরই সন্তান, Child of the soil, শুধু সংখ্যা-গুরুত্বের জন্য অন্যায় কোর না, বঞ্চিত কোর না, তো, তার বেদনা কোথায় রাখা যায় ?

কিন্তু আমি যে বিষামৃতর কথা বলেছি, যথেষ্ট কটু হ'লেও তা এ নয়—

রক্তের বিষ-প্রবাহ আমাদের ধমনীতেই। বাঙ্গালীর ঈর্ষা, দ্বেষ, একটা বড় স্বার্থে এক-প্রাণ হ'য়ে দীর্ঘদিন লেগে থাকার ক্ষমতার অভাব, সেই দলা দলি—হয়তো তুর্গাপূজাতেই তার একদিন পুণ্যঅভিষেক হয়েছিল,

এখন সর্বক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়েছে, কোথায় যে জাতিগতভাবে সবার কল্যাণ তা দেখতে দিচ্ছে না।

পুনরুজ্জীবিত বাংলা-সমিতির বয়স বেশি নয়, এগারো-বারো বৎসর মাত্র, এরই মধ্যে মাঝে মাঝে চিড় খেয়ে গেছে। একটা অনীহা এসে পড়েছে অনেকের মধ্যে। বিপদের কথা, সমিতির বিরুদ্ধে অপপ্রচার ক'রে সেই অনীহা অপরের মধ্যে সংক্রামিত করার একটা অপচেষ্টা চলেছে। ধমনী-রক্তের এ বিষের প্রতিষেধক কোথায় পাই?

বিধাতা তাঁর বিচিত্র বিধানে যেমন এক হাতে বঞ্চিত করেন, তেমনি অন্য হাতে দিয়েও যান। সবক্ষেত্রে যে ক্ষতিপূরণ হয় এমন নয়, তবে, জীবনে ভারসাম্য কতকটা রক্ষা পেয়েই যায়। দেশে গেলে আমার দু'টি আশ্রয় ছিল; শিবপুরের "দীনভবন" আমার ভগ্নীর বাড়ি, আর কলকাতায় বুদ্ধদেববাবুর বাড়ি। উনি মারা যেতে এ-আশ্রয়টি গেল। আমার সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই এতটা নিবিড়ভাবে জড়িত এমন একটা আশ্রয় পাওয়ার আর সম্ভাবনা নেই, তবু একটা ব্যবস্থা হ'য়েই যাচ্ছিল নেপথ্যে, এবং, কৌতুকের বিষয় এই যে, তার গোড়াপত্তনও হয় বুদ্ধদেববাবুর জীবিতকালেই এবং তাঁর বাড়িতেই।

দুর্গাপ্রসাদের কথা বলেছি, একদিন যে-ছেলেটি তার গৃহশিক্ষককে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তারপর সে-পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হওয়ার কথাও বলেছি, ওঁদের পিতামাতা জীবিত, বৃহৎ একান্ন-বর্তী পরিবার ১৬০ নম্বর বউবাজারের (বর্তমান বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট) বাসা বাড়িতে অধিষ্টিত। তাঁরা মারা গেলেন। দেশবিভাগের পর কুষ্টিয়ায় যাঁরা ছিলেন, চ'লে এলেন। পরিবারটি ছড়িয়েও পড়ল কয়েক জায়গায়। যতদূর মনে পড়ছে, দুর্গাই বোধহয় নিজের ছোট পরিবারটি নিয়ে শেষ অবধি ছিলেন এ বাড়িতে। তারপর নিউ-আলিপুরে বাড়ি ক'রে উঠে আসেন। তখন থেকেই কলকাতায় এলে ওখানে গিয়ে ওঠবার কায়েমী নিমন্ত্রণ আমার। শিবপুরকে একেবারে বাদ দেওয়া যে সম্ভব নয়, আমার ভগ্নীর বাড়িই, তাছাড়া শিবপুর যে আমার জীবনে কতখানি, এসব অজানা নয় দুর্গার; এক ধরণের রফা হোল,—এলে ভাগাভাগি ক'রে থাকতে হবে। কখনও এক যাত্রাতেই কিছু কিছু ক'রে দু'জায়গায়, কখনও বা একটানা শিবপুরে, একটানা নিউ-আলিপুরে। এই ক'রে চ'লে আসছে।

এই ক'রে ক'রে, এখন যদি বলি, আমার সমস্ত "আমি"-টাই

দ্বারভাঙ্গা-শিবপুর-নিউ আলিপুরে ভাগাভাগি হ'য়ে গেছে তো বোধহয় ভুল বলা হবে না।

তাই হয়েছে। আমি দুর্গার এ বাড়িতে প্রথম যে গেছি সেও প্রায় নয়-দশ বৎসর হ'তে চলল।

সেই থেকে দ্বৈত-ব্যবস্থায় যাওয়া-আসা-থাকা চ'লে আসছে; কখন শিবপুর কখন নিউ আলিপুর।

একটা কথা এইখানে বলে দিই—বুদ্ধদেববাবুর সংসারের সঙ্গে দুর্গার সংসারের যেমন একদিকে একেবারেই মিল ছিল না—ওঁরটা বৃদ্ধ পিতা মাতা আর অকৃতদার সন্তানেই সীমিত, অন্যদিকে, আমার সম্পর্কে যেটা মস্তবড় মিল ছিল;—ওঁরা উভয়েই সাহিত্যসেবী। নিতান্ত ওপরে ওপরে নয়, জীবনের গভীরে। এই সূত্র ধ'রে আর একটা মিল ছিল দু'জনের মধ্যে—নিতান্ত হয়ত চান্স (Chance), কিন্তু বেশ একটু কৌতুকজনক—বুদ্ধদেববাবু বেশিরকম অন্তরঙ্গ ছিলেন সে সময়ের দু'জন পরিচিত সাহিত্যিকের সঙ্গে, যাঁরা নাকি থেকে থেকে কাটিয়েও গেছেন ওঁদের বাড়িতে—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিভূতি মুখোপাধ্যায়। অপর দিকে ঠিক এই ধরণেরই অন্তরঙ্গতা দুর্গারও দু'জন পরিচিত লেখকের সঙ্গে—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, আর Common বা উভয়লগ্ন এই বিভূতি মুখোপাধ্যায়।

শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে সম্বন্ধটা আরও ঘনিষ্ঠতরই ছিল। এই অর্থে যে, উনি পরবর্তীকালে সস্ত্রীক বম্বে থেকে কলকাতা এলে এখানেই উঠতেন। ওঁরা এঁদের মেসোমশাই-মাসিমা বলতেন। কোনরকম আত্মীয়তার সূত্রে কিনা জানা নেই আমার।

আর একটা যোগাযোগ বা তার অভাবই বলা ঠিক—আমার উভয়এই গতিবিধি থাকলেও কখন এঁদের কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি এ দু'জায়গায়। যা দেখাসাক্ষাৎ-পরিচয় হয় তা এর বাইরেই।

নিউ-আলিপুরের বাড়িতে যাওয়া আসা বাড়তে আমার একটা যে নূতন জিনিস লাভ হোল তা দ্বারভাঙ্গার বাইরে আর একটি নূতন সংসার। জিনিসটা এমন কিছু অভিনব না হ'লেও যথেষ্ট দুর্লভ এ-জগতে। সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় অপর একজনকে সম্পূর্ণ আপন ক'রে নেওয়ার ক্ষমতা অনেকে রাখে, তবে, সেটা সার্থক ক'রে তুলতে যেন আর একটু কিছু দরকার হয়। দুর্গা, শুধু দুর্গা নয়, ওঁর স্ত্রী মণিকা আর দু'টি ছেলে তূনীর আর রঞ্জন ছোট সংসারটুকু এই সুরে বাঁধা। কবে যে নিতান্ত সহজ, সাবলীল আত্মীয়তার মধ্যে দিয়ে অনাত্মীয়তার রেখাটুকু মুছে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে এক হ'য়ে গেছি, বুঝতেই পারিনি। এটিকে যা পুষ্ট

ক'রে তুলল সেও যেন আমারই এই নূতন সংসারের একটি ঘটনা, স্নিগ্ধ, মধুর—

বহু-বহুদিন পূর্বে দুর্গার যে প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রিত হ'য়ে কুষ্টিয়ায় যাই—মণিকা যে নধরকান্তি শিশুটিকে কোলে ক'রে দেখাতে নিয়ে এলেন, এই সেদিন তার বিবাহ হ'য়ে গেল। শিক্ষিতা, সুন্দরী; আমার সঙ্গে সম্বন্ধটা দাঁড়াল নাৎবৌ। নিউ আলিপুরের সংসারকে দ্বারভাঙ্গার পরে যদি আমার দ্বিতীয় সংসার বলি তো, এ আমার দ্বিতীয় নাৎবৌ পেলাম; রাণু দিয়েছে প্রথমটিকে। এ-বয়সের দুর্লভ সম্পদ। গাছ যখন শুকিয়ে আসছে, সখ্য-প্রীতির জল দিয়ে সরস-সজীব ক'রে রাখতে এদের মতো তো আর কেউ হ'তে নেই। সংসারটি বেড়ে চলল। চার থেকে পাঁচ। যথাকালে মালবিকা একটি শিশু কন্যা এনে দিয়ে আর একটু পূর্ণতর ক'রে তুলল সংসারটি। এক 'পুরুষ' এগিয়ে এটির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে কন্যার; রাণু-রেখা-জয়ন্তী-রুপ-আভা-ছবিদের স্তরে। 'মামনি' ব'লে ডাকি। কথায়-আচরণে তাদেরই মতো পরিপক্ক, যার জন্য 'মামনি' আমার সুদূর অতীতের সেইসব দিনগুলি আবার যেন ফিরিয়ে এনেছে।

দুর্গার পরিবারে সবচেয়ে বড় বিশিষ্টতা তার অনাড়ম্বর জীবন-ধারা। ওঁদের সব আছে, প্রচুর পরিমাণেই আছে, দুর্গার প্রভার-প্রতিপত্তিও কম নয়—ইণ্ডিয়ান চেম্বার-অব-কমার্সের চেয়ারম্যান হয়েছেন, কলকাতার সেরিফ্ হয়েছেন, এদিক ওদিক অনেক ব্যবসায়িক তথা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টও,—সব দিক দিয়েই প্রাচুর্যে ভরা জীবন, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে, ওঁর নিজের, বা, পরিবারের কারুর এ প্রাচুর্যের কোন প্রতিফলন নেই। এইজন্যই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে এমনভাবে মিশে যাওয়া। নিশ্চয়ই শরদিন্দুবাবুর পক্ষেও এই কথাটা খাটে।

আমার সাহিত্য এবং সাহিত্য-সম্পর্কিত জীবনে নিউ-আলিপুরের দান প্রচুর—এর শান্ত পরিবেশের মধ্যে ব'সে লিখেছি, নিশ্চিন্ত হ'য়ে সাহিত্য-আলোচনা করেছি সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে, সিনেমার অনেক কথাবার্তা ও চুক্তি এইখান থেকে; মাঝে মাঝে কিছু বই প্রকাশনেরও। কলকাতার মধ্যেই ব'লে এ বাড়িতে এসে অনেকের ইণ্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার নিতে সুবিধা হয়েছে। সব মিলিয়ে আমার সাহিত্যিক জীবনের একটি পরিপূর্ণ রূপ। অন্য দিক দিয়েও আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করার সুযোগ পেয়েছি এ বাড়িতে। জায়গাটা উত্তর এবং মধ্য কলকাতার তুলনায় শুধু নিরিবিলি ও পরিচ্ছন্নই নয়,

যানবাহনের প্রচুর সুবিধা এখানে। বাড়ি থেকে দু'পা বেরিয়েই মাঝেরহাট রেলস্টেশন; দূর-কাছের ট্রামবাস। আগেই বলেছি, কলকাতায় এলেই অবসর পেলে, না পেলেও ক'রে নিয়ে, দশ-বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পর্যন্ত ঘুরে আসবার জন্য আমার পা চুলকায়। নিঃসঙ্গ ভ্রমণে। একদিনের সফর। শিবপুরে থাকলে গঙ্গার এপারের জায়গাগুলি সারি। মূল আকর্ষণ অবশ্য চাতরা, আমাদের আদি জন্মভিটা। আবাল্য স্মৃতি-পুষ্ট, এদিকে এসে আরও বেড়েছে সে আকর্ষণ দু'টি কারণে। উত্তর জীবনে এসে বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয়ের কথা বলেছি। তা ভিন্ন, সেজপিসিমা ত্রিনয়নী, যাঁর আমার জীবনে অতখানি স্থান। বড়ছেলে গোষ্ঠ কোন্নগর থেকে এসে শ্রীরামপুরে বাড়ি করায় তাঁকেও পাই এক যাত্রাতেই।

চাতরার পর মহানাদ; ব্যাণ্ডেল থেকে একটু ভেতরে; পুরাতন সপ্তগ্রামের একটি শাখা। ব্যোমকেশ অবসর নেওয়ার পর রাণুরা তাদের পুরণো ভিটায় এসে উঠেছে। ওখানে গেলে একটি দিনে কুলায় না। মহানদ-চাতরা-শ্রীরামপুর ছাড়া কিছুদিন থেকে আরও একটি জায়গা টানতে আরম্ভ করেছে; ডানকুনি। জীবনে অনেক মানুষের সঙ্গে মাঝপথে পরিচয় হয় যাঁদের সঙ্গলাভের সঙ্গে প্রথমে এই কথাই মনে হয়, এতদিন না পাওয়াতে কত ক্ষতি না হ'য়ে গেছে। সেই জাতের মানুষ ছিলেন ভূপেন নন্দী মহাশয়। কৃতী পুরুষ। লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে পনেরো টাকা মাইনেতে প্রবেশ করেছিলেন; আমার সঙ্গে যখন পরিচয় তখন উনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের লক্ষ্ণৌ কারখানার শীর্ষ-স্থানীয় অফিসার, সে সময়ে ভারতীয় কর্মচারীর পক্ষে যা একরকম স্বপ্নই ছিল। আমার সময়েই অবসর গ্রহণ ক'রে বাড়িতে বসলেন ভূপেন বাবু। এদিকে সাহিত্য রসবেত্তা, সাহিত্যামোদী, অমায়িক প্রকৃতির পুরুষ। আমার সঙ্গে হঠাৎ পরিচয়; সূত্রটা ঐ সাহিত্য। কলকাতায় ক্লান্তি এসে গেলে ওঁর ডানকুনির ত্রিতল বাড়িতে ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে কতদিন যে মাঝে মাঝে কেটেছে, কত রজনীও, এখনও মনে পড়লে মনটা স্বপ্নাতুর হ'য়ে ওঠে। পূর্বেই চ'লে গিয়ে আমার জীবনে একটা শূন্যতা রেখে গেছেন উনি।

এই গেল গঙ্গার এপারের কথা।

নিউ-আলিপুর থেকে গঙ্গার পূর্ব দিকের গুলি লক্ষ্য ছিল—ডায়মণ্ড-হারবার, ক্যানিং, ফলতা, নৈহাটি, কল্যাণী, রাণাঘাট; অর্থাৎ চূর্ণী নদীর তীর। প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শেষ, একটা-না-একটা নদী, গঙ্গা, মাত্‌লা, চূর্ণী। এই নিরুদ্দেশ-ভ্রমণ-প্রবৃত্তি আর

যার কাছে লঘু, এমনকি হয়তো দুর্বোধ্য মনে হোক, আমার জীবনের একটা বড় অংশ। এবং, এ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে নিউ-আলিপুরের ভূমিকা আমায় কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হয়।

এইখানেই শেষ করি; গৃহহীনের গৃহের কথা দিয়ে।

আয়ুর হিসাব নিতে গিয়ে দেখি, আমার জীবনের শেষ অধ্যায় হ'য়ে গিয়ে এখন পরিশিষ্ট চলবার কথা।

মন্দ হোল কি এমন?

আমাদের জাতকর্মের একটা বিধান অনুযায়ী জন্মের ষষ্ঠ দিনে প্রসূতির কক্ষদ্বারে কালি-ভরা দোয়াত আর একটা কলম রেখে দিতে হয়। বিধাতাপুরুষ নাকি মায়ের ঘুমন্ত অবস্থায় চুপিসারে এসে জাতকের ললাটে জীবনের আদ্যন্ত সবকিছু লিখে দিয়ে যান। আমার বেলাও রাখা হয়েছিল। লিখেও গেলেন; কিন্তু অতি-বৃদ্ধ, হাত কেঁপে তার ওপর কি ক'রে একটা টানা আঁচড় প'ড়ে গিয়ে থাকবে, বেশ একটু ওলট পালট হ'য়ে গেল।

অন্য দিক দিয়ে যদি বলি (বলেনও অনেকে)—সংসারটা তাঁর একটা খেলাঘর—নিজের সৃষ্টির সঙ্গে লুকোচুরি, ভাঙ্গাগড়ার খেলা, তাহ'লে বলতে হয়, ভাঙ্গায় ওঁর জিতটা অ-নিবার্য হ'লেও, লুকোচুরি খেলায় তো আমি জিতলাম।

তা নয়তো কি?

আমার ললাট-লিপি ছিল গৃহত্যাগী হব। কৌপীন, একতারা—সব উপকরণই প্রস্তুত, সন্ন্যাসী তাঁর গঞ্জিকার ছিলিমের ওপর নবজাতকের উৎকট লোভের কথা জানিয়ে আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণীও ক'রে গেলেন, কিন্তু সব গেল উল্টে। যেখানে একটি গৃহও না জোটবার কথা, সেখানে, ছয়-ছ'টি;—পাণ্ডুল, চাতরা, দ্বারভাঙ্গা, শিবপুর, মাণিকতলা, নিউ আলিপুর।'

পাণ্ডুল, চাতরা আর দ্বারভাঙ্গাকে আলাদা করে রাখতে হয়, স্বীকার করি; জন্মাধিকারে তাদের একটা আলাদা স্থান আছে; কিন্তু সে অধিকারের মর্যাদা না পেয়েও বাকি তিনটি কম কি করল? শিবপুর আমার জীবনে না এলে জীবনের কতখানি যে বাদ প'ড়ে যেত ভাবতে গেলে জ্ঞান থাকেনা। তাকে যে দু'টি রূপে পেয়েছি—যৌবনে মাতুলালয়রূপে, উত্তর জীবনে আজও আপন সহোদরারই গৃহরূপে, উভয়ক্ষেত্রেই শিবপুর অঞ্জলি ভ'রে দিয়ে গেছে আমায়।

না হয় শিবপুরকেও আলাদা করে রাখলাম; জন্মসূত্রেই তো। কিন্তু…

আর নিউ আলিপুর, যেখানে একদিনের তরে ভাববার অবসর পেলাম না—এ আমার জন্মসূত্রে পাওয়া নয়?

আমার বিধাতা লুকোচুরি খেলায় হেরেছেন।

কিম্বা, শেষ পর্যন্ত তাঁরই জিত বলব?—মায়ের মতো ভরামুঠিটা পেছনে লুকিয়ে রেখে শূন্য হাতটা সামনে ধ'রে সন্তানের সঙ্গে কান্না-হাসির খেলা খেলে যাওয়া।